
প্রচেত গুপ্তর গল্প

প্রচেত গুপ্তর গল্প

প্রচেত গুপ্তর গল্প

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদপট : দেবব্রত ঘোষ

PRACHETA GUPTOR GALPO (Stories)
by
Pracheta Gupta
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan De Street, Kolkata 700 073

ISBN : 978-93-5020-050-6

শব্দগ্রন্থন
টেকনোগ্রাফ, ১/৯৮ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস ৭৩ শিশির ভাদুড়ি সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬ হইতে প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

এতদিন পর্যন্ত আমি একাই বই উৎসর্গ করে এসেছি। এটাই নিয়ম। একমাত্র লেখকই বই উৎসর্গ করার অধিকারী। এই বইয়েরবেলায় সেই নিয়ম আমি ভাঙছি। না ভেঙে উপায় নেই। কারণ যে মানুষটিকে এই বই উৎসর্গ করছি, তাকে আমরা দু'ভাই-ই বড্ড ভালোবাসি। একজন সামনাসামনি, একজন একটু আড়াল থেকে।

প্রাণের বন্ধু সুব্রত সেনগুপ্তকে (টুকুন)— প্রচেত, পুষ্কর।

অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
(চাবি)

লেখকের নিবেদন

আমার গল্পের বইয়ের সংখ্যা বেশি নয়। নীল আলোর ফুল, পঞ্চাশটি গল্প, প্রিয় বান্ধবীকে, রূপোর খাঁচা, আশ্চর্য পুকুর। এই বইতে যে গল্পগুলি রইল তা আমার অন্য কোনো বইতে প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সংকলনে ছড়িয়ে ছিল। মিত্র ঘোষের উদ্যোগে এক সঙ্গে করা হল। গল্প কেন লিখি স্পষ্ট করে বলতে পারব না। দশ বছরের বেশি সময় ধরে লেখার পরও মনে হয়, যা লিখতে চাই তা এখনো লেখা হয়নি। আমি পারছি না। শুনেছি, লেখকের ভেতর এই অতৃপ্তি থাকা ভালো। আমি অত ভালো মন্দ বুঝি না। যা সত্যি তাই বললাম। তবে কোনো কোনো গল্প শেষ করে আনন্দে বা বেদনায় মন ভরে যায়। চোখে জল আসে। গোপনে সেই জল মুছে ভাবি, আমার মতো অতি সামান্য একজন লেখককে গল্প এর থেকে বেশি কী দিতে পারে?

সূচিপত্র

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

জলে আঁকা

ঝিলডাঙার কন্যা

চাঁদের বাড়ি

আশ্চর্য পুকুর

বাইশে শ্রাবণের গল্প

প্রেম হলেই যে বিয়ে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই।

বরং প্রেম হলে বিয়ে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আকছার ঘটছে। ঘটার 'যুক্তিসংগত' কারণও থাকে। কখনো ছেলে-মেয়ের তুমুল ঝগড়া হয়। কখনো ছেলে আরও সুন্দরী প্রেমিকা জুটিয়ে ফেলে। কখনো আবার মেয়ের জন্য বাবা দুম করে মোটা মাইনের পাত্র পাকড়ে ফেলে। সহজ-সরল মেয়ে, কী করবে সে? মোটা মাইনের পাত্র ফেলে বেকার প্রেমিকের জামা ধরে ঝুলে পড়বে? এ-কাজ কখনো করা যায়? বাবা-মা দুঃখ পাবে না? মেয়ে যে কাউকে দুঃখ দিতে পারে না। কখনো ঘটনা ঘটে আচমকা। কিছু বোঝার আগে শত্রুপক্ষ 'প্রেম'-এর ওপর বমিং করে চলে যায়। বলা নেই-কওয়া নেই, বড়ো মাসির ননদের ছেলে আমেরিকা থেকে উড়ে আসে দুম করে। রূপসী 'প্রেমিকা'কে বিয়েবাড়িতে দেখে পাগলপারা অবস্থা। এমন সুন্দরী নাকি সে শেষ দেখেছিল মাদ্রিদে। বাঙালি মেয়েও এত সুন্দরী হয়! বোঝ কাণ্ড। এর পর আর তাকে কে আটকাবে? ভস করে বিয়ে করে ভুস করে উড়ে চলে যায়। শর্ট টাইমে বিয়ে বলে প্রেমিকা বেচারি প্রেমিককে বলার সময়ও পায় না। প্লেনে উড়ে যেতে যেতে ভাবে, 'ইস, আমি যদি সীতা হতাম, রামচন্দ্রকে পথ দেখানোর জন্য গায়ের গয়নাগুলো খুলে প্লেনের জানলা দিয়ে ফেলতে ফেলতে যেতে পারতাম। যাক, এ-জন্মে যা হওয়ার হয়ে গেছে। পরের জন্মে আমি ঠিক সীতা হব।' এখানেই শেষ নয়। প্রেমের পর বিয়ে না হওয়ার আরও কারণ আছে। অনেক সময় 'মৃত্যুপথযাত্রী ঠাকুমা'র কথা রাখতে নাতি 'বাধ্য হয়ে' প্রেমিকাকে বিয়ে করতে পারে না। এমনি ঠাকুমা হলে একটা কথা ছিল, 'মৃত্যুপথযাত্রী' ঠাকুমা আলাদা ব্যাপার। তার শেষ ইচ্ছে রাখতেই হয়। প্রেম মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ছেলে তিনটে বাড়ি, চারটে গাড়ি, দশ বিঘে জমি, দুটো পুকুরের মালিকের ক্লাস এইট পাশ করা শ্যামলা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। এইসব ক্ষেত্রে অবশ্য বেশিরভাগ সময়েই

নাতির বিয়ের পর ঠাকুমা ম্যাজিকের মতো সুস্থ হয়ে ওঠেন। অন্তত ছেলে তো সে-রকমই বলে। এ-বছর শ্রাবণ মাসের অবস্থা টাইট। মাস শেষ হতে চলল বৃষ্টি-বাদলার দেখা নেই। একেবারে খটখটা। এই সময়ে প্রেম ও বিয়ে নিয়ে এত বকবক করার কারণ কী?

কারণ আমার এবং তুলির বিয়েও ভেঙে গেছে। সেটা বলার জন্যই এত বড়ো ভূমিকা। তবে আর পাঁচজন প্রেমিক-প্রেমিকার বিয়ে ভাঙার সঙ্গে আমাদের বিয়ে ভাঙার কোনো মিল নেই। আমাদের বিয়ে কোনো সুন্দরী মেয়ে, আমেরিকা থেকে উড়ে আসা ননদের ছেলে, বাবার পাকড়াও করা মোটা মাইনের পাত্র, মৃত্যুপথযাত্রী ঠাকুমা ভাঙেননি। আমাদের বিয়ে যিনি ভেঙেছেন তাঁর নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ওরিজিনাল রবীন্দ্রনাথ। পঁচিশে বৈশাখ যাঁর জন্ম, মৃত্যু বাইশে শ্রাবণে। তিনি এই কাজটি করেছেন, আমার বাবা, শ্রীভূপতি হালদারের মাধ্যমে। বড়োমানুষরা মৃত্যুর পরও অন্যের মাধ্যমে নানা ধরনের কাজ করতে পারেন।

তবে ঘটনা এখানেই শেষ নয়। এই বিয়ে ভাঙার জন্য আমার প্রেমিকা তুলি আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে। কী আশ্চর্য! বিয়ে তো আমি ভাঙিনি। বিয়ে ভেঙেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভায়া বাবা। আমি তো তুলিকে ভীষণ ভালোবাসি। আমি তাকে বিয়ে করতেই চাই। তাহলে আমার ওপর কেন প্রতিশোধ? তুলি আমার মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়েছে—আই শ্যাল কিল ইউ।

আমি দোতলা থেকে পা টিপে টিপে নামছি। আওয়াজ হতে পারে বলে জুতো পরিনি। জুতো আমার হাতে। এই মুহূর্তে বাইরের কেউ দেখলে আমাকে চোর ভাববে। ভাববে চোর চুরি সেরে সিঁড়ি দিয়ে চুপি চুপি নেমে যাচ্ছে।

কথাটা অর্ধেক ঠিক, অর্ধেক ভুল। আমি চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়ে নামছি ঠিকই, কিন্তু আমি চোর নই। আমি এ-বাড়ির ছেলে। এ-বাড়ির ছেলে হয়েও আমি চোরের মতো আচরণ করছি কেন? করছি তার কারণ আজ শ্রাবণ মাসের বাইশ তারিখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিন। কথাটা শুনে অবাক লাগছে? অবাক লাগবারই কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিনে আমাকে চোরের মতো আচরণ করতে হবে কেন? একটু গোড়া থেকে বলে নিই। যদিও হাতে বেশি সময় নেই। সংক্ষেপে যতটা পারি বলছি।

আমার নাম নিখিলেশ। নরমাল নিখিলেশ নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিখিলেশ। আমার বাবা এই নাম রেখেছেন। আমার বাবা ভূপতি হালদার একজন রবীন্দ্রনাথ-পাগল মানুষ। রবীন্দ্রনাথে পাগল বহু মানুষই। কিন্তু আমার বাবার পাগলামি 'বাড়াবাড়ি ধরনের পাগলামি'। বৈশাখ আর শ্রাবণ মাসে মানুষটা প্রায় সর্বক্ষণ চোখ দুটো আধবোজা করে রাখেন। ধ্যানের মতো ভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উচ্চারণের সময় জোড় হাত কপালে ঠেকান। মাঝেমধ্যে মনে হয়, যদি সম্ভব হত উনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো জোব্বা পরতেন, লম্বা দাড়ি রাখতেন। তারপর ছাতা হাতে আঠেরো নম্বর ট্রামে উঠে অফিস যেতেন। কন্ডাক্টর টিকিট চাইতে গিয়ে থমকে যেত। মানুষটাকে চেনা চেনা লাগে না!

পুত্রের জন্মের খবর পেয়ে বাবা একটুও সময় নষ্ট করেননি। আলমারি থেকে রবীন্দ্র রচনাবলীর সেট নামিয়ে নিলেন। নামিয়ে ফরফর করে গল্প, উপন্যাস, গান, কবিতা, নাটক এমনকী প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের পাতাও উলটোতে থাকেন। যেখানেই কোনো নাম পান, থমকে যান। মনে ধরলে নোট রাখেন। না-ধরলে বাদ। শেষ পর্যন্ত নাম চূড়ান্ত হয় নক আউট সিস্টেমে। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, ফাইনাল। ফাইনাল লড়াই হয় ঘরে বাইরের নিখিলেশ আর নষ্টনীড়ের অমলের মধ্যে। টাফ ফাইট। শেষ পর্যন্ত 'নিখিলেশ' জেতে এবং আমার ঘাড়ে চেপে বসে। বাবা নাম নিয়ে ছুটলেন নার্সিং হোম।

নার্সিং হোমের বেবিকটে আমি শুয়ে আছি। বাবা ঝুঁকে পড়ে পরম আদরে ডাকলেন 'বাবা নিখিলেশ, নিখিলেশ সোনা আমার'। আমি চিলচিৎকার দিলাম। আয়ামাসি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল গদগদ মুখে। বাবা আয়ামাসির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেন, 'ছেলের নাম পছন্দ হয়েছে। বড়োদের সঙ্গে শিশুর এটাই তফাত। বড়োরা পছন্দ হলে হাসে, শিশুরা আচরণ করে উলটো। তারা কাঁদে। কেঁদে বলে, আমি খুশি।'

আয়ামাসি এক গাল হেসে বলে, 'ঠিক কইসেন। শিশু মানুষের সবই উলটো-পালটা। ওরা খুশি হইলে কান্দে, আবার অইত্যন্ত খুশি হইলে অনেক সময় হাগামুতাও কইরা ফ্যালে। আমার মনে হয় আপনার পুলাও তার নাম শুইনা অইত্যন্ত খুশি হইসে এবং হাগামুতা কইরা ফ্যালসে। সরেন একবার দেইখ্যা লই।'

আমার বাবা সরে দাঁড়ালেন। সত্যি আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি কি না তা দেখার জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এ সবই শোনা কথা। কোনো কনফার্মেশন নেই। সত্যি কিনা জোর দিয়ে বলতে পারব না। সত্যি হতে পারে আবার মিথ্যেও হতে পারে। পাকাপাকি বলতে পারবেন ভূপতি হালদার। বলাবাহুল্য তাঁকে এসব অর্বাচীন প্রশ্ন করার সাহস আমার নেই। তবে আমার মা যে 'নিখিলেশ' নামে ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। মা নিজেই সে-কথা বলেছেন। নিখিলেশ শুনে মা নাকি বলেছিলেন, 'এমা! নিখিলেশ আবার কী! আজকের দিনে ছেলেপিলেদের আবার এরকম নাম হয় নাকি! ছি ছি।'

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, 'আজকের দিনে ছেলেপিলেদের কী ধরনের নাম হয় সোহিনী?'

মা লজ্জা লজ্জা মুখে বললেন, 'আমার দুটো লিস্ট আছে। মেয়ে হলে একটা, ছেলে হলে আর একটা। এতদিন কাউকে বলিনি। আজ তোমাকে বলছি। নার্সিং হোমে ভরতি হওয়ার সময়ে সেই লিস্ট আমি লুকিয়ে সঙ্গে এনেছি। দাঁড়াও, পড়ে শোনাই।'

কথা শেষ করে মা বালিশের তলা থেকে কাগজের টুকরো বের করেন। কিন্তু বাবা মাকে পড়বার সুযোগ দিলেন না। শান্ত গলায় বললেন, 'নিখিলেশ নামটা

আমার নয় সোহিনী। এই নাম আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকে সংগ্রহ করেছি। তোমার নামের থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম গ্রহণ করাটাই কি বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না? তুমি কী বল?'

মা ঠোঁট উলটিয়ে বললেন, 'এই হাবিজাবি নামের জন্য রবীন্দ্রনাথের কী দরকার ছিল, এ তো আমিও দিতে পারতাম।'

বাবা আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, 'যা বোঝো না তাই নিয়ে কথা বোলো না। হয়তো দিতে পারতে, কিন্তু তোমার নিখিলেশ আর রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশ এক হত না। আমার সিদ্ধান্তই ফাইনাল। ছেলের নাম নিখিলেশই থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিখিলেশ।'

শুনেছি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিখিলেশ' কথাটা বলার মধ্যে আমার বাবা এক ধরনের গর্ব প্রকাশ করেছিলেন। আমার মা তাতেও ভোলেননি। তারপরেও প্রতিবাদ করেছেন।

'দেখবে ছেলেই একদিন নিজের নাম নিয়ে রাগ করবে। তার বন্ধুরা যখন হাসিঠাট্টা করবে আমাদের এসে কথা শোনাবে।' বাবা নির্লিপ্ত গলায় বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে যদি মূর্খ হয়, তার বন্ধুরা যদি মূর্খ হয়, তার জন্য আমি কী করব? রবীন্দ্রনাথকে ফেলে দেব? যদি তাই চাও হবে। তুমি নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরে রবীন্দ্র রচনাবলীর পুরো সেট ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবে। কেউ যদি বলে, 'এ কী করছেন আপনি! রবীন্দ্র রচনাবলী ফেলে দিচ্ছেন! তুমি বলবে, আমার ছেলে মূর্খ, তাই ফেলছি।'

মায়ের এই দুশ্চিন্তা অমূলক প্রমাণিত হল। হওয়ারই কথা। বন্ধুরা আমার নাম নিয়ে কোনোরকম হাসিঠাট্টা করল না। বন্ধুরা কখনো নাম নিয়ে ভাবে না। তাদের কাছে কায়দা মার্কা নামও যা ফেলাছড়া নামও তাই। তাঁরা যেমন তৃষ্ণীক, অরিঞ্জয়, ঋষভ, সায়নকে ভালোবাসে, তেমন পচা, ঘণ্টা, ভটুকেও ভালোবাসে। বড়ো হওয়ার পর আমার বেলাতেও তাই হল। নিখিলেশ নামে কারো কিছু এসে গেল না। ভালোও বলল না, খারাপও বলল না। কেউ মাথাই ঘামালো না। আমিও রবীন্দ্রনাথের কথা বেমালুম চেপে গেলাম। তবে অনেকেই নামটা ঝেড়েঝুড়ে নিজের মতো করে ছোটো করে নিয়েছিল। কেউ ডাকত নিখিল। কেউ ডাকত খিল। কেউ ডাকে নিলে। এখন তুলি আদর করে ডাকে 'নি'। আদরের মাত্রা বাড়লে 'নি' সম্বোধনে মোবাইল-চিঠি পাঠায়। একটা চিঠি তো তার খুবই ফেবারিট। প্রায়ই মেসেজ করে।

'নি, অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, তোমার মতো একজন হ্যাবলা-ক্যাবলা ছেলের সঙ্গে আমার পক্ষে আর সম্পর্ক রাখা ইমপসিবল। সুতরাং এখানেই দ্য এন্ড। নি, তুমি মানে-মানে কেটে পড়ো।'

তবে এসব অনেক পরের কথা। তুলির সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছে কলেজ ছাড়ার পর।

এই হল আমার মোটামুটি ব্যাকগ্রাউন্ড। ও একটা কথা বলতে ভুলে গেলাম। আমার বোনের নাম কুমুদিনী। ডাক নাম কুমু। বলাবাহুল্য এই নামও আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই শুনতে পাচ্ছি নীচের ঘরে মা গাইছেন—

'যেতে দাও যেতে দাও গেল যারা/তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না,/আমার বাদলের গান হয়নি সারা॥/কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার, নিভৃত রজনী অন্ধকার...।'

গানের মধ্যে অনেক ইনফর্মেশন। গান বলছে, এখন অন্ধকার রাত এবং বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। রাত কত, তারও মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। রাত বেশি। সেই কারণে সবাই বাড়ির দরজা বন্ধ করেছে। তবে বৃষ্টির তেজ কেমন সেটা পরিষ্কার নয়। জোরেও হতে পারে, আবার টিপটিপ করেও হতে পারে। আরও কটা লাইন শুনলে হয়তো বোঝা যাবে। সব কথা প্রথম দু-তিন লাইনের মধ্যে থাকবে এমন আশা করা ঠিক নয়। গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাসে এই ধরনের ফ্যাচাং থাকে। অনেক সময়েই আসল কথা থাকে শেষে। একরকম ভাবা হয়, ঘটে অন্যরকম। সেদিক থেকে ভাবলে, গানের শেষ জানার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। রাত কত, বৃষ্টি কত এই সিচুয়েশনে আমার বাড়ি থেকে বেরোনো কি উচিত?

না, এসবের কিছুই প্রয়োজন নেই। এখন মোটেও রাত নয়, বৃষ্টিও হচ্ছে না। এখন সকাল দশটা বেজে বারো মিনিট। চারপাশে ফ্যাটফ্যাটে আলো। এই সাতসকালেই কড়া রোদ উঠেছে। আমি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি। গোড়াতেই বলেছি আমাকে পা টিপে টিপে নামতে হচ্ছে, কারণ আজ বাইশে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিন। বাড়িতে আজ হুলুস্থুল কাণ্ড। আমার বাবার মতো একজন রবীন্দ্র পাগল মানুষ এই দিনে যে বাড়িতে হুলুস্থুল কাণ্ড করবেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ঘটনা নতুন নয়। প্রতি বছরই হয়। তবে হুলুস্থুল মানে হইচই, হাসাহাসি, ঠাট্টা-তামাশা নয়। গুরুগম্ভীর পরিবেশ। একতলার ড্রয়িংরুমে সোফা, টেবিল, টিভি সরিয়ে পাতা হয়েছে ফরাশ। রাখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো ফটো। ফটো বড়ো নয়, মাঝারি। গলায় মোটা মালা দেওয়ার কারণে মানুষটার মুখ অনেকটা ঢাকা পড়ে যায়। ইচ্ছে করলে ফটো বদলানো যায়। বাবা রাজি নন। একমাত্র এই ফটোতেই নাকি তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ, সৌম্য ভাব খুঁজে পেয়েছেন। ফটোর দু-পাশে ফুলদানিতে রজনীগন্ধার স্টিক।

পঁচিশে বৈশাখ এবং বাইশে শ্রাবণ আমাদের এই পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সকাল থেকে খেপে খেপে লোক আসে। পাড়ার বয়স্ক মানুষরা আসেন সকালের দিকটায়। একেবারে জলখাবার সেরে তবে যান। বিকেলের পর পাড়ার মায়েরা ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে আসেন। তখন টাইম টিফিনের। সকাল-বিকেল দু-বেলাই খাবারের মেনু এক। চারটে লুচি, আলুর দম, একটা করে মিষ্টি। এ বছর পঁচিশে বৈশাখ লোক কম এসেছিল। তাই বাবা মিষ্টির সংখ্যা বাড়িয়ে দুই করেছেন। অনেকে খান না। অসুবিধে নেই, প্যাকেটের ব্যবস্থা থাকে। প্যাকেটের ওপর বাবার

নির্দেশমতো কুমু কিছুমিছু লিখে দেয়। এবার যেমন লিখেছে—বাইশে শ্রাবণ লহ প্রণাম। কুমু নানা ধরনের হাতের লেখা করতে পারে। লুচি, আলুর দমের প্যাকেটে সে ব্যবহার করে রাবীন্দ্রিক স্টাইল। ইচ্ছে করে দুটো কথা কেটে ফুল-পাতা এঁকে দেয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন করতেন। খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে ফরাশে পা গুটিয়ে বসে গান, কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা চলে। সকালের সেশনে প্রায় কেউই কিছু বলেন না। নীরবে খান। বাবা নিজেই বকবক করেন। মাঝে মাঝে মা এসে গান ধরেন। বিকেলের সেশনে পার্টিসিপেশন বরং বেটার। পাড়ার মা-মাসি-পিসি হারমোনিয়াম বাজিয়ে প্রবল উৎসাহে গান ধরেন। নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট বেতাল, বেসুরো, ভুল কথা। তারা ছেলে-মেয়েদেরও জোর করে গান করায়, কবিতা বলায়। ছেলে-মেয়েরা যে সবসময় রাজি হয়ে যায় এমন নয়। তখন মায়েরা চোখ পাকিয়ে বলে, 'না-করলে কিন্তু এরা লুচি দেবে না।' ছেলে-মেয়েরা তখন পরিত্রাহি চিৎকার করে ওঠে—'মনে করো যেন বিদেশে ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে...' দু-চার লাইনের পরই কবিতা ভুলে যায়। বাবা মধুর হেসে বলেন, 'এতেই হবে, এতেই হবে। মুখস্থ করা বড়ো কথা নয় বাবা, মনীষীকে স্মরণ করাটাই বড়ো কথা।'

কুমু থাকে জলখাবার পরিবেশনের দায়িত্বে। আমাকে থাকতে হয় গেটে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। কেউ এলে বলি, 'আসুন আসুন'। স্কুল জীবন থেকে এই কাজ করছি। একবার কলের মিস্ত্রি বানোয়ারকে চিনতে পারিনি। জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে ফরাশে বসিয়ে দিয়েছিলাম। বানোয়ার বিহারের মানুষ। সে খুবই হতভম্ব হয়ে যায়। আমি যে ভুল করেছি সেটা বুঝতে পারি ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর। কিন্তু তখন সিচুয়েশন কন্ট্রোলের বাইরে। কারণ বাবাও তাকে চিনতে পারেননি। কে জানে পরিবেশ বদল হলে মানুষের চেহারাও হয়তো বদলে যায়। বাবা, একসময় বানোয়ারকে বলে বসলেন, 'এবার আপনি কিছু বলুন।' আশ্চর্যের কথা বানোয়ার লজ্জা-পাওয়া গলায়, ভাঙা হিন্দি, ভাঙা বাংলায় ঠাকুরকে নিয়ে চার লাইন বলেও ফেলল! তার ক্লাস ফোরের মেয়ে যখন স্কুলের বই খুলে দুলে দুলে হিন্দিতে 'আমাদের ছোটো নদী...' কবিতাটা পড়ে তখন নাকি তার ফেলে আসা নিজের গাঁয়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে ফেলে আসা নদীর কথা। বলতে বলতে বানোয়ারের চোখে জল চলে আসে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ আমাদের বাড়ি থেকে বেরোনোর কোনো প্রশ্ন নেই। ভোর হতে-না-হতে স্নান সেরে নিতে হয়। তারপর যে যার ডিউটিতে নেমে পড়ি। একটা বয়েসে আমি আর কুমু আপত্তি করেছি। এ আবার কেমন কথা! রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে ধেড়ে ছেলে-মেয়েকে জোর করে বাড়িতে আটকে রাখার অর্থ কী? ভূপতি হালদারের যদি প্রাণ চায় উনি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে মাতামাতি করুন। জন্মদিনে ধেই ধেই করে নৃত্য করুন। মৃত্যুদিনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদুন। আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন বাপু?

আপত্তি অবশ্য বাবার কাছে করার সাহস হয়নি। করেছি মায়ের কাছে। লাভ হয়নি। মা বাবার সাইড নিয়েছেন। 'সারাবছরই তো বাইরে উড়ে বেড়াচ্ছ। বছরের দুটো দিন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে থাকতে আপত্তি কীসের? বাঙালি হয়েছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে শিখতে হবে না?' পরে দেখেছি, মার বাবাকে সাপোর্ট করার পিছনে কারণ আছে। এই দুটো দিন মা ইচ্ছেমতো গান গাইবার সুযোগ পান। ঘুরতে-ফিরতে ফরাশ পাতা ঘরে ঢুকে টুক করে দুটো গান গেয়ে আসেন। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। বারণ করার কেউ নেই। তুলে দেওয়ার কেউ নেই। বরং লুচি, আলুরদম খেতে খেতে সকলেই বলে, 'বাঃ বাঃ, কী গলা কী সুর! কী কথা!' যেন 'রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে, প্রাণমনে ধরি রাখো আনন্দবন্ধনে' গানের কথা রবীন্দ্রনাথের নয়, লেখা আমার মায়ের। অথবা 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে/বলে শুধু, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে' গানের সুর রবীন্দ্রনাথ দেননি, দিয়েছেন আমার মা, সোহিনী হালদার। মিষ্টি খাওয়ার সময় শ্রোতাদের তারিফ বেশি পাওয়া যায়। রস লাগা হাতে তাদের কেউ কেউ এমন হাততালি দিয়ে ওঠে, মনে হয় এতক্ষণ গান গেয়ে উঠলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়! নিজের বাড়ি ছাড়া এই সুযোগ মা কোথায় পাবেন? কোথাও পাবেন না। কারণ মায়ের গলায় সুর কম। আমি দেখেছি, যাদের গলায় সুর কম তারা গান গাইতে সবথেকে পছন্দ করে। রবীন্দ্রনাথের গানের বেলায় এই ঘটনা সবথেকে বেশি ঘটে।

আজ আমি পড়েছি বিরাট বিপদে। বাইশে শ্রাবণ হলেও আজ আমি বাড়ি থাকতে পারব না। আজ তুলি প্রতিশোধ নেবে।

ফরাশ পাতা ঘরে মা গান গেয়ে বলছে, 'তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না', কিন্তু আমার এ-কথা শুনলে চলবে না। আমাকে যেতে হবে। ঠিক এগারোটার সময় তুলির সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তুলি আমাকে বলেছে, 'এক মিনিটও যেন দেরি না হয়।' আমি হ্যাবলা-ক্যাবলা মানুষ। তুলির মতো সুন্দরী, স্মার্ট, আধুনিক মেয়ের হুকুম অমান্য করার সাহস আমার নেই।

তুলির সঙ্গে আগে কখনো এত সকালে আমি দেখা করিনি। আমাদের পাঁচ বছরের প্রেম। প্রেম করেছি বিকেলে। সেই বিকেল কোনো কোনো দিন রাত পর্যন্ত গড়িয়েছে। তবে বেশি রাত নয়, কম রাত। শুনে কি মনে হচ্ছে আমি একজন স্কুল-কলেজে পড়া ছোটো ছেলে? না। আমি চাকরি করা একজন অ্যাডাল্ট যুবক। কিন্তু আমার বেশি রাত পর্যন্ত বাইরে থাকার নিয়ম নেই। ভূপতি হালদার যতই রবীন্দ্রনাথের নাম শুনে চোখ বুজে ফেলুন, তিনি একজন কড়া প্রকৃতির মানুষ। আশাকরি এতক্ষণে সেটা খানিকটা বোঝাও গেছে। মানুষ কড়া না নরম বোঝার জন্য নানা টেকনিক আছে। তার একটা হল মর্নিংওয়াক। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই বাবাকে দেখেছি ঘড়ি দেখে মর্নিংওয়াক করেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কোনো ঋতুতে বাদ নেই। উপরন্তু বৃষ্টিতে ভদ্রলোক ছাতা মাথায় হাঁটেন। কনকনে শীতে দেখেছি গায়ে

চাদর, মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। গম্ভীর মুখে হেঁটে চলেছেন হনহনিয়ে। সেই হাঁটার মধ্যে একটা 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' টাইপ ভঙ্গি। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, এই মানুষ কড়া। পরে বুঝলাম শুধু কড়া না, বেশি কড়া। বেশি কড়া হওয়ার কারণে আমার বাবা মর্নিংওয়াকের সময় মানুষকে চিনতে পারেন না। কথা বলেন না। এমনকী বাড়ির লোককেও নয়! একটা ঘটনা বলি। সেবার বড়োমামা পাটনা থেকে আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলেন। কাকভোরে ট্রেন থেকে নামলেন হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়ি। বাড়ি নয়, আমাদের গলির মোড়। বাবা তখন মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছেন। বড়োমামা বাবাকে দেখে উল্লসিত হলেন। চিৎকার করে বললেন, 'ভূপতি, ভূপতি। আরে ও ভূপতি।'

বাবা মুখ তুলেও তাকালেন না। অপমানিত বড়োমামা ট্যাক্সি ঘুরিয়ে বালিগঞ্জে পিসির বাড়ি চলে যান। পরে বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমার কিছু করার ছিল না।' এই বাবার কথা অমান্য করব কীভাবে? বাড়ি ফিরতে রাত হলে উনি আমাকে বলেন, 'নিজে রোজগার করলেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করার লাইসেন্স পাওয়া যায় বলে তো শুনিনি।'

আমি মাথা চুলকে বলেছিলাম, 'অনেক সময় অফিসের কাজে দেরি হয়ে যায়।'

'দেরি। সরকারি অফিসে আবার দেরি কীসের হে? করো তো কনিষ্ঠ করণিকের কাজ।'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'অনেক সময় আউটডোরের কাজ থাকে তো।'

'আউটডোর! তুমি কি ফিল্মস্টার নাকি যে আউটডোরে গিয়ে শুটিং করবে! এর পর যেদিন আউটডোর থাকবে, আমাকে খবর দেবে। আমিও যাব।'

এর পর আর রাত করে বাড়ি ফেরার উপায় আছে? তুলি আজ আমাকে তার সল্টলেকের বাড়িতে যেতে বলেছে। ঠিক বাড়িতে নয়, বাড়ির বাইরে। ওদের বাড়ির বাইরে যে বড়ো লোহার গেটটা আছে তার সামনে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তিনদিন আগে সাউথ সিটি হলে জিলেটো আইসক্রিম খেতে খেতে সে যখন আমাকে এইসব কথা বলে, আমি ঘাবড়ে যাই। এত সকালে তুলি আমাকে কেন ডাকছে? ওর বাবার রাগ কি আরও বেড়েছে? আমাকে মারধর করবেন? করতেই পারেন। ভদ্রলোক এক সময় মিলিটারিতে ছিলেন। বড়ো অফিসার। মিলিটারি মানুষরা যেমন প্রাণ খুলে হাসতে পারে, তেমনি গোঁফ চুমরে রাগতেও জানে। ওদের হাসিও থামতে চায় না, রাগও চট করে কমতে চায় না। তার ওপর ভদ্রলোকের শরীর-স্বাস্থ্য ভালো। আমাকে মারতে মোটেও পরিশ্রম করতে হবে না। এখন মনে হচ্ছে, কেন যে মরতে মিলিটারি কন্যার সঙ্গে প্রেম করতে গেলাম। আমি একটা নরম-সরম, ভীতু, ক্যাবলা, ভ্যাবলা ছেলে। এসব কি আমাকে মানায়? আচ্ছা, আমার কথা না হয় বাদই দিলাম। তুলিই-বা মরতে মিলিটারির মেয়ে হতে গেল কোন দুঃখে? আচ্ছা, তুলির বাবার কি আরও কঠিন কোনো পরিকল্পনা আছে?

মারধরের থেকেও বেশি? ওর কাছে বন্দুক আছে। ছাদ থেকে গুলি করবেন না তো? সেইজন্যই কি আমাকে বাড়ির বাইরে দাঁড়াতে বলেছে? তুলি কি এ-রকম নিষ্ঠুর একটা কাজ করতে পারবে? আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাবার হাতে বন্দুক তুলে দেবে? দিলে দেবে। পিতার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার কন্যার তো আছেই। কী আর বলব। আমার ঘাবড়ানোর আরও কারণ আছে। বাইশ তারিখ বাড়ি থেকে বেরোব কী করে? বাবাকে কী বলব? উফ, বাবাতে বাবাতে আমি দেখছি একেবারে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছি। একদিকে নিজের বাবা, অন্যদিকে তুলির বাবা। বাইশ তারিখ কীভাবে বাড়ি থেকে বেরোব এ-কথা তুলিকে আমি শপিং মলে বসে বলিনি। বলা যাবে না। বাইশে শ্রাবণ মানেই রবীন্দ্রনাথ। আমি নিশ্চিত রবীন্দ্রনাথ শুনলে তুলি শপিং মলে বসেই ভয়ংকর কাণ্ড ঘটাত। তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠত। হাতে ধরা আইসক্রিমের কাপটা আমাকে লক্ষ করে ছুড়ে মারতেও পারে। প্রেমিককে প্রকাশ্যে আইসক্রিম ছুড়ে মারাটা উচিত নয়। কিন্তু তুলির ক্ষেত্রে উচিত হত। কিছুদিন তাদের সঙ্গে আমার বাবা যে কাণ্ড করছেন তাতে আইসক্রিম কেন, তুলি পাথর ছুড়ে মারলেও আমি অবাক হতাম না। অন্তত তার বাবার বন্দুকের গুলির থেকে সেটা ভালো হত। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসার চান্স থাকত। গুলিটুলি হলে তো সে সুযোগও থাকবে না।

এতক্ষণ উপঘটনায় ঘোরাফেরা করলাম। এবার আসি মূল ঘটনায়। অনেক ক্ষেত্রে মূল ঘটনার থেকে উপঘটনার আড়ম্বর বেশি হয়। ঝাপসা গাছের ডালপালা আগে চোখে পড়ে। মূল কাণ্ড দেখা যায় পরে। কোনো কোনো সময়ে কাণ্ড হয়তো দেখাই গেল না। তবে আমার এই কাহিনিতে তা দেখা যাবে।

গত মাসে আমার আর তুলির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তুলির বাবা আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। আমি খুবই নার্ভাস ছিলাম। ভূপতি হালদার বিষয়টি কীভাবে নেবেন বুঝতে পারছিলাম না। আবার অন্য কোনো উপায় ছিল না। বিয়ের আগে বলাবলির ফর্মাল একটা ব্যাপার তো আছে। আমি আগেই তুলির মিলিটারি বাবার কাছে গিয়ে ঢোক গিলে মাথা চুলকে, ঘেমে, বিষম খেয়ে কথাটা পেড়েছিলাম।

'...যদি কিছু না মনে করেন...একটা কথা বলি...আমি মানে আমরা...তুলি আমাকে...আমি তুলিকে...আমরা এবার বিয়ে...।'

ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠেন।

'বুঝে গেছি ইয়ংম্যান, সব বুঝে গেছি, আর বলতে হবে না। তোমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসো, তোমরা বিয়ে করবে। তাই তো? এ তো দারুণ সুখবর। তুমি আমাকে বললে, এবার আমি তোমার বাবা-মায়ের কাছে যাব। তাঁদের কাছে গিয়ে বলব, অনুগ্রহ করে আপনারা কি আমার কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করবেন? যদি করেন, আই উইল বি গ্রেটফুল।'

সেই 'গ্রেটফুল' হতেই যাওয়া। তুলির মা মারা গেছেন ছোটো বয়সে। তুলির

বাবা একাই এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। আজ একতলার যে ঘরে বাইশে শ্রাবণ পালিত হচ্ছে, চা, বিস্কুট, শিঙাড়া নিয়ে তুলির বাবার সঙ্গে সেখানেই আমার বাবার কথাবার্তা শুরু হয়। এটা-সেটা কথার পর তুলির বাবা কাজের কথায় এলেন।

'আপনারা এবার একদিন আমার বাড়িতে আসুন, আমার মেয়েকে দেখে যান।'

ভূপতি হালদার বললেন, 'ছি, ছি, আপনার মেয়েকে দেখবার কী আছে? আমার ছেলে পছন্দ করেছে এটাই যথেষ্ট। নিখিলেশের প্রতি আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। সন্তানের রক্তের মধ্যে পিতামাতার রুচি মিশে থাকে। সে ভুল করবে না। সে যখন তুলিকে পছন্দ করেছে, তার অর্থ আপনার মেয়ে এ-বাড়ির উপযুক্ত।'

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হলাম। বাঃ, বাবার কথার মধ্যে একটা পুরোনো বাংলা সিনেমার গাউন পরা, মুখে চুরুট ঝোলানো 'কমল মিত্র' ভাব! তুলির বাবাকে দেখলাম খুব খুশি। তিনি 'হো হো' আওয়াজে হেসে বললেন, 'ভেরি গুড। এ-রকম বাড়িতে মেয়েকে দিতে পারছি বলে আমি গর্বিত। তবু আমার মেয়েকে তো আপনার কিছু জিজ্ঞেস করার থাকতে পারে!'

বাবা মুখ তুলে বললে, 'বেশি কিছু নেই। দু-একটা আছে। ম্যাক্সিমাম পাঁচ-ছ'টা।'

আমি চমকে উঠলাম। তুলিকে আবার বাবার কী প্রশ্ন? কী পড়ছ? চাকরি করবে? রান্না করতে জানো? চাকরি করলে রান্না করবে কী করে?

তুলির বাবা হাসিমুখ করে বললেন, 'সেই পাঁচ-ছ-টা কোয়েশ্চেনই না হয় মেয়েকে করবেন। তারপর ডিনার খেয়ে চলে আসবেন।'

রবীন্দ্র পাগল ভূপতি হালদার এবার দুম করে একটা বাড়াবাড়ি করে বসলেন। বললেন, প্রশ্নগুলো আপনাকে করলেও হয়। বললাম তো সন্তান যেমন পিতা-মাতার শিক্ষা, রুচি বহন করে, পিতামাতাও তেমন সন্তানের শিক্ষা, রুচি, জ্ঞান ধারণ করেন।'

'বহন' 'ধারণ' শব্দগুলো তুলির বাবার ক্ষেত্রে খানিকটা কঠিনই হল। তিনি বলেন, 'ক্যারি করা বলছেন?'

বাবা হেসে বললেন, 'রাইট।'

তুলির বাবা সোফায় হেলান দিয়ে দু-হাত ছড়িয়ে বললেন, 'ইন্টারেস্টিং। এমন তো আগে কখনো শুনিনি! খুবই এক্সেপশনাল। নিন শুরু করুন মিস্টার হালদার।'

'করব?' বাবার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। আমার বুক কেঁপে উঠল। কুমু আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমার হাত ধরল খিমচে। সেও প্রমাদ গুনল। বাবা একটা কেলেঙ্কারি করে না-বসে।

'শিওর!' তুলির বাবা বললেন। গলায় জোর। মিলিটারি মানুষের গলায় জোর তো হবেই।

বাবা সামনের দিকে ঝুঁকে, নীচু গলায় বললেন, 'আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্চতা কেমন ছিল বলতে পারেন মিস্টার দত্ত?'

তুলির বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'হোয়াট?'

বাবা এবার ইংরেজিতে বললেন, 'হোয়াট ওয়াজ দ্য হাইট অফ টেগোর?'

তুলির বাবা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'এটা আমি কী করে জানব? আই ডোন্ট নো।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'বাঙালি হয়ে এত বড়ো একজন বাঙালির উচ্চতা জানবেন না? সে কী? আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, উনি ছিলেন ছ-ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। নিন, নেক্সট কোয়েশ্চেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোব্বা বানাতেন যে দর্জি তার নাম কী?'

তুলির বাবা এবার থমথমে গলায় বললেন, 'আর ইউ জোকিং মিস্টার হালদার? আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? মেয়ের বিয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ড্রেসের সম্পর্ক কী?'

বাবা জোর গলায় বললেন, 'অবশ্যই সম্পর্ক আছে। যে-বাড়ির মেয়ে আমার বাড়িতে আসছে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেই বাড়ির মেয়ের জ্ঞানগম্যি কতটা আমি জানব না? শুধু আমি নই, প্রতিটা বাঙালি পরিবারের জানা উচিত। মিস্টার দত্ত বংশ পরিচয় তো বন্দুক চালাতে পারলেই হয় না। গীতাঞ্জলি, গীতবিতানও ঘাঁটতে হয়।'

তুলির বাবা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন। তাঁর গাল লাল হয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে তিনি ভয়ংকর অপমানিত হয়েছেন। আমি ঘামছি। বাবা এটা খুবই অন্যায় করছেন। তিনি যেসব প্রশ্ন করছেন তার সঙ্গে গীতাঞ্জলি, গীতবিতানের কোনো সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথের হাইট বা জোব্বার টেলরের নাম কি ওসব বইতে আছে? বাবা সেই অপমানের আঁচ আরও বাড়িয়ে দিলেন।

'ঠিক আছে এটাও আমি বলে দিচ্ছি। ভদ্রলোকের নাম ছিল ওস্তাগর ফতেউল্লা।'

বাবা মৃদু হাসলেন। ব্যঙ্গের হাসি। বললেন, 'আপনি যদি চান আমি প্রশ্ন বন্ধ করতে পারি। আমি বুঝতে পারছি, আপনার সমস্যা হচ্ছে।'

তুলির বাবা হুঙ্কার দিলেন, 'কী বুঝেছেন? কিচ্ছু বোঝেননি। নিন আপনার থার্ড প্রশ্ন করুন।'

'মিস্টার দত্ত মনে হচ্ছে, আপনি বিপদে পড়েছেন, আচ্ছা বলুন দেখি বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা গানটা কোন তালের ওপর আছে?'

ভেতরে ভেতরে তুলির বাবা ফুঁসছেন। বাইরে আমি কাঁপছি। বাবা শান্ত গলায় বললেন, 'ঝম্পক তাল। এটা কিন্তু জানা উচিত ছিল। এই গান আমরা সবাই জানি। জানি কি না? জানা জিনিসের কিছু অচেনা থাকবে এটা কেমন কথা।'

তুলির বাবা গরগর আওয়াজ করে বললেন, 'নেক্সট?'

'আচ্ছা এবার সহজ প্রশ্ন। হে ধরণী, কেন প্রতিদিন/তৃপ্তিহীন/একই লিপি পড় ফিরে ফিরে—কবিতাটি কোন জাহাজে বসে লেখা?'

তুলির বাবা উঠে দাঁড়ালেন।

বাবা বললেন, 'জাহাজের নাম হল হারুনা মারু। কবি ১৯২৪ সালে এই জাহাজে করে...।'

তুলির বাবা চিৎকার করে উঠলেন, 'শাট আপ। ইউ আর ইনসাল্টিং মি। আমাকে অপমান করছেন। এক মুহূর্ত আমি আর এ-বাড়িতে থাকব না। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের কথা এখানেই ফিনিশ। গুড বাই।'

রাতে তুলি আমাকে মেসেজ পাঠাল—'আই শ্যাল কিল ইউ।'

সেদিন শপিং মলে বসে আমি শান্ত গলায় বললাম, 'বাড়ির বাইরে কেন তুলি?'

তুলি ভুরু কুঁচকে বলল, 'বাড়ির বাইরে হলে তোমার সমস্যা কী?'

আমি ঢোঁক গিলে বলি, 'না সমস্যা কিছু না। ভেতরে গেলে এক কাপ চা খেতাম। তোমার বাবার সঙ্গে দুটো কথা হত এই আর কি!'

চামচের কোনায় আইসক্রিম মুখে নিয়ে তুলি নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'দুটো কেন, বাবা তোমার সঙ্গে একটা কথাও বলতে চায় না। আমিও চাই না। নেহাত আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করি তাই বলতে বাধ্য হই। প্রেম না-করলে বলতাম না।'

কাতর গলায় আমি বললাম, 'আমি কি তোমার বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইব?'

তুলি আইসক্রিমের বাটিতে মন দিয়ে বলল, 'কোনো লাভ হবে না।'

'আমি তো কোনো অন্যায় করিনি তুলি। অন্যায় করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আমার বাবা। রবীন্দ্রনাথ যদি আজ এত বড়ো একটা ব্যাপার না-হতেন তাকে নিয়ে জানাজানিরও কিছু থাকত না। বাবা প্রশ্নও করতে পারতেন না। আমাদের বিয়েটা হয়ে যেত।'

'নি, আমার বাবা কাজ করেছেন মিলিটারিতে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর রিসার্চ করেননি। তোমার বাবা এটা ভালো করেই জানতেন। তবু তিনি তাঁকে এ সব প্রশ্ন করে হেয় করেছেন। সবাইকে সব জানতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তোমার বাবা কি বন্দুক চালাতে পারবেন? আমার বাবা যদি তাঁর হাতে একটা এ কে ফর্টি সেভেন রাইফেল ধরিয়ে দিতেন কী হত? আমি ঠিক করেছি এই অপমানের প্রতিশোধ নেব। এই কারণেই পরশুদিন তোমাকে ডেকেছি। তুমি আর একটা আইসক্রিম বলো। জিলেটো বলবে। ইটস ফ্যান্টাস্টিক।'

সেই পরশুদিন হল আজ। বাইশে শ্রাবণ। আমি বাড়ি থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এখন দাঁড়িয়ে আছি তুলির বাড়ির সামনে। আমার হাঁটু কাঁপছে। প্রতিশোধ কেমন হবে? আচ্ছা, আমি কত বড়ো বোকা? যে-মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার আর কোনো চান্স নেই, দু'দিন পরে যার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না, হয়তো সে বিয়ে করে হনলুলু উড়ে যাবে, হয়তো আমি বিয়ে করে 'আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।/কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো'

টাইপ বউ বিয়ে করে আনব, তুলির সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি হবে না, অথচ সেই মেয়ের কথা মতো সুড়সুড় করে চলে এলাম কেন? গুলি খাওয়ার জন্য? তুলি ঝাঁঝালো মেয়ে। তাকে আমি ভয় পাই। কিন্তু এতটা ভয় কি পাই? কেটে পড়লে কেমন হয়? ঠিক হয়। উচিত হয়। বাড়িতে গিয়ে বাইশে শ্রাবণে জয়েন করব।

চলে যাব মনস্থির করেও যখন যেতে পারছি না, ঠিক তখন তুলিদের বাড়ির লোহার গেটটা খুলে গেল। হুস করে বেরিয়ে এল লাল টুকটুকে গাড়ি। আমি চমকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, চালকের আসনে তুলি! তুলি ঝুঁকে পড়ে দরজা খুলতে খুলতে ধমক দিয়ে বলল, 'হাঁ করে কী দেখছ, এসো উঠে এসো।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে দেখলাম, তুলিকে দারুণ লাগছে। সে পরেছে শাড়ি। সেই শাড়ির রং শ্রাবণের আকাশের মতো। শুকনো খটখটে শ্রাবণ নয়, জলে মেঘে মাখামাখি হওয়া শ্রাবণ।

আমি ভয় ভয় গলায় বললাম, 'তুলি, তুমি কি গাড়ি চালাতে পার?'

'শিখছি। এক একদিন এক একটা শিখছি। কোনোদিন ব্রেক, কোনোদিন গিয়ার, কোনোদিন স্পিড। আজ যেমন স্পিড শিখব। তোমাকে নিয়ে এইট্টি, নাইনটি, হান্ড্রেডে ছুটব। সমস্যা হল, বাবা আমাকে বলেছিল, আগে ব্রেকটা শিখে নে, তারপর স্পিডে যাবি। আমি ঠিক করেছি ব্রেকটা সবার শেষে শিখব।'

আমি ঢোক গিলে আমতা আমতা গলায় বললাম, 'এটা কি ঠিক হবে তুলি? ব্রেক শেখোনি, অথচ জোরে গাড়ি চালাবে... তা ছাড়া আজ বাইশে শ্রাবণ।'

এই কথাটা বলার কোনো মানে নেই। গাড়ির স্পিডের সঙ্গে বাইশে শ্রাবণের কী সম্পর্ক? কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে নার্ভাস হলে মানুষ যা খুশি বলে বসে। তার কোনো মানে আছে কি না বুঝতে পারে না।

তুলি গাড়ির গতি বাড়িয়ে আমার দিকে মুখ ফেরাল। হিসহিসে গলায় বলল, 'আমি জানি। জানি আজ বাইশে শ্রাবণ। সেই কারণেই তো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আজকের দিনটা বেছেছি।'

আমি কপালের ঘাম মুছে স্মার্ট হাসি হাসার চেষ্টা করলাম। নিউ টাউনের ঝকঝকে রাস্তায় ঢুকে পড়েছি। তুলি গাড়ির গতি বাড়াচ্ছে হুড়মুড় করে। স্পিডো-মিটারের কাঁটা ঘুরছে বনবন করে। ঠোঁটের কোণে হেসে তুলি বলল, 'নি, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, খুব ঘাবড়ে গেছ। ঠিক আছে আমি গাড়ি দাঁড় করাচ্ছি। তুমি নেমে যাও। নো প্রবলেম, উলটো দিকে ফেরার বাস পাবে। ইউ আর ফ্রি। মুক্ত।'

তুলি সত্যি সত্যি গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। আর আমি আবার একটা বোকামি করে বসলাম। তুলির কাঁধে হাত দিয়ে শুকনো হেসে বললাম, 'থামবে না। স্পিড বাড়াও।'

তুলি ওর কাঁধে রাখা আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বড়ো সুন্দর করে হাসল। মেয়েটার এই একটা গুণ, রেগেও মেয়ে সুন্দর করে হাসতে পারে। বলল, 'স্পিড তো বাড়াতেই হবে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের বাড়িতে ঠিক সময় পৌঁছোতে হবে না?'

'ম্যারেজ রেজিস্ট্রার!'

তুলি ঝড়ের গতিতে সামনের গাড়িটাকে ওভারটেক করল। তারপর আমার দিকে না-তাকিয়েই বলল, 'আজ অফিস ছুটি, তাই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের বাড়িতেই সই-সাবুদ হবে। সব ব্যবস্থা করা আছে। বাইশে শ্রাবণ তারিখটা তো মিস করতে পারি না। আজই প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষে সবচেয়ে ভালো দিন। তুমি কি বলোনি?'

আমাদের একতলার ঘরে ফরাশের ওপর বসে আছে তুলি। তাকে কি বাড়ির নতুন বউয়ের মতো দেখাচ্ছে? বুঝতে পারছি না। বাড়িতে ঢুকে তুলি মাথায় ঘোমটা দিয়ে ভক্তিভরে ভূপতি হালদারকে প্রণাম করেছে, তারপর কঠিন গলায় বলেছে, 'বাবা, আমি, আপনার রবীন্দ্রনাথের হাইট জানি না, জোব্বার টেলরের নাম জানি না, গানের তাল জানি না, কিন্তু আমার রবীন্দ্রনাথের গান জানি। আমি একখানা গান গাইব।'

তুলি খালি গলায় গান গাইছে—'এই শ্রাবণবেলা বাদলঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা।'

তুলি এত সুন্দর গাইতে পারে! কই আমি তো জানতাম না! ভাগ্যিস আজ বাইশে শ্রাবণ।

এই গল্পের জন্য যেসব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

১। গীতবিতানের জগৎ—সুভাষ চৌধুরী, প্যাপিরাস।

২। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ—প্রমথনাথ বিশী।

৩। ক্যুইজে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য—জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী।

মানিব্যাগ

ফোনটা এল চারমাথার মোড়ে। তারক সবে অটো থেকে নেমেছে। বুকপকেটে রাখা মোবাইল বেজে উঠল।

অফিস থেকে ফেরার সময় তারক পারতপক্ষে অটোতে উঠতে চায় না। যত ভিড়ই হোক বাস ধরে। অটোতে ভাড়া একটাকা বেশি। ছুটিছাটা বাদ দিলে মাসে কুড়ি বাইশ টাকা বেশি খরচ করার মানুষ তারক নয়। অনেকদিন পর আজ অটোতে উঠেছে। কারণ আছে। আজ একটা অন্যরকম দিন। আজ একটা ঘটনা ঘটেছে। তারকের জীবনে এই ঘটনা প্রথম ঘটল। সেই উপলক্ষেই ভিড় বাসের বদলে অটো।

তারকের জীবন অবশ্য খুব ছোটো নয়। সামনের মাঘে চৌত্রিশ কমপ্লিট হচ্ছে। চাকরি জীবনও প্রায় আট বছরের। আজ যা ঘটেছে তা আগে হয়ে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। বরং সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তারকের জীবনে সেই স্বাভাবিকটাই ঘটেনি। এর পিছনে দুটো কারণ আছে। মূল কারণ হল সুযোগ। তিন মাস আগে পর্যন্ত তারক যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছে সেখানে সুযোগ মেলেনি। মাথার ওপর অনেক মাতব্বর ছিল। 'কাজকর্ম' যা হয়েছে মগডালেই হয়েছে। নীচের দিকে আসেনি। আর উপ-কারণটি হল তারকের চরিত্র। সে একজন সাবধানী এবং ভীতু প্রকৃতির মানুষ। আজ যেন দুম করে সব বাধা কেটে গেল। ঘটনাটার পর থেকে ভেতরে ভেতরে তারক একধরনের উত্তেজনা অনুভব করছে। সেই উত্তেজনায় যেমন একটা খুশির ব্যাপার আছে তেমন অপরাধবোধও রয়েছে। সঙ্গে টেনশন।

মোবাইল যখন বাজছে, তারক তখন প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করছিল। অটোর ভাড়া দেবে। তারকের মোবাইলে রিংটোন সাধারণ। গান-বাজনা কিছু নেই। শুধু 'ক্রিং ক্রিং'। টেলিফোনে অনেকরকম 'ক্রিং ক্রিং' থাকে। মধুর, কর্কশ। তারকেরটা বিতিকিচ্ছিরি ধরনের কর্কশ। স্ত্রী অঞ্জলি আর মেয়ে বুটির খুব

ইচ্ছে এই আওয়াজের বদলে মোবাইলে গান বাজুক। ফোন এলে বাইরে বাজুক, ফোন করলে ভেতরে বাজুক। অঞ্জলি রবীন্দ্রসংগীত চায়। বুটির মন হিন্দি গানে। অঞ্জলি এই বিষয়ে স্বামীকে বেশ কয়েকবার আবদার করেছে।

'মোবাইলে গান বাজলে সুন্দর লাগে। সবার তো আছে। তুমিও নাও। আজকাল কত সুন্দর সুন্দর রবীন্দ্রসংগীত পাওয়া যায়। ওইসব গান এমনি শুনতে ভালো লাগে না, মোবাইলে শুনলে ভালো লাগে। মনে হয় রবিঠাকুর মোবাইলের জন্যই ওইসব গান তৈরি করেছেন। কোম্পানিকে বললেই ওরা লাগিয়ে দেয়। এই ধর, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে, বা তোমার খেলা হাওয়া লাগিয়ে পালে।' অঞ্জলি এই পর্যন্ত বলে একটু থামল। তারপর মুখ নামিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে বলল, 'তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে।'

তারক বলল, 'আর একটা ব্যাপার! সেটা কী?'

অঞ্জলি হেসে বলল, 'ফোনে রবীন্দ্রসংগীত বাজলে সবাই অন্যচোখে তাকায়।'

তারক অবাক হল। বলল, 'মানে! অন্যচোখে তাকাবে কেন?'

'কেন তাকাবে তা আমি কী করে বলব? দেখেছি তাকায়, তাই বললাম। এই তো সেদিন ভিড় বাসে একজনের ফোনে বাজছিল আমার পরাণ যাহা চায়। সবাই ঘুরে ঘুরে লোকটাকে দেখতে শুরু করল। আমিও দেখলাম। চেহারা দেখলে কে বলবে, ওই মানুষ রবীন্দ্রনাথের গান শোনে! চিমসে মার্কা, নোংরা জামাকাপড়। অথচ কেমন রুচি দেখ! ফোনে কী সুন্দর গান লাগিয়েছে! ফোন এলেই বাজছে। গানটা আমার খুব ভালো লাগে। তোমার লাগে না?'

তারক নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'ও বুঝেছি, বেটা নিশ্চয় পকেটমার।'

'পকেটমার! কে বলেছে?' অঞ্জলি অবাক।

'কে আবার বলবে, কাগজে পড়নি? দু-দিন আগেই তো খবর ছিল। পকেটমাররা আজকাল মোবাইলে গান বাজিয়ে বাসে ট্রামে পকেট কাটছে। এন্টালি না বড়বাজারে এরকম একটা দল ঘুরছে। তারা অফিস টাইমে অপারেশন করে ভিড় বাসে ট্রামে উঠে মোবাইলে রবীন্দ্রসংগীত বাজিয়ে একজন আর একজনকে কোড পাঠায়। কাগজে ডিটেইলসে লিখেছে।'

অঞ্জলির চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। বলল, 'রবীন্দ্রসংগীত বাজিয়ে পকেটমারি!'

তারক স্বাভাবিক গলায় বলল, 'মোবাইল বাজিয়ে টিমের একজন অন্যজনের সঙ্গে কথা বলে। সেইমতো অপারেশন হয়। কখনো মেয়েদের ব্যাগ থেকে টাকা সরানোর কথা, কখনো বাস থেকে নেমে পড়বার সিগন্যাল, কখনো পকেট থেকে মানিব্যাগ তোলবার ইঙ্গিত। এক একটা রবীন্দ্রসংগীতে এক এক রকম। তোমারটা কী গান বললে যেন? হ্যাঁ ওই যে আমার পরান যাহা চায় না কী যেন, তাই তো? দেখবে ওটা হয়তো কারো পাঞ্জাবির পকেট কাটার জন্য বাজিয়েছে। ওই গানের মানে হয়তো—এবার ব্লেড চালাও। কাগজে লিখেছে, পুলিশ ওইসব কোড বোঝার

জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। থানাগুলোতে গীতবিতান কেনা হয়েছে। গানের পাশে পাশে পকেট কাটা, ব্যাগ লিফটিং, মানিব্যাগ হাপিস লেখার কাজ চলছে।'

অঞ্জলি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'যাঃ সত্যি?'

তারক হাই তুলে বলল, 'সত্যি মিথ্যে জানি না, কাগজে পড়েছি তাই বললাম।'

বুটির বায়নার কারণ সিনেমার হিট গান। যখন যেটা চলে। তার ইচ্ছে, বাবার ফোনে হিট গানটা থাকবে। ইচ্ছেমতো বাড়ির ল্যান্ড ফোন থেকে বাবাকে ফোন করে সে গান শুনবে। বাবার সঙ্গে কথা বলার কোনো দরকার নেই। গান শেষ হলে ফোন কেটে দেবে। তারক স্ত্রীর আবদার, মেয়ের বায়না কোনোটাই রাখেনি। মোবাইলে গান-বাজনার ব্যবস্থা করতে হলে আলাদা খরচ লাগে। আলাদা খরচ করার মতো ক্ষমতা তার নেই। তার সংসার চলতে ফিরতে রবীন্দ্রসংগীত বা হিন্দি সিনেমার গান শোনার নয়। তার সংসার টানাটানির সংসার। সব খরচই চেপে করতে হয়।

মানিব্যাগ থেকে দশ টাকার নোট নিয়ে অটোর চালককে এগিয়ে দিল তারক। তারপর দ্রুত হাতে মোবাইল বের করে নম্বর দেখল। নম্বর অচেনা। 'হ্যালো' বলতে ওপাশ থেকে অচেনা গলা।

'আমি কি তারক সেনগুপ্তর সঙ্গে কথা বলছি?'

তারক বিরক্ত হল। বিরক্ত হওয়ার কারণ শুধু অচেনা ফোন নয়, বিরক্ত হওয়ার কারণ ফোন আসার সময়। এক হাতে টাকা অন্য হাতে মানিব্যাগ। দুটো হাতই ব্যস্ত। এই অবস্থায় ফোন ধরা মুশকিল। কাঁধ আর ঘাড়ের মাঝখানে ফোনটা চেপে ধরে তারক খানিকটা কঠিন গলায় বলল, 'আপনি কে বলছেন?' ওপাশের গলা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারক এবার পকেটে মানিব্যাগ ঢুকিয়ে মোবাইল হাতে নিল। ধমকের ঢঙে বলল, 'কী হল! কে বলছেন?'

ওপাশের গলা একটু যেন হাসল। হতে পারে। হয়তো তারকের ধমকে মজা পেয়েছে। তারপর বলল, 'স্যার, আমাকে চিনবেন না। আমি একটা জরুরি কারণে আপনাকে ফোন করেছি।'

গলাটা অল্প বয়েসের। একটা ফ্যাসফ্যাসে ভাব আছে। তারক ভুরু কোঁচকাল। রাস্তা ছেড়ে ততক্ষণে সে উঠে এসেছে ফুটপাতে। মোড়ের কাছটা নামেই ফুটপাত। প্রায় সবটাই হকারদের দখলে। এখান থেকে বাড়ি পাক্কা সতেরো মিনিট। জোরেও নয়, আস্তেও নয়, হাঁটতে হবে মাঝারি স্পিডে। তারক হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'জরুরি কারণটা কী?'

ফ্যাসফ্যাসে গলা বলল, 'স্যার, আমি একটা মানিব্যাগ পেয়েছি। মনে হচ্ছে জিনিসটা আপনার।'

তারক ফুটপাতের মাঝখানেই থমকে দাঁড়াল। ডান হাত দ্রুত পকেটে ছোঁয়াল। এই তো তার মানিব্যাগ, নিজের জায়গাতেই রয়েছে। এক্ষুনি মানিব্যাগ থেকে টাকা

বের করে অটোর ভাড়াও তো দিল। লোকটা ভুল করছে। অন্য কারো জিনিস। তবে ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং। জিনিস আর একজনের, কিন্তু নাম এক! তারক মানিব্যাগ আগে রাখত প্যান্টের পিছনের পকেটে। অফিস কলিগ রাধাকান্তর মানিব্যাগ খোয়া যাওয়ার পর সামনে এনেছে। বছর খানেক হয়ে গেল। রাধাকান্ত ব্যাগ রাখত পিছনের পকেটে। পকেটের মুখ থাকত বোতাম দিয়ে আটকানো। মানিব্যাগ খোয়া যাওয়ার পর দেখা গেল বোতাম যত্ন করেই আটকানো। শুধু ব্যাগ নেই। যে ব্যাগ সরিয়েছে সে-ই বোতাম লাগিয়ে দিয়েছে। আবার হাঁটা শুরু করল তারক। হাঁটতে হাঁটতেই বলল, 'জিনিসটা আপনি কোথায় পেলেন?'

ফ্যাসফেসে গলা উৎসাহিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমহার্স্ট স্ট্রিটে, সিটি কলেজের দিকটায় স্যার। যেখানে আবর্জনা ফেলে তার একপাশে। আমি দেখতে পেতাম না, হঠাৎই নজরে পড়ল। কতগুলো প্লাস্টিক ব্যাগের ওপর খয়েরি রঙের পেটমোটা মানিব্যাগটা পড়ে আছে। পুরো মোটা নয়, হাফ মোটা।'

তারক মনে মনে হোঁচট খেল। তার ব্যাগও খয়েরি। অবশ্য মানিব্যাগ সাধারণত দু'রকমই হয়। কালো নয়তো খয়েরি।

'আপনি আমার মোবাইলের নম্বর পেলেন কোথা থেকে?'

ফ্যাসফেসে গলা একটু ঢোঁক গিলল যেন। বলল, 'স্যার, ব্যাগ খুলেছি বলে কিছু মনে করবেন না। না-খুললে মালিকের খোঁজ পেতাম না। একচিলতে কাগজে আপনার নাম আর মোবাইল নম্বর লেখা আছে। লাল কালি দিয়ে কাঁচা হাতে লেখা। নম্বর জড়ামড়ি হয়ে আছে। একটা থ্রি নিয়ে বেশি ঝামেলায় পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল এইট। ভালো করে দেখলাম এইট নয়, থ্রি-ই হবে। শিওর হয়ে আপনাকে ফোন করলাম।'

তারকের ভুরু আবার কুঁচকে গেল। তার মানিব্যাগে কাঁচা হাতে লাল কালি দিয়ে লেখা নাম, ফোন নম্বরের কাগজ! কে রাখল! কই, মনে পড়ছে না তো! হতেই পারে না। তারক নীচু গলায় বলল, 'ভাই, জিনিসটা আমার নয়।'

ওপাশের গলা মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে বলল, 'মানে! আপনি তারক সেনগুপ্ত নন?'

তারক একটু শব্দ করেই হাসল। বলল, 'আমি তারক সেনগুপ্ত ঠিকই, কিন্তু মানিব্যাগটা আমার নয়। আপনি নিশ্চয় নম্বরে কোনো ভুল করেছেন। থ্রি, এইটে গোলমাল হয়ে গেছে মনে হয়।'

'আপনি আজ আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে আসেননি?' ওপাশের গলার মধ্যে অবিশ্বাসের সুর।

তারক মজা পেল। এ তো অদ্ভুত কথা! যে বলছে জিনিস তার নয়, তাকেই জেরা! তারক নরম গলায় বলল, 'ভাই, আজ কেন, গত ছ-মাস আমি ওই রাস্তায় গেছি বলে মনে পড়ছে না। নর্থে আমার যাওয়া আসাই কম।'

ওপাশের গলা এবার থতোমতো খেয়ে বলল, 'ও, আচ্ছা, আমি ভেবেছিলাম...।'

'আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না ভাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কুড়িয়ে পাওয়া ব্যাগ আমার নয়। আমার মানিব্যাগ আমার কাছেই রয়েছে। কলকাতা শহরে তারক সেনগুপ্ত নাম তো শুধু আমার একার নয়, ওই নামে আরও অনেকে আছে। খুবই কমন নাম।'

'স্যার, তবু...।'

তারক আর কথা বাড়াল না। ফোন বন্ধ করে দিল। মোবাইলে নানারকম উলটোপালটা ফোন আসে। বেশিরভাগই বিক্রিবাটার বিষয়। হেন কিনুন, তেন কিনুন। দু-একবার 'আঁশটে' টাইপ কলও এসেছে। কলকলানি গলায় কোনো তরুণী বলেছে—'আপনি কি নিঃসঙ্গ? কোনো সুন্দরীর সঙ্গে গোপনে মনের কথা বলতে চান? তাহলে গভীর রাতে আমাকে ডায়াল করুন।' তারক একেবারেই নিঃসঙ্গ নয়। মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে অঞ্জলিকে নিয়ে মাঝেমধ্যে গভীর রাতে সে অন্য ঘরে চলে যায়। তারক একা একাই হাসল। সত্যি আজকের দিনটা অন্যরকম। এতক্ষণ একটা কারণে অন্যরকম ছিল। এবার দুটো কারণ হল। প্রথম কারণটা কাউকে বলা যাবে না। মানিব্যাগের গল্পটা বাড়িতে গিয়ে জমিয়ে বলতে হবে। বাড়ির কাছাকাছি এসে তারক মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়াল। মিষ্টি নিলে কেমন হয়? তার ছ'বছরের মেয়ে সন্দেশ ভালোবাসে। অঞ্জলি অবশ্য মিষ্টিতে নেই। তার পছন্দ ঝাল বা নোনতা। তার মানে যে চপ কাটলেট দিতে হবে এমন নয়, কচুরি, শিঙাড়া ধরনের কিছু দিলেও চলবে। অঞ্জলির বড়ো চাহিদা নেই। সে বোকাসোকা, সরল মেয়ে। এই ধরনের মেয়েরা ভালো হয়। অঞ্জলিও ভালো। ছাপোষা কেরানির সংসারে টানাটানি লেগেই আছে। সেই টানাটানি নিয়েও অঞ্জলির বিশেষ অভিযোগ নেই। সমস্যা বেশি হলে নিজের মনেই খানিকটা গজগজ করে চুপ করে যায়। এর সঙ্গে আরও একটা বিষয় আছে। অঞ্জলি হল 'স্বামী গদগদ' টাইপ স্ত্রী। এই ধরনের স্ত্রীরা স্বামীকে সবসময় মাথায় তুলে রাখে। সুযোগ পেলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। বাপেরবাড়ি থেকে প্রতিবেশী সকলের কাছেই স্বামীব গুণগান গেয়ে বেড়ায়। অঞ্জলির মা গীতাদেবী মেয়ের এই স্বভাবে খুবই বিরক্ত। মেয়ের মুখে জামাইয়ের 'প্রশংসা কীর্তন' তাঁর অসহ্য লাগে। কম রোজগেরে স্বামী নিয়ে এত আদিখ্যেতা কীসের রে বাপু? গীতাদেবী মেয়েকে সে-কথা আকারে ইঙ্গিতে জানিয়েওছেন। অঞ্জলির কিছু এসে যায়নি। সে চান্স পেলেই শুরু করে।

'জান মা, বুটির বাবাকে নিয়ে অফিসে সেদিন বিরাট কেলেঙ্কারি হল। কেলেঙ্কাবি করেছেন ওর স্যার।'

গীতাদেবী চমকে উঠে বললেন, 'কেলেঙ্কারি! কীসের কেলেঙ্কারি?'

অঞ্জলি এক গাল হেসে বলল, 'সেদিন সবার সামনে স্যার বলেছেন, সেনগুপ্ত, তোমার পারফরমেন্সে আমি খুব খুশি। বিলিং সেকশনে তোমার মতো এফিশিয়েন্ট স্টাফ আমি খুব কম পেয়েছি। তিনমাসে দারুণ কাজ দেখিয়েছ। ভেরি গুড।'

গীতাদেবী বিরক্ত গলায় বললেন, 'স্যার কে?'

অঞ্জলি চোখ কপালে তুলে বলল, 'ওমা! তুমি স্যারকে চেন না? ওর বস। ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ। স্যার খুব রাগী মানুষ। স্যার সবাইকে বকাঝকা করে। শুধু বুটির বাবাকে কিছু বলে না। দেখা হলে স্যার বলে, কী ইয়ং ম্যান কাজকর্ম কেমন চলছে?'

গীতাদেবী ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তুই স্যার স্যার করছিস কেন? ওই লোক কি তোর বস?'

'কি যে এক একটা কথা বল না মা। ওর স্যারকে আমি স্যার ডাকব না তো কী বলব? নাম ধরে ডাকব?'

গীতাদেবী নীচু গলায় বললেন, 'দরকার হলে তাই ডাকবি। হয় নাম ধরবি, নয় মিস্টার ঘোষ, মিস্টার বোস, মিস্টার চ্যাটার্জি বলবি। না-হলে চুপ করে থাকবি। অতবার স্যার স্যার করবি না, অসহ্য লাগছে।'

মায়ের কথা কানে না-নিয়ে অঞ্জলি বলে যেতে থাকে।

'তারপর কী হল শোন। বুটির বাবা তো স্যারের কথা শুনে খুব লজ্জা পেয়ে গেল।'

গীতাদেবী ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন? লজ্জা পেল কেন? তারক তো লজ্জার পাওয়ার মতো কিছু করেনি। সে ভালো কাজ করেছে। তার বস তার প্রশংসা করেছে। চুরিচামারি কিছু করলে লজ্জা পাওয়ার কথা ছিল।'

কথাটা শুনে অঞ্জলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'ছি ছি, তুমি ওর নামে একটা খারাপ কথা মুখে আনতে পারলে মা? ও কখনো চুরিচামারির মধ্যে থাকতে পারে? তুমি বিশ্বাস কর?'

গীতাদেবীর খুব ইচ্ছে করল, মেয়ের গালে একটা চড় লাগাই। এই জাতীয় স্বামী আহ্লাদেপনা আসলে একটা অসুখ। সেই অসুখের একটাই ওষুধ। গালে ঠাসিয়ে চড়। চড় মারলেই অসুখ দূর হবে। কিন্তু মেয়ে বড়ো হয়েছে। ঘর সংসার হয়েছে। ইচ্ছে হলেও তাকে চড় মারা যায় না। নিজেকে সামলে তিনি বললেন, 'আমিও তো সে-কথাই বলছি। সে তো ভালো ছেলে। বসের কথায় সে লজ্জা পাবে কেন?'

অঞ্জলির কান্না কান্না ভাবটা একটু কমল। বলল, 'তুমি কি তোমার জামাইকে চেন না মা? জান না সে নিজের গুণের কথা একেবারে শুনতে চায় না? তার লজ্জা করে। তুমি কি পুরোটা শুনবে না?'

গীতাদেবী হতাশ গলায় বললেন, 'আচ্ছা, বল।'

তারক ভেবেছিল অঞ্জলির জন্য শিঙাড়া কচুরি দুটোই কিনবে। মিষ্টির দোকানের ছেলেটা জানালও, দুটোর কোনোটাই নেই। খান দুয়েক নিমকি পড়ে আছে মাত্র। সন্দেশ আর নিমকির দাম মেটাতে গিয়ে মানিব্যাগটা আবার দেখল তারক। সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। খয়েরি চামড়ার এই ব্যাগ দু-বছর আগে অঞ্জলিই

দিয়েছিল তাকে। হস্তশিল্প মেলা না কুটির শিল্পের কোন দোকান থেকে কিনে এনেছিল শখ করে। দামও বেশি। উপহার পেয়ে খুশি হয়নি তারক। বেশি দামের শখ ভালো নয়। অঞ্জলিকে বলতে সে মুখ গোমড়া করে বলল, 'আমার জন্য তো কিনিনি, তোমার জন্য এনেছি। সেদিন অফিস থেকে ফিরে বললে মানিব্যাগটা নষ্ট হয়ে গেছে। নীচে ফুটো। তখনই ভেবেছিলাম, জন্মদিনে একটা ভালো কিছু কিনে দেব।'

তারক বলেছিল, 'ব্যাপারটা আমার তোমার নয় অঞ্জলি। ব্যাপারটা হল বুদ্ধির। যে জিনিস কম খরচে পাওয়া যায়, তার জন্য বেশি টাকা দেব কেন?'

অঞ্জলি চোখ বড়ো করে বলল, 'এই জিনিস কম দামে পাবে কী করে? পিওর লেদার। হাত দিয়ে দেখেছ?'

তারক ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার মানিব্যাগে ক-টা টাকা থাকে? লেদার পিওর হওয়ার দরকার কী? ভেজাল হলেই চলত। ইস অনেকগুলো টাকা নষ্ট হল।'

অঞ্জলি মুখ নামিয়ে বলল, 'অত চিন্তা কোরো না। তোমার টাকা নষ্ট হয়নি, মায়ের টাকায় কিনেছি। মা তোমার জন্মদিন উপলক্ষে টাকা দিয়েছিল। বলেছিল, কিছু কিনে দিস।'

শাশুড়ি জন্মদিন মনে রাখায় তারক খুশি হল। কিন্তু মুখে বলল, 'ধেড়ে জামাইয়ের জন্মদিন উপলক্ষে টাকা দেওয়াটাও কোনো বুদ্ধির কথা নয় অঞ্জলি।'

তারকের মানিব্যাগটা আর পাঁচটার মতোই। তিন ধরনের খাপ। বড়ো, মেজো আর ছোটো। বড়োটা চেন টেনে বন্ধ করা যায়। তারপরেই মেজো। সেটার মুখ খোলা। সামনে গোটা তিন ছোটো পকেট। একটা আর একটার গায়ে সেঁটে বসে আছে। ওপরে ফটো গোঁজার প্লাস্টিক। সেখানে বুটির ফটো। এখনকার ফটো নয়। দু-বছর বয়েসের মুখের ছবি। ফোকলা দাঁতে হাসছে। পাশে টিপ বোতাম দেওয়া মুখ বন্ধ আরও একটা খাপ। অনেকটা খামের মতো। খুচরো পয়সা থাকে। চেন আটকানো খাপে বড়ো অঙ্কের টাকার নোট রাখে তারক। বড়ো অঙ্ক বলতে একশো আর পঞ্চাশ। এর বেশি 'বড়ো অঙ্ক' রাখার সাধ্য তারকের নেই। সঙ্গে অবশ্য ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ডটা থাকে। সেই কার্ডের পাশে এক চিলতে কাগজ। সেখানে কোডে এটিএম কার্ডের নম্বর লেখা। সেই কোড ধাঁধার মতো। তারক নিজে ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। কোড তৈরির পিছনে ভাবনাচিন্তা আছে। মেয়ের পড়ার বই থেকে কবিতার লাইন নিয়ে তৈরি হয়েছে। কবিতার নাম এখন আর মনে নেই। লাইনগুলো এরকম—'ছিপখান তিন দাঁড়/ তিনজন মাল্লা/ চৌপর দিন-ভোর/ দেয় দূর পাল্লা। 'তিন দাঁড়' আর 'তিনজন মাল্লা'র কথা পড়লেই নাকি পর পর দুটো 'তিন' মাথায় চলে আসবে। তারকের এটিএম নম্বরে প্রথম দুটো সংখ্যাই 'তিন'। দুটো মনে পড়লে বাকি দুটো নিয়ে চিন্তা নেই। নিজে থেকেই মনে পড়বে। গোপন এই কোড তৈরি করে তারক খুশি হয়েছিল। নিজেই নিজের পিঠ চাপড়েছিল। নিজে

না-চাপড়ে উপায় কী? কোডের কথা অন্যদের বলা যায় না। সমস্যা হল, এখন পর্যন্ত কোড ব্যবহার করার সুযোগ আসেনি। আগে মাঝেমধ্যেই নম্বর ভুলত। এটিএম মেশিন থেকে টাকা তুলতে গিয়ে নম্বর ভুলে বোকার মতো মাথা চুলকোত। প্রথম সংখ্যাটা কী যেন? সাত না পাঁচ? মজার ব্যাপার হল, কোড তৈরির পর থেকে আর কোনোদিন নম্বর ভোলেনি তারক। যাই হোক বড়ো নোট আর এটিএম কার্ড বড়ো খাপে রেখে, চেন টেনে স্পেশাল সিকিউরিটি দেওয়া হয়। মেজো খাপে দশ টাকার নোট থেকে রাখা শুরু, চলে একেবারে এক টাকা পর্যন্ত। নোটের পাশাপাশি দরকারি আর হাবিজাবি কিছু টুকরো কাগজ। লন্ড্রির বিল। মুদির দোকানের লিস্ট। টুকরো কাগজে এমন দু-একজনের নাম আছে যাদের কাছ থেকে টাকা পায় তারক। বেশি টাকা নয়, কুড়ি-তিরিশ-চল্লিশ এ-রকম। বড়ো ধার দেওয়ার লোক নয় তারক। মুরোদও নেই। তবু কেউ চাইলে দুম করে 'না' বলতে পারে না। মাঝেমধ্যে মানিব্যাগ খুলে কাগজ বের করে লিস্ট দেখে। তারপর তাড়া দেয়। এ ছাড়াও কিছু বিল আছে ব্যাগে। মেয়ের জামা, অঞ্জলির জুতো, প্রেশার কুকার সারানো, বাথরুমের কল কেনার বিল। এর মধ্যে অনেকগুলোই 'ফেলব ফেলব' করে ফেলা হয়নি। কিছু রেখে দিয়েছে যদি ফট করে লেগে যায় এই ভেবে। ছোটো ছোটো খাপগুলোও ব্যবহার করেছে তারক। কোনোটায় দুটো রেভিনিউ স্ট্যাম্প রাখা, কোনোটায় পেট খারাপের ট্যাবলেট। হঠাৎ অফিসে যদি লেগে যায়, কী হবে? এলোমেলো ক-টা ভিজিটিং কার্ড আছে। দেখলে এখন আর মনে পড়ে না, কে দিয়েছিল। বোতাম দেওয়া খামে খুচরোই রাখে তারক। সঙ্গে একটা চাবি। অফিস ড্রয়ারের চাবি। সব মিলিয়ে যেন তার ছাপোষা একটা সংসার মানিব্যাগে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারক। বাড়ি, অফিস, বউ, মেয়ে সবই কোনো-না-কোনো ভাবে আছে। আর আছে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ একটা ভাব।

মিষ্টির দোকানের দাম মেটানো শেষ হলে চট করে বড়ো খাপের চেনটা অর্ধেক খুলল। তারা রয়েছে। ঠিক যেমনটি গুছিয়ে রেখেছিল আজ দুপুরে। চকচকে পাঁচশো টাকার দুটো নোট। তারকের জীবনে নেওয়া প্রথম ঘুষ।

মানিব্যাগ বন্ধ করে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে এল তারক। হাঁটার স্পিড বাড়াল। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছোতে হবে। নিমকি ঠান্ডা হয়ে গেলে মুশকিল। হাঁটার সঙ্গে তারক গুনগুন করে সুর ভাঁজতে লাগল। সে কি একটু নার্ভাস? মনে হয়। পারতপক্ষে তো গান-টানের মধ্যে তারক কখনো যায় না!

২

খালি গায়ে চেয়ারে বসে আছে তারক। কাঁধে তোয়ালে। তার মুখ গম্ভীর। ভুরুদুটো গম্ভীরভাবে কুঁচকে আছে। স্নান করতে যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল। থমকে গেছে। থমকে যাওয়ার কারণ আছে। সে বাড়িতে ঢুকেছে মিনিট কুড়ি হতে চলল। খুব বেশি

হলে পঁচিশ। এর মধ্যে দু-দু-বার ওই ফোনটা এসেছে। খ্যাসখ্যাসে গলার লোকটার ফোন। লোকটা এবার নাম বলেছে।

অঞ্জলি হাসিমুখে ঘরে ঢুকছে। এক হাতে তারকের চায়ের কাপ, অন্য হাতে নিমকি। তারকের হাতে কাপ ধরিয়ে, খাটের একপাশে বসল সে। পা দোলাতে দোলাতে কামড় দিল ঠান্ডা নিমকিতে। কামড় দেওয়ার কায়দা দেখে মনে হচ্ছে, ঠান্ডা নিমকি নয়, তার হাতে রয়েছে মহার্ঘ কোনো খাবার।

'কী ব্যাপার বল তো, হঠাৎ এককাঁড়ি খাবার নিয়ে বাড়িতে ঢুকলে যে!'

তারক চুপ করে চায়ে চুমুক দিল। অঞ্জলির সবকথার উত্তর দেওয়ার অভ্যেস তার নেই। তা ছাড়া এই মুহূর্তে মনের যা পরিস্থিতি তাতে কথার উত্তর দেবার প্রশ্নই ওঠে না। অঞ্জলি বলল, 'ভালোই করেছ, বিকেল থেকেই মনে হচ্ছিল ভালোমন্দ কিছু খাই।'

তারক বলল, 'বুটি এখনো পড়ছে?'

'হ্যাঁ। মাস্টারকে আর মেয়েকে সন্দেশ দুটো দিয়ে এসেছি।'

তারক অসন্তুষ্ট গলায় বলল, 'মাস্টারকে আবার দিতে গেলে কেন? বুটিকে পরে দিলেই হত। আজ একটা খেত, কাল টিফিনে নিয়ে যেত। তোমরা বড্ড বাড়াবাড়ি কর। প্রাইভেট টিউটরকে চা বিস্কুট দেওয়াই যথেষ্ট। যাক, ছেলেটা ঠিকমতো পড়াচ্ছে তো? তুমি নজর রাখছ?'

অঞ্জলি পা দোলানোর স্পিড বাড়িয়ে বলল, 'নজর কীভাবে রাখব? পড়ানোর সময় কি পাশে বসে থাকব?'

তারক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'পাশে বসে থাকবে কেন? আড়াল থেকে নজর রাখবে।'

কথাটা বলে নিজেই চমকে উঠল তারক। ঘুষ নেবার সময় কেউ আড়াল থেকে নজর করেনি তো? কীভাবে করবে? লোকটা পাঁচশো টাকার নোট দুটো তো অফিসে বসে দেয়নি। পান সিগারেটের দোকানে নিয়ে গিয়েছিল। সেই দোকানও অফিস থেকে দূরে। খামটা জোর করে পকেটে গুঁজে নীচু গলায় বলেছিল, 'বার্থ ডেতে ভাইপো, ভাইঝিকে খেলনা কিনে দেবেন দাদা। আমি কিনে আনতাম, তারপর ভাবলাম যদি পছন্দ না হয়। আজকালকার বাচ্চাদের চয়েস আলাদা। বড়োরা বুঝতে পারে না। এই তো দেখুন না, সাড়ে চার বছরের ভাগনিকে পুতুল কিনে দিলাম। সে বলল পুতুল নেব না মামা, বন্দুক চাই। বুঝুন কাণ্ড! আপনার মতো গুডম্যান যে বিলিং সেকশনে আগে কেন আসেনি, ভেবে বড়ো আফশোস হচ্ছে। দাদা, কালই ফাইলটা ছেড়ে দেবেন তো?' এসব কথা কে জানবে? কেউ জানবে না। পরে অফিসে ফিরে, বাথরুমের দরজা আটকে খাম থেকে টাকা বের করেছে তারক। মানিব্যাগে ঢুকিয়েছে যত্ন করে। ঢোকানোর সময় হাত সামান্য কেঁপেছে। কাঁপবেই। জীবনের প্রথম ঘুষ, হাত কাঁপবে না? মনও কেঁপেছে। তারক নিজেই বুঝিয়েছে—'দুনিয়াদারি ক্রমশ কঠিন হচ্ছে বাপু। সংসারে খরচ বাড়ছে।

মেয়ে বড়ো হচ্ছে। নেহাত বউটা বোকাসোকা, বর আদেখলা। নইলে এই রোজগারে টিকে থাকা মুশকিল হত। কম রোজগেরে স্বামীর নাটবল্টু কীভাবে টাইট করতে হয় আজকাল- কার মেয়েরা ভালো করেই জানে। জান বের করে দিত। যা পাচ্ছ চোখ বুজে নিয়ে নাও।'

এর আগের ডিপার্টমেন্টগুলোতে যে ঘুষের কারবার ছিল না এমন নয়। কিন্তু ওপর থেকে কন্ট্রোল হত। প্রোমোশন নিয়ে নতুন সেকশনে আসার পর এই প্রথম সুযোগ এল। ঘটনা কেউ বুঝতে পারেনি। শুধু সুশোভনটা হঠাৎ ঠাট্টা করল।

'কী ব্যাপার বলুন তো তারকদা, আপনার মুখটা তেলতেলে লাগছে কেন? বউদি অফিসে আসার আগে ক্রিম টিম ঘষে দিয়েছে নাকি? হ্যা হ্যা।'

আড়ালে গিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়েছে তারক। সত্যি তেলতেলে লাগছে নাকি? ঘুষ নিলে মুখ দিয়ে তেল বের হয় বলে তো কখনো শোনেনি।

হাতের নিমকি শেষ করে অঞ্জলি বলল, 'কী হল বসে রইলে কেন? স্নানে যাবে না?'

তারক খানিকটা আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, 'যাব।'

বাড়ি ঢুকে সবে জুতো মোজা খুলেছে তারক। লোকটা তখনই ফোন করল। এবার নিজের নামটা বলল।

'স্যার, আমি প্রলয়।'

খ্যাসখ্যাসে গলাটা একটু চেনা লাগলেও তারক ধরতে পারল না। বলল, 'প্রলয়! প্রলয় কে?'

ওপাশের গলা থতোমতো খেয়ে বলল, 'এই যে একটু আগে ফোন করেছিলাম স্যার। আপনার মানিব্যাগটা...।'

তারকের এবার সত্যি সত্যি রাগ হল। গলা চড়িয়ে বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? আমি বলছি না, আমার মানিব্যাগ আমার কাছেই আছে। আপনি বার বার আমাকে ফোন করছেন কেন?'

প্রলয় আমতা আমতা করে বলল, 'রাগ করবেন না স্যার। আপনি আমাকে বলেছেন ব্যাগটা আপনার নয়, কিন্তু ভুলও তো হতে পারে। আসলে স্যার, আপনি কি মানিব্যাগে ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ড রাখেন?'

তারক রেগে মেগে বলল, 'রাখলে আপনার কী?'

'না, মানে ব্যাগটার খাপে একটা এটিএম কার্ড পেলাম কিনা। কার্ডের গায়ে তারক সেনগুপ্তর নাম...টাকাপয়সার ব্যাপার তো, ভাবলাম যদি আপনার ভুল হয়। হয়তো সেকেন্ড থট...।'

তারক বেতের চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়ল। না, এই গাধার ওপর রাগ করে কোনো লাভ নেই। গলা নরম করে বলল, 'আপনাকে নিয়ে তো আর পারা যাচ্ছে না প্রলয়বাবু না অলয়বাবু। মানিব্যাগ যদি অন্য কোনো তারক সেনগুপ্তর হয়, এটিএম কার্ড তো তারই হবে। মানিব্যাগে যে শুধু আমি এটিএম

কার্ড রাখি এমন তো নয়। প্লিজ আর আমাকে বিরক্ত করবেন না। এই লাস্ট টাইম আমি আপনার ফোন ধরলাম।'

মোবাইল কেটে আপনমনেই লোকটাকে গাল দিল তারক। বুটি মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়ছে। অঞ্জলিকে চা করতে বলে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল তারক। ডাইনিংরুমের এককোণে টেবিল। টেবিল মানে পুরোনো খবরের কাগজ, বাতিল বইপত্রের পাহাড়। বেশিটাই বুটির। ড্রয়ার খুলল তারক, শার্টের পকেট থেকে পেন, চশমা, অফিসের আইডেন্টিটি কার্ড বের করে রাখল। মোবাইলটাও রাখল টেবিলের ওপর; তারপর প্যান্টের পকেট থেকে টেনে নিল মানিব্যাগ। বড়ো খাপের চেন খুলতেই নোট দুটো ঝলমল করে উঠল নিয়ন আলোয়। পাশে এটিএম কার্ডটাও উঁকি দিচ্ছে। এবার একটা ক্রেডিট কার্ড করাতে হবে। সকলের আছে। থাকলে ক্ষতি কী? ব্যবহার না-করলেই হল। বাড়তি টাকা তো আসতে শুরু করছে। আচ্ছা টাকাটা মানিব্যাগে রাখা ঠিক হবে কি? আলমারিতে তুলে দেওয়াই নিরাপদ। অঞ্জলি দেখে ফেলবে না তো? হঠাৎ হাজার টাকা দেখলে অবাক হবে নিশ্চয়। মাসের বাইশ তারিখে হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে? আচ্ছা, টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে কেমন হয়? কাল অফিস যাওয়ার পথে টুক করে যদি...না, ঘুষের টাকা ব্যাঙ্কে রাখা ঠিক নয়। বিলিং সেকশনে ফাইল যে ঘুষের জোরে ছোটে বুঝতে সময় লাগছে না। সামান্য একটা ফাইল ছাড়বে তার জন্য হাজার! কী করবে বুঝতে না-পেরে তারক টাকাটা মানিব্যাগেই রেখে দিল। ড্রয়ার বন্ধ করার পর টেবিলে রাখা মোবাইল বেজে উঠল বিচ্ছিরি সুরে। তারক ফোন কানে দিয়েই চমকে উঠল। আবার সেই লোক।

লোকটা কিছু বলার সুযোগ দিল না। তার আগেই 'হে হে' টাইপ হেসে বলল, 'স্যার, ক্ষমা চাইতে ফোন করেছি। মানিব্যাগটা আপনার নয়। ছি ছি, কীভাবে যে বিরক্ত করেছি। ব্যাগের ভেতর স্যার এক চিলতে কাগজে চার লাইন কবিতা পেলাম। আমাদের ছেলেবেলার কবিতা। ছিপখান তিন দাঁড়/তিন জন মাল্লা...স্যার, আপনার সঙ্গে কথা বলে এইটুকু বুঝেছি, আপনি আর যাই হোক, মানিব্যাগে কবিতা নিয়ে ঘোরার মানুষ নন। হা হা। তাই ভাবলাম, আপনাকে লাস্ট একবার বিরক্ত করি, ক্ষমা চেয়ে নিই।'

তারকের মনে হল, হাত থেকে ফোনটা মাটিতে পড়ে যাবে। নিজেকে পাথরের মূর্তির মতো মনে হচ্ছে তার। হাত পা নড়ছে না। মনে হচ্ছে, আর কোনোদিন নড়বেও না। বেশ কয়েক মুহূর্ত এভাবে কেটে যাওয়ার পর গাঢ় স্বরে তারক বলল, 'মানিব্যাগে আর কী পেয়েছেন?'

ফ্যাশফ্যাশে গলা উৎসাহ গলা নিয়ে বলল, 'সব খাপ খুলে দেখিনি স্যার। অন্যের মানিব্যাগ খুলতে খারাপ লাগে। নেহাত উপায় নেই তাই বাধ্য হয়ে... মালিকের খোঁজ একটা খোঁজ করতে হবে। কোনো সূত্র ধরে যদি...লন্ড্রির একটা বিল পেয়েছি। পুরোনো। ডেলিভারি হয়ে গেছে বলে স্ট্যাম্প মারা। শ্যামবাজারের

কোনো এক পোশাকের দোকানের বিলও রয়েছে। দুশো ছাব্বিশ টাকার ফ্রক। দাঁড়ান স্যার আপনাকে দোকানের নাম বলছি।'

তারক ফিসফিস করে বলল, 'থাক, বলতে হবে না।'

ফোন কেটে বেডরুমে এল তারক। চা খাওয়া হয়ে গেছে। এটা কী করে সম্ভব! একইরকম দুটো মানিব্যাগ! আচ্ছা, অসম্ভবই-বা ভাবছে কে? আর একটা তারক সেনগুপ্ত যদি থাকতে পারে, তার একটা খয়েরি রঙের মানিব্যাগ যদি থাকতে পারে, তাহলে সেও কি তার এটিএম কার্ডের নম্বর মনে রাখতে সাংকেতিক ভাষা লিখতে পারে না? অবশ্যই পারে। কবিতা কি তার একার? তারও হয়তো বুটির মতো একটা মেয়ে আছে। তার স্কুলেও কবিতার বই আছে। সেই মেয়েরও নিশ্চয় শ্যামবাজারের দোকান থেকে ফ্রক কেনা হয়েছে। দুশো ছাব্বিশ টাকার ফ্রক তো দোকানে একটা থাকে না। ইংরেজিতে একেই বলে কোইন্সিডেন্স? কোইন্সিডেন্স শব্দটার বাংলা কী? মনে পড়ছে না।

অঞ্জলি খাট থেকে নেমে তারকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার নিমকি খাওয়া শেষ। সে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে আদুরে গলায় বলল, 'অ্যাই, তোমার কি শরীর খারাপ?'

তারক চমকে বলল, 'কই! না তো।'

অঞ্জলি তারকের খালি বুকের ওপর আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, 'মুখটা কেমন যেন শুকনো শুকনো। সব ঠিক আছে তো?'

অঞ্জলির এই আচরণ তারকের চেনা। তার মাঝে মাঝে এরকম হয়। বেসময়ে স্বামীকে আদর করতে ইচ্ছে করে। তারক বউয়ের হাত সরিয়ে শুকনো হেসে বলল, 'না না সব ঠিক আছে।' অঞ্জলি কিছু বুঝতে পারেনি তো?

অঞ্জলি মুখটা কাছে এনে ফিসফিস করে বলল, 'সব ঠিক আছে তো আমাকে সরিয়ে দিচ্ছ কেন?'

তারক চেয়ার ছেড়ে উঠে, রাগের ভান করে বলল, 'উফ, পাশের ঘরে বুটি পড়ছে।'

অঞ্জলি স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ঘেমো পিঠে মুখ ঘষে বলল, 'কিচ্ছু হবে না। প্লিজ...।'

তারকের টেনশন হচ্ছে। সে 'স্বাভাবিক' সাজার চেষ্টা করল। বউকে আলতো ঠেলায় সরিয়ে বলল, 'এখন নয়, রাতে দেখা যাবে। জান অঞ্জলি, আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। শুনবে?'

অঞ্জলি ঠোঁট সরু করে বলল, 'না এখন নয়, রাতে তোমার পাশে শুয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরে শুনব। বুটি ঘুমিয়ে পড়লে, তুমি আমি এ-ঘরে চলে আসব।'

তারক বাথরুমে ঢুকল। শরীর জুড়ে অস্বস্তি। মাথায় দু-মগ জল ঢালার পরই থমকে গেল। ফ্যাসফ্যাস গলার ছোকরাটা গোলমেলে কেউ নয় তো? পুলিশ,

ভিজিলেন্স বা অফিসের বস? ঘুষের খবর পেয়ে তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। প্রথমে মানিব্যাগের কথা বলে ঘাবড়ে দিচ্ছে, এরপর টাকার কথা বলবে। আন্দাজে ঢিল ছুড়ছে একটার পর একটা। আশ্চর্যভাবে মিলেও যাচ্ছে! আচ্ছা, মোবাইল ফোনের নম্বর লেখা কাগজটার কথা কি সত্যি? সত্যি কি এমন কিছু তার মানিব্যাগে আছে? বাথরুমের আয়নায় নিজের মুখ দেখে চমকে উঠল তারক। আধভেজা গায়েই বেরিয়ে এল। ডাইনিংরুমে গিয়ে দ্রুত হাতে ড্রয়ার খুলল।

মাস্টারমশাই চলে গেছে। বুটি এসে দাঁড়িয়েছে বাবার পিছনে। অবাক হয়ে সে বাবাকে দেখছে। খাপের পর খাপ হাতড়াচ্ছে তারক। বোতাম খুলতে একগাদা খুচরো পয়সায় টুং টাং আওয়াজে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

কাগজের টুকরোটা পাওয়া গেল ছোটো পকেটে। সত্যি সেখানে লাল কালি দিয়ে কাঁচা হাতে তারক সেনগুপ্তর নাম আর মোবাইল ফোনের নম্বর লেখা! সত্যি সংখ্যাগুলো বুঝতে খানিকটা অসুবিধে হচ্ছে। তারকের হাত কাঁপছে। এই হাতের লেখা বুটির না? তারক ঘুরতেই মেয়ের মুখোমুখি হল। বুটি হাসল। তাকে দেখতে মিষ্টি। চোখগুলো মায়ের মতো টানা টানা।

'বাবা, তোমার কী হয়েছে?'

তারক কাগজটা এগিয়ে বলল, 'এটা তোমার লেখা?' তার ঠোঁট কাঁপছে। চোখের মণি স্থির। বুটি উঁকি মেরে কাগজ দেখে আবার হাসল।

'হ্যাঁ বাবা, পরশুদিন লিখে চুপি চুপি তোমার মানিব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কেন?'

বাবার কঠিন গলায় থতোমতো খেল বুটি। বলল, 'যদি ব্যাগটা হারিয়ে যায়, তাহলে যে পাবে সে তোমার নম্বরে ফোন করবে। তাই...।'

তারক এক মুহূর্তও দেরি করল না। সপাটে চড় কষাল মেয়ের গালে। হিসহিসিয়ে বলল, 'কোন সাহসে তুমি আমার মানিব্যাগে হাত দিয়েছ? কোন সাহসে?'

বুটির কান্নার আওয়াজ শুনে অঞ্জলি রান্নাঘর থেকে ছুটে এল।

রাতে খেতে বসেও মুখে কিছু তুলতে পারল না তারক। গা গুলিয়ে উঠল। অন্ধকার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল দীর্ঘক্ষণ। অঞ্জলি দু-বার ডাকতে এসেছিল। ধমক খেয়ে ফিরে গেছে। তারকের নিজেকে কেমন দিশেহারা মনে হচ্ছে। লোকটা কে? ঠিক তার মতো আর একটা তারক সেনগুপ্ত? একই ফোন নম্বর, একই মানিব্যাগ নিয়ে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তার মেয়ের নামও কি বুটি? বউ অঞ্জলি? স্বামীকে নিয়ে আহ্লাদ করে? সেও কি ঝাল নোনতা খেতে ভালোবাসে? বেটাইমে স্বামীর শরীর চায়? এও কি হয়? হতে পারে কখনো? দু-হাতে মাথা চেপে উঠে বসল তারক। মাথার ভেতর কেউ একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। পাগল হয়ে যাবে না তো সে? ভয়ে কেঁপে উঠল তারক। আচ্ছা, ওই তারক সেনগুপ্তও কি তার অফিসের বিলিং সেকশনে কাজ করে? ফাইল ছাড়তে ঘুষ নেয়? তারক মাথার

বালিশের তলা থেকে মোবাইলটা টেনে বের করল। রিসিভড কলের তালিকা থেকে নম্বর খুঁজে বের করতে সময় লাগল না।

ফ্যাসফ্যাসে গলা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'স্যার, এত রাতে! আপনি!'

তারক নীচু অথচ ঠান্ডা গলায় বলল, 'প্রলয়বাবু, আপনি কি আমার একটা উপকার করতে পারবেন?'

'উপকার! বলুন স্যার। অবশ্যই পারব, সারাদিন স্যার আপনাকে যে কত জ্বালাতন করলাম...।'

তারক বড়ো করে শ্বাস টেনে বলল, 'আচ্ছা ব্যাগটায় কি হাজার টাকা আছে? দুটো পাঁচশো টাকার নোট?'

ফ্যাসফ্যাস গলা হাসল। বলল, 'মানিব্যাগটার কথা সব নিয়ে বলেছি স্যার, শুধু টাকার কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মানিব্যাগের মানিটাই বাদ দিয়েছিলাম। হা হা...। না স্যার পাঁচশো, হাজারের কোনো কেস নেই। একটা পঞ্চাশ আর খানকতক দশ টাকার নোট পড়ে আছে। নোটগুলো বেশিরভাগই ময়লা। সেদিক থেকে ব্যাগের অবস্থা বেশ খারাপ। গরিব মানুষের ব্যাগ। তবে একটা জিনিস বুঝেছি স্যার।'

টাকা নেই শুনে মাথায় চেপে বসা পাথরটা সরে গেল তারকের। নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলে তারক বলল, 'কী? কী বুঝেছেন?'

'আপনার নামের ওই মানুষটা কিন্তু বেশ ভালো। টাকাপয়সা তেমন না-থাকলেও মেয়ে, বউ, সংসার নিয়ে দিব্যি আছে। লন্ড্রি, ফ্রক, জুতো বাথরুমের কল, পেট খারাপের ওষুধ...হা হা। মানিব্যাগে কেউ ওষুধ রাখে? হা হা। ভীতু কিন্তু ভালো মানুষ একটা...। তাই না?'

তারক একটু চুপ করে থেকে শান্ত গলায় বলল, 'ভাই, ওই ব্যাগটা আমার। আপনি যদি ঠিকানাটা বলেন তাহলে কাল সকালে গিয়ে নিয়ে আসতে পারি।'

ফ্যাসফ্যাসে গলা একটু থমকাল। তারপর বলল, 'সরি স্যার। মানিব্যাগের মালিকের খোঁজ পেয়ে গেছি। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, মোবাইলের নম্বর পড়তে আমার ভুল হয়েছিল। থ্রি-এর বদলে এইট-ই হবে। আরও একটা সংখ্যা...জড়িয়ে মড়িয়ে...ছোটোদের লেখা তো...। শেষ পর্যন্ত নম্বরগুলো উলটেপালটে ফোন করলাম...ভদ্রলোক কাল সকালেই আসছেন...। আপনাকে মিছিমিছি সারাদিন বিরক্ত করেছি। ক্ষমা করবেন স্যার।'

গভীর রাতে পাশের ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে অঞ্জলিকে নিজের ঘরে নিয়ে এল তারক। ব্লাউজের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'মজার ঘটনাটা এবার শোন অঞ্জলি। কী ফ্যাসাদে যে পড়েছিলাম। ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা পেয়েছি, কিন্তু একটা লোকের ওপর খুব হিংসে হচ্ছে।' অঞ্জলি স্বামীর দিকে ঘন হয়ে আসে।

'হিংসে! এই ধেড়ে বয়েসে? ওমা কাকে গো?'

'একটা ভালোমানুষকে।'

অঞ্জলি হিসহিসিয়ে বলল, 'ভালোমানুষটা কে?'

তারক মুখ নামাতে নামাতে বলল, 'লোকটার নাম তারক সেনগুপ্ত। স্ত্রীর নাম অঞ্জলি, মেয়ের নাম বুটি...।'

সেই লোক দাঁড়িয়ে ছিল পান সিগারেটের দোকানের সামনে। অফিস ছুটির পর সেখানে গেল তারক। দুটো পাঁচশো টাকার নোট ভরা খাম লোকটার জামার পকেটে গুঁজে বলল, 'আপনার ফাইল ছেড়ে দিয়েছি। এটা আপনি ফেরত নিয়ে যান। আপনার ভাইপো, ভাইঝিদের কোনো খেলনাই পছন্দ হচ্ছে না।'

বাড়ি ফিরে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তারক মুচকি হাসল। ফিসফিস করে বলল, 'কী রে বেটা তারক, এবার আমাকে হিংসে হচ্ছে তো?'

সাইকেল



বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল শুভ্রাংশুর। ঠিক যেন একটা মানুষ! মানুষটা ঘুপসি অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে!

এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল শুভ্রাংশু। এগোনো যাবে না। জায়গাটা নোংরা। হাবিজাবি জিনিসে ভরতি। পায়া ভাঙা তক্তাপোশ, দুটো বড়ো বাক্স, হাতলহীন বালতি একটা, খারাপ-হয়ে-যাওয়া টেবিল ফ্যান, ফেলে দেওয়া জলের কল, জং ধরা পাইপের টুকরো। সেইসঙ্গে ধুলো, ঝুল আর মাকড়শার জাল। কতদিন যে জায়গাটা পরিষ্কার হয়নি!

ঘটনার শুরু আজ সকালে। শুভ্রাংশু চায়ের কাপ নিয়ে খবরের কাগজ পড়তে বসেছিল। একটা সময় ছিল, এই মফস্বল শহরে কাগজ পেতে বেলা হয়ে যেত। কলকাতা থেকে কাগজ আসত ট্রেনে। সেই কাগজ বাড়িতে বিলি হতে হতে দেরি। কোনোদিন ট্রেন লেট করলে হকার সকালে আর বেরোতই না। বিকেলে কাগজ দিয়ে যেত। অফিসকাছারি, কাজকর্ম সেরে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে কাগজ নিয়ে বসাটাই এখানকার মানুষের অভ্যেস ছিল। দাদু, বাবা, কাকাদের সে-রকমই দেখেছে শুভ্রাংশু। সেদিন আর নেই। নানা ধরনের সব আধুনিক ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতার কাগজ এখন কাছাকাছি ছাপা হয়। গাড়ির পথে দু-আড়াই ঘণ্টায় চলে আসে ভোরবেলাতেই। সকালের চায়ের কাপের সঙ্গে টাটকা কাগজ নিয়ে বসা যায়। শুভ্রাংশু আজও তাই বসেছিল। চা শেষ করে বাজারে যাবে। মনটা খুশি খুশি। কাগজের পাঁচ নম্বর পাতায় স্কুল মাস্টারদের মাইনে বাড়ার একটা খবর আছে। ঠিক 'মাইনে বাড়া' নয়, মাইনে বাড়া নিয়ে 'ভাবনা চিন্তা'র খবর। সরকার ভাবছে।

এমন সময় করুণা কঠিন গলায় বলল, 'সিঁড়ির নীচটা পরিষ্কার করব। তুমি সাইকেলটার একটা ব্যবস্থা কর।'

খবরটা আবার পড়ল শুভ্রাংশু। সত্যি যদি দু-একবছরের মধ্যে মাইনে বাড়ে ভালো হয়। তাহলে পেনশনটাও বাড়বে। রিটায়ারমেন্ট খুব দূরে নয়। এখন থেকে চিন্তা না-করলে চলবে কী করে?

করুণা আবার বলল, 'কী হল কথা কানে গেল না?'

এবার করুণার গলা আরও একটু কঠিন। স্ত্রীর কঠিন গলা একবার অগ্রাহ্য করা গেলেও যেতে পারে, দু-বার যায় না। যারা পারে তারা অসীম সাহসী। শুভ্রাংশু সে-রকম নয়। বরং উলটোটাই। ভয় না-পাক, করুণাকে সে সমঝে চলে। শুধু করুণা কেন, কাউকেই মেজাজ দেখাতে পারে না। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, স্কুলের কলিগ কারো সঙ্গেই গোলমালে নেই। কেউ বলে শান্তিপ্রিয়, কেউ বলে গোবেচারা টাইপ। করুণা বলে 'ভীতু'। শুভ্রাংশু বলে, 'কী হবে ঝগড়াঝাটির মধ্যে গিয়ে?'

করুণা রাগ দেখিয়ে বলে, 'কী হবে মানে? কেউ অ্যাবসেন্ট করলে তোমার ঘাড়েই এক্সট্রা ক্লাস পড়বে? কেন? স্কুলে আর কোনো মাস্টার নেই? তারা মাইনে পায় না? ভূদেবস্যার, মণিময়স্যারের সঙ্গে তোমাদের হেডমাস্টারের এত পিরিত কীসের? বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায় বলে? তাই তুমি ক্লাসের পর ক্লাস নিয়ে যাও আর ওরা টিচার্সরুমে বসে ঠ্যাং নাচায়?'

শুভ্রাংশু শান্তভাবে বলে, 'আহা, এসব কী বলছ করুণা! এক্সট্রা ক্লাস নেওয়ার সঙ্গে বাড়িতে নেমন্তন্ন করার কী সম্পর্ক? তাছাড়া. .তাছাড়া আমার পড়াতে ভালোই লাগে।'

আরও রেগে যায় করুণা। বলে, 'তুমি পাশের বাড়ির মল্লিকবাবুকে ভয় পাও কেন? বাড়ির সামনে ময়লা ফেলা নিয়ে পরশুদিন ট্যাঁক, ট্যাঁক করে কত কথা শোনাল! তুমি একটাও জবাব দিতে পারলে? মাথা নেড়ে গেলে শুধু। বলতে তো পারতে ময়লা আপনারাও ফেলেন। আমাদের থেকে বেশি ফেলেন। এটাও কি তোমার ওই পড়াতে ভালো লাগে?'

শুভ্রাংশু আমতা আমতা করে বলল, 'মল্লিকদা বুড়োমানুষ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়া করব!'

'আর তোমার গুণধর ভাইপো? দেশের জমিটা মেরে দেওয়ার ফন্দি করছে, সেও বুড়োমানুষ?'

শুভ্রাংশু চুপ করে যায়। তার কোনো যুক্তিই খাটছে না। হতাশ হয়। এত বছর পরেও করুণা তাকে ঠিক বুঝতে পারল না। সে যে ঝামেলার মধ্যে যেতে পারে না, অশান্তি, ঝগড়াঝাঁটি ভালোবাসে না এইটা বুঝল না। করুণা বলে, 'ওসব বাজে কথা। ঝামেলা, অশান্তি কিছু না। আসলে তুমি একজন ভীতু পুরুষমানুষ। ভীতু পুরুষমানুষ নিয়ে ঘর করা যে কত সমস্যার সে শুধু আমি জানি।'

সেই শুভ্রাংশু স্ত্রীর দু-বার ডাকে সাড়া দেবে না তা কখনো হয়?

মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে শুভ্রাংশু হাসল। বউ ম্যানেজ করা হাসি। নরম গলায় বলল, 'কী হয়েছে করুণা? সকালবেলা এত উত্তেজনা কীসের?'

করুণা ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'তোমারই-বা সকালবেলা হাসিমুখের কী হয়েছে?'

'হাসিমুখের কারণ আছে। কাগজে একটা ভালো খবর দিয়েছে। আমাদের মাইনে বাড়বে। ভাবনাচিন্তা হচ্ছে।'

করুণা এ-কথায় আমল না-দিয়ে বলল, 'রাখ, তোমার ভাবনাচিন্তা। তিন বছর ধরে একই কথা শুনছি। ভাবনাচিন্তা আর ভাবনাচিন্তা। বাড়ছে কই? বাদ দাও ওসব। সাইকেলটার কী করবে? বাকি সব আবর্জনা লোক ডেকে সরিয়ে দেব। এরপর সিঁড়ির তলায় সাপখোপের বাসা হবে।'

মাইনে থেকে সাইকেলে। বুঝতে সময় লেগেছিল শুভ্রাংশুর! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্স কমছে। শুধু শরীরের রিফ্লেক্স নয়, মাথাও কাজ করতে সময় নিচ্ছে। আজকাল চট করে সব বুঝতে পারে না। স্কুলেও সমস্যা হয়। সমস্যা যদিও বড়ো কিছু নয়। তবু এই নিয়ে কথা শুরু হয়েছে। ছেলেরা যত না বলছে মাস্টাররা বলছে বেশি। বলছে, 'এস জি ছেলেদের প্রশ্ন বুঝতে সময় নিচ্ছে। ছাত্রদের কমপ্লেইন আছে।' শুভ্রাংশু গাঙ্গুলি তাই 'এস জি'।

সামান্য থতোমতো খেয়ে শুভ্রাংশু স্ত্রীকে বলল, 'সাইকেল! কোন সাইকেল!'

করুণার হাতে ছিল বিছানার চাদর। সে চাদর ভাঁজ করছিল। সকালে আগে বিছানা গোছাবে করুণা। বাসি বিছানা সহ্য করতে পারে না। কলেজে পড়বার সময় খুব জ্বালিয়েছে অঙ্কুর। রাত জেগে পড়ত আর ভোঁস ভোঁস পরে ঘুমোত দুপুর পর্যন্ত। এই নিয়ে মা আর ছেলেতে খটামটি কম হয়নি। অঙ্কুর বলত, 'তোমার কী সমস্যা হয়েছে মা? আমি তো আমার ঘরে ঘুমোই। তুমি তোমার ঘর পরিষ্কার কর।'

করুণা থমথমে গলায় বলত, 'তোমার ঘর আমার ঘর কথা নয়। ঘর তো বাড়ির। বেলা পর্যন্ত বিছানা তোলা হয় না। কী বিচ্ছিরি লাগে। সকালে উঠলেই তো হয়।'

অঙ্কুর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলত, 'সকালে উঠব কী করে! রাত জাগি না?'

করুণা ছেলের কথায় বিরক্ত হয়ে বলত, 'আজ থেকে আর জাগবে না। ভোরে উঠে পড়বে। আমাদের সময় তো ভোরে উঠেই পড়াশোনার ব্যাপার ছিল। তোমার বাবা-কাকারাও তাই করেছে। তারা কি লেখাপড়া শেখেনি?'

অঙ্কুর হেসে বলত, 'কী বলছ মা! সেই সময় আর এখন কি এক হল? দুনিয়াটাই বদলে গেছে। সেই সঙ্গে লাইফ স্টাইলও। দিনেরবেলায় লেখাপড়ার সময় কোথায়? কতরকম ইনভলভমেন্ট রয়েছে। এখনকার ছেলে-মেয়েরা তো আর শুধু বই মুখে বসে থাকে না। সকালে নানারকম ডিসটার্বেন্সও হয়। খাতাবই নিয়ে বসলেই হল না, কনসেনট্রেশনের ব্যাপার আছে। তা ছাড়া বাবাদের সময় ইন্টারনেট ছিল? এখন নেট না ঘাঁটলে দমবন্ধ হয়ে যায়। রাতে যত না বই খুলি, নেট কনসাল্ট করতে হয় তার থেকে অনেক বেশি।'

করুণা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। এখন অবশ্য আর সে-প্রশ্ন নেই। ছ-মাস হল অঙ্কুর কলকাতায় চাকরি পেয়েছে। আই টি সেক্টরের চাকরি। নিয়ম করে নাইট

ডিউটি দেয়। সল্টলেকে পেইং গেস্ট হয়ে থাকে। তবে এখনো রাত জাগার অভ্যেস যায়নি। ছুটিছাটায় বাড়ি এলে রাত জাগে।

করুণা স্বামীর দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'কোন সাইকেল জান না?'

শুভ্রাংশু ঢোঁক গিলে বলল, 'ওহ্ আমাদেরটার কথা বলছ? বলেছি তো একটা কিছু করব।'

'আর কবে করবে? গত তিনবছর ধরে একই কথা বলছো। সাইকেলটার জন্যই জায়গাটা ও-রকম আঁস্তাকুড় হয়ে গেছে। একটা আবর্জনার জন্য হাজারটা বাজে জিনিস জমা করা হচ্ছে। বাড়ির দিকে তো ফিরেও তাকাও না। কর্তব্য বলতে খাওয়া দাওয়া আর পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকা।'

শুভ্রাংশু চুপ করে রইল। না-থেকে উপায় কী? কথাটা তো ভুল নয়। সত্যি তো বাড়ির কাজকর্মে তার তেমন কোনো ভূমিকা নেই। ভীতু টাইপ মানুষরা কি খানিকটা অলস হয়? কে জানে, হয়তো হয়। সে বিড়বিড় করে বলল, 'দেখি কাউকে যদি দেওয়া যায়।'

করুণা হাতের কাজ থামিয়ে বলল, 'কাউকে দেবে! ওই ঝরঝরে জিনিস নেবে কে?'

শুভ্রাংশু চোখ বড়ো করে বলল, 'ঝরঝরে! ঝরঝরে কী বলছ করুণা! ও কি ঝরঝরে হওয়ার জিনিস?'

করুণা শীতল গলায় বলল, 'কেন? ঝরঝরে হবে না কেন? সোনা দিয়ে তৈরি?'

স্ত্রীর ব্যঙ্গে আমল দেয়নি শুভ্রাংশু। হাতের কাগজ সরিয়ে উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করল।

'সোনারই বটে। কোন আমলের সাইকেল সেটা তো দেখবে। বাবা ক্লাস এইটে ফার্স্ট হল। দাদু বললেন. কী নিবি? বাবা বলল, কিচ্ছু না। পরদিনই বর্ধমান টাউন থেকে দাদু সাইকেল নিয়ে হাজির। বাবাকে বললেন, ভেবেছিলাম একটা পেন কিনে উপহার দেব, অল্পের ওপর দিয়ে চলে যাব। কিছু নেব না বলে আমাকে বড়ো ধাক্কায় ফেললি। নে, কাল থেকে এই সাইকেলে স্কুলে যাবি। বাবার কাছ থেকে গল্প শুনেছি। বাবা তো চড়তই, দাদুও চড়েছেন। তারপর চড়েছি আমি। স্কুল বল, খেলার মাঠ বল, মায়ের অর্ডার মতো বাজার থেকে কিছু কিনে আনা বল সব ওই সাইকেলে। ফনফন করে উড়ে যেতাম। সাইকেল তো নয়, যেন ঘোড়া ছোটাচ্ছি। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জিনিস বলে কথা।' এত পর্যন্ত বলে একটু থেমেছিল শুভ্রাংশু। করুণা তখন চাদর ভাঁজ শেষ করে, বিছানা ঝাড়ছে। শুভ্রাংশু আবার বলতে থাকে, 'তখনকার লোহা, স্টিল অন্যরকম ছিল। মজবুত কাকে বলে! আজও সাইকেলটা কেমন আছে দেখছ না? তেমন করে জং ধরেনি। স্পোকগুলো ঝাড়পোঁচ করে তেল মাখালে ঝকঝক করবে। চামড়া বাঁধানো সিট একটু ফেটেফুটে গেছে ঠিকই, কিন্তু নষ্ট হয়নি।'

করুণা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তাই নাকি! ওই সাইকেলে তুমি ব্যবহার কর না ক-বছর হয়ে গেল? শেষ কবে চড়েছ মনে আছে তোমার? তাকিয়ে দেখেছ একবারও?'

শুভ্রাংশু বোকা বোকা হেসে বলল, 'এই বয়েসে আর সাইকেল কী চালাব? মানাবে নাকি? যেটুকু পারি হাঁটি, বাকিটা রিকশ।'

'ভাগ্যিস বাবার জিনিস বলে আদিখ্যেতা দেখিয়ে ওই কাণ্ডটি করতে যাওনি? বিরাট কেলেঙ্কারি হত। মাজা ভেঙে পড়ে থাকবে। আমাকে রাতদিন সেবা করতে হবে। তোমার ছেলেও তো ওটায় ওঠেনি কখনো। বলত, ওই মান্ধাতার আমলের ঢ্যাঙা সাইকেলে উঠলে বন্ধুরা হাসবে।'

'অঙ্কুরদের জেনারেশনটাই আলাদা করুণা।'

করুণা গলায় ঝাঁঝ এনে বলল, 'কী জেনারেশন? ঝরঝরে সাইকেলে না-চড়ার জেনারেশন? অঙ্কুর তো মোটরবাইক কিনবে বলছে। বলেছে তোমায়?'

শুভ্রাংশু চমকে উঠে বলল, 'তাই নাকি! কই জানি না তো। আমাকে কিছু বলেনি। কলকাতায় মোটরবাইক চালানো কি ঠিক হবে করুণা? খুব অ্যাক্সিডেন্ট হয়।'

করুণা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'না চালানো ঠিক হবে না। তোমার ছেলের উচিত একটা গোরুর গাড়ি কেনা। তারপর সুট টাই পরে, সেই গাড়িতে চড়ে, হাতে লাঠি নিয়ে হ্যাট হ্যাট করতে করতে অফিসে যাওয়া। তাই তো? ঠিক আছে আজ ফোন করলে আমি বলে দেব। কিন্তু তার আগে তুমি ওই লোহালক্কড় বাড়ি থেকে বিদায় করবে। কাউকে দিয়ে দিলে দেবে, ফেলে দিলে দেবে। সবথেকে ভালো হয় ওজন দরে বিক্রি করতে পারলে। যে দু-চার পয়সা পাওয়া যায়।'

তারপরই অফিস যাওয়ার সময় সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়েছে শুভ্রাংশু। উঁকি মেরেছে। অনেকদিন পর সিঁড়ির তলায় উঁকি দিল। কতদিন পর? তিনমাস? চারমাস? বছরখানেক হয়ে যায়নি তো? হতেও পারে। ঠিক মনে পড়ছে না। নিজের বাড়িরই একটা জায়গা এতদিন তাকিয়ে দেখেনি ভেবে খানিকটা অবাকই হয় শুভ্রাংশু। লজ্জাও পেল। করুণা যে গালমন্দ করে তা এমনি করে না। এবার থেকে ছুটিছাটার দিনে একবার করে গোটা বাড়িটা ঘুরে দেখতে হবে। পিছনের বাগান, ছাদে যাওয়া হয়নি অনেকদিন। পশ্চিমের বারান্দা দিয়ে নাকি বর্ষায় জল পড়ছে। না না, এসব ঠিক নয়। বাবা একটা বাড়ি তৈরি করে দিয়ে গেছেন ঠিকই, সেটাকে রক্ষাও তো করতে হবে। এবার নজর দেবার সময় এসেছে।

কড়কড়ে দুপুরেও সিঁড়ির এই দিকটায় আলো পড়ে না। আগে পড়ত। ওপারের দিকে একটা জানলা ছিল। চোর একবার শিক ভাঙল, তারপরই ইট গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেও বছর পাঁচেক হয়ে গেল। তখন থেকেই অন্ধকার অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সাইকেলে চোখ পড়তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল শুভ্রাংশুর। সাইকেল তো নয়, যেন একটা মানুষ! বুড়ো মানুষ। বয়েসের ভারে ঝুঁকে আছে।

নিথর, নিস্পন্দ। শুভ্রাংশু একটু হাসল। এখন থম মেরে গেলে কী হবে, একসময় কম ছুটেছে! বাবা সেই বর্ধমান টাউন পর্যন্তও গেছে। কম পথ? বাবার পা ফুলে ঢোল, সাইকেলের কিছু হল না। শুভ্রাংশু মনে করার চেষ্টা করল, কতদিন পর সাইকেলটা দেখছে সে? না, তাও মনে নেই। করুণা ঠিকই বলেছে। জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে। ফালতু জিনিস বিদায় করতে হবে সব। সাইকেলটাও।

স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে আরও একবার তাকাল শুভ্রাংশু। হঠাৎই কোথা থেকে যেন সরু একফালি রোদ এসে পড়েছে সাইকেলটার গায়ে। সম্ভবত দেয়ালে কোনো ফাঁকফোঁকর আছে। দিনের এই সময়টার হয়তো সামান্য আলো ঢোকে। সেই সামান্য আলোতেই চকচক করছে চাকার স্পোকগুলো! ফের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল শুভ্রাংশুর। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হল, আলো নয়, সাইকেলটা হাসছে! জোরে নয়, মাথা নামিয়ে নিজের মনে হাসছে!

২

দু-দুজন প্রত্যাখ্যান করল। একজন দেখে, একজন না-দেখে।

সুশীল দেখেছে দূর থেকে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেলে। বলল, 'ওরে বাবা, এ তো সাইকেল নয় মাস্টারমশাই, এ তো ডাইনোসর! এ আপনি কী করেছেন! বাড়িতে ডাইনোসর রেখে দিয়েছেন? না না, এ জিনিস আমি সামলাতে পারব না। দোকানের সামনে রাখলে কাস্টমাররা পেটাবে। দেখেছেনই তো দোকানের এন্ট্রান্সটা মোটে ওইটুকু। সেটাও যদি আটকে দিই তাহলে ব্যাবসা লাটে উঠবে।'

শুভ্রাংশু ভেবেছিল, সাইকেলটা বিলিয়ে দেবে। বাতিল, ভাঙা লোহালক্কড়ের মতো ফেলে না-দিয়ে সেটাই ভালো হবে। জিনিসটা কাজে লাগবে। সেন্টিমেন্টের কোনো ব্যাপার নয়, তবে একটা স্মৃতি তো আছে। তাই প্রথমেই ভাঙাচোরার পথে না-গিয়ে যদি অন্য ব্যবস্থা করা যায়। জিনিসটা বাড়ি থেকে বিদায়ও নেবে, অথচ থেকেও যাবে। অন্য কেউ ব্যবহার করলে হয়তো পথে-টথে দেখা হয়ে যাবে। বেশ লাগবে। কিন্তু ওই জিনিস নেবে কে? স্কুলের কোনো ছাত্রকে বলবে? যার সাইকেল নেই? না থাক। সে আর এক ঝামেলা হবে। এখনকার ছেলেপিলেরা সব অঙ্কুরের মতো। ধ্যাড়ধ্যাড়ে জিনিস দেখলে নাক কোঁচকাবে। আর যদি-বা রাজি হয় মেরামতের জন্য হয়তো খরচ চেয়ে বসবে। তখন 'না' বলা যাবে না। এই জিনিসের জন্য পয়সা খরচ হয়েছে জানতে পারলে করুণা চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলবে। ছাত্রদের কথা মাথা থেকে ঝেড়ে শুভ্রাংশু তাই প্রথমে সুশীলকে বলল। সুশীলের বাজারের পাশে বইখাতার দোকান। অর্ডার দিলে কলকাতা থেকে বই এনে দেয়। শুভ্রাংশুকে 'মাস্টারমশাই' ডাকে। ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। ছেলেটাকে শুভ্রাংশু পছন্দ করে।

‘সুশীল একটা সাইকেল নেবে নাকি?’

‘সাইকেল! কোন সাইকেল মাস্টারমশাই?’ সুশীল উৎসাহ দেখায়।

‘আমারটা। পড়ে আছে বাড়িতে। ভাবছিলাম তুমি যদি নাও। অবশ্য তোমার একটা আছে। কিন্তু আমারটায় বড়ো কেরিয়ার, সেই বাবার আমলের জিনিস তো। বইপত্র নিয়ে যাতায়াত করতে পারবে, সেই কারণেই তোমাকে বলা।’

একটু চুপ থেকে সুশীল বলল, ‘কত দাম দিতে হবে মাস্টারমশাই?’

শুভ্রাংশু আওয়াজ করে হেসে উঠল। বলল, ‘কী বলছ সুশীল? বাপ ঠাকুরদার সাইকেল নিয়ে বিজনেস করব? তারওপর আবার তোমার সঙ্গে? দুর, একটা পয়সাও দিতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে নিয়ে যেয়ো।’

সুশীল নীচু গলায় বলল, ‘সত্যি কথা বলতে কী মাস্টারমশাই, সাইকেল নয়, কেরিয়ারটার জন্য লোভ হচ্ছে।’

সুশীল সেদিন রাতেই চলে এল এবং সাইকেল দেখে পিছিয়ে গেল। করুণা বলল, ‘ওর একটা আছে, আর একটায় গরজ নেই। তুমি লোক বুঝে বলতে পারতে।’

এর পরেরটা ‘লোক’ বুঝেই বলল শুভ্রাংশু। বঙ্কা ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি। টিউব লাইটের চোক বদলাতে এসেছিল বাড়িতে। কাজের ফাঁকে সাইকেলের কথাটা পাড়ল শুভ্রাংশু। এক কথায় বাতিল।

‘না কাকু। এখন আর সাইকেলে-টাইকেল চলবে না। একটা স্কুটার নিতে হবে। কাজের জন্য অনেক দূরে দূরে যেতে হচ্ছে। শহর বড়ো হয়ে গেছে। তার ওপর সবার তাড়া। সাইকেল চালিয়ে গুটুর গুটুর করে চলার সময় কই?’

শুভ্রাংশু বলল, ‘ও। তাও একবার দেখবে নাকি?’

‘লাভ কী? বরং পারলে হাজারখানেক টাকা ধার দিন। স্কুটারটা নিয়ে ফেলি। দু-হাজারে আটকে আছি।’

শনিবার স্কুল থেকে ফেরার পর করুণা বলল, ‘কী ব্যাপার বল তো? কী আরম্ভ করেছো তুমি! জনে জনে সাইকেল নেবে কিনা জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছ!’

‘জনে জনে কোথায় বলেছি!’ শুভ্রাংশু অবাক হল।

স্বামীর অবাকে পাত্তা দিল না করুণা। বলল, ‘সুপ্রভাদির সঙ্গে বাজারে দেখা হল। বলল কীরে তোর বর নাকি সাইকেলের বিজনেস করছে করুণা! কই জানাসনি তো? সেদিন বঙ্কা ফ্যান সারাতে এসে বলছিল। ভালোই করেছে। শুধু স্কুল মাস্টারিতে কি আর চলে? আজকাল সাইডে কিছু করতে হয়। মহিলা বেঁকা করে কথা বলে, শুনলে গা পিত্তি জ্বলে যায়...হাজারটা লোকের সামনে...ছি ছি...লজ্জায় আমার একেবারে মাটিতে মিশে যাওয়ার অবস্থা...কার্তিকও একই কথা বলল। ইস্! কী প্রেস্টিজ।’

শুভ্রাংশু বলল, ‘কার্তিক! সে কে?’

ঝাঁঝিয়ে উঠল করুণা, ‘কার্তিক কে জান না? একসময় অঙ্কুরকে পড়াত মনে

নেই? বলল, দাদার আবার সাইকেল আছে নাকি! কই কখনো চড়তে দেখিনি তো! বইয়ের দোকানের সুশীল সেদিন বলছিল, দাদা নাকি সেই সাইকেল...আমি এটা সেটা বলে কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচলাম। ছি ছি। তুমি দেখছি পাড়ায় থাকতে দেবে না। খবরদার আর যদি কাউকে ওই সাইকেলের কথা বলেছ আমি কিন্তু দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দেব।'

শুভ্রাংশু চুপ করে রইল। চুপ করেই সিদ্ধান্ত নিল, না আর কাউকে বলবে না। রবিবার সকালে স্টেশনের কাছে যে ভাঙা লোহালক্কড় বেচাকেনার দোকানটা আছে সেখানে চলে যাবে। বলবে, লোক পাঠিয়ে নিয়ে যায় যেন। সত্যি তো কাজটা ঠিক হয়নি। ছোটো জায়গা, কথা মুখে মুখে ছড়ায়। আর সেই ছড়ানোর সময় যে যার ইচ্ছে মতো রং লাগায়। করুণার সুপ্রভাদি, কার্তিকও লাগিয়েছে। করুণার অপমানিত হওয়ার কারণ আছে। তাও তো অঙ্কুর এখানে নেই। থাকলে তার কানেও আসত। বিরাট রাগারাগি করত তখন। একটা বাতিল, ফালতু জিনিস নিয়ে এই অশান্তির কোনো মানে আছে? কোনো মানে নেই।

তবু পরদিন দিবাকরকে ফস্ করে সাইকেলের কথাটা বলে ফেলল শুভ্রাংশু। স্কুলের পিয়োন দিবাকর। ছেলে ভালো নয়। লোক বুঝে খাতির করে। কোন মাস্টারের দাপট বেশি, কে হেডস্যারের নেকনজরে, গভর্নিং বডির সঙ্গে যোগাযোগ কার বেশি সব খবর রাখে। সেদিক থেকে 'এস জি' নগণ্য। সেই 'এস জি'র প্রস্তাব শুনে দিবাকর ভুরু কোঁচকায়।

'সাইকেল একটা আমার লাগবে ঠিকই, কিন্তু স্যার অতদিন আগের শুনে ভরসা পাচ্ছি না।'

শুভ্রাংশু নীচু গলায় বলল, 'কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। তুমি একবার গিয়ে দেখতে পার। মনে হয় না কন্ডিশন খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

'ওইটাই তো গোলমালের স্যার। মনে হল এক, গিয়ে দেখলাম আর এক। মাঝখান থেকে গাদাখানেক সময় নষ্ট।'

কথাটার মধ্যে একটা অপমানের সুর আছে। শুভ্রাংশু গায়ে মাখল না। জীবনে সব কিছু গায়ে মাখলে চলে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এটাই শেষ চেষ্টা। সাইকেলটাকে যদি টিকিয়ে রাখা যায়। শুভ্রাংশু খানিকটা গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার মনে হয় না সময় নষ্ট হবে দিবাকর। আর যদি সে-রকম মনে কর তাহলে...।'

দিবাকর চোখ তুলে বলল, 'তাহলে কী স্যার? যাব না?'

'না বলছিলাম, যদি মনে কর ওটা ব্যবহার করা যাবে না তাহলে না হয় লোহার দোকানে দিয়ে দিয়ো। ওরা ভেঙে-টেঙে ওজনদরে বিক্রি করে দেবে।'

দিবাকর হেসে বলল, 'এটাই আসল কথা স্যার। আজকাল আবর্জনা ফেলতেও পয়সা লাগে। মাল নিয়ে যাওয়ার ক্যারিং কস্ট আছে না? ভ্যান ভাড়া করতে হবে। ভাঙা সাইকেল তো আর মাথায় করে নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

আবার অপমান। দিবাকর কি ভাবছে ভ্যানের ভাড়া বাঁচাতে তাকে ডাকছে? শুভ্রাংশু সামান্য আহত গলায় বলল, 'চিন্তা কোরো না, সেই খরচ লাগলে আমি দেব।'

দিবাকর নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'জানি না স্যার পারব কি না। দেখি যদি সময় পাই কাল সকালে স্কুলে আসার আগে একবার আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে আসব।'

এসে কিন্তু ঘটনা ঘটল উলটো। জামায় ঝুল, হাতে ধুলো লাগিয়ে সাইকেলটা নিজেই টেনে বের করল দিবাকর। তারপর চোখ কপালে তুলে বলল, 'এ তো দারুণ আছে স্যার! একেবারে ফার্স্ট ক্লাস!'

দিবাকরের গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে এতটা 'দারুণ' সে ভাবতে পারেনি। শুভ্রাংশু গদগদ গলায় বলল, 'দারুণ তো থাকবেই। কোন আমলের জিনিস দেখতে হবে না? আরও একশো বছর দারুণ থাকবে।'

'স্ট্যান্ডটাও ঠিক আছে।'

দিবাকর ততক্ষণে এক হাতে হ্যান্ডেল, অন্য হাতে সিট ধরে সাইকেলটা টেনে দাঁড় করিয়েছে। পুরোনো আমলের লোহার স্ট্যান্ড। আজকালকার মতো লিকপিকে ফ্যাশন করা একপেয়ে নয়। এই জিনিসে পিছনের চাকা সামান্য উঠে দু-দিকেই ব্যালান্স রাখে। মনে হয় শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়িয়েছে। হাইটও বেশি। দাঁড়ানোর পর দুম করে আরও খানিকটা লম্বা হয়ে গেল। শুভ্রাংশুর মনে পড়ল, প্রথম একটা বছর তাকে লাফ দিয়ে উঠতে হত। বাবাকে বলতে, বাবা বলেছিল, 'আরে বাবা লম্বা তো হবি, নাকি একই থাকবি চিরকাল?' বড়ো বড়ো দুটো চাকা। চামড়া বাঁধানো চওড়া, বুক চেতানো সিট। হাতলদুটো দু-পাশে ছড়িয়ে আছে বাইসনের শিং-এর মতো। পিছনের লোহার কেরিয়ারটা দেখলে হাসি পায়। এতটাই বড়ো যে একটা ছোটোখাটো ট্রাঙ্ক দড়ি দিয়ে বেঁধে অনায়াসে নিয়ে যাওয়া যাবে। গাবদা সাইজের একটা বেলও আছে। বেলটা কি এখনো বাজে? শুভ্রাংশুর ইচ্ছে করল, একবার গিয়ে পরীক্ষা করে দেখে। এই বেল সে কতবার যে বাজিয়েছে। নিজেকে সামলাল। ছেলেমানুষির কোনো মানে হয় না। দিবাকর পকেট থেকে ফস করে একটা কাপড় বের করল। তারপর রড, হ্যান্ডেল, চাকা মুছতে শুরু করল দ্রুত হাতে। শুভ্রাংশু মনে মনে হাসল। ওস্তাদ ছেলে। কাল বড়ো বড়ো কথা বলছিল। অথচ আজ সঙ্গে ঝাড়পোঁছের কাপড় পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। সিঁড়ির একধাপ ওপর থেকেই সাইকেলটা দেখছে শুভ্রাংশু। দিবাকর যতটা বলছে অবস্থা ততটা 'দারুণ' না। বরং খানিকটা খারাপই। চাকাদুটো চুপসে আছে। মনে হচ্ছে, টায়ারগুলো গেছে। রড, হাতল আর কেরিয়ারে জং। চামড়ার সিটটাও ফেটেছে পাশ থেকে। দিবাকর যেন শুভ্রাংশুর মনের কথা বুঝতে পারল। সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি ভাববেন না স্যার, টুকটাক মেরামতগুলো করে নেব। দরকার হলে দুটো টায়ারই পালটে ফেলব। মনে হয় যা লাগবে। নন্দ সাইকেলের কাজ ভালোই করে। বেটা জিনিস দেখে চমকে যাবে। যাবে না স্যার?' কথাটা বলে দাঁত বের করে হাসল দিবাকর।

শুভ্রাংশু বলল, 'তাহলে দিবাকর, তখন কেন রাজি হচ্ছিলে না?'

দিবাকর মাথা চুলকে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি যখন বললেন বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, অবস্থা একবারে লজঝরে হয়ে গেছে।'

শুভ্রাংশু গর্বের হাসি হেসে বলল, 'আরে বাপু লজঝড়ে হলে কী আর বলি? যাও, নিয়ে যাও। এখন তো টেনে নিয়ে যেতে হবে।'

দিবাকর অতিরিক্ত উৎসাহ নিয়ে বলল, 'সমস্যা নেই। রাস্তাতেই পাম্প দিয়ে নিচ্ছি। আজ স্যার স্কুলে এই সাইকেলেই যাব। ভালো হবে না?'

শুভ্রাংশু উত্তর দিল না। মোলায়েম হাসল। কত বছর পর যে সাইকেলটা রাস্তায় চলবে! শুভ্রাংশুর খুব ইচ্ছে করল দিবাকরকে জিজ্ঞেস করে কখন সে স্কুলে আসবে? ওই সময়টা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে। নিজেকে আবার সামলাল শুভ্রাংশু। বলল, 'সে যাও, কিন্তু কাউকে কথাটা বোলো না। বোঝই তো, তুমি তো স্কুলের ব্যাপার সব জান দিবাকর।'

দিবাকর চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'জানি না আবার, খুব জানি। সব বেটা হিংসুটে। আপনি যে ভালোবেসে জিনিসটা আমায় দিলেন কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে, নিশ্চয় এস জির সঙ্গে কোনো সাঁট আছে। হারামি এক একটা।'

গালটা দিয়েই জিব কাটল দিবাকর। শুভ্রাংশু ভান করল যেন কথাটা শুনতে পায়নি। ফিসফিস করে বলল, 'শুধু একটাই কথা দিবাকর, একটু যত্নে রেখ...বোঝই তো মায়া আছে।'

'ও আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না স্যার, জিনিস তো আমারই হল। স্কুলে দেখা হবে।'

দিবাকরের সঙ্গে স্কুলে দেখা হল না শুভ্রাংশুর। স্কুলে সে এলই না। খবর এল, কোন এক ভাঙা সাইকেল চাপতে গিয়ে সে নাকি ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে বাঁ-পায়ের হাড়ে চিড় ধরেছে। বিকেলে এক্স-রে রিপোর্ট পেলে ফাইনাল জানা যাবে।

সন্ধের মুখে দিবাকরের ছোটো ছেলে সাইকেল ফিরিয়ে দিয়ে গেল। শুভ্রাংশু দরজা খুলতে বলল, 'বাবা বলেছে, এ জিনিস বাড়িতে রাখা চলবে না। আরও বড়ো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। ব্যালান্সে গোলমাল আছে। মায়ে আপনার কাছে কিছু টাকা চেয়েছে। ডাক্তারবাবুর খরচ...।'

সাইকেল আবার ঢুকে গেল সিঁড়ির তলায়। সেই অন্ধকারে। মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল জড়োসড়ো হয়ে। যেন নিজের জায়গায় ফিরে স্বস্তি পেয়েছে! হতাশ শুভ্রাংশু সেদিকে তাকাল ভুরু কুঁচকে।

৩

বুধুয়া নাক কুঁচকে বলল, 'দাম কিন্তু এখন বলতে পারব না দিদিমণি। আগে ভেঙে-টেঙে ওজন করে দেখতে হবে। সিট-টিট সব বাদ যাবে। তার ওপর স্ক্র্যাপের দাম আজকাল ভালো যাচ্ছে না।'

করুণা চোখ পাকিয়ে বলল, 'ভালো যাচ্ছে না বললেই মানব। কতটা লোহা পাবে বল তো। আগেরকার আমলের জিনিস, সেই আমার শ্বশুরের সময়ে। একেবারে খাঁটি লোহা।'

বুধুয়া খইনি খাওয়া তামাটে দাঁত বের করে হাসল।

'খাঁটি কোথায় দিদিমণি। জং ধরে গেছে। একটা হাতল, কেরিয়ার সবই ফেলে দিতে হবে। পায়ের কাছের চেন গার্ডটার অবস্থাও বহুত খারাপ। টিন পচে গেছে।'

একটু চমকে উঠে করুণা বলল, 'বাজে কথা বোলো না, টিন আবার পচে নাকি!'

বধুয়া দার্শনিক ধরনের হেসে বলল, 'কেন পচবে না দিদিমণি? খুব পচে। মানুষ পচে যাচ্ছে...এই দেখুন চেনেও জং লেগেছে।'

বলতে বলতে একটা প্যাডেল ঘুরিয়ে দিল বুধুয়া। বিশ্রী ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দ করে পিছনের চাকাটা ঘুরতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যে থেমেও গেল। হাঁপিয়ে পড়ল যেন।

বুধুয়া বসে আছে উবু হয়ে। সামনে স্ট্যান্ডের ওপর সাইকেল তোলা। বুধুয়া এখানকার সবথেকে বড়ো স্ক্র্যাপের দোকানটার মালিক। রাজ্যের ভাঙা লোহা কেনাবেচা করে। বুধুয়াকে শুভ্রাংশু খবর দিয়ে আনলেও কথা বলছে করুণা। স্বামীর ওপর তার আর বিশ্বাস নেই। সাতদিন পার হয়ে গেছে। কাজের কাজ হয়নি। যেটুকু যা হয়েছে তা 'অকাজ'। শেষ 'অকাজ'টার পিছনে তার ভূমিকা আছে। তাতে 'জিনিস'টার ওপর রাগ বেড়ে গেছে আরও কয়েকগুণ। কথাটা সে শুভ্রাংশুকে বলেনি। বলে হবে কী? ভীতু মানুষ। পরপর দুটো দুর্ঘটনায় টেনশন বাড়বে।

ঘটনাটা ঘটে পরশু। রান্নার মাসিকে চুপিচুপি বলেছিল, যদি চায় সাইকেলটা নিয়ে যেতে পারে। পয়সাকড়ি কিছু লাগবে না। তবে মেরামত করতে হলে, নিজের খরচে করতে হবে। বিনা পয়সায় আস্ত একটা সাইকেল লাভ হবে শুনে চোখ চকচক করে ওঠে রাজুর মায়ের। সেই লোভ বাড়িয়ে দেয় করুণা। বলে, সাইকেলটা নিলে সঙ্গে ঘাড় ভাঙা টেবিল ফ্যানটাও দিয়ে দিতে রাজি আছে। 'একটা কিনলে একটা ফ্রি' পাওয়ার সিস্টেম তো এখন সর্বত্র। ভাঙা জিনিস বলে কি সেই 'সুবিধে' থাকবে না? রাজুর মা দেরি করেনি। মাছের ঝোলের কড়াইতে ঢাকা দিয়ে দোতলা থেকে নেমে সিঁড়ির তলায় হানা দেয়। করুণা জানতে পারেনি। জানতে পারল রাজুর মায়ের চিৎকারে। হাতের কাজ ফেলে ছুটে গেল করুণা। রাজুর মা উঠে আসছে

সিঁড়ি বেয়ে। নিজের ডান হাতটা চেপে ধরে আছে বাঁ-হাত দিয়ে। সেখান থেকে রক্ত পড়ছে ঝরঝরিয়ে। শিউরে উঠল করুণা। কী হল। সাপখোপে কামড়ে দিল নাকি? রাজুর মা কাঁদতে কাঁদতে জানাল, সাপ নয় সাইকেল! আবর্জনা টপকে সাইকেল দেখতে গিয়ে বিপদ ঘটেছে। কেমন করে যেন চেন গার্ডে আটকে গিয়েছিল শাড়ি। অন্ধকারে ঠাওর হয়নি। সেই শাড়ি ছাড়াতে গিয়ে হাত কেটে গেছে লম্বাভাবে। করুণা ঘাবড়ে গেল। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের পুরোনো টিন। নাকি তার বেশি? বড়ো ধরনের কেলেঙ্কারি ঘটতে পারে। তাড়াতাড়ি টাকা বের করে রাজুর মাকে বলল, 'এখনই চল। মনে হচ্ছে স্টিচ করতে হবে।' রান্নাঘর থেকে পোড়া গন্ধ ভেসে এল।

তিনটে স্টিচ করতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজুর মায়ের কাজে আসা বন্ধ। রান্না করতে হচ্ছে করুণাকেই। এর পরেও জিনিসটার ওপর রাগ বাড়বে না?

তারপরই করুণার সিদ্ধান্ত, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাইকেলটা বাড়ি থেকে দূর করবে। এই কারণেই বুধুয়ার সঙ্গে কথা চালাচ্ছে।

বুধুয়া বলল, 'দিদিমণি, লোহার ওজন না-করে কিন্তু দাম বলতে পারব না।'

করুণা বলল, 'করো, বারন করেছে কে?'

বুধুয়া আবার তামাটে দাঁত দেখিয়ে হাসল। বলল, 'কী ভাবে করব? সাইকেল কি দাঁড়িপাল্লায় তুলব? ভেঙে করতে হবে না?'

'ভাঙতে হলে ভাঙবে। নিয়ে যাও। দোকানে নিয়ে গিয়ে যা করবার করো।'

'না দিদিমণি। বুধুয়া ওই ব্যাবসা করে না। যা করার খদ্দেরের সামনেই করব। পরে বলতে পারবেন না ঠকিয়েছি।'

করুণা বিরক্ত গলায় বলল, 'আমরা বলব না।'

বুধুয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে আনা বস্তা থেকে একটা বড়ো হাতুড়ি বের করে বলল, 'ঠিক আছে তাই হবে। আমি লোক পাঠিয়ে মাল তুলে নিয়ে যাচ্ছি।' বলতে বলতে সে হাতুড়িটা দিয়ে সাইকেলের গায়ে হালকাভাবে মারতে থাকে। ঢং ঢং আওয়াজে কিছুটা জং ঝরে পড়ে। ঝরে পড়ে গায়ে লেগে থাকা নষ্ট হয়ে যাওয়া রঙের পলেস্তারা। বুধুয়া সোৎসাহে বলে ওঠে, 'দেখেন দিদিমণি, কিতনা জং হায়। রড ভি ফাঁপা। একদম উইক হো গিয়া।'

করুণা হাত বাড়িয়ে হাঁই হাঁই করে ওঠে।

'অ্যাই কী করছ, কী করছ? বাড়ি নোংরা হচ্ছে যে, এখানে হাতুড়ি পিটছ কেন?'

বুধুয়া হেসে বলল, 'আর পিটব না, শুধু দেখিয়ে দিলাম।'

বলতে বলতে দুই হাতলের মাঝখানে সজোরে হাতুড়ি চালাল বুধুয়া। হঠাৎই হাত থেকে ছিটকে হাতুড়ি এসে লাগল তার তলপেটে। 'আই বাপ' বলে পেট চেপে বসে পড়ল বুধুয়া। ধাক্কা লেগে স্ট্যান্ড উপড়ে সাইকেলে টাল খেয়ে পড়ল তারই গায়ের ওপর।

বহুদিন পর সেদিন রাতে স্বামীর গায়ে হাত দিল করুণা। সেই স্পর্শ আদরের নয়, ভয়ের।

'আমার ভয় করছে।'

ঘর অন্ধকার। চিত হয়ে শুয়ে আছে শুভ্রাংশু। করুণার কথায় চুপ করে রইল। করুণা ফিসফিস করে বলল, 'পর পর তিনজন! তিনজনের বেলাতেই ঘটল... সেদিন তোমার দিবাকর, পরশু রাজুর মা, আজ বুধুয়া...আমার ভালো লাগছে না।'

শুভ্রাংশু বলল, 'দুর, দুর সব অ্যাক্সিডেন্ট। নিজেরা অ্যালার্ট ছিল না। দেখলে না বুধুয়াটা কেমন গাধার মতো হাতুড়ি চালাল? স্লিপ তো করবেই। আমি হলেও করত। সাইকেলে না-করে অন্য কোথাও করলেও লাগত। একটু বেশি লেগেছে এই যা।'

'হয়তো তাই, তবু আমার কেমন যেন লাগছে। যাই বল, জিনিসটা অলক্ষুণে।'

সংসারে ভীতু শুভ্রাংশু কিন্তু স্ত্রীর এই ভয়ে হেসে ফেলল। অন্ধকারে সেই হাসি দেখা গেল না। বলল, 'কই এতদিন তো কিছু হয়নি! ওই সাইকেলের জন্য কারো পা-ও ভাঙেনি, হাতও কাটেনি।'

করুণা ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে বলল, 'কী জানি, বুঝতে পারছি না, জিনিসটা বাড়ি থেকে সরাচ্ছি বলে এমন হচ্ছে না তো? হয়তো আপত্তি জানাচ্ছে।'

শুভ্রাংশু জোরে হেসে উঠল। বলল, 'কে আপত্তি করছে? সাইকেল! এর হাত কেটে, তার পা ভেঙে লড়াই করছে? অঙ্কুরকে কালই ফোন করে গল্পটা করতে হবে।'

কথা শেষ করে শুভ্রাংশু হাত বাড়িয়ে করুণাকে কাছে টানল। অন্যসময় হলে, ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিত। বলত, 'মাগো, ছেলের বিয়ে দেওয়ার বয়স হয়ে গেল ওনার এখনো শখ মিটল না।' আজ কিছু বলল না। বরং উলটোটা হল। স্বামীর কাছে সরে এল। বিড়বিড় করে বলল, 'হয়তো বাড়ি থেকে যেতে চাইছে না।'

'তোমার কি মাথা একদম খারাপ হয়ে গেল করুণা?'

'একটা কথা বলব?'

স্ত্রীর থুতনিতে হাত দিয়ে শুভ্রাংশু বলল, 'বলো।'

'হ্যাঁগো, তোমার ওই জিনিসটার ওপর কোনো দরদ নেই তো?'

'দরদ! দরদের কী আছে? স্মৃতি আছে। সে তো পুরোনো সব জিনিসেই থাকে। খাট, আলমারি, চেয়ার, টেবিল। তা বলে কি আমরা সেগুলো আঁকড়ে বসে থাকি? না থাকা সম্ভব? আমি সাইকেলটার দিকে কত বছর তাকিয়ে দেখিনি পর্যন্ত বল তো। সিঁড়িরতলা পরিষ্কারের কথা উঠল তাই, নইলে হয়তো আরও কয়েকবছর ওভাবেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত। তুমি চিন্তা কোরো না করুণা। কালই আমি ওর ব্যবস্থা করব।'

স্ত্রীর মুখের ওপর মুখ নামাল শুভ্রাংশু। করুণা কাঁপা গলায় বলল, 'কী ব্যবস্থা করবে?'

এবার শুভ্রাংশু করুণার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আমি নিজে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসব।'

'তুমি নিজে?' দাপুটে করুণা অনেকটাই যেন মিইয়ে পড়েছে। ভয় মানুষের চরিত্র বদলে দেয়।

শুভ্রাংশু বলল, 'হ্যাঁ আমি নিজে। অনেক হয়েছে। আর লোক ডাকাডাকির দরকার নেই। আবার কে কী রটাবে তার নেই ঠিক। যাব একদম ভোরবেলা। ভালো করে আলো ফোটবার আগেই। কেউ জানতেও পারবে না। রেললাইনের ওপাশে যে আগাছার জঙ্গল আছে...মনে পড়েছে? ওখানেই ফেলব। দরকার হলে স্কুল যাব না কাল। সি. এল. নেব। সারাদিন লোক লাগিয়ে তোমার সিঁড়িরতলা একেবারে ঝকঝকে করে ফেলব। সুশীলকে ডেকে একটা আলোর লাইন করে নেব জায়গাটায়। তোমার ছেলে বাড়ি এসে একেবারে চমকে যাবে।'

করুণা নিশ্চিন্ত গলায় বলল. 'ঠিক বলছ তো?'

দু-হাতে করুণার গাল দুটো ধরে গাঢ় স্বরে বলল, 'একদম ঠিক।'

বহু বছর পর করুণা স্বামীকে জড়িয়ে ধরল।

সম্ভবত শেষরাতে বৃষ্টি নেমেছিল। এই ভোরেও সেই বৃষ্টি চলছে টিপটিপ করে। মেঘলা আকাশ ঝিম মেরে আছে। এখনো সেভাবে লোক নামেনি পথে। যারা মর্নিংওয়াক করে তারাও বৃষ্টির কারণে বেরোয়নি। রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটছে শুভ্রাংশু। এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে সাইকেলের হাতলটা ধরা। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় করুণা পই পই করে বলে দিয়েছে, কাজ হয়ে গেলেই যেন মোবাইল থেকে একটা ফোন করে। চিন্তায় থাকবে।

শুভ্রাংশুর কোনো চিন্তা নেই। সে হাঁটছে সাবধানে। সাইকেলটা ভিজছে। টপ টপ করে জল পড়ছে রড, হাতল, সিট থেকে। শুভ্রাংশুর মনে হল বৃষ্টির জল নয়, কান্না। আহা, কাঁদুক।

অর্জুন



বড়োমামা বলল, "তোমাদের এবার বাঘ দেখিয়ে আনব। আমি কথা দিচ্ছি।"

মা হেসে বলল, "দাদা, সুন্দরবন নিয়ে যাওয়ার সময় সকলেই এ-রকম বলে। শেষ পর্যন্ত ক-টা হরিণ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। আমি যখন কলেজে পড়েছি তুমি বাঘ দেখাবে বলে বাড়িশুদ্ধ সবাইকে সুন্দরবন টেনে নিয়ে গিয়েছিলে। সেবার হরিণও দেখতে পাইনি। তোমার মনে নেই?"

বাবা মায়ের থেকেও জোরে হেসে বলল, "সে দীপু আর কী করবে বল? বাঘেরা যদি ওর কথা না-শোনে। তারা তো আর পোষা বিড়াল নয় যে ডাকলেই মিউ মিউ করে চলে আসবে।"

হাসিঠাট্টা গায়ে মাখল না বড়োমামা। বলল, "জামাইবাবু, জঙ্গলে বাঘ দেখা একটা ভাগ্যের ব্যাপার। একে বলে টাইগার লাক। এই লাক সবসময় ক্লিক করে না। যখন করে তখনই শুধু বাঘ দেখা যায়। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এবাব আমাদের লাক ক্লিক করবে। তা ছাড়া বহুবছর ওদিকটায় যাইনি।"

সোফার একপাশে বসে ছোটোমাসি মন দিয়ে উল বুনছিল। উলের কাঁটা থেকে মুখ না-তুলে বলল, "বড়দা, তোর মনে হওয়ার জন্য গায়ে ব্যথা করাতে রাজি নই। গ্যারান্টি কী যে বাঘ দেখা যাবে?"

ছোটোকাকা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল,"বাঘ দেখার জন্য খরচখরচা করে সুন্দরবন পর্যন্ত যাওয়ার দরকার কী? অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট চ্যানেল খুলে বসলেই তো মিটে যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওরা বাঘ সিংহ দেখাচ্ছে। এখন খুললে এখনো পাবে। বউদি, তুমি বরং বেশি করে তেলেভাজার ব্যবস্থা কর। তেলেভাজা সহযোগে টিভিতে বাঘ দেখা যাক।"

বাবা বলল, "সত্যি কথা বলতে কী দীপু, এত বয়স হয়ে গেল আমার, আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত একজনকেও পেলাম না যে সুন্দরবনে গিয়ে বাঘ দেখে এসেছে।"

মেজদি ম্যাগাজিন পড়ছিল। হাত তুলে বলল, “এমন লোককে আমি দেখেছি।”

মা বলল, “কাকে দেখেছিস? সত্যি সত্যি বাঘ দেখেছে?”

মেজদি বলল, “রাই দেখেছে। রাই আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ে। সে গতবছর এ-রকম শীতে সুন্দরবন গিয়েছিল। দু-দিনের ট্যুর। ফিরে এসে বাঘের ফটো দেখাল। ওর ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা।”

ছোটোকাকা ভুরু কুঁচকে বলল, “বাঘটা কী করছিল রুমকি? নদীতে সাঁতার কাটছিল?”

মেজদি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “সাঁতার কাটবে কেন? সুন্দরবনে সব বাঘ কি সাঁতার জানে? রাইয়ের ফটোর বাঘ বসেছিল। বসে বসে হাই তুলছিল।”

ছোটোকাকার মন থেকে সন্দেহ গেল না। বলল, “তুই ফটোটা ভালো করে দেখেছিলি? আজকাল খুব ফটোর কেরামতি হয়। হয়তো বই থেকে তুলে ফটোশপে ফেলে বানিয়েছে। তোরা তো আবার ফটোশপ কী জানিস না।”

মেজদি চোখ বড়ো বড়ো করে ঝগড়া-গলায় বলল, “ওমা! ফটোশপ কী জানব না! কম্পিউটারের এই প্রোগ্রাম এখন ছেলেমানুষরাও অপারেট করতে পারে। তা ছাড়া রাই ফটোর কেরামতি করতেই-বা যাবে কেন? সে তো আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে ছবি তুলেছে। তিন বছর আগে ওই বাঘকে সুন্দরবনের গ্রাম থেকে ধরা হয়েছিল।”

বাবা হেসে বলল, “তাই বল। তাহলে সুন্দরবন ট্যুরে গিয়ে দেখা হল বলছিস কেন?”

মেজদি গম্ভীর গলায় বলল, “ওরা সুন্দরবন ট্যুরের সঙ্গে আলিপুর জু-টাও জুড়ে নিয়েছিল। প্যাকেজ ট্যুর। তাহলে তো সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েই বাঘ দেখা হল। হল না?”

এবার সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

বড়োমামা বলল, “হাসির কথা নয়, আমার মন কিন্তু বলছে এবার বাঘ দেখতে পাবে।”

বড়োমামি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, “উনি একেবারে বিরাট বাঘ জ্যোতিষী এসেছেন। হাত গুনে বলে দিচ্ছেন বাঘ দেখা যাবে।”

প্রতিবছর শীতে আমরা একটা করে পারিবারিক ট্যুর করি। দু-তিনদিনের ছোটোখাটো উইক এন্ড ট্যুর। যাওয়ার আগে সবাই মিলে বসে জায়গা ঠিক হয়। গতবার যেমন আমরা গিয়েছিলাম গালুডি। তার আগেরবার, দীঘার কাছে চাঁদিপুর। তার আগেরবার শান্তিনিকেতন। আমরা সারাবছর এই ছোটো বেড়ানোটার জন্য অপেক্ষা করে থাকি। অনেক সময় বড়ো বেড়ানোর থেকে ছোটো বেড়ানোয় বেশি মজা হয়। দলবেঁধে যাওয়া হয় বলেই মজা বেশি। জায়গা নিয়ে প্রতিবারই অবশ্য একেকজন একেকরকম কথা বলে। আমি আর আমার খুড়তুতো বোন বুনি শুধু কিছু

বলি না। আমি পড়ি ক্লাস এইটে আর বুনি সিক্সে। আমরা জায়গার কী জানি? আর তা ছাড়া আমাদের বেড়াতে গেলেই হল। জায়গা নিয়ে অত বাছবিচার নেই। এবার যেমন বড়োমামা প্রস্তাব দিয়েছে সুন্দরবন যাওয়ার। শুধু সুন্দরবন যাওয়াই নয়, সেখানে বাঘও দেখাবে বলছে। এই প্রস্তাব আমার খুব পছন্দ হয়েছে। খুব পছন্দ বললে কম বলা হবে। খুব খুব পছন্দ হয়েছে। জঙ্গলে বাঘ আমরা শুধু সিনেমাতেই দেখেছি। সুন্দরবনের রয়্যালবেঙ্গল টাইগারের গল্প তো কম শুনিনি। সেই বাঘ যদি সত্যি সত্যি দেখতে পাই তাহলে দারুণ একটা ব্যাপার হবে। কলকাতায় ফেরার পর আমাদের দাম বেড়ে যাবে। স্কুলের বন্ধুরা খাতির করবে। আমরা বড়োমামার দলে। সুন্দরবনেই যেতে চাই। বড়োমামা যখন বলছে, বাঘ দেখা যাবে তখন দেখা যাবেই। বড়োমামা মিথ্যে কথা বলবে কেন? কিন্তু বাকিরা কি রাজি হবে? আমি আর বুনি দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছি। ইস আমরা যদি ছোটো না-হতাম তাহলে নিশ্চয় আমাদের মতামত শোনা হত।

মা বলল, ‘‘আচ্ছা, অনেক সময় বিখ্যাত মানুষরা যে সুন্দরবনে রয়্যালবেঙ্গল টাইগার দেখতে যান, তখন কী হয়? তারা দেখতে পান?’’

বাবা বলল, ‘‘তুমি ভি আই পিদের কথা বলছ তো? তারা অবশ্যই দেখতে পান। ওদের একেবারে কোর এরিয়ায় লঞ্চে করে নিয়ে যাওয়া হয়। স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে।’’

মা বলল, ‘‘আমরা কোর এরিয়ায় যেতে পারি না?’’

বাবা বলল, ‘‘সাধারণদের সবসময় সেই পারমিশান দেওয়া হয় না। সুন্দরবন যেমন সুন্দর তেমন আবার ভয়ংকর। যে কোনো সময় বাঘ আক্রমণের ভয় আছে। তার ওপর ডাকাত, ঝড় জল এসব তো আছেই। ভিআইপিদের মতো তো আর আমাদের স্পেশাল সিকিউরিটি দেওয়া হবে না।’’

ছোটোকাকা বলল, ‘‘ভিআইপিদের জন্য অ্যারেঞ্জমেন্টটা কী? বাঘ তো আর তাড়া করে আনা যাবে না।’’

মেজদি বলল, ‘‘কাগজে কিন্তু পড়ি অমুক দেশের প্রেসিডেন্ট, তমুক দেশের মন্ত্রী সুন্দরবন সফরে গিয়া ব্যাঘ্রদর্শন করিলেন।’’

ছোটোকাকু বলল, ‘‘কচু দেখিলেন। একবার সুদানের কোন এক রাজাকে বাঘ দেখানো হবে বলে মেকআপ করে নদীতে লোক নামানো হয়েছিল।’’

বড়োমামি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, ‘‘বল কী! সাজানো বাঘ?’’

বুনি বলল, ‘‘ছিনাথ বহুরূপীর মতো কাকা?’’

ছোটোকাকা সিরিয়াস মুখ করে বলল, ‘‘অনেকটা ওইরকম। বাঘের মুখোশ পরিয়ে দূর থেকে সাঁতার কাটানো হল। সুদানের রাজা লঞ্চের মাথায় ডেক চেয়ারে বসে পটাপট ছবি তুললেন আর বলতে লাগলেন হাই কো আ, হাই কো আ।’’

নন্তুদা আমার পিসির বড়ো ছেলে। কথা কম বলে। এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, ‘হাই কো আ! এর মানে কী?’’

ছোটোকাকা গম্ভীর গলায় বলল, "হাই কো আ! মানে হল কী ভয়ংকর। এটা আফ্রিকার একটা ভাষা।"

বাবা বলল, "এ-ঘটনা তুই কোথা থেকে জানলি? কোন কাগজে বেরিয়েছিল? কই আমি তো জানি না।"

ছোটোকাকা বলল, "কোথাও বেরোয়নি, আমি জানি। সব ঘটনা কি কাগজে বেরোয়?"

নন্তুদা বিড়বিড় করে বলল, "হাই কো আ...।"

সবাই আবার হেসে উঠল। আমি আর বুনি বুঝতে পারলাম, আমাদের বেড়ানোর মজা এখনই জমে উঠেছে।

বড়োমামি বড়োমামাকে বলল, "তুমি বরং ওই ব্যবস্থাই কর। বাঘের মুখোশ নিয়ে চল। লঞ্চ থেকে নেমে সাঁতার দেবে, আমরা ছবি তুলব।"

বাবা বলল, "অনেক হাসি ঠাট্টা হয়েছে, এবার জায়গাটা ঠিক করে ফেল। সামনের শনিবার যদি বেরোতে হয় তাহলে আর দেরি করা উচিত হবে না।"

মেজদি বলল, "জায়গা নিয়েই তো গোলমাল হচ্ছে।"

বড়োমামা বলল, "আমি একটা কথা বলব?"

ছোটোমাসি বলল, "তুমিই তো বলছ বড়দা। আমরা চুপ করে আছি।"

বড়োমামা বলল, "এবার বরং বিল্টু আর বুনিকে চান্স দেওয়া হোক। ওরাই ঠিক করুক কোথায় যাবে। প্রতিবার তো বড়োরা স্পট বাছে, এবার ছোটোরা বাছুক।"

মা বলল, "ওমা! ওরা কী বলবে? ওরা কী জানে?"

বুনি লাফ দিয়ে উঠে বলল, "জানি জেঠিমা।"

কাকিমা চোখ পাকিয়ে বলল, "পাকামি হচ্ছে?"

আমি এক মুহূর্ত দেরি না করে বললাম, "আমি চাই সুন্দরবন।"

বুনি বলল, "আমিও চাই সুন্দরবন।"

বড়োমামা মিটিমিটি হেসে বলল, "তাহলে তো আর কোনো কথা নেই। সুন্দরবনই যেতে হবে। যাই আমি ব্যবস্থা করি।"

যারা সুন্দরবন গেছে তাদের কাছে সুন্দরবন বেড়ানোর গল্প নতুন করে বলে লাভ নেই। যারা যায়নি তাদের কাছে বলেও লাভ নেই। কারণ এই বেড়ানোটা এত সুন্দর যে বলে বোঝানো যাবে না। আমরা দুটো দিন লঞ্চে চেপে জলের ওপর ছিলাম। দু-পাশের সবুজ জঙ্গল, ছোটো ছোটো গ্রাম, নদীর ওপর জেলেদের মাছ ধরার নৌকো। নদীর পাড়ে গ্রামের মেয়ে বউরা মীন ধরছে। যত এগোচ্ছি, পাশের জঙ্গল থমথম করছে। নদীর স্রোত কমছে বাড়ছে। আমরা লঞ্চের ডেকেই হইহই করে সময় কাটাচ্ছি। বড়োমামার চোখে দূরবীন। জঙ্গলের ফাঁকে উনি বাঘ খুঁজছেন। নন্তুদার চোখে ক্যামেরা। ঘন ঘন ছবি উঠছে। রাত হলে নদী ভাসিয়ে চাঁদ উঠল। জলের ওপর কুয়াশার সর। মা, কাকিমা, ছোড়দি গলা ছেড়ে গান ধরল—আজ

জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। রাতে লঞ্চ বাঁধা হল পাড় থেকে অনেকটা দূরে। সারেং মুরগির ঝোল করে ফেলেছে। গরম ভাত দিয়ে সেই ঝোলই বোধ হয় অমৃত। বাবা বলল, "খাওয়ার সময় অত আওয়াজ করিস না, লোভে পড়ে বাঘ চলে আসবে।"

না, বাঘ এল না। দুটো দিন একটা রাত টইটই করে জলে জঙ্গলে ঘুরেও বাঘের লেজটুকু পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। তবে সত্যি কথা বলতে কী, বেড়ানোর মজাটা এত বেশি হচ্ছিল যে বাঘ না-দেখার কথাটাই অত মাথায় থাকল না। মাঝে মাঝে শুধু বড়োমামাকে খোঁচা খেতে হচ্ছিল। কথার খোঁচা।

বাবা বলল, "কী হল দীপু, তোমার বাঘ কোথায় গেল?"

মা বলল, "মনে হয় ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে গেছে। ওদেরও উইক এন্ড ট্যুরে যেতে ইচ্ছে করে।"

ছোটোমামি বেড়াতে এসেও উল বুনছে। বলল, "বড়দা, মনে হচ্ছে একটা মুখোশ আনলে ভালো হত।"

ছোটোকাকা বলল, "বাঘ দরকার নেই, বাঘের পায়ের ছাপ দেখলেই হত।"

লঞ্চের মাঝি মাল্লা সারেং বাঘ নিয়ে অনেক গল্প শোনাল। তবে জলে থাকার সময় ওরা বাঘের নাম নেয় না। আপনি আজ্ঞে করে। সারেং-এর নাম হবিবুর মোল্লা। আমরা ডাকি হবিবুরচাচা। হবিবুরচাচা বলল, "কর্তা ওনাদের দেখা ভালো, আবার না-দেখাও ভালো।"

"না-দেখা ভালো কেন!"

"দেখলে অনেক সময় বিপদ হয়।"

"দুর আমাদের কী বিপদ হবে? আমরা তো লঞ্চে। লঞ্চ পর্যন্ত তো আর বাঘ আসবে না।"

"কর্তা সে-কথা কি কেউ বলতে পারে? সুন্দরবনে এ-রকম ঘটনা কত ঘটেছে। লঞ্চে উঠে মানুষ ধরে নিয়ে গেছে।"

বড়োমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, "নিক, তুমি একটা জম্পেশ দেখে খাঁড়ি ধর দেখি হবিবুরচাচা। বাঘ একটা দেখাতেই হবে। নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।"

আমাদের লঞ্চ এক দুপুরে খাঁড়িতেও ঘোরালো। ছায়া ছায়া, বেশি গা ছমছমে সেই ভ্রমণ দারুণ হল। কুমির দেখলাম। হরিণ দেখলাম। কিন্তু বাঘ দেখা হল না।

ঘটনা ঘটল ফেরার দিন।

লঞ্চের ইঞ্জিনে কী-একটা গোলমাল হল। হবিবুরচাচা বলল, ক্যানিং-এ ফেরার আগে একটু মেরামতি দরকার। ঝড়খালি নামের একটা জায়গায় লঞ্চ দাঁড় করানো হল। নদীর ঘাটে অনেকটা কাদা। আমরা কেউ নামলাম না। নামল শুধু বড়োমামা, নন্তুদা আর ছোটোকাকা। বাবা বলল, "দেরি কোরো না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কিন্তু ফিরে এস।"

আমি বললাম, "আমিও যাব।"

বিনু বলল, "আমিও।"

মা বারণ করল। বড়োমামা বলল, "যাক না, সুন্দরবনের জঙ্গল দেখলেই তো শুধু চলবে না। মানুষও দেখতে হবে।"

বাঁশ আর তক্তার ওপর ব্যালান্স করে আমরা ঘাটে পৌঁছোলাম। ছিমছাম বাজার। ছড়ানো ছিটোনো গ্রাম। শান্ত মানুষ। নন্তুদা ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে তুলতে এগিয়ে গেল। বড়োমামা একটা দোকানে গিয়ে চা আর বড়ো বড়ো জিলিপির অর্ডার দিল। ছোটোকাকা এদিক-ওদিক ঘুরে মাটির হাঁড়ি কলসির দরদাম করতে লাগল।

মিনিট কুড়ি পঁচিশও হয়নি, হঠাৎ নন্তুদা হন্তদন্ত হয়ে এল।

বড়োমামা বলল, "কী হল?"

নন্তুদা বিস্ফারিত চোখে বলল, "ওদিকে একটা বাড়িতে ভয়ংকর কাণ্ড হয়েছে।"

ছোটোকাকা বলল, "ভয়ংকর কাণ্ড! গোলমাল কিছু?"

নন্তুদা ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "বাড়ির বড়ো ছেলেকে বাঘে কামড়েছে।"

আমি বললাম, "বাঘ!"

নন্তুদা উত্তেজিত গলায় বলল, "হ্যাঁ, দিন দশ আগে হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদী পেরিয়ে দল বেঁধে কাঠ কাটতে গিয়েছিল, সেখানেই বাঘ অ্যাটাক করে।"

ছোটোকাকা বলল, "সেকী রে! বেঁচে আছে?'

নন্তুদা বলল, "বেঁচে আছে। শুনলাম এই লোক নাকি তার দলের একজনকে বাঘের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। তাকে কলকাতায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।"

বিনু আমার হাত খিমচে ধরে বলল, "বাঘের সঙ্গে লড়াই?"

নন্তুদা বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে। আমি ওই লোকের ছবি তুলতে যাচ্ছি। তোমরা কি যাবে?"

ছোটোকাকা বলল, "দেরি হয়ে যাবে না তো?"

বড়োমামা বলল, "হলে হবে। আমি যাব।"

আমি আর বিনু বললাম, "আমরাও যাব।"

ঘটনা সত্যি। লোকটার নাম অর্জুন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাটির বাড়ি খুঁজে যখন পৌঁছোলাম অর্জুন তখন দাওয়ায় বসে ধামায় মুড়ি নিয়ে খাচ্ছে। পিঠের ওপর বিরাট ব্যান্ডেজ। কলকাতা থেকে এসেছি শুনেই তার বউ খাতির করে বসাল। তারপর সেই মানুষের মুখে ঘটনাটা শুনলাম।

কাঠ কাটার সময় অতর্কিতে বাঘ এসেছিল পিছন থেকে। অর্জুনের সঙ্গীর কাঁধে থাবা বসায় নিঃশব্দে। তারপর টানতে থাকে। চিৎকার শুনে সবাই প্রথমটায় হতবাক হয়ে যায়। তারপর ছুটতে থাকে নদীর দিকে। একবার নৌকোয় উঠতে পারলে নিশ্চিন্ত। বাঘ নাকি অনেক সময় প্রথম শিকার ছেড়ে অন্য কাউকে আক্রমণ করে।

সেই কারণেই পালানো। অর্জুন পালায়নি। সে চট করে বড়ো গাছের ডাল তুলে তেড়ে যায়। মানুষ যে একটা সামান্য গেছো ডাল হাতে তেড়ে আসতে পারে এমনটা বেচারি বাঘও বোধ হয় কল্পনা করতে পারেনি। সে হতচকিত হয়ে অর্জুনের সঙ্গীকে ছেড়ে দেয়। তখন সেই লোকের কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে। অর্জুন বুঝতে পারে বাঘ ঘাবড়েছে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সঙ্গীর ওপর। তার পা ধরে টান মারে। বাঘের একটা থাবা এসে পড়ে অর্জুনের পিঠে। অর্জুন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হাতের গাছের ডালটা ছোড়ে। বাঘের চোখে লাগে। বাঘ কয়েক পা পিছিয়ে যায়। ততক্ষণে অর্জুন তার আহত সঙ্গীকে অনেকটা সরিয়ে নিয়েছে। এই সময় বাকিরা নদীর ধার থেকে হইহই করে ছুটে আসতে থাকে। দুই সঙ্গীকে ফেলে তারা যেতে পারছে না। তাদের হাতে পাথর, লাঠি, কুঠার, দা সবই ছিল। বাঘটা এবার সত্যি সত্যি ঘাবড়ে যায়। কয়েক লাফে জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। অর্জুন আর তার সঙ্গীসাথিরা একমুহূর্ত দেরি করেনি। বাঘ আবার ফিরে আসতে পারে। তারা আহত দুই সঙ্গীকে একরকম কাঁধে ফেলেই নৌকায় উঠে পড়ে এবং সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড় বেয়ে পাড় থেকে সরে আসে। ঝড়খালিতে আসার পর বেশি আহতকে পাঠানো হয়েছে কলকাতায়। অর্জুনের চিকিৎসা হয়েছে ক্যানিং হাসপাতালে। প্রথম ক-দিন খুব ব্যথা যন্ত্রণা হয়েছে, তবে এখন অনেকটা সুস্থ। কলকাতার হাসপাতালে যে ভরতি হয়েছে তার অবস্থারও উন্নতি হচ্ছে।

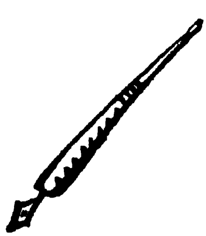
বড়োমামা উজ্জ্বল চোখে অর্জুনের হাত ধরে বলল, "আপনি তো ভাই বীরের মতো কাজ করেছেন। বাঘের সঙ্গে লড়াই! বাপরে! এ তো গল্প মনে হচ্ছে।"

ছোটোকাকা বলল, "আপনি না-থাকলে আপনার সঙ্গীকে সেদিন কিছুতেই বাঁচানো যেত না।"

শক্ত সমর্থ চেহারার অর্জুন লাজুক মুখে হেসে বলল, "এ আর এমন কী করেছি? শুধু ওনাদেরই সাহস থাকবে? আমাদের থাকবে না? মানুষ কম কীসে?"

নন্তুদা পটাপট অর্জুনের ছবি তুলতে লাগল। আমি আর বুনি বললাম, "অর্জুনকাকুর সঙ্গে আমাদের ছবিও তুলতে হবে।"

সত্যিকারের বাঘের সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ কেউ ছাড়তে পারে? কলকাতায় গিয়ে সবাইকে দেখাতে হবে না?



সব ঠিক আছে

থানা থেকে বেরোনোর সময় ঠোঁট সরু করে শিস দেবার চেষ্টা করলাম। শিস হল না। ফর্‌ফর্‌ ধরনের একটা আওয়াজ হল।

আমার কোনোদিনই শিস হয় না। ছোটোবেলায় এই কারণে দুঃখ ছিল। দেখতাম বন্ধুরা সবাই পারে। শিস দিয়ে পাখির ডাক নকল করে, রাস্তার কুকুর বিড়াল ডাকে, এমনকী গানও গাইতে পারে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছি। অনেকরকম আওয়াজ বেরোতো, শুধু শিসটাই বেরোত না। আমার অপমান হত, রাগ হত। বন্ধুরা হেসে বলে, 'ছেড়ে দে শশাঙ্ক, তোর হবে না।'

কাঁদো কাঁদো গলায় বন্ধুদের বলতাম, 'তোদের সবার হয়, আমার কেন হবে না!'

বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলত, 'তুই মনে হয় খাঁটি গুডবয়।'

আমি অবাক হতাম। বলতাম, 'গুডবয়ের আবার খাঁটি, ভেজাল আছে নাকি!'

'আলবাত আছে। খাঁটি গুড বয়দের অনেকরকম লক্ষণ থাকে। তার একটা হল, ওদের শিস আসে না।'

এই ঠাট্টায় আমার রাগ হত, আবার মনে মনে খুশিও হতাম। 'খাঁটি গুড বয়' হওয়ার খুশি। এই ধেড়ে বয়েসে হঠাৎ নতুন করে মুখে শিস আসবে এমনটাও নয়। তবু চেষ্টা চালাচ্ছি। এই চেষ্টা শিসের জন্য নয়, অন্য কারণ আছে। এই মুহূর্তে আমি দেখাতে চাইছি, 'কিছুই হয়নি, সব ঠিক আছে।'

অন্যকে দেখাতে চাইছি, আবার নিজেকেও দেখাতে চাইছি। 'কিছুই হয়নি, সব ঠিক আছে' দেখাতে শিস সব থেকে উপযুক্ত জিনিস। দুশ্চিন্তায় থাকা মানুষ অনেক কিছু করে, কিন্তু কখনো শিস দেয় না। আমি শিস দিচ্ছি দেখলে সবাই ভাববে, আমারও কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আমি একজন নরমাল মানুষ।

কথাটা যদিও সত্যি নয়। এই মুহূর্তে আমি ভয়ংকর দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি।

সেই দুশ্চিন্তায় খানিকটা ভয় আছে, বেশিটাই আছে আতঙ্ক। যতক্ষণ ওসি সাহেবের ঘরের ভেতর ছিলাম, ততক্ষণ অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না। শুধু ভয় ছিল। বুক ঢিবঢিব করছিল। গলা শুকিয়ে আসছিল। অল্প অল্প ঘামও হয়েছে। কিন্তু 'কাজ' শেষ করে দরজার হালকা নীল পর্দা সরিয়ে ঘরের বাইরে পা দিতেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। কেউ জানতে পারবে না তো? শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। নিজেকে সামলানোর জন্য মুখ হাসি হাসি করলাম। কেউ যেন মুখ দেখে বুঝতে না পারে, আমি ঘাবড়ে গেছি। যদিও আমাকে দেখার মতো আশেপাশে কেউ নেই। ভাদ্র মাসের প্যাচ প্যাচে দুপুর। এই সময় থানার বাইরে কে থাকবে? ওসির ঘরের বাইরে টানা বারান্দা। বারান্দা থেকে নেমে গেট। গেটের পাশে সেন্ট্রি টুল পেতে বসে আছে। সেও আমার দিকে তাকাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে নিজের হাতের তালুর দিকে। খইনি বানাচ্ছে। মনে হচ্ছে, খইনি নয়, বড়ো ধরনের কোনো শিল্পকর্মে ব্যস্ত। পাথর বা কাঠ খোদাই করে মূর্তি তৈরি করছে। সামনে একজিবিশন আছে। আমি সেন্ট্রির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। হেসেই বুঝলাম, কোনো দরকার ছিল না। যে আমার দিকে তাকিয়ে নেই, তার দিকে তাকিয়ে হাসার কোনো মানে হয় না। তবু হাসলাম। এর একটাই অর্থ। আমি নার্ভাস। নার্ভাস মানুষ লজিক ফেল করে।

সাইকেল রেখেছিলাম বারান্দার গায়ে হেলান দিয়ে। টেনে নিয়ে গেট পেরোলাম। রোদে তেজ নেই, জ্যাবজ্যাবে একটা অস্বস্তি আছে। ছাতাটা খুলে মাথায় ধরতেও লাভ হল না। ছাতায় রোদ আটকায়, অস্বস্তি যায় না। গেটের পাশে ঝুপড়ি টাইপ চায়ের দোকান। চা খেলে কেমন হয়? বড়ো কাচের গেলাসে চা নিয়ে শান্ত ভাবে বসে খাব। খেতে খেতে পা নাড়াব। হাতে বিস্কুট থাকবে। চায়ে ডোবাব যত্ন করে। এতে কি 'কিছুই ঘটেনি, সব ঠিক আছে' ভাবটা আরো স্ট্রং হবে? আমি উঁকি দিলাম দোকানিকে দেখা যাচ্ছে না। একটা রোগা লোক টান টান হয়ে শুয়ে আছে বেঞ্চে। গায়ে কমলা রঙের জামা। মনে হয়, ঘুমোচ্ছে। থাক, চা খেয়ে কাজ নেই। কেউ দেখে ফেললে সন্দেহ করতে পারে। দুপুরবেলা থানার পাশে বসে চা খাওয়া কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আবার আমি লজিক হারাচ্ছিলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই তল্লাট থেকে সরে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। থানার গেট থেকে আরো খানিকটা সরে এলাম। রাস্তা শুনশান। দূর থেকে দুটো মেয়ে আসছে। স্কুলের মেয়ে। সবুজ স্কার্ট আর সাদা জামার ইউনিফর্ম, কাঁধে ব্যাগ। থেকে থেকে এ-ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। ওরা কি আমার পাড়ার? আমাকে চিনতে পারবে? এই পোশাকে মেয়েদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে আসতে দেখেছি না? এই রং? নাকি বেগুনি? হলুদ নয় তো? মনে পড়ছে না। দ্রুত ছাতা নামিয়ে মুখ আড়াল করলাম। মেয়েদুটো হাসতে হাসতে সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। চেনা নয়। একটা মেয়ের মুখ খুব মিষ্টি।

না, আর দেরি নয়। প্যাডেলে হালকা চাপ দিয়ে, উঠে বসলাম সাইকেলের সিটে। এক হাতে হ্যান্ডেল, অন্য হাতে ছাতা। অকারণেই আলতো করে বেল

বাজালাম। ঠোঁট সরু করে আরো একবার চেষ্টা করলাম শিস দিতে। যথারীতি হল না।

প্রথমে ভেবেছিলাম, রাতে আসব। বেশি রাতে। দশটার পর। পরে মনে হল, সেটা ঠিক হবে না। থানার রাতই হল অফিসটাইম। ভিড়ভাট্টার সময়। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি সব রাত বিরেতের ব্যাপার। রাত যত বাড়ে থানা জমজমাট হয়। ওই ভিড়ে চেনা কেউ থাকতে পারে। হয়তো দেখব মুখার্জিবাবু ওসির সামনে বসে আছেন। মুখার্জিবাবু আমার দুটো বাড়ির পরে থাকেন। ওর বাড়িতে প্রায়ই কাজের লোক চুরি করে পালায়। বড়ো কিছু নয়, ছোটোখাটো চুরি। ঘটি, বাটি, হাতা, খুন্তি—এইসব। একবার শ্যাম্পুর শিশি আর দুটো সাবান নিয়ে গিয়েছিল। সাবানের একটা আবার আধখানা ব্যবহার করা। চুরির জিনিস। ছোটোখাটো হলেও মুখার্জিবাবুর স্ত্রী ছাড়েন না। তিনি স্বামীকে নিয়মিত থানায় পাঠান। তবে চোর ধরা পড়েছে বলে কখনো শোনা যায়নি। শুনেছি, থানায় নাকি সবাই মুখার্জিবাবুকে চেনে। উনি গেলেই এক গাল হেসে বলে, 'কী দাদা, আবার কী গেল? বউদির লিপস্টিক?'

মুখার্জিবাবুও হেসে বলেন, 'আর বল না ভাই। লিপস্টিক নয়, এবার মেয়েটা পাউডারের কৌটো নিয়ে পালিয়েছে।'

মুখার্জিবাবু যে চোর ধরার জন্য খুব ব্যস্ত থাকেন এমন নয়। কমপ্লেইন করতে হয় তাই করা। পুলিশের সঙ্গে চা খেয়ে, গল্প গুজব করে রাত করে বাড়ি ফেরেন। রাতে থানায় গেলে হয়তো মুখার্জিবাবুর সঙ্গেই দেখা হয়ে যাবে। ভুরু কুঁচকে বলবেন, 'আরে শশাঙ্ক তুমি! কী হয়েছে? তোমারও কি মেইড সার্ভেন্ট কেস?' আমি কী বলব? 'কিছু হয়নি, সব ঠিক আছে?' ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। তাই দুপুর বেছেছি। গরমের দুপুরে লোক কম থাকবে। থানাতেও কম থাকবে, রাস্তাতেও কম থাকবে। আমার আসা যাওয়া কেউ দেখতে পাবে না। অফিস থেকে বেরিয়ে চট করে ঘুরে যাব। দুপুরে অফিস থেকে বেরোনো আমার নতুন নয়। মাঝে মধ্যেই টিফিনের সময় বাড়ি খাই। ঘড়ি ধরে সতেরো মিনিট লাগে। সাইকেল জোরে চালালে চোদ্দো পনেরোতে হয়ে যায়। যাওয়ার আগে কল্যাণীকে ফোন করে নিই। সে টিফিন রেডি রাখে। কোনোদিন রুটি তরকারি, কোনোদিন চিঁড়ের পোলাও, কোনোদিন দই ভাত। গরমের সময় ফট করে আম কেটে দেয়। টুকরো টুকরো করে কাটা আম তারিয়ে তারিয়ে খাই। কলিগরা আমার এই টিফিন-অভিসার নিয়ে ঠাট্টা করে।

'ভালই আছেন শশাঙ্কদা। তিনবেলা বউদির আদর যত্ন পাচ্ছেন। একেই বলে কপাল।'

আমি হেসে বলি, 'কপাল কেন বলছো ব্রাদার। পেট বল।'

'আপনাকে দেখলে হিংসে হয়। সেই সকালে করে দেওয়া টিফিন বের করে দেখি ঠান্ডা হয়ে গেছে। ইচ্ছে করে টান মেরে ফেলে দিই।'

'কী করবে বল ভায়া? বাড়ি অফিসের কাছে হলে জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাডভানটেজ

তো থাকবেই। তোমরা এক কাজ কর না, কলকাতার পাততাড়ি গুটিয়ে এখানে বাসা নিয়ে চলে এস। টিফিনে তোমরাও গরম রুটি খাবে।'

সকালে পঞ্চানন সাঁতরাকে দেখার পরই থানায় ফোন করেছিলাম।

তখন আমি বাজার থেকে ফিরছি। স্টেশনের বাজারটা বাড়ি থেকে দূর হলেও, একটু সস্তা। আমার মতো ছাপোষা কেরানির কাছে একটু সস্তাও অনেক। বিন্দু বিন্দু জলে সমুদ্র। বাজার সেরে সবে সাইকেলে উঠব উঠব করছি, আর তখনই দেখি সামনে পঞ্চানন! প্রায় একই রকম আছে। এক বছর আগে যেমন দেখেছিলাম। শুধু মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ রেখেছে। জিনসের ওপর বেগুনি রঙের একটা পাঞ্জাবি। হাতে সুটকেস। কোনো দিকে না তাকিয়ে ধড়ফড় করে রিকশয় উঠল। স্পষ্ট শুনলাম রিকশঅলাকে বলল, 'দিঘির পাড়।' দিঘির পাড়! তার মানে যে বাড়িটায় সে থাকত? যেটা বন্ধ? মাথার ভেতর চিড়িক মারল। এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। সাইকেলটাকে আবার স্ট্যান্ডে রেখে রাস্তার ধারের পাবলিক টেলিফোন বুথে ঢুকে গেলাম। স্টেশনের দিকের এই বুথটা পুরনো। আলাদা ঘর। কাঁচের দরজা টেনে কথা বলতে হয়। থানার ফোন নম্বর সাধারণ মানুষের চট করে মনে থাকার কথা নয়। আমার আছে। এই নম্বর মুখস্থ করেছিলাম। থানা থেকে যখন পোস্টার লাগানো হয়েছিল, সেই তখন থেকে। বেশ খানিকক্ষণ রিং হওয়ার পর একজন ফোন ধরল। ততক্ষণে আমি ঠিক করে নিয়েছি, থানায় যাব দুপুরে। ওপাশে ধমক দেওয়া গলা।

'কী হয়েছে?'

আমি থতোমতো খেয়ে বললাম, 'কিছু হয়নি, ওসি সাহেব আছেন?'

ওপাশের ধমক গলা বলল, 'কেন?'

আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'একটু কথা বলব।'

'আমার সঙ্গে বলুন।'

আমি আগে কখনো পুলিশের সঙ্গে কথা বলিনি। ঢোঁক গিলে বললাম, 'না মানে, ওর সঙ্গে বললেই ভালো হত।'

ধমক গলা ঠান্ডা ভাবে বলল, 'কার ভালো হত? আপনার? আপনার ভালোটা আমাদের বুঝতে দিন। অন্যের ভালো বোঝাটাই পুলিশের কাজ।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'বিষয়টা জরুরি ছিল...কনফিডেন-সিয়াল।'

'আপনার কি ধারনা, পুলিশ থানা কোনো হ্যা হ্যা ফ্যা ফ্যা করার জায়গা? এখানে সব ব্যাপারেই জরুরি আর গোপন। আপনি ফালতু সময় নষ্ট না করে কাজের কথা বলুন।'

কাচের দরজার বাইরে তাকালাম। একটা অল্পবয়সী ছোকরা এসে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয় আমার পরে ফোন করবে। আর দেরি করে লাভ নেই। আমি গলা আরো নামিয়ে বললাম, 'পঞ্চানন সাঁতরা সম্পর্কে একটা ইনফরমেশন দিতে চাই।'

ওপাশে গলা এবার মুহূর্তখানেক চুপ করে রইল। বলল, 'আপনি কে?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'এখানেই থাকি। থানায় গিয়ে কথা বললে ভালো হত না?'

ওপাশে ধমক গলার ভঙ্গি বদলেছে। ধমক ভাব কেটেছে। চাপা গলায় বললেন, 'ইনফরমেশন বানানো নয় তো?'

আমি ডান হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললাম, 'না বানানো নয়।'

'আমি ওসি-ই বলছি। আপনি এখনই থানায় চলে আসুন।'

'ওসি' শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। রাস্তার মোড়ে মোড়ে থানা থেকে যে পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছিল, সেখানে পঞ্চাননের ফটোর তলায় লেখা ছিল—

'এই ব্যক্তির কোনো রকম সন্ধান জানা থাকিলে থানার ওসির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন। আপনার নাম ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হইবে। আপনার দেওয়া তথ্য যদি সঠিক হয় তাহলে পুরস্কার অর্থমূল্য দ্রুত আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া হইবে...।'

কাচের দরজায় টোকা পড়ছে। বাইরের ছোকরা তাড়া দিচ্ছে। আমি ফিসফিস করে দ্রুত বললাম, 'স্যার, প্রাইজের ব্যাপারটা এখনও আছে তো?'

ওসি ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আপনার খবর ঠিক তো? দেখুন, এর আগে টাকার জন্য অনেকেই ভুল খবর দিয়েছে, শুধু ভুল নয় মিথ্যে খবরও দিয়েছে। আমরা ফোর্স পাঠিয়ে কয়েকবার হ্যারাস হয়েছি।'

'বলছি তো স্যার, আমার খবর ঠিক হবে। স্যার টাকার অ্যামাউন্ট কমেনি তো?' কাঁপা গলায় বললাম।

ওসি সাহেব নিস্পৃহ গলায় বললেন, 'খবর ঠিক হলেই ভালো। আমরা ডিসাইড করেছি, এবার থেকে যারা মিথ্যে খবর দেবে তাদের বিরুদ্ধেও স্টেপ নেব। গভর্নমেন্টকে হ্যারাস করাটা এক ধরনের অপরাধ।'

ভয় দেখাচ্ছে। পুলিশের কাজই ভয় দেখানো। আমি আবার কপালের ঘাম মুছলাম।

'আমি হ্যারাস করব না। দুপুরে আসছি। দুটোর পর। অফিসে সেই সময় টিফিন হয়।'

'আপনি কোন অফিসে আছেন?'

আমি সাবধান হলাম। টেলিফোনে এত কথা, ঠিক হচ্ছে না। বললাম, 'গিয়ে বলছি স্যার।'

চার মাথার মোড় পার হলাম। একটু যেন হাঁপাচ্ছি। নিশ্চয় স্বাভাবিকের থেকে জোরে প্যাডেল করেছি। জোরে করলাম কেন? আমি কি পালাতে চাইছি? দুর, হাবিজাবি কী ভাবছি! পালাতে যাব কেন? কোনো অন্যায় তো করিনি। পুলিশ একজনকে খুঁজছে। আমি জানি লোকটা এখানে এসেছে। সেই খবর পুলিশকে জানিয়ে এলাম। এটা অন্যায় হবে কেন? কোনো অন্যায় নয়। বরং কর্তব্য। ডিউটি।

আর টাকার ব্যাপারটা? সে আর আমি কী করব? পুলিশ যদি দেয়... আমি কি এখন অফিসে যাব? হাতে বেশ খানিকটা সময় আছে। অফিসে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ওখানে সবাই জানে, বাড়িতে টিফিন করতে গেছি। আগে ফিরে গেলে কিছু ভাবতে পারে। থাক, বাড়িতে একবার ঘুরেই আসি। যেদিন টিফিন করতে বাড়ি যাই কল্যাণীকে মোবাইলে একটা ফোন করে নিই। ও খাবার রেডি করে রাখে। আজ ফোন করিনি। না করলে কী এসে যায়? নিজের বাড়িতে যেতে সবসময়ে ফোন করে যেতে হবে নাকি? আমি এত ভাবছি কেন! নিশ্চয় নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি এবং লজিক হারাচ্ছি। আমাকে লজিক ফিরিয়ে আনতে হবে। বাড়ির পথে সাইকেল ঘুরিয়ে ঠোঁটের ফাঁক থেকে বাতাস ছাড়লাম। শিসের ভঙ্গি করতে করতে বাকি পথটুকু চলে যাব। রাস্তার মানুষ বুঝতে পারবে—এই লোকটার কিছু হয়নি, সব ঠিক আছে।

থানার ওসি ক্যাজুয়াল ড্রেসে ছিলেন। পায়জামা, পাঞ্জাবি গলার কাছে সুতোর কাজ। হঠাৎ দেখে মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোক পুলিশ নন, গায়ক। বিকেলে ফাংশন আছে। আমাকে বসতে বললেন। আমি জল চাইতে উনি বেল বাজালেন। হাবিলদার ধরনের একজন গ্লাসে জল দিয়ে গেল।

'চা খাবেন?'

'না।'

'খান না। ভালো চা। থানার মতো নয়, বাড়ির মতো।'

কথাটা বলে ওসি একটু হাসলেন। অবাক হলাম। এই মানুষটাই টেলিফোনে খানিক আগে ধমক দিচ্ছিল! মানুষের কত রূপ!

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'আমি খেয়ে এসেছি স্যার।'

'থাক, জোর করে খাবার দরকার নেই। আসুন, আমরা কাজের কথায় আসি।'

আমি মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালাম। দরজায় নীল পর্দা উড়ছে। ওসি বললেন, 'চিন্তা করবেন না। আমি ছাড়া আপনার কথা কেউ শুনবে না।' কথাটা বলে পাশে রাখা নোটখাতা আর পেন টানলেন।

'আগে আপনার নাম ঠিকানা বলুন? কোন অফিসে কাজ করেন? মোবাইল আছে নিশ্চয়? নম্বর কত? আপনি পঞ্চানন সাঁতরাকে কোথায় দেখলেন?'

আমি গ্লাস তুলে লম্বা চুমুকে জল খেলাম। বাঁ হাতের চেটো দিয়ে ঠোঁট মুছে বললাম, 'স্যার, দেখবেন কেউ যেন না জানে। আমার নাম...।'

আমি নিচু গলায় বলতে শুরু করলাম। সবটা টানা বলতে পারলাম না। ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে বললাম। তবে কথা খুব বেশি ছিল না। শেষ হলে ওসি সাহেব বললেন, 'আপনি সিওর ওই লোকটাই পঞ্চানন?'

এতক্ষণ পরে আমি একটু হাসার চেষ্টা করলাম।

'অনেক বছর ধরে চিনি স্যার।'

'কত বছর?'

আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকের দু'পাশ মুছলাম। বেরোনোর সময় কল্যাণী রুমালে সেন্ট ধরনের কিছু একটা ঢেলে দেয়। রোজই দেয়। আমার একেবারে পছন্দ নয়। ঝাঁঝের মতো লাগে। কল্যাণীকে অনেকবার বারণ করেছি। কল্যাণী শোনেনি। রুমালে ঘামের গন্ধ তার সহ্য হয় না।

'রুমাল তো তুমি ব্যবহার করবে না কল্যাণী। তোমার সহ্য করার কী আছে!'

'তুমি সহ্য করবে এটাও আমি চাই না।'

এরপর বারণ করা বন্ধ করে দিয়েছি। কোলন ঢালা রুমাল নিয়েই বেরোই। আজও বেরিয়েছি। মুখের ঘাম মুছে রুমাল হাতেই রাখলাম। ওসির চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'অনেক বছর। সেই কলেজের পড়ার সময় থেকে।'

ওসি সাহেব নড়েচড়ে বসলেন।

'তাই নাকি! আপনার কলেজের বন্ধু?'

'না স্যার, বন্ধু নয়। কলেজে পড়ত, তবে বন্ধু নয়। ক্লাস-টাস বিশেষ করত না। সারাক্ষণ পার্টি পলিটিক্স নিয়ে থাকত। মুখোমুখি হয়ে গেলে, কীরে কেমন আছিস, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে—ধরনের সাধারণ দু একটা কথা হত। সত্যি কথা বলতে কী, পঞ্চাননকে এড়িয়েই চলতাম। যতদূর মনে পড়ছে, ফাইনাল পরীক্ষাও দেয়নি। আমরা পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। যে যার মতো এদিক-ওদিক ছিটকে গেলাম। অনেকের সঙ্গে পঞ্চাননকেও স্যার ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর বহু বছরের গ্যাপ। চাকরি-বাকরি পেয়ে এখানে পাকাপাকি চলে এসেছি। বছর তিন আগে হঠাৎ একদিন বাজারে ওকে দেখি। স্টেশন বাজারে। ওই বাজারে একটু সস্তা হয়। সরাসরি ট্রেন থেকে নেমে বিক্রি হয় কিনা।

আমি চুপ করলাম। ওসি চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'তারপর?'

'এতদিন পরে ওকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। একই রকম দেখতে আছে। একটু মোটা হয়েছে এই যা। পঞ্চানন কিন্তু আমাকে চিনতে পারেনি। পরিচয় দিতেও যে খুব একটা চিনতে পারল এমন নয়। দু-একটা কথা হল। বলল, এখানে নাকি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে। কী সব ব্যাবসা-ট্যাবসা করছে।'

ওসি বিড়বিড় করে বললেন, 'বাজে কথা। হারামজাদা কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে এখান থেকে অপারেশন কনডাক্ট করত... যাক গে, তারপর?'

আমি বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'ব্যস ওই পর্যন্ত। তারপর আবার হারিয়ে গেল। তারপর আপনাদের সন্ধান চাই পোস্টার দেখলাম। সেদিন কলকাতায় গিয়েছিলাম, ট্রেন থেকে নেমে দেখি প্ল্যাটফর্মে দেয়ালে সাঁটা। পঞ্চাননের ফটো দেখে চমকে উঠেছিলাম। বাকিটা তো আপনাকে বললাম স্যার, আজ...।'

'আপনাকে দেখেছে?' ভুরু কুঁচকে তাকালেন ওসি।

'না, মাথা নামিয়ে রিকশতে উঠল। মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ রেখেছে। আমার অবাকই লাগল, ও কি জানে না, ওকে ধরবার জন্য আপনারা... যদিও পুরোনো পোস্টারগুলো আর নেই, রোদে জলে...তবু...।'

ওসি দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, 'শালার দাড়ি গোঁফ আমি একটা একটা করে উপড়োবো। ক্রিমিনালদের এটাই নিয়ম। তারা ভুল করবেই। হারামজাদা ওভার কনফিডেন্ট হয়ে গেছে। আবার অন্য কারণও থাকতে পারে। হয়তো এখানে কোনো জরুরি কাজ আছে, আস্তানা থেকে মালপত্র সরাতে এসেছে। ভেবেছে পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে...যাক সেটা আমরা বুঝে নেব। আপনার সঙ্গে সঙ্গে আসা উচিত ছিল শশাঙ্কবাবু।'

আমি মাথা চুলকে বললাম, 'সাহস করে উঠতে সময় লাগল। বোঝেনই তো ছা পোষা মানুষ... স্যার, টাকাটা পাব তো?'

ওসি উঠে দাঁড়িয়েছেন। টেবিলের ওপর টোকা দিয়ে বললেন, 'অবশ্যই পাবেন। তবে আগে আমরা ওকে ধরি। দেখি লোকটা সত্যি পঞ্চানন সাঁতরা কিনা। শুধু আমরা দেখলে হবে না। হেডকোয়ার্টার থেকে অফিসাররা আসবে। তারাও চেক করবে। ঘটনা ঠিক হলে অবশ্যই টাকা পাবেন। যে অ্যামাউন্ট ঘোষণা করা হয়েছিল সেটাই পাবেন। আপনার কনটাক্ট তো আমার কাছে রইলই।'

'ভয়ের কিছু নেই তো?'

'কী থাকবে? কেউ তো জানবে না আপনি বলেছেন। তাছাড়া যাকে নিয়ে ভয় সে তো হাজতে ঢুকে যাবে।'

আমি মাথা নামিয়ে বললাম, 'ভয় করছে। ওর দলবল তো আছে।'

ওসি সাহেব আবার পুরোনো ফর্মে ফিরে গেলেন। টেলিফোনের ধমক ফর্ম। হাত নেড়ে বললেন, 'টাকা পেতে গেলে কিছুটা ভয়ও পেতে হয়। আপনি এখন যান। আমাদের অনেক কাজ আছে। দিঘির পাড় কথাটা ঠিক শুনেছেন তো?'

কলিং বেল বাজানোর পরও কল্যাণী দরজা খুলছে না। ঘাবড়ে গেলাম। আবার বেল টিপলাম। তাও দরজা খুলল না! কল্যাণীর কি কিছু হয়েছে? কী হয়েছে? খারাপ কিছু? বেলটা টিপেই রাখলাম। মুখেও ডাকতে শুরু করলাম, 'কল্যাণী, কল্যাণী, অ্যাই কল্যাণী...।' মিনিট পাঁচ পরে কল্যাণী দরজা খুলল। চোখ ফোলা। বোঝাই যাচ্ছে, ঘুম ভেঙে এসেছে। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী হয়েছে?' আমার বুকের মধ্যেটা আবার ছ্যাৎ করে উঠল। কল্যাণীর গলায় সন্দেহ। কেন? সন্দেহ কেন? আমাকে দেখে কি কিছু বোঝা যাচ্ছে? আমি তাকে ঠেলে দ্রুত ঘরে ঢুকলাম। গলা তুলে বললাম, 'হবার কী আছে? দরজা খুলছো না কেন?'

কল্যাণী বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি!'

'হ্যাঁ আমি। কেন আমি বাড়িতে আজ প্রথম আসছি?'

কল্যাণী দরজা বন্ধ করে আমার দিকে ফিরল। ভুরু আরো কুঁচকে গেছে। বলল, 'চিৎকার করছ কেন?'

'চিৎকার করার মতো কথা বলছো তাই চিৎকার করছি। মড়ার মতো ঘুমোচ্ছো। এতক্ষণ ধরে ডাকছি!'

কল্যাণী চুপ করে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠান্ডা গলায় বলল, 'কী হয়েছে তোমার!'

না, এভাবে হবে না। আচরণে গোলমাল করে ফেলছি। নিজেকে সামলাতে হবে। এক পা এগিয়ে এলাম। কল্যাণীর চিবুকে হাত দিয়ে হেসে বললাম, 'কিছুই হয়নি ম্যাডাম, সব ঠিক আছে।'

কল্যাণী চাপা গলায় বলল, 'না, সব ঠিক নেই।'

আমি ভয় পাচ্ছি। আমি কি ধরা পড়ে যাচ্ছি? ঢোঁক গিলে, হেসে বললাম, 'সরি। বাইরের প্যাচপ্যাচে গরমে মাথাও গরম হয়ে গেছে। কিছু খেতে দেবে না?'

কল্যাণী খেতে দিল। দুটো টোস্ট, একটা কলা। ডিমসেদ্ধ করতে চাইল। আমি বারণ করলাম। সময় নেই। অফিসে যেতে হবে। দেরি হয়ে গেলে ওরাও হয়তো কিছু ভাববে। ভাববে কিছু হয়েছে তাই দেরি করলাম। আমি তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছি। আড়চোখে দেখতে পেলাম, কল্যাণী তার ঘুম ভাঙা ফোলা চোখে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আমি টোস্টে কামড় দিয়ে সহজ গলায় বললাম, 'খুব শিগগিরই একটা স্কুটার কিনব। স্কুটারে অফিস যাতায়াত করব। আজকাল সাইকেল চালাতে হাঁপ ধরে যায়। আরে বাবা বয়স হয়ে যাচ্ছে না?' কথাটা বলে মুখ তুলে কল্যাণীর দিকে তাকালাম। হেসে বললাম, 'তুমি যদি বল একটা গাড়িও নিয়ে নিতে পারি। আজকাল কিছু টাকা দিলে বাড়িতে গাড়ি দিয়ে যায়। এই ধর হাজার পঞ্চাশ ডাউন পেমেন্ট করলাম...। খারাপ হবে?'

কল্যাণী অস্ফুটে বলল, 'পঞ্চাশ হাজার টাকা! অত টাকা তুমি কোথা থেকে পাবে! কী বলছ তুমি!'

আমি দ্রুত চোখ নামিয়ে নিলাম। ইস্, টাকার কথাটা দুম করে বলা ঠিক হল না। বিরাট বোকামি হয়ে গেল। সত্যিই তো, সরকারি অফিসের একজন নিচুর দিকের কেরানি ফট করে অত টাকা কোথায় পাবে? নাহ্, যত ভাবছি সাবধানে থাকব, তত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পঞ্চাননকে পুলিশ ধরার আগেই পুরস্কারের টাকা কীভাবে খরচ করব ভাবতে শুরু করেছি! লজিক হারাচ্ছি। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। নার্ভাস হেসে বললাম, 'ঠাট্টা করলাম। দুর, আমি টাকা পাব কোথা থেকে? কল্যাণী, তুমি কি আজকাল ঠাট্টাও বোঝো না?'

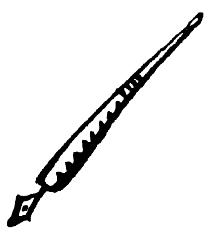
দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কল্যাণী। আমার বুকে হাত দিল। ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ? অফিসে গোলমাল? আমাকে লুকোচ্ছ কেন?' আমি ফ্যাকাশে মুখে হাসলাম।

সাইকেল ছুটিয়ে অফিস ফিরছি। টেনশন বাড়ছে। কল্যাণী সন্দেহ করেছে। এবার বাকিরাও করবে। আজ না হয় কাল জানতে পারবে, আমি পঞ্চাননকে ধরিয়ে দিয়েছি। আমার শরীর ঝিমঝিম করছে। রাস্তার ওপর নজর রেখেছি। পঞ্চাননকে দেখতে পাই যদি? সে যদি আমায় চিনতে পারে? অবাক হয়ে যদি জিজ্ঞেস করে, 'কীরে শশাঙ্ক, তড়বড় করে যাচ্ছিস কোথায়? কী হয়েছে?' কী বলব? কিছু হয়নি,

সব ঠিক আছে? দুর, এসব কেন হবে! লজিক হারাচ্ছি আবার। নিজেকে শান্ত করতে হবে। নরমাল হতে হবে। কীভাবে? শিস দেব? আমি যে অনেক কিছু পারি না। আমি যে খাঁটি গুডবয়।

চার মাথার মোড়ে এসে অফিসের উলটো পথে সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়েছি। দিঘির পাড় এখান থেকে দশ মিনিটের পথ। পুলিশ কি এতক্ষণে পৌঁছে গেছে? মনে হয় না। শুনেছি, ওরা ধড়পাকড় করতে যায় রাতের দিকে। আমায় দেখলে পঞ্চানন নিশ্চয় খুব অবাক হবে। চিনতে পারবে? না পারলে না পারবে। আমি ওর হাত ধরে বলব, 'চেনবার দরকার নেই। তুই এখনই চলে যা। পালা চিন্তা করিস না, সব ঠিক আছে।'

প্যাডেলে জোরে চাপ দিলাম। আমাকে পুলিশের আগে পৌঁছোতে হবে।



ছোটোমামার বিয়ে

ছোটোমামার বউভাত। বাড়িতে হুলুস্থুলু হচ্ছে। হবেই তো। নতুন-মামি দারুণ হয়েছে। সবাই খুব খুশি। কেবল ছোটোমামার মুখ সকাল থেকে থমথমে। শুধু থমথমে নয়, তার সঙ্গে কেমন যেন 'উদাস উদাস'। এটা একটা অদ্ভুত কম্বিনেশন। থমথমে মুখের সঙ্গে গম্ভীর, রাগ, বিরক্তি যেতে পারে, কিন্তু 'উদাস' ভাব কিছুতেই যায় না। ছোটোমামার গেছে। কঠিন চোয়ালের পাশে 'সংসার মায়ার খেলা' টাইপ ঢুলু ঢুলু চোখ। একসময় নতুন পায়জামা আর নতুন স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ল্যাপটপ বগলদাবা করে ছাদে চলে গেল। চিলেকোঠার ঘরে খিল তুলল। ছোটোমামার কী হয়েছে?

মা, মেজোমাসি, মেজোকাকিমা, বড়োমামি, ছোড়দি, মঞ্জুআন্টি, মানাদি, বুড়িপিসিকে দেখছি মাঝেমধ্যেই নীচু গলায় গুজগুজ ফুসফুস করছে। আমাদের দেখলেই চুপ করে যাচ্ছে। মনে হয়, আমরা ছোটো বলে আমাদের কাছে কিছু লুকোনো হচ্ছে। ঝিঙ্কুদি বলল, 'ছোটোমামার নিশ্চয় কোনো অ্যাডাল্ট প্রবলেম হয়েছে।'

ভল্টু বলল, 'অ্যাডাল্ট প্রবলেমটা আবার কী! বড়ো সমস্যা?'

ঝিঙ্কুদি মেজোমাসির মেয়ে। ক্লাস টুয়েলভের পরীক্ষা দিয়েছে। সব ব্যাপারে পাকা পাকা ভাব। বিয়েবাড়ির নিয়ম হল শাড়ি পরলেই মেয়েদের খানিকটা পাকা হতে হয়। ঝিঙ্কুদি শাড়ি পরেছে, তার পাকামি আরও বেড়েছে। চান্স পেলেই আমার আর ভল্টুর ওপর মাতব্বরি ফলাচ্ছে। ঝিঙ্কুদির থেকে বয়েসে যে আমরা বিরাট ছোটো এমন নয়। এবার আমার ক্লাস টেন হয়েছে, মেজকার ছেলে ভল্টু এইট পেরোবে। ঝিঙ্কুদি গম্ভীর গলায় বলল, 'হাঁদার মতো কথা বলিস না। অ্যাডাল্ট প্রবলেম মানে বড়ো সমস্যা নয়, অ্যাডাল্ট প্রবলেম মানে বড়োদের সমস্যা। এটা বোঝার মতো বয়স তোদের এখনো হয়নি। আমি গেলেই ওরা বলে দেবে। আমি যাচ্ছি না তাই বলছে না।'

ডাহা মিথ্যে কথা। খানিক আগে দোতলায় মেজোমাসি আর মায়ের ফিস-ফিসানি শুনতে গিয়ে ঝিঙ্কুদি ধমক খেয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

নতুন-মামি বাড়াবাড়ি ধরনের সুন্দরী। বিয়ের দিন আত্মীয়রা কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল, বেনারসী, গয়নাগাটি, ফুলের মুকুট আছে বলেই মেয়েকে বেশি সুন্দর লাগছে। তারওপর চড়া মেকআপ আর ঝলমলে আলোর কারিকুরি। ঘটনা কিন্তু মোটেও তা নয়। বাড়ির নরমাল সাজেও দেখা গেছে নতুন-মামি সুন্দরী। এর মধ্যে আবার একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। কে মেয়ে পছন্দ করেছে তা নিয়ে কম্পিটিশন শুরু হয়েছে। সবাই ক্রেডিট নিতে চায়। আমি যতদূর জানি, পাত্রীর খোঁজ এনেছিল ফুলদি। আমার বড়োপিসির বড়ো মেয়ে। খুব বুদ্ধি। বছরখানেক হল কলেজে চাকরি পেয়েছে। কিন্তু দিদিমণি টাইপ গম্ভীর নয়। বরং উলটোটা। আত্মীয়দের মধ্যে হাসি ঠাট্টায় এক নম্বর। সবসময় আসর জমিয়ে রাখে। ছোটোমামার বিয়ের ব্যাপারে সে খুবই লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করছে। সে-ই প্রথম নতুন-মামিমার খোঁজ আনে। মাকে ফটো এনে দেখায়। মা দাদু-দিদাকে খবর দেয়। একদিন আড়াল থেকে শুনি মা ফুলদিকে বলছে, 'সত্যি, তুই না-থাকলে যে কী হত ফুল, গজার বিয়েটাই হত না।'

গজা ছোটোমামার ডাকনাম। ছোটোমামা এই নাম পছন্দ করে না। প্রেস্টিজে লাগে। লাগারই কথা। একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়রের নাম হবে গজা! বারণ করা সত্ত্বেও মা, মাসি, কাকি, জেঠিরা শুনতে চায় না। 'গজা, গজা' করে। যাই হোক, ফুলদি সেদিন হেসে মাকে বলছিল, 'এই বিয়ের ব্যাপারে আমাকে তো থাকতেই হত। এরপরেই তো আমার টার্ন।' ফুলদির বয়সও ছোটোমামার কাছাকাছি। দুজনে বন্ধুর মতো। নতুন মামির খবর যে ফুলদিই এনেছিল সেকথা এখন আর কেউ মনে রাখতে চাইছে না। যেমন আমার দিদা। একসঙ্গে ডবল পান খান। তিনি পান মুখে দিয়ে বিয়েবাড়ির একতলা তিনতলা করছেন আর সবাইকে ডেকে ডেকে বলছেন, 'দেখছ ছোটো ছেলের জন্য কেমন মেয়ে এনেছি? গজা নিজে পছন্দ করলে এমন হত? ঘেঁচুর মাথা হত। আমি নিশ্চিত একটা পেতনি ধরে আনত। আমার ছেলেকে আমি তো জানি। ভাগ্যিস মেয়ে পছন্দের ব্যাপারটা নিজের কন্ট্রোলে রেখেছিলাম।' এসব বলতে বলতে দিদা এমন তালজ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন যে নতুন বউকে পর্যন্ত কথাটা বলে বসলেন। সে বেচারি বিষম-টিষম খেয়ে একাকার কাণ্ড! শুধু সুন্দর নয়, লেখাপড়াতেও নতুন-মামী দুর্দান্ত। ফিজিক্স না কেমিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করছে। লেখাপড়ার কৃতিত্ব নিচ্ছেন আমার দাদু। তার মুখে সবসময়েই পাইপ। ডাক্তারের বারণে পাইপে তামাক, আগুন কিছুই থাকে না। দাদু তবু অদৃশ্য ধোঁয়া ছাড়েন। মাঝেমধ্যে মুখের সামনে হাত নেড়ে সেই ধোঁয়া সরিয়েও দেন। তিনি বলছেন, 'মেয়ে খোঁজার সময় আমি শুধু একটা কথাই বলেছিলাম। বাপু, মেয়েকে লেখাপড়াটা জানতে হবে। শুধু ফর্সা রং আর চুলের ঢাল থাকলেই এ-বাড়িতে ঢোকার পারমিশন মিলবে না। পেটে বিদ্যে চাই। গজাকে বললাম, এ কম্ম তোমার নয় বাপু। তুমি পারবে না। ছেলেমানুষরা বাইরের রূপ দেখে ভুল করে বসে।

সুতরাং বাড়ির ছোটোবউমাটি কে হবে সেটা আমার হাতেই থাকুক। এখন বউমা-গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে। এই যদি গজা নিজের বউ নিজে বাছত, তাহলে নির্ঘাত বি. এ. ফেল কাউকে ধরে আনত।'

আমার নতুন মামির গুণের লিস্ট এখানেই শেষ নয়। রান্নাতেও সে ওস্তাদ। বড়োমাসির দাবি এই বাবদ পিঠ চাপড়ানি তার প্রাপ্য। মেসো বাইরে চাকরি করার কারণে মেয়ে দেখার কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনালে বড়োমাসি থাকতে পারেননি। সরাসরি ফাইনালে এসে টিমে জয়েন করতে হয়েছে। কাঁদো কাঁদো মুখে ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, 'সবই তো করে ফেলেছ দেখছি। গজার বউ পছন্দ করার ব্যাপারে আমার তো কোনো কনট্রিবিউশনই রইল না। কেন যে ছাই ছুটে এলাম।'

ফুলদি অভিমানী বড়োমাসিকে ম্যানেজ করল। ছাদে নিয়ে গিয়ে বলল, 'কে বলেছে মেয়ে বাছাইতে তোমার কোনো কনট্রিবিউশন থাকবে না? অবশ্যই থাকবে। তুমি ফাইনাল টকের দিন মেয়েকে রান্না নিয়ে অ্যাটাক করবে। ওই পেপারটা এখনো কেউ টাচ করেনি।'

বড়োমাসি খুশি হয়ে এক গাল হেসে বললেন, 'সত্যি! রান্নার কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি।'

ফুলদি নীচু গলায় বলল, 'না, কেউ করেনি। মনে হয় রূপ দেখে ভুলে গেছে। তুমি করবে। যতদূর শুনেছি, ওই মেয়ে চচ্চড়িতে খুব উইক। তুমি চচ্চড়ি দিয়ে ধরবে। ফেল করলে মেয়ে বাতিল।'

নতুন মামি ফাইনালের দিন চচ্চড়ি পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে পাশ করেছে। তাই বড়োমাসির দাবি মেয়ে তারই পছন্দ করা। এতজনের পছন্দের পরেও ছোটোমামার মুখ থমথমে কেন!

উত্তর পেলাম বিকেলে। ভল্টু সব জানতে পেরেছে। তার কাছ থেকে শুনে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। কান গরম হল। বুকের ভেতর শুরু হল ধুকপুকানি। বাপ্ রে! এ তো সত্যি অ্যাডাল্ট কাণ্ড! দুপুরে খেয়েদেয়ে ভল্টু শুয়েছিল তিনতলার ঘরে। মেজোকাকিমা তাকে জানিয়েছেন, দুপুরে এক ঘণ্টা না ঘুমোলে কান টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে। ভল্টু তাই ঘাপটি মেরে খাটের ধারে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিল। কখন এক ঘণ্টা কাটে তার অপেক্ষা। পাশেই মা, মেজোকাকিমা, মঞ্জুদি ফিসফিস করে গল্প করছিল। বিয়েবাড়ির এটাই নিয়ম। মহিলামহলে গল্প থামে না। সেই গল্প থেকেই মারাত্মক ঘটনা জেনে ফেলেছে ভল্টু। জেনে চাদরের তলায় দরদর করে ঘামতে থাকে। দাদু দিদা বিয়ের কথা পাড়তে ছোটোমামা তাদের নাকি জানিয়েছিল, সে একটা মেয়েকে ভালোবাসে। তাকেই বিয়ে করতে চায়। ছোটো ছেলের কথা শুনে দাদু-দিদা খেপে আগুন। দাদু স্নান বন্ধ করে দিলেন, দিদা বন্ধ করলেন খাওয়া। দুটো মিলে যাকে বলে নাওয়া খাওয়া স্টপ। তাদের নাকি বহুদিনের ইচ্ছে, ছোটো ছেলের বউ তারা নিজেরাই পছন্দ করে আনবে। ছোটোমামা তাদের বলল, 'তোমরা অন্তত মেয়েটাকে একবার দেখ। মেয়ে খারাপ নয়।'

দাদু বললেন, 'খারাপ ভালোর দরকার নেই বাপু। তুমি বরং দুটো রেলের টিকিট কেটে দাও। আমরা কাশী গিয়ে ঘর ভাড়া করে সেটল করি। তুমি বাড়িতে তোমার পছন্দ করা বউ নিয়ে সেটল কর।'

হতাশ ছোটোমামা রাগে দুঃখে হাল ছাড়লেন। দাদু-দিদাও পাত্রী খুঁজতে শুরু করলেন। দু-দিনের মধ্যে কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে নতুন মামিমার খবর নিয়ে এল ফুলদি। সঙ্গে একেবারে ফটো। সেই ফটো দেখে দাদু দিদা কুপোকাৎ। তারপর নানা প্রক্রিয়ায় বিয়ে ফাইনাল হল। নতুন মামি বাড়িতে এসেছে। সেই কারণেই নাকি ছোটোমামার মুখ বেজার, মন খারাপ। নিজের ভালোবাসার মেয়েকে বিয়ে করতে পারেনি বলে দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে। প্যান্ডেলের কোনায় দাঁড়িয়ে ছোটোমামার 'বুক ফেটে' যাওয়ার কথা বলে ভল্টু ফোঁস করে এমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যে আমিই চমকে গেলাম।

ভল্টু বলল, 'চমকাস না। সেদিন দুপুরবেলা টিভি দেখছিলাম। বাবা মা বেরিয়ে গেল। আমিও ফট করে কার্টুন চ্যানেল থেকে সিনেমায় ঢুকে পড়লাম। প্রেম দিয়েছ, মন দাওনি সিনেমাটা চলছিল। সেখানে হিরোর এ-রকম একটা দীর্ঘশ্বাস আছে। লাভ কেস ফেল করলে এ-রকম হয়।'

ছোটোমামার জন্য মনটা খারাপ হল, আবার বিয়েবাড়ির হইচইতে ভুলেও গেলাম। তারওপর বিরাট একটা উত্তেজনার ব্যাপার হল। খবর পেলাম, ফুলশয্যার খাটের তলায় টেপ রেকর্ডার লাগানো হয়েছে। রাতে ছোটোমামা আর নতুন মামি যা যা বলবে সব টেপে ধরা থাকবে। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বড়োদের সরিয়ে দিয়ে নতুন বর বউয়ের সামনে সেই টেপ চালানো হবে। এর জন্য ফুলশয্যা টিম হয়েছে। সেই টিমের ক্যাপ্টেন ফুলদি নিজে। টিমে ঝিঙ্কুদিও আছে। আমি আর ভল্টু টিমে ঢোকার জন্য ঝিঙ্কুদির কাছে খুব কাকুতিমিনতি করলাম। ঝিঙ্কুদি চোখ পাকিয়ে বলল, 'ইস খুব শখ না? চড় খাবি। এটা একটা অ্যাডাল্ট মজা। ফুলশয্যার রাতে কী হয় জানিস?'

ভল্টু বলল, 'কী হয়?'

ঝিঙ্কুদি হেসে বলল, 'ইয়ে হয়। যা ভাগ ফাজিল কোথাকারে।'

রাতে মুখ শুকিয়ে চলে গেলেও আমরা থাকলাম পরদিন সকালে। ব্রেকফাস্ট টেবিলে লুচি আলুর দম, বোঁদে দেওয়া হয়েছে। মা, মাসি, কাকা, কাকিমারা কীভাবে যেন ঘটনা আঁচ করতে পেরে মুখ টিপে হেসে নিজেরাই সরে গেছেন। আমি ভল্টু গিয়ে লুকিয়েছি দরজার আড়ালে। ছোটোমামা, নতুন মামিমার সামনেই ফুলদি টেপ বের করে সুইচ টিপল। আমরা দম বন্ধ করলাম। এবার অ্যাডাল্ট মজা শুরু হবে। ছোটোমামার গলা ভেসে উঠল—'উফ অনেক হয়েছে আর অ্যাক্টিং করতে পারব না। এ-রকম একটা আনন্দের দিনে সারাক্ষণ মুখ শুকিয়ে থাকা কি চাট্টিখানি কথা? টানা নাটক করে চলেছি। সেই বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকেই। বিয়ের জন্য যে অভিনেতা হতে হবে জানা ছিল না।'

এবার নতুন মামির গলা, 'ফুলের জন্যই তো সব হল। মেয়েটার বুদ্ধি আছে বটে। কেমন প্ল্যান করে আমার বাবা-মাকে দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন করাল বল? ওদের বুঝতেও দেয়নি। তারপর ফটো নিয়ে সেই রবিবারই ছুটল। এমনি কি চচ্চড়ি নিয়ে প্রশ্ন আসছে সেটাও বলে দিয়েছিল। কেউ ধরতে পারেনি যে আমিই সেই মেয়ে।'

ছোটোমামা কেমন যেন আধো আধো গলায় বলল, 'শুধু ফুলের প্ল্যান দেখলে, আর আমি বুঝি কেউ নই? কেমন সম্বন্ধও হল, প্রেমও হল সেটা দেখলে না?'

নতুন মামির হাসির আওয়াজ। বলল, 'তুমি একটা ভীতুর ডিম। পুরো দড়ির ওপর খেলা হল। একটু এদিক-ওদিক হলেই ধপাস করে পড়তাম।'

ছোটোমামা এবার জড়ানো গলায় বলল, 'আমি ভীতু? তবে দেখ, আমি কেমন সাহসী।'

এরপরেই 'চকাস' করে একটা আওয়াজ। তারপর সব চুপ। আমি ভুরু কুঁচকে ভল্টুকে ফিসফিস করে বললাম, 'ওটা কীসের আওয়াজ হল?'

ভল্টু গম্ভীর গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না।'

ঘরের ভেতর তখন ফুলদিকে ছোটোমামা তাড়া করেছে। ফুলদি হাসতে হাসতে টেবিল ঘিরে দৌড়োচ্ছে। নতুন মামি বসে আছে মুখে দু'হাত চাপা দিয়ে। মনে হয় কোনো কারণে লজ্জা পেয়েছে। মুখ দেখা না-গেলেও তাকে ভারী সুন্দর লাগছে!

খারাপ ছেলে



ক্লাস সেভেনের বিশ্বনাথ লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা। পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে পেলেই তার পেট ব্যথা শুরু হয়। পরীক্ষা না-দিয়ে বাড়ি চলে যায়। খেলাধুলোতেও মোটে চৌকস নয়। ফুটবল খেলতে নামলেই হয় হ্যান্ডবল নয় সেমসাইড করে বসে। সেই কারণে টিমে চান্স পায় না। আর গানের গলা? বাপ রে! শুনলে হয় পালাতে হবে নয় রামচিমটি কেটে থামাতে হবে। ছেলেটা আঁকতেও পারে না। গোল আঁকতে দিলে চৌকো করে ফেলে। ড্রয়িং পরীক্ষায় তার হাইয়েস্ট নম্বর দশের মধ্যে দেড়। সব মিলিয়ে বিশ্বনাথ আমাদের স্কুলের একজন 'খারাপ ছেলে'। মজা হল স্কুলের ছেলেদের কাছে এই 'খারাপ ছেলে'র ডিমান্ড মারাত্মক। তাকে নিয়ে সারাক্ষণ টানাটানি। এর একটা গোপন কারণ আছে।

সেই কারণ বলার আগে আমাদের 'ভালো ছেলে'গুলোর কথা একটু বলে নিই।

সব স্কুলেই কেউ লেখাপড়ায়, কেউ খেলাধুলোয়, কেউ গান-বাজনায় ভালো হয়। সবাই তাদের নিয়ে গর্ব করে। আশা রাখে, একদিন কেউকেটা হবে। আমাদের স্কুলও সে-রকম। অনেক 'ভালো ছেলে' আছে। যেমন ক্লাস এইটের জীবন। জীবন হল লেখাপড়ায় ভালো ছেলে। তাকে আমরা বলি 'অঙ্ক ওস্তাদ'। স্যার তার খাতা দেখার আগেই আশি নম্বর দিয়ে দেন। তারপর খাতা দেখা শুরু হয়। তবে আমরা তাকে মোটেও সহ্য করতে পারি না। জীবন বিরাট ন্যাকা ছেলে। পরীক্ষায় এক-শোর মধ্যে এক-শো পেয়েও সে মুখ বেজার করে বসে থাকে। আমরা অবাক হয়ে বলি, "এ কীরে, জীবন, ফুল মার্কস পেয়েও তোর মুখ বেজার কেন?"

জীবন কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, "গতবারও তো এক-শো পেয়েছিলাম। এবার ভেবেছিলাম, এক-দু-নম্বর এদিক-ওদিক হবে। তোদের সকলেরই তো

হয়েছে। নম্বর কম হয়েছে, নয় বেড়েছে। আমার কেন হবে না? আমার কী দোষ? আমি কেন প্রতিবার এক নম্বর পাব?"

এই ছেলেকে কী করা উচিত? গালে গুনে গুনে তিন চড় মারা উচিত কি না? আমাদের হাত নিশপিশ করে। কিন্তু চড় মারতে পারি না। অঙ্কে এক-শো পাওয়া ছেলেকে চড় মারলে, স্যারেরা আমাদের পিঠে কিল মারবেন।

যাক, এবার অন্য 'ভালো ছেলে'র কথা বলি।

ক্লাস সেভেনের সাত্যকি ফুটবলে ফাটাফাটি। ছোটোখাটো চেহারা। স্কুল লিগে প্রতিবছর তিনটে করে হ্যাটট্রিক তার পকেটে থাকে। যাকে বলে হ্যাটট্রিকের হ্যাটট্রিক। গেম টিচার অর্ধেন্দু স্যার একদিন গম্ভীর মুখে বললেন, "দেখিস, এই ছেলে অনেক বড়ো প্লেয়ার হবে। ইস্টবেঙ্গল টিমে খেলবে।"

মুকুল বলল, "স্যার, আপনি কী করে বুঝলেন, ও ইস্টবেঙ্গলেই খেলবে? মোহনবাগানেও তো চান্স পেতে পারে।"

মুচকি হেসে স্যার বললেন, "আরে বাবা আমি সব বুঝতে পারি। খেলাধুলো নিয়ে তো কম দিন থাকা হল না। ওর বাঁ-পায়ের শট দেখলেই বোঝা যায়। টিপিক্যাল ইস্টবেঙ্গলে খেলার শট।"

মুকুল আরও অবাক হল। বাঁ-পায়ের শট দেখে কখনো টিম বোঝা যায়! সাত্যকি নীচু গলায় বলল, "স্যারের কথা বাদ দে। আমার বয়ে গেছে ইস্টবেঙ্গলে খেলতে। আমি মোহনবাগানের সাপোর্টার, খেলতে হলে মোহনবাগানের হয়েই খেলব। স্যার ইস্টবেঙ্গল বলে ও-রকম বলছে।"

ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান যেখানেই খেলুক না কেন, সাত্যকির স্বভাব মোটে ভালো নয়। ক্লাসের টিম তৈরিতে সে সবসময় খবরদারি করে। সুমন এবার খেলবে না, অনুপমকে নিতে হবে। তপনকে বসিয়ে দিতে হবে দশ মিনিটের মধ্যে, নামাতে হবে বিদ্যুৎকে--এইসব ও ঠিক করবে। এই ঠিক করার পিছনেও 'গোলমাল' আছে। শোনা যায়, টিমে ঢোকার জন্য অনুপম, বিদ্যুৎরা তাকে এগরোল, আইসক্রিম খাওয়ায়। সবাই এটা জানে, কিছু বলতে পারে না। ওর কথা না-শুনলে বিপদ। ম্যাচের দিন 'জ্বর হয়েছে' বলে ডুব মারবে। ক্লাস অবধারিত হারবে। যতই ভালো খেলুক, ক্লাসের সবাই সাত্যকিকে অপছন্দ করে।

সিক্সের তপোবিজয়ের গানের গলা সুন্দর। শুধু সুন্দর নয়, বাড়াবাড়ি ধরনের সুন্দর। টিভিতে রিয়ালিটি শোতে অল্পের জন্য চান্স পায়নি। সিলেকশন পরীক্ষায় গানের মুখরা না অন্তরায় ছোটো গোলমাল করে বাদ পড়েছে। মনে হয় নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। এতে কিছু আসে যায় না। আমরা সবাই জানি, ও ঠিক একদিন সুযোগ পাবে। কিন্তু ছেলেটা বড়ো হিংসুটে। স্কুলের অন্য কোনো ছেলে যদি কখনো একটু ভালো গায় ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। একবার কুন্তল অ্যানুয়াল ফাংশনে গান গেয়ে হাততালি পেল। ব্যস, তপোবিজয়ের মুখ হাঁড়ি। কুন্তলের গান শুনে হাততালি দেওয়ার অপরাধে তিনদিন কারও সঙ্গে কথাই বলল না।

জ্যোতি। ক্লাস নাইনে পড়ে। দারুণ ছবি আঁকে জ্যোতি। সবকটা 'বসে আঁকো'তে ফার্স্ট হয়। ড্রইং স্যার রেবতিবাবু বলেছেন, "এই ছেলে এখন বসে আঁকোতে ফার্স্ট হচ্ছে, একদিন দাঁড়িয়ে আঁকো-তেও ফার্স্ট হবে।"

তবে জ্যোতি হল মহাপাকা ছেলে। পাকার সঙ্গে অহংকারী। ড্রয়িং স্যার যে-বিষয়ে ক্লাসে ছবি আঁকতে বলেন, জ্যোতি কখনো সেই বিষয়টা আঁকে না। সে নিজের ইচ্ছেমতো আঁকবে। ধরা যাক, স্যার সাবজেক্ট দিলেন 'একটি শান্ত গ্রামের ছবি।' জ্যোতি আঁকল রেল স্টেশন। স্যার হয়তো দিলেন, 'ব্যস্ত বাজার'। জ্যোতি আঁকবে টলটলে দিঘি। দুটো হাঁস সেই জলে সাঁতার কাটছে। শুধু আঁকবে না, ঘাবড়ে দেওয়ার মতো ভালো আঁকবে। তবে যতই ভালো আঁকুক, স্যারের দেওয়া বিষয় না-আঁকাটা একটা বড়ো অন্যায়। পরীক্ষার উত্তর তো প্রশ্ন অনুযায়ী লেখা উচিত। ছাত্র যতই ভালো হোক, প্রশ্ন তো বদলাতে পারে না। আমরা স্যারকে বললাম, "স্যার, জ্যোতি কেন নিজের ইচ্ছেমতো আঁকে?"

ড্রয়িং স্যারের অল্প একটু দাড়ি আছে। তিনি সেই দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "শিল্পী মানেই স্বাধীন। তাকে ইচ্ছেমতো কাজ করতে দিতে হয়। নইলে তার প্রতিভা প্রকাশ পায় না। এই যে আমি তাকে শান্ত গ্রামের ছবি আঁকতে দিলাম, অথচ সে আঁকল রেল স্টেশন, এর একটা গভীর মানে আছে।"

ছেলেরা আঁতকে উঠল। বলল, "মানে! রেল স্টেশনের আবার মানে কী?"

"এর মানে হল, শিল্পী চাইছে ওই স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে কোনো শান্ত গ্রামে চলে যেতে।"

"উরি বাবা! আমরাও ও-রকম ইচ্ছেমতো আঁকতে চাই স্যার। আপনি যদি সূর্যাস্তের ছবি আঁকতে দেন আমরা তাহলে একটা সাইকেল আঁকব। ওই সাইকেল চালিয়ে পাহাড়ের কাছে যাব সানসেট দেখতে। হবে?"

স্যার আবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "আঁকবি, অবশ্যই আঁকবি। যেদিন জ্যোতির মতো শিল্পী হবি সেদিন আঁকবি। এখন যা বলছি তাই আঁক। নইলে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখব।"

আমরা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আঁকতে বসি।

ক্লাস টেনের বিক্রমের আছে অন্য গুণ। সে হল ম্যাজিশিয়ান। স্কুলে লেখাপড়া, খেলাধুলো, গান-বাজনায় ভালো হলে যতটা কদর পাওয়া যায়, ম্যাজিকের বেলায় ততটা পাওয়া যায় না। তবে একেবারে হতচ্ছেদ্দা করাও হয় না। স্বাধীনতা দিবসের দিন হেডস্যারের নির্দেশে বিক্রম ম্যাজিক দেখাল। ওইদিন আমাদের স্কুলের ছাদে পতাকা তোলা হত। তারপর একটু গান, হেডস্যারের ভাষণ। একটা করে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সেবার বিক্রম সুযোগ পেল। একটা কাঠের বাক্সে তিনটে সাদা কাপড়ের টুকরো ঢুকিয়ে তেরঙা পতাকা বের করল। আমরা জোর হাততালি দিলাম। হেডস্যার খুশি হয়ে বিক্রমের পিঠ চাপড়ে দিলেন। এরপর থেকে আর বিক্রমের মাটিতে পা পড়ছে না। আমরা ওকে যদি

ম্যাজিক দেখাতে বলি, ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—'খেপেছিস? পি সি সরকার কখনো যখন তখন ম্যাজিক দেখান?"

ছেলের কত বড়ো সাহস! নিজেকে পি সি সরকার ভাবে! আমরা বিক্রমকে এড়িয়ে চলি।

এর মধ্যে একেবারে আলাদা ক্লাস সেভেনের বিশ্বনাথ। আমাদের বিশু। সে হল স্কুলের 'খারাপ ছেলে'।

বিশু দু-বছর ধরে ক্লাস সেভেনে পড়ছে। এর জন্য তার কোনো দোষ নেই। পরীক্ষার সময় বিশুর পেট বিশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। প্রতিবারই ইংরেজি পরীক্ষা আদ্দেকটা দেওয়ার পর তার পেট ব্যথা শুরু হয়। ঠিক ট্রান্সলেশনের সময় ব্যথাটা মাথাচাড়া দেয়। পরীক্ষা দিতে পারে না। ইতিহাসের দিনও একই কাণ্ড। প্রশ্নপত্র হাতে পেয়েই পেট চেপে ককিয়ে ওঠে সে। সবাই জানে এই ব্যথা সত্যি নয়। এই ব্যথা পরীক্ষা না-দেওয়ার ফন্দি।

সে যাই হোক, এই বিশুরই কিন্তু স্কুলের ছেলেদের কাছে ডিমান্ড সবথেকে বেশি। সে দারুণ জনপ্রিয়। অঙ্কের জীবন, ফুটবলের সাত্যকি, গানের তপোবিজয়, আঁকার জ্যোতিকে দেখে আমরা যখন পাশ কাটাই, বিশুকে নিয়ে তখন টানাহেঁচড়া হয়। টিফিনের সময় তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্লাস সেভেনের সামনে সব ক্লাসের ছেলেরাই দাঁড়িয়ে থাকে। আগে ধ্বস্তাধ্বস্তি হত।

ক্লাস সেভেনের ছেলেরা রোজই বলত, "আজ আমরা বিশুকে ছাড়ব না। আজ ও আমাদের কাছে থাকবে।"

ক্লাস এইটের ছেলেরা বলত, "তোরা তো সবসময় ওকে পাস, এখন আমাদের একটু নিয়ে যেতে দে।"

ক্লাস নাইন বলত, "কোনো কথা শুনব না, আজ বিশু আমাদের জন্য বুকড্। দেরি করিস না। টিফিন তো মোটে কুড়ি মিনিট। এক্ষুনি ফুরিয়ে যাবে।"

ক্লাস টেনের ছেলেরা বড়ো। তারা এসে আলগোছে বিশুর কাঁধে হাত রাখত। চোখ পাকিয়ে বলত, "চুপচাপ আমাদের ক্লাসরুমে চল। নইলে গাঁট্টা খাবি।"

ক্লাস সিক্সের ছেলেরা ছোটো। তারা কুঁই কুঁই করত। বলত, "একদিন তো আমাদের কাছে যাবে বিশুদা? নাকি যাবে না? আমরা সবার ছোটো বলে এত অচ্ছেদ্দা?"

এরপর বিশু নিজেই একটা ব্যবস্থা করেছে। সে সোম, মঙ্গল, বুধ ভাগ করে নিয়েছে। একেকদিন একেকটা ক্লাসে যায়। টিফিনের সময়টা কাটিয়ে আসে। যে-ক্লাসে যায় তারাই ভাগ করে টিফিন খাওয়ায়। বিশু খেতে না-চাইলে ভালোবেসে জোর করে খাওয়ায়। শুধু টিফিনের সময় নয়, স্কুল বসার আগে বা ছুটির পরও তাকে ছেলেরা চেপে ধরে।

"বিশু, প্লিজ একবার...।"

"বিশু, একটুখানি...।"

"বিশু, না বলিসনি ভাই...।"

বিশুকে আমরা ঘুড়ি, লাট্টু, স্ট্যাম্প, ছবির বই উপহারও দিই। বিশু লজ্জা পায়। বলে, "আমার এসব লাগবে না। তোরা আনন্দ পেলেই হল।"

আমরা বলি, "বেশি পাকামি করবি না। গাঁট্টা খাবি। সব কিছুরই একটা দাম আছে। তা ছাড়া তুই তো জোর করে নিচ্ছিস না, আমরা খুশি হয়ে দিচ্ছি।"

বিশুর এই জনপ্রিয়তার খবর স্যাররা তেমন জানেন না। হেডস্যার তো নয়ই। আমরা যতটা পারি গোপন রাখি। ব্যাপারটা গোপন রাখার মতোই। কিন্তু সেদিন ভয়ংকর একটা কাণ্ড হল।

টিফিনের সময় আমরা দেখলাম, জীবন, সাত্যকি, তপোবিজয়, জ্যোতি আর বিক্রম দল বেঁধে হেডস্যারের ঘরে ঢুকছে। মিনিট দশেকের মধ্যে তারা বেরিয়েও এল। তারপরই পিয়োন রাধুদা বিশুকে ডেকে নিয়ে গেল। রাধুদা মানুষ ভালো। স্কুলের ছেলেদের ভালোবাসে। বিপদের আগে সাবধান করে দেয়। লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটাতে সে বিশুকে বলল, "ভয় পেয়ো না ছেলে, স্যার যখন পিটানি দেবে দম চেপে রাখবে। দম চেপে রাখলে মারের ব্যথা বেদনা কম লাগে।"

বিশু আঁতকে ওঠে। বলে, "স্যার মারবে! মারবে কেন?"

"মারবে শুধু নয়, উনি যেমন রেগে আছেন দেখলাম, তাতে স্কুল থেকে তাড়িয়েও দিতে পারেন।"

বিশু বিরাট ভয় পেয়ে বলল, "তাড়িয়ে দেবেন! কেন? তাড়িয়ে দেবে কেন?'

রাধুদা নাক টেনে বলল, "তাড়িয়েই যে দেবে তাতে আমি নিশ্চিত নই। এটা নির্ভর করে মারধোরের ওপর। পিটুনিতে যদি রাগ কমে তখন হয়তো...।"

বিশু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আমি কী করেছি রাধুদা?"

"কী করেছ সে তো জীবন, সাত্যকি, তপোবিজয়রা গিয়ে বলে এসেছে। যাও চুপ করে স্যারের ঘরে ঢুকে যাও।"

বিশু কাঁপতে কাঁপতে হেডস্যারের ঘরে ঢুকল। আমরা খবর পেয়ে নজর রাখলাম। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট বিশু আর বেরোয় না। আমাদের বুক ধুকপুক করছে। আহা রে, বেচারি ছেলেটা নিশ্চয় মারাত্মক বিপদে পড়েছে। আমাদের নিজেদের ওপরই রাগ হতে লাগল। আমরাই ওকে রোজ রোজ...নইলে এতটা জানাজানি হত না। হতচ্ছাড়া জীবন, তপোবিজয়, সাত্যকিও নালিশ করতে পারত না। হঠাৎই একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। হেডস্যারের ঘর থেকে 'হো হো' শব্দে হাসির আওয়াজ ভেসে এল! রাগী, গম্ভীর হেডস্যার হাসছেন! নিজের কানকে আমরা বিশ্বাসই করতে পারছি না। নিশ্চয় ভুল শুনছি। ঠিক তখনই গুটিগুটি পায়ে হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিশু! আমাদের খারাপ ছেলে বিশ্বনাথ। আমরা ছুটে গিয়ে তাকে ঘিরে ধরলাম। হেডস্যারের ঘরে কী হল? বিশু হাসতে হাসতে যা বলল—

ঘরে ঢুকতেই হেডস্যার তাকে চোখ পাকিয়ে বললেন, "তোমার নামে জীবন, তপোবিজয়, সাত্যকিদের কাছ থেকে যে নালিশ শুনলাম সেটা সত্যি?"

"কী শুনেছেন স্যার?" আমতা আমতা গলায় বলল বিশু।

"তুমি নাকি সবাইকে নকল কর। সত্যি কর?"

বিশু মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হেডস্যার ধমক দিয়ে বললেন, "কী হল, চুপ করে আছ কেন? সত্যি কি না বল।"

"হ্যাঁ, স্যার করি। আর করব না।"

"আর করবে কী করবে না সেটা পরের কথা। কী কর সেটা আগে বল। ছি ছি। আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার স্কুলে এমন একটা ছাত্র আছে ভাবতে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।"

বিশু ভয় পেয়ে বলল, "স্যার, আমি সবার হাঁটা চলা, কথা বলার ভঙ্গি, হাবভাব, আচরণ নকল করতে পারি।"

হেডস্যার পিঠ সোজা করে বললেন, "সেটা কেমন?"

বিশু ঢোক গিলে বলল, "বলতে ভয় পাচ্ছি স্যার।"

"না-বললে আরও ভয় পেতে হবে। একটা ছাত্রকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আগে তার অপরাধটা আমাকে ঠিকমতো জেনে নিতে হবে না?"

"আমাকে তাড়াবেন না স্যার।" চোখের জল মুছতে মুছতে বিশু বলল।

"সেটা নির্ভর করবে, তুমি তোমার অপরাধ কতটা স্বীকার কর তার ওপর।"

এরপর বিশু সবটাই বলল। শুধু বলল না, করে দেখালও। কীভাবে জীবন অঙ্কে এক-শো পাওয়ার পরও বানিয়ে বানিয়ে বেজার মুখে বসে থাকে, কীভাবে সাত্যকি টিমে চান্স পাইয়ে দেওয়ার জন্য আইসক্রিম ঘুষ নিয়ে খায়, কীভাবে তপোবিজয় অন্যের ভালো গান শুনলে নাক সিটকে নিন্দে করে, কীভাবে বিক্রম কাঁধ ঝাঁকিয়ে কথা বলে, কীভাবে জ্যোতি প্রশ্নপত্রের বাইরে ইচ্ছেমতো ছবি আঁকে আর নালিশ করলে ড্রয়িং স্যার দাড়িতে হাত বোলান,—সব। প্রথমে গম্ভীর, তারপর ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি, পরে সেই হাসি মিটিমিটি হল, শেষে ড্রয়িং স্যারের 'নকল' দেখে বড়ো করে হেসে ফেললেন হেডস্যার। সামান্য ঝুঁকে পড়ে নীচু গলায় বললেন, "আমাকে নকল করতে পারবে?"

"চেষ্টা করতে পারি স্যার। করব?" বিশুর ভয় কেটে গেছে। সে উৎসাহ নিয়ে বলল।

"করো। দাঁড়াও আগে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে বলি।" হেডস্যার রাধুদাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "দেখ এখন যেন কেউ ঘরে না-ঢোকে।"

বিশু গম্ভীর মুখে পিছনে হাত রেখে পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যেই। হো হো আওয়াজে হেসে উঠলেন হেডস্যার। তিনি যে রোজ সকালে স্কুল শুরুর পর এমনটাই করেন। বারান্দায় পায়চারি। অবিকল এইভাবেই করেন!

হেডস্যার উঠে এসে বিশুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "মাঝেমধ্যে টিফিনের সময় আমার ঘরে আসবে। এখন ক্লাসে যাও।"

গল্প এখানেই শেষ নয়। আর একটু আছে।

কিছুদিন পরেই স্কুলের এক অনুষ্ঠানে হেডস্যার ছাত্রদের বললেন, "কোনো কোনো সময় আসলের থেকে নকলটাই আমরা বেশি ভালোবাসি। কারণ আসলের খারাপটা সেখানে থাকে না। তাই ভালো ছেলের থেকে অনেক সময় খারাপ ছেলেদের আমরা বেশি পছন্দ করি।"

বৃষ্টি



শ্রীপর্ণা বসে আছে বারান্দায়। গাঢ় বেগুনি রঙের একটা ওড়না তার কানে গলায় মাফলারের মতো করে জড়ানো। সে নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যালে হাঁচছে এবং নাক টানছে। তবে তার মন হাঁচি বা নাক টানায় নেই। তার মন কোলের ওপর রাখা ল্যাপটপে। টাইপ করতে করতে হাসছে। কখনো মুচকি, কখনো জোরে। সম্ভবত কারো সঙ্গে কথা চালাচালি হচ্ছে। কার সঙ্গে কথা চালাচালি হচ্ছে?

ঘন ঘন নাক মোছার কারণে শ্রীপর্ণার ফর্সা, টিকোলো নাকের ডগা এখন টকটকে লাল। পঁচিশ বছরের এই মেয়েকে খুবই সুন্দর দেখতে। নাকের ডগা লাল হওয়ায় এখন অতিরিক্ত সুন্দর লাগছে। তবে শুধু টিকোলো নাক, ভাসা ভাসা চোখ আর গায়ের রং ফর্সা বলেই সে সুন্দর এমন নয়। তার ছিপছিপে চেহারায় এক ধরনের বুদ্ধির ছাপ আছে। দেখা গেছে, যাদের চেহারায় বুদ্ধির ছাপ থাকে তারা সাধারণত বোকা হয়। শ্রীপর্ণার বেলাতে ঘটনা অন্যরকম। সে সত্যিই বুদ্ধিমতী।

মেয়ের থেকে কয়েক হাত দূরে বসে আছেন মানসবাবু। তিনি বসে আছেন মোড়ার ওপর। বারান্দায় একটাই চেয়ার। বেতের রকিং চেয়ার। সেই চেয়ারের দখল নিয়েছে শ্রীপর্ণা। রকিং চেয়ারের নিয়ম হল সে সামনে পিছনে দুলবে। এই চেয়ার দোলে পাশাপাশি। শ্রীপর্ণার ফেভারিট। বসলে উঠতে চায় না। এই বারান্দাটাও চমৎকার। এখন আরও চমৎকার লাগছে। কাল রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে। এখন বৃষ্টি নেই, তবে আকাশ মেঘলা। এই মেঘকে বলে কাজল লেপটে যাওয়া মেঘ। মেঘ টপকে সকালের অল্প আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। আলো নয়, আলোর ছায়া। আলোর ছায়া খুব সুন্দর। হাত পেতে ধরতে ইচ্ছে করে।

আলো নয়, মানসবাবু ধরে আছেন খবরের কাগজ। চোখের সামনে তুলে ধরে আছেন। কিন্তু পড়তে পারছেন না। তাঁর মধ্যে 'পাথর-ভাব' দেখা দিয়েছে। 'পাথর-ভাব' একধরনের কঠিন অবস্থা। এই অবস্থায় মনে হয়, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ

পাথর হয়ে গেছে। চোখের মণি, হাত-পা, ঘাড় গলা সব পাথর। কিছুই নাড়াচড়া করা যাবে না। মানুষ সাধারণত এই ধরনের অবস্থা লাভ করে গভীর শোকে। মানসবাবু পাথর হয়েছেন রাগে। তাঁর রাগ দুজনের ওপর। মেয়ে এবং মেয়ের মা। মেয়ের বুদ্ধি নিয়ে মানসবাবুর গর্ব ছিল। সম্বন্ধের সময় মাত্র সতেরো মিনিট এই মেয়ের সঙ্গে পাত্র কথা বলেছিল। তাও মুখোমুখি নয়, কথা হয়েছিল টেলিফোনে, কর্পোরেট কায়দায়। ব্যস তাতেই ছেলে রাজি, বিয়ে ফাইনাল। এমন মেয়েকে নিয়ে গর্ব হবে না? আজ মানসবাবুর সেই গর্ব তছনছ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, তাঁর মেয়ে শুধু বোকা নয়, তার বুদ্ধি গাধার থেকেও নিম্নমানের। নইলে বিয়ের মাত্র আটমাসের মধ্যে এমন কাজ কেউ করতে পারে? শ্বশুরবাড়ি যদি গোলমালের হত তাহলে একটা কথা ছিল। ঘটনা একেবারেই তা নয়। ফ্যামিলি অতি সজ্জন ফ্যামিলি। জামাই রঞ্জন অতি ভদ্রসভ্য ছেলে। এতটাই ভদ্রসভ্য যে মাঝেমধ্যে শ্বশুর হিসেবে মানসবাবুরই অস্বস্তি হয়। দেখা হলে দু-বার করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। একবার প্রথমে, একবার শেষে। আজকের দিনে দু-বার প্রণাম করা জামাই পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আগামী বছর জামাইকে অফিস থেকে বিদেশে পাঠাচ্ছে। গোটা ইউরোপ ট্যুর। লন্ডনে শ্রীপর্ণা গিয়ে মিট করবে। অথচ ছেলের এতটুকু গর্ব নেই। শুধু ছেলের নয়, ছেলের বাপ-মায়েরও নেই। বলছে, 'ও তো আপনাদেরও ছেলে। গর্ব আপনাদের।' আহা! সব মিলিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি হল সোনার শ্বশুরবাড়ি। বড়ো মাপের গাধা না হলে সেখান থেকে...। মেয়ের মা সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। মনে হচ্ছে, এই ঘটনায় সেও যুক্ত। কীভাবে যুক্ত?

মানসবাবু খুব চেষ্টা করছেন রাগ কমিয়ে মাথা ঠান্ডা করতে। তিনি পর পর দু-কাপ গরম চা খেয়েছেন। মাথা ঠান্ডা হতে শুরু করেছে। পাথর-ভাব কাটছে। আর একটু সময় নিচ্ছেন।

রাগের শুরু কাল রাতে। তখন সাড়ে দশটা বাজে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। রোজকার মতো বই হাতে শুতে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন মানসবাবু। এমন সময় গাড়ির আওয়াজ পেলেন। পুরোনো লড়ঝড়ে গাড়ি স্টার্ট বন্ধ না-করে দাঁড়ালে এক ধরনের পাড়া কাঁপানো বিচ্ছিরি আওয়াজ হয়, সেই আওয়াজ। বিরক্ত হয়ে দোতলার জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন মানসবাবু এবং চমকে উঠলেন। ট্যাক্সি থেকে নামছে শ্রীপর্ণা। তার একহাতে সুটকেস, অন্য হাতে ল্যাপটপের ব্যাগ। আধো আলো আধো অন্ধকারে মানসবাবু দেখলেন মেয়ের মুখ হাসি হাসি! মানসবাবু একই কারণে খুশি এবং চিন্তিত হলেন। মেয়ে হঠাৎ এসেছে বলে খুশি আবার মেয়ে হঠাৎ এসেছে বলে চিন্তা। কোনো গোলমাল হয়নি তো? এত রাতে কেন? গোলমাল হলে তো মুখে হাসি থাকার কথা নয়। নাকি ওটা হাসি নয়। আবছা আলো আর বৃষ্টির ফোঁটায় বিভ্রম হয়েছে। তিনি জানলা থেকে সরে এসে স্ত্রীকে বললেন, 'অনুরাধা, পর্ণা এসেছে।'

অনুরাধাদেবী শোবার জন্য বিছানা করছিলেন। স্বামীর মুখে মেয়ে এসেছে শুনে খুশিতে বালিশ-টালিশ ছুড়ে ফেলে খাট থেকে লাফ দিয়ে নামলেন।

'কী ব্যাপার বল তো? পর্ণা কাউকে না-জানিয়ে হুট করে চলে এল! তোমায় ফোন করেছিল?'

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে অনুরাধা স্বামীর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়েকে বাপের বাড়ি আসতে হলে আগাম জানিয়ে আসতে হয় নাকি! কীভাবে জানিয়ে আসবে? আগে আগে ব্যান্ড পার্টি আসবে?'

মানসবাবু থমকে গেলেন। কথাটা ভুল নয়। এটাও তো শ্রীপর্ণার বাড়ি। বিয়ে হয়ে গেছে মানে এই নয় যে এ-বাড়ি তার নয়। এ-বাড়ি অবশ্যই তার। যখন খুশি আসতে পারে। আসার আগে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে আসার কোনো যুক্তি নেই। তিনি ঢোক গিলে বললেন, 'না, ভাবছি কোনো সমস্যা হল কিনা? আজকালকার মেয়েদের নিয়ে ভয় করে।'

অনুরাধা আরও কঠিন চোখে তাকালেন। বললেন, 'অলুক্ষুণে কথা বলছ কেন? সমস্যা হবে কী জন্য? অমন হিরের টুকরো জামাই, তার সঙ্গে সমস্যা কীসের? এ-রকম অলুক্ষুণে কথা আর বলবে না।'

মানসবাবু থতোমতো খেয়ে বললেন, 'ঠিক আছে আর বলব না।'

সিঁড়ির ধাপ টপকাতে টপকাতে অনুরাধাদেবী বললেন, 'ফট করে যেন মেয়েকে জিজ্ঞেস কোরো না কেন এসেছ, কতদিন থাকবে। বাপের বাড়িতে এসে মেয়েরা এই ধরনের প্রশ্ন শুনলে রেগে যায়। অপমানিত হয়।' স্ত্রীর শাসনে মানসবাবু বিরক্ত হলেন। কিন্তু প্রকাশ করলেন না। স্ত্রীকে আজকাল একটু ভয় ভয় লাগে। মনে হয় বয়স বাড়ার লক্ষণ।

শ্রীপর্ণার শরীর খারাপ। ঠান্ডা লেগেছে। গলা বসে গেছে। টনসিল ফুলেছে। সর্দি, কাশি, হাঁচি সব একসঙ্গে চলছে। ঠান্ডা লাগার কারণ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চেপে গেলেন মানসবাবু। কে জানে এই প্রশ্নও করা উচিত হবে কি না। আজ রাতে ঝুঁকি না-নেওয়াই ভালো। কাল সকালে দেখা যাবে। মেয়ের কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে। তবে মায়ের সঙ্গে তার কথা চলল আকারে ইঙ্গিতে। আকারে ইঙ্গিতে হাসাহাসিও হল। কাজটা কঠিন, তবু হল। হাসাহাসির বিষয় মানসবাবু বুঝতে পারলেন না। মা মেয়ের হাসাহাসির কারণ কখনো অন্য কেউ বুঝতে পারে না। মানসবাবুর ইচ্ছে করছিল মেয়েকে একটা ধমক দিয়ে বলেন, 'বোকার মতো হাসাহাসি বন্ধ কর। শরীর খারাপ নিয়ে এত রাতে এলে কেন? টালিগঞ্জ থেকে দমদম তো কম পথ নয়। তার ওপর বৃষ্টি বাদলার রাত। কাল সকালে এলে কি তোমার বাবা-মা পালিয়ে যেত?' মনে ভাবলেও কথাটা বলতে পারলেন না মানসবাবু। অনুরাধা ঠিকই বলেছে। বাবা-মায়ের কাছে মেয়ের আসাটাই বড়ো। কখন এলো, কেন এলো সেটা বড়ো বিষয় নয়।

বিষয় বড়ো হল রাতে। একটু বেশি রাতের দিকে। স্ত্রীর কাছ থেকে মেয়ের আসার কারণ আধখানা জানতে পারলেন মানসবাবু। জেনে শিউরে উঠলেন।

বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। একটানা দু-মাস ধরে মানুষ-খুন-করা টাইপের গরম চলছিল। অনেকে বলছিল, মরুভূমি সৃষ্টির প্রাকমুহূর্তে অবস্থা নাকি ঠিক এ-রকমই হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে কলকাতাও একটা মরুশহর হয়ে যাবে। নতুন মরুশহর। ফ্লাইওভার দিয়ে চলবে উটের সারি। শপিংমলে পাথরের গয়না, খেজুর, তরমুজ বিক্রি হবে। বেশি রাতে গড়িয়াহাটের মোড়ে আগুন জ্বেলে, ট্যামবুরিন হাতে নাচবে ঘাগরা পরা জিপসি কন্যারা। আর ক-টা দিন গরমের কষ্ট সহ্য করলেই এই দারুণ কাণ্ড ঘটবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দারুণ কাণ্ড ঘটল না। তিনদিন হল প্রকৃতি একেবারে উলটো হয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগর থেকে হইহই করে ছুটে এসেছে উথাল পাতাল মেঘ। আকাশ সেই যে কালো চাদরে মুখ ঢেকেছে, খুলছে না কিছুতেই। ঝমঝমিয়ে, ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি নামছে যখন-তখন। আবহাওয়া অফিসের কর্তারা গদগদ মুখে বলেছেন, চিন্তা নেই, বর্ষা এসে গেছে।

সেই বৃষ্টিই চলছে। মানসবাবু আগেই শুয়ে পড়েছিলেন। বেশি রাতে মেয়ের সঙ্গে বকবকানি সেরে ঘরে ঢুকলেন অনুরাধা। তাঁকে খুশি খুশি লাগছিল। মানসবাবুর হিংসে হল। ইস জানলে মেয়ের সঙ্গে তিনিও গল্প করতে পারতেন। ফালতু শুয়ে রইলেন। রাগ রাগ গলায় বললেন, 'এত রাত পর্যন্ত অসুস্থ মেয়েটাকে জাগিয়ে রাখলে?'

অনুরাধা বললেন, 'আমি কোথায় জাগিয়ে রাখলাম! তোমার মেয়েই তো ছাড়ছিল না। গলায় ব্যথা তবু কথা বলবে। ভেবেছিলাম বিয়ের পর ছেলে-মানুষিগুলো কাটবে। এখন দেখছি আরও বেড়েছে।' কথাটা শেষ করে 'ফিচ' ধরনের আওয়াজ করে হাসলেন অনুরাধা।

এই হাসিতে মানসবাবু আরও রাগলেন। বললেন, 'ছেলেমানুষি আরও বেড়েছে! কীরকম সেটা?'

অনুরাধা মজা-পাওয়া গলায় বললেন, 'জানি না। কাল সকালে মেয়েকে জিজ্ঞেস কোরো।'

মানসবাবুর রাগও বাড়ল। বললেন, 'জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মাঝরাতে চলে এল। ছি ছি। ও-বাড়ির লোকজন কী ভাবছে বল তো? ভাবছে আমাদের আশকারা রয়েছে। রাত পর্যন্ত আদিখ্যেতা না-করে তোমার উচিত ছিল মেয়েকে এই পাগলামির জন্য জোর ধমক দেওয়া।'

অনুরাধা হাই তুলতে গিয়ে থমকে গেলেন। অবাক গলায় বললেন, 'ওমা, ধমক দেব কেন? আমি তো খুব খুশি।'

মানসবাবু বললেন, 'কী বলছ তুমি? মেয়ের পাগলামিতে খুশি হয়েছ?'

অনুরাধা এবার আওয়াজ না-করে সুন্দর করে হাসলেন। নাইটল্যাম্পের ফিকে আলোয় তাঁর ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখা গেল। বললেন, 'খুশি হব না? বিয়ের পর আমার কতবার ইচ্ছে করেছে বাবা মায়ের কাছে চলে যাই। দুপুরে, মাঝরাতে,

...বয়স অল্প ছিল, সংসারে মন বসত না, মন কেমন করত। কিন্তু আমি কি যেতে পারতাম? পারতাম না! তোমার মেয়ে পেরেছে।'

মানসবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কে তোমায় যেতে বারণ করেছিল?'

অনুরাধা নিস্পৃহ গলায় বললেন, 'কেউ করেনি, আবার সবাই করেছিল। থাক, এখন আর ওসব তুমি বুঝবে না। পর্ণা আজ রাগ করে টালিগঞ্জ থেকে চলে এসেছে।'

বিছানার ওপর ধড়ফড় করে উঠে বসলেন মানসবাবু। বললেন, 'চলে এসেছে মানে!'

অনুরাধা নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে হাই তুললেন। বললেন, 'চলে এসেছে মানে, চলে এসেছে। রাগ হয়েছে।'

মানসবাবু বিস্মিত হলেন। মেয়ে রাগ করে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করেছে আর মেয়ের মা হাই তুলছে! তিনি বিস্ফারিত চোখে বললেন, 'কী হয়েছে? হোয়াট হ্যাপেন্ড?'

অনুরাধাদেবী মুচকি হেসে বললেন, 'ভেরি মজার থিং হ্যাপেন্ড। কাল মেয়ের কাছ থেকে জেনে নিয়ো। আমি এখন ঘুমোব।' কথাটা বলে অনুরাধা আবার মুচকি হাসলেন। তারপর সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন। বাইরে গুমগুম শব্দে বাজ পড়ল। মানসবাবুর মনে হল বাইরে নয়, বাজ পড়েছে তাঁর মাথায়। পড়ারই কথা। বিয়ের মাত্র আটমাসের মাথায় মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে রাগ করে চলে এলে মেয়ের বাবার মাথায় বাজ পড়বে না? তার ওপর মেয়ের মা বলছে মজার ঘটনা! ভয়ংকর! মনে হচ্ছে, মা-মেয়ের মধ্যে কোনো চক্রান্ত রয়েছে। মানসবাবু খাট থেকে নেমে পুরো এক জাগ জল খেলেন। ঘরে পায়চারি করলেন। বেশ কয়েকবার খাটে বসলেন এবং উঠলেন। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে একতলায় মেয়ের ঘর পর্যন্ত গিয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফিরে এলেন দু-বার। শেষ পর্যন্ত বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, রাগের কারণ জানার দরকার নেই। দরকার মেয়ের সঙ্গে কথা বলার। রাগ করে কথা নয়, ঠান্ডা গলায় কথা। তাকে বুঝিয়ে কালই ও-বাড়ি পাঠাতে হবে। বলবেন—'ছি ছি। কী বলে তুমি এমন কাজ করলে পর্ণা! লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। না, না আমি তোমার কাছ থেকে কোনো এক্সকিউজ শুনতে চাই না। একজন বুদ্ধিমতী মেয়ের কাছ থেকে এ জিনিস ভাবা যায় না। অমন শ্বশুরবাড়ি এক-শো হাত মাটি খুঁড়লে পাওয়া যাবে? বল, পাওয়া যাবে? যদি বল পাওয়া যাবে তাহলে এখনই আমি বাগানে গিয়ে এক-শো হাত মাটি খুঁড়ব...।'

মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টায় অনেকটা সফল হলেন মানসবাবু। পাথর ভাব কাটিয়ে আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। শ্রীপর্ণা 'ফ্যাঁচ' আওয়াজে হাঁচল। এক গাল হেসে বলল, 'বাবা, অমন করে আড়চোখে তাকিয়ো না। আমার ভয় করছে।' মানসবাবু লজ্জা পেয়ে দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলেন। শ্রীপর্ণা বলল, 'আমি জানি তুমি আমার ওপর রেগে আছ। মা নিশ্চয় তোমাকে সব বলেছে। তাই তো? তারপরেও

হাসছি বলে তোমার রাগ আরও বাড়ছে। রাগের সময় হাসি ক্যাটালিস্টের কাজ করে। রাগ বাড়িয়ে দেয়। দুঃখের সময় ক্যাটালিস্টের কাজ করে সান্ত্বনা। সেই কারণে দুঃখের সময় কাউকে সান্ত্বনা দিতে নেই। কেন হাসছি তুমি কি শুনবে? শুনলে তুমিও মজা পাবে।'

মানসবাবু ঠিক করলেন, এবার কথা বলবেন। তবে প্রথমে কাজের কথা নয়। প্রথমে হাবিজাবি কথা। ঠান্ডা লাগা নিয়ে কথা শুরু করলে কেমন হয়?

'তোমার ঠান্ডা লেগেছে কেন পর্ণা?'

শ্রীপর্ণা হেসে বলল, 'বৃষ্টিতে ভিজেছি বাবা। ওই গরমের পর পরশু যখন প্রথম বৃষ্টি হল তখন খুব ভিজেছি।'

'ও, কোথাও গিয়েছিলে বুঝি? সঙ্গে ছাতা ছিল্ল না? এ-রকম করবে না। বর্ষাকালে সবসময় ছাতা নেবে।'

শ্রীপর্ণা খিলখিল করে হেসে বলল, 'ওমা! ছাতা থাকবে কেন? আমি তো ছাদে উঠে ভিজলাম। আগেও তো ভিজতাম। রঞ্জনদের বাড়ির ছাদটা খুব বড়ো আর খুব সুন্দর। মনে হয় ওরা বৃষ্টিতে ভেজার জন্যই ছাদটা বানিয়েছে।'

মানসবাবু মোড়াতেই নড়েচড়ে বসলেন। শ্বশুরবাড়ির ছাদে গিয়ে বাড়ির নতুন বউ ভিজেছে! কাজের কথা সব গোলমাল হয়ে গেল। আগে এই ধাক্কা সামলাতে হবে। তিনি ঢোক গিলে বললেন, 'কেউ দেখেনি তো মা?'

শ্রীপর্ণা দু'বার নাক টেনে রকিং চেয়ার দুলিয়ে বলল, 'দেখেছে কি না জানি না, তবে সবাই জেনেছে।'

গলা খাঁকারি দিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে মানসবাবু বললেন, 'এটা ঠিক হয়নি। শ্বশুরবাড়ির ছাদে ভেজাটা ঠিক হয়নি। এখন তুমি বাড়ির বউ, কলেজের মেয়ে নও।'

'কী যে বল না বাবা। বৃষ্টি নেমেছে আর আমি ভিজব না? এমন কখনো হয়েছে? বৃষ্টি হচ্ছে শ্বশুরবাড়ির ছাদে আর আমি ভিজব অন্য জায়গায়? জান বাবা, শুধু ভিজিনি, সঙ্গে নেচেওছি। সিজনের প্রথম বৃষ্টিতে সবসময় ভেজার সঙ্গে নাচতে হয়। এটাই নিয়ম। ধেই ধেই করে নেচেছি। সঙ্গে বেসুরো গলায় গান। ঝর ঝর বরিষে বারিধারা/হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা...হি হি।'

মানসবাবু মুহূর্তখানেক চুপ করে রইলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, 'ছি ছি। আর কখনো এমন কোরো না।'

শ্রীপর্ণা দু-বার হাঁচি দিল, একবার নাক টানল। গলার ওড়না টেনেটুনে জড়িয়ে বলল, 'রঞ্জনও ফিরে এসে এই কথা বলল। ও অফিসে ট্যুরে বাইরে গিয়েছিল। তিনদিন পরে রাতে বাড়ি ফিরে এসে সব খবর পেল। আমার বৃষ্টি স্নানের খবর। বলল, ছি ছি, আর কখনো এমন কোরো না শ্রীপর্ণা। বাবা-মা দুঃখ পেয়েছেন। আমি বললাম, একশোবার করব। একশো বছর বাঁচব তাই একশোবার। হাজার বছর বাঁচলে হাজার বছর ভিজতাম। এরপর থেকে তোমার মা-বাবাকেও সঙ্গে নেব। ওঁরা

যদি রাজি হন ভালো, না হলে জোর করব। আমার মাকে বিয়ের পর ছাদে উঠে বৃষ্টিতে ভিজতে দেয়নি বাবা। মায়ের সেই দুঃখ আজও আছে। নিশ্চয় তোমার মায়েরও সে-রকম কোনো দুঃখ আছে। আমি দুঃখ দূর করব। রঞ্জন এ-কথা শুনে আমাকে বলল, শাট আপ। বাবা, তোমার জামাই তো খুব ভালো ছেলে, শাট আপের বেশি বলতে পারে না। তবে সঙ্গেসঙ্গে আমি সুটকেস গুছিয়ে চলে এসেছি। ঠিক করিনি?' শ্রীপর্ণা আবার খিলখিল করে হাসল।

স্তম্ভিত হয়ে বসে আছেন মানসবাবু। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। সত্যি কি এমন হয়েছিল? অনুরাধাকে বৃষ্টিতে ভিজতে দেননি? কবে? এই সামান্য একটা ঘটনা সে আজও মনে রেখেছে। নাকি এটা সামান্য নয়?

শ্রীপর্ণা চকচকে চোখে বলল, 'বাবা, কার সঙ্গে কম্পিউটারে হেসে হেসে চ্যাট করছি জানতে চাইলে না তো? তোমার জামাইয়ের সঙ্গে। সে আজ আমাকে নিয়ে যেতে আসছে। আমি বলেছি যেতে পারি একটা শর্তে। এ-বাড়ির ছাদে উঠে আমার সঙ্গে তাকে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। তবেই তাকে আমি ক্ষমা করব। ও গাঁইগুঁই করছে। বলছে, আমার ঠান্ডা লেগেছে, আর ভেজা উচিত হবে না। আমি বলেছি, উচিত না হলেও ভিজব। মাকে জিজ্ঞেস করেছি, মা বলেছে, হ্যাঁ ভিজবি, ঠান্ডা লাগলেও ভিজবি। যদি আমাকে সঙ্গে নিস আমিও ভিজব।'

মানসবাবু একটুখানি চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ তুলে গাধা মেয়ের চোখের দিকে তাকালেন। লাজুক হেসে বললেন, 'এই বুড়ো বয়েসে আমার বৃষ্টিতে ভেজাটা কি ঠিক হবে? তুই কী বলিস?'

বৃংহতি

পরমেশ্বর সান্যাল অল্প অল্প দুলছেন। এর অর্থ উনি খুব খুশি। খুব খুশি হলে উনি অল্প অল্প দোলেন। খুশি হলে উনি যে বেশি দুলতে পারেন না তা নয়। পারেন, তবে তিনি হলেন মন্ত্রী মানুষ। মন্ত্রী মানুষের অফিসে বসে বেশি দোলা ঠিক নয়।

'স্যার, এ তো কেলেঙ্কারি অবস্থা।'

একান্ত সহকারী বিজয়কে পরমেশ্বর দেখতে পাচ্ছেন না। তবে তার গলা শুনতে পাচ্ছেন। সেটাই স্বাভাবিক। টেবিলের ওপর যে পরিমাণ আবেদনপত্র জমে আছে তাতে উলটোদিকের কাউকে দেখা সম্ভব নয়। টেবিল তো নয়, মনে হচ্ছে, হিমালয়ের রেঞ্জ। পরমেশ্বর মুগ্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছেন। ভাবটা এমন, টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে আছেন। যে কোনো সময় কুয়াশা কেটে যাবে। তখন হিমালয়ের ফাঁকে জেগে উঠবে কাঞ্চনজঙ্ঘা!

বিজয় কাগজের বান্ডিল সরিয়ে উঁকি মারল। আবার বলল, 'স্যার, এ তো কেলেঙ্কারি অবস্থা। এত অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়বে ভাবতেও পারিনি।'

পরমেশ্বর মিটিমিটি হাসলেন। বললেন, 'তবে? তবে বল। বল তবে। কেমন একটা প্ল্যান ছেড়েছি? একসময় তোমাকে বলিনি, আমারও সময় আসবে? বলিনি তোমায়, আমিও হইচই ফেলে দেব? আরে বাবা মাথা থাকলে সব হয়। মাথাই আসল। ঠিক কি না বিজয়? মাথাই আসল কি না?'

বিজয় কাগজ আরও সরাল। সরাতে গিয়ে খানকয়েক টেবিলের নীচে পড়ে গেল। পড়ুক গে। মন্ত্রীর টেবিল থেকে অ্যাপ্লিকেশন পড়ে যাওয়া কোনো অপরাধ নয়। তা ছাড়া এতগুলোর মাঝখানে খানকতক পড়ে গেলে ক্ষতি কী? কোনো ক্ষতি নেই।

'*স্যার সে তো ঠিকই। আসল কথা হল গিয়ে মাথা।* মাথার মতো জিনিস নেই। সেইজন্যই তো চোর ডাকাতের মাথার দাম ধরা হয় কারো পঞ্চাশ হাজার, কারো দশ হাজার, কারো দশ লক্ষ।'

মন্ত্রীর মাথার সঙ্গে চোর ডাকাতের মাথার তুলনা করা অপমানের বিষয়। তবে আনন্দের সময় মান অপমানের কথা অত ধরলে চলে না। পরমেশ্বরও ধরলেন না। এতদিন তিনি ছিলেন একটা হেলাফেলা দপ্তরের মন্ত্রী। হেলাফেলা শুধু নয়, রসিকতার দপ্তরও বটে। প্রথম যেদিন এখানে মন্ত্রী হয়ে এলেন, তখন দেখলেন ঘরের বাইরে নেমপ্লেটে লেখা—'শ্রীপরমেশ্বর সান্যাল, উপমন্ত্রী, পশু।'

বিজয় ঘরে ঢুকে কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'স্যার, "পশু" কথাটা কেমন কেমন শোনাচ্ছে যেন। লোকে হাসাহাসি করছে। বলছে, 'অর্থ মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, পশু মন্ত্রী।'

পরমেশ্বর বিচলিত হননি। মন্ত্রী হয়েছেন এটাই আসল কথা। মন্ত্রী হওয়া বড়ো, না, হাসা বড়ো? পশুদের মন্ত্রী না মানুষের মন্ত্রী তাতে কিছু যায় আসে না। পরমেশ্বর নির্বিকার রইলেন। কিছুদিন পর মন্ত্রীর সংখ্যা আরও বাড়ল। ডিপার্টমেন্ট ভাগাভাগি হল। তাঁর নেমপ্লেটে 'পশু'র পাশে ব্র্যাকেটে লেখা হল 'বড়ো'। অর্থাৎ তিনি বড়ো বড়ো 'পশু'দের দায়িত্ব পেলেন। ছোটো পশুদের জন্য এলেন আলাদা মন্ত্রী।

রাজাহাটের বাংলোর গায়ে কোনো বজ্জাত ছেলে চক দিয়ে লিখে দিয়ে গেল, 'মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।' পরিবারের লোকেরা তো খেপে আগুন। বলল, 'পুলিশে খবর দাও। এত বড়ো সাহস। মন্ত্রী নিয়ে ফাজলামি করে। বজ্জাত ছেলেপিলেদের ধরে জেলে ঢোকালে ঠিক হবে।' পরমেশ্বর পুলিশকে খবর দিলে মুশকিল হত। কাগজ লিখত, টিভি ছবি তুলত। টিভিগুলো ইদানীং নানা ধরনের গোলমাল শুরু করেছে। সুযোগ একটা পেলেই হল। পটাপট ছবি তুলে ফেলছে। হয়তো প্রথমে দেখাত চিড়িয়াখানায় গণ্ডার ঘুরছে। তারপর মন্ত্রীর মুখ। শেষে বজ্জাত ছেলেদের ইন্টারভিউ। লাভ কিছু হত না। উলটে ক্ষতি হত।

দপ্তরে কাজকম্ম নেই। চিন্তাভাবনাও নেই। হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়ার মতো ছোটোখাটো পশুপাখি নিয়ে ভাবনাচিন্তার রিস্ক তাও নেওয়া যায়। বাঘ, ভাল্লুকের মতো বড়োদের নিয়ে সেসব চলে না। বড়ো পশুরা অন্যের চিন্তাভাবনা মোটেও পছন্দ করে না। সুতরাং চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের। পরমেশ্বর এবং তাঁর দপ্তর চুপচাপ রইল।

এমন সময় এই হস্তী-কাণ্ড! হ্যাঁ, ঠিকই, যা ঘটেছে তাকে হস্তী-কাণ্ডই বলা ঠিক হবে।

আর সেই হস্তী-কাণ্ডের চোটে আজ এক কোণে পড়ে থাকা ঠাট্টা ইয়ারকির দপ্তরে একেবারে তুলকালাম পড়ে গেছে। সবার নজর কেড়েছে। কর্মচারীদের নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। যে পিয়োন অফিস টাইমে ঘুমোত সে বেচারি এখন ঘরের বাইরে ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে।

এই হস্তী কাণ্ডের শুরু মাসখানেক আগে। তাঁর কাছে দপ্তরের অফিসাররা দল বেঁধে এসে উপস্থিত হলেন।

'অনেক হয়েছে, আর না। স্যার, হাতিদের নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। বাঘ,

ভাল্লুক, সিংহরা স্যার ঠিক আছে। নিজেদের মতো জঙ্গলে থাকে। আমাদের ছায়াও মাড়াতে চায় না। আমরাও স্যার ওদের ছায়া মাড়াতে চাই না। কিন্তু হাতিরা স্যার বিরাট ঝামেলা পাকাচ্ছে। জঙ্গল ছেড়ে একবার বেরোলে, ফিরতে চাইছে না কিছুতেই। মানুষের কাছেই থেকে যাচ্ছে বেশ ক'-টা দিন। যেন বেড়াতে এসেছে। আর এই ক'টা দিন গোটা দায় পড়েছে আমাদের দপ্তরের ওপর। জঙ্গল ছেড়ে এলেই তাদের আদর যত্ন, চান-খাওয়ার সব ব্যবস্থাই করতে হচ্ছে। হাতিদের মতো এত বিশাল একটা প্রাণীকে খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা কি স্যার চাট্টিখানি কথা? দপ্তর যে ফতুর হওয়ার জোগাড়। আপনি কিছু একটা করুন। এতদিন শুধু ধেড়েগুলোর যাতায়াত ছিল। কিছুদিন হল ওরা ওদের ছানাপোনাদের রেখে গেছে। রেখে ফের বেড়াতে চলে গেছে জঙ্গলে। একটা-দুটো নয় স্যার, তেরো তেরোখানা হস্তী শাবক। সেগুলো স্যার আমাদের ঘাড়ে চেপে খাচ্ছেদাচ্ছে, খেলছে। যেন ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে এসেছে! বাচ্চা হলে কী হবে স্যার, তেরোটার খাওয়ার বহর দেখলে চমকে যেতে হবে। আপনি যদি এখনই কোনো সিদ্ধান্ত না নেন পশু (বড়ো) দপ্তর স্যার খুব শিগ্‌গিরই লাটে উঠবে। রুগ্‌ণ কারখানার মতো, রুগ্‌ণ দপ্তর হিসেবে ঘোষণা করতে হবে তখন। আপনি স্যার একটা কোনো সিদ্ধান্ত নিন।'

সিদ্ধান্ত নিতে পরমেশ্বর সান্যাল বেশি দেরি করেননি। মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সিদ্ধান্ত মোটে খরচ হয়নি। ফলে এমনিতে অনেক সিদ্ধান্ত মাথায় জমা আছে। একটা গভীর ভাবনা চিন্তার পর অফিসারদের ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। তারপর লেকচার দেওয়া ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনাদের এত চিন্তা কীসের? কীসের এত চিন্তা? মনে রাখবেন, এটা হল কেনাবেচার সময়। সেই অমোঘ সময়কে আমরা যতই অস্বীকার করতে চাই, আমরা পারব না। আসুন, এই সময়কে আমরা কাজে লাগাই। মুখ ঘুরিয়ে না-থেকে কেনাবেচার মধ্যে নিজেরাও ঢুকে পড়ি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, হাতির বাচ্চাগুলোকে বেচে দেব।'

অফিসাররা এর ওর মুখের দিকে তাকাল। অবাক হয়ে বলল, 'হাতি বেচব!'

'কেন বেচব না কেন? হাঁস, মুরগি যদি বেচা যায় হাতি বেচা যাবে না কেন?'

'স্যার, হাতি কে কিনবে?'

পরমেশ্বর বললেন, 'কেন? জনগণ কিনবে। জনগণ সব কিনতে পারে। হাতিও পারবে।'

'পাবলিক হাতি কিনবে? স্যার, কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে পাবলিক হাতি কিনবে, তাহলে পুষবে কেমন করে? কথায় বলে হাতি পোষার খরচ।'

পরমেশ্বর সামান্য হাসলেন। হেসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'আপনাদের নিয়ে এই হয়েছে মুশকিল। পাবলিক সম্পর্কে আপনাদের ধারণা বড়ো অস্বচ্ছ। বড়ো সংকীর্ণ। নানাভাবে তাদের আন্ডার-এস্টিমেট করাটাই আপনাদের অভ্যেস। রাজনীতি করার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে এ জিনিস করতেন না। জনগণের হাতে টাকা এখন আর

কোনো সমস্যাই নয়। টাকা খরচের পথটাই সমস্যা। নতুন নতুন পথে টাকা খরচের জন্য তারা আকুলিবিকুলি করছে। আমরা নতুন পথের হদিশ দেব।'

অফিসাররা মাথা নীচু করে মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন।

পরদিন খবরের কাগজগুলোতে বিজ্ঞাপন বেরোল। ছোটো দু'লাইনের বিজ্ঞাপন। সঙ্গে একটা বাচ্চা হাতির রঙিন ছবি। 'হাতি মেরে সাথী' সিনেমার ঢঙে সেই বাচ্চা বল খেলছে।

'কয়েকটি হস্তি শাবক বিক্রি করতে চায় পশু (বড়ো) দপ্তর। যাঁরা কিনতে ইচ্ছুক, তাঁরা বিস্তারিত লিখে আবেদনপত্র জমা দিন। সঙ্গে পাসপোর্ট সাইজ ছবি আবশ্যিক, ছবি ছাড়া আবেদন গ্রাহ্য হবে না।'

সেই আবেদনপত্র জমা পড়েছে। গোড়ার দিকে ছিল কয়েকশো, এখন তা বেড়ে হয়েছে কয়েক হাজার। বাকিরা তো দূরের কথা, নিজের সিদ্ধান্তের জোর যে এতটা তা পরমেশ্বর সান্যাল নিজেও কল্পনা করতে পারেননি। শুধু আবেদনপত্র জমা নয়, শুরু হয়েছে 'ধরা করা'। ঘরের ভিজিটরের ভিড়। টেলিফোনের পর টেলিফোন। অনুরোধের ওপর অনুরোধ—একটা হাতি চাই। যে-করেই হোক একটা হাতি চাই। দাদা, একটা হাতি চাই।

এতদিন পর এই প্রথম নিজেকে 'মন্ত্রী মন্ত্রী' লাগছে। তাই পরমেশ্বর খুব খুশি।

বিজয় বলল, 'স্যার, এত অ্যাপ্লিকেশন বাছাই হবে কী করে? বাচ্চা তো স্যার হাতে আছে মাত্র তেরোখানা। কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে তেরোখানা ভাগ করব কীভাবে? পাবলিক খেপে যাবে মনে হচ্ছে স্যার।'

পরমেশ্বর বিরক্ত হলেন। এ তো আচ্ছা গাধা। হাতে তেরোখানা আছে মানে তেরোখানাই বিলিয়ে দিতে হবে? বোকা কোথাকার। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'বোকার মতো কথা বোলো না বিজয়। সবসময় মনে রাখবে। তুমি একজন মন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করছ। মন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করবার সময় বোকার মতো কথা বলা যায় না। যা বলছি নোট করো।'

লেখার মতো জায়গা টেবিলে নেই। তার মধ্যেই কোনোরকমে পেন বের করল বিজয়।

'লেখো, তেরোখানার মধ্যে টেন পার্সেন্ট হাতির বাচ্চা থাকবে ভি আই পি কোটায়।'

'ভি আই পি কোটায়!'

'বাঃ ভি আই পি-রা কি অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়ে হাতি কিনবে? তাদের জন্য আলাদা করে ধরে রাখতে হবে না? সব মিলিয়ে ভি আই পি কত আছে জানো? জানা আছে তোমার? যদি লিস্ট করা হত তাহলে দেখতে, সাধারণ পাবলিকের থেকে ভেরি ইমপর্টান্টদের সংখ্যা অনেক বেশি। দেখবে হাতির জন্য ভি আই পি-দের কত টেলিফোন আসে। সবাইকে নিয়ে ছেলেখেলা চলে তাদের নিয়ে ছেলেখেলা চলে না। এসব ব্যাপারে কোনো রিস্ক নেওয়া নেই।'

বিজয় বুঝল। মাথা নাড়িয়ে বলল, 'সেটা স্যার ঠিকই। বলতে গেলে এটাই বড়ো পশু দপ্তরের প্রথম বড়ো কাজ। প্রথম কাজে কোনো রিস্ক নেওয়াটা ঠিক হবে না।'

'গুড, এই তো মাথা খুলছে। এবার লেখো, সেভেন পার্সেন্ট সরিয়ে রাখতে হবে এন আর আই কোটা হিসেবে।'

বিজয় আবার অবাক হল। মুখ তুলে বলল, 'এন আর আই মানে স্যার অনাবাসীদের কথা বলছেন? তারা এখান থেকে হাতির বাচ্চা নিয়ে লন্ডন, আমেরিকায় চলে যাবে!'

'আহা, যাবে কি যাবে না সেটা তাদের ব্যাপার। আজকাল যেকোনো ব্যাপারে এন আর আই কোটা রাখা একটা নিয়ম। এতে জিনিসের কদর বাড়ে। যে জিনিসের জন্য এন আর আই কোটা নেই, সে জিনিসের কোনো কদর নেই। ক'দিন বাদে দেখবে, বাজারের সবজিওলাও এন আর আই কোটায় আলু, পটল পাশে সরিয়ে রাখছে। চাইলে কিছুই দেবে না। আলু, পটল সরানো থাকলে হাতি সরানো থাকবে না কেন? বল তুমি। নিজের মুখেই বল।'

বিজয় নিজের মুখেই বলল, 'একশোবার থাকবে। হাজারবার থাকবে।'

'এবার লেখো ফাইভ পার্সেন্ট মিনিস্টারের কোটা। মানে, আমার হাতে কয়েকটা থাকবে। আমি যাকে ইচ্ছে দিতে পারব।'

'এটা স্যার খুব ভালো করলেন। নিজের হাতে কিছু রেখে দেওয়া ভালো। আর আপনি যা হাত খোলা মানুষ স্যার। দেওয়াথোওয়ার ওপরই সবসময় আছেন। অনেকসময় গিফট-টিফট না-থাকলে খুবই সমস্যা হয়। এবার আর হবে না। আগেরকার দিনে রাজা বাদশারা হাতি উপহার দিতেন। এখন মন্ত্রী দেবেন।'

'ছিঃ বিজয়, আমার সঙ্গে রাজা বাদশার তুলনা কোরো না। আমি অতি দীন দরিদ্র মানুষ। তা ছাড়া যেকোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে কখনো হাতি নিয়ে যাওয়া যায়? নাকি মানায়? তবে হ্যাঁ, তোমার কথাটা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতোও নয়। সামনের মাসে শেঠ ঝাণ্ডুরামের নাতনির বিয়ে আছে। ওখানে একটা নিয়ে যাওয়া গেলেও যেতে পারে।'

বিজয় একগাল হেসে বলল, 'খুবই ভালো হবে স্যার। মারাত্মক ভালো হবে। তাক লেগে যাবে একেবারে। বাচ্চাটার গলায় একটা ঘণ্টা লাগানোর ব্যবস্থা করে দেব। আপনি বিয়েবাড়িতে ঢুকবেন, সেও পিছনে পিছনে ঢুকবে। ঘণ্টা বাজবে টুং টাং, টুং টাং।'

দৃশ্যটা ভেবে পরমেশ্বর আনন্দ পেলেন। মুখে সে-আনন্দ প্রকাশ করলেন না। মন্ত্রীদের চট করে আনন্দ প্রকাশ করবার নিয়ম নেই। মুখে বললেন, 'সে দেখা যাবে'খন। এবার লেখো আবেদনপত্র ভাগ হবে তিন ভাগে। যাঁরা আবেদন করেছেন তাঁদের আয় দেখে। কিছু হস্তিশাবক থাকবে উচ্চ আয়সম্পন্ন মানুষের জন্য। তোমরা যাকে বল, এইচ আই জি বা হায়ার ইনকাম গ্রুপ। মাঝারি আয়ের যারা হল গিয়ে

মধ্যবিত্ত, মিডল ইনকামের সেই সব লোকের জন্য রাখতে হবে কয়েকটা। তারপর আসছে একেবারে কম আয়ের লোকেরা। এদের তোমরা কী বল যেন বিজয়? কী যেন...? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে লোয়ার ইনকাম গ্রুপ। লোয়ার ইনকাম গ্রুপ মানে এল আই জি। তাদের বিক্রি করার জন্যও কিছু বাচ্চা থাকবে। দেখতে হবে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়।'

'স্যার, এল আই জি'র জন্য হাতি!' কলম থেমে গেছে বিজয়ের।

পরমেশ্বর চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, 'ছি বিজয় ছি। আমার সঙ্গে এতদিন থেকে তুমি এ-কথা বলতে পারলে? নিম্ন আয়ের মানুষরা কি মানুষ নয়? তাদের প্রয়োজন, শখ, আহ্লাদ বলে কি কিছু নেই? আমি কখনো এ জিনিস মানব না। একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবে, ধনী, দরিদ্র সবাই সমান। বড়োলোকরা যেমন আমার কাছ থেকে হাতি পাবে, তেমনি গরিবরাও পাবে। তুমি খেয়াল রাখবে, আমি যতদিন মন্ত্রী থাকব. এর যেন কোনো অন্যথা না হয়।'

স্যারের কথায় বিজয় আপ্লুত হয়ে পড়ল। সাচ্চা মানুষ একেই বলে। এ-রকম একটা সাচ্চা মানুষকে এতদিন কাজ না-করতে দিয়ে কী অন্যায়টাই না করা হয়েছে। তার ওপর কত বড়ো একটা দায়িত্ব আজ তার মতো সামান্য মানুষকে উনি দিলেন। ধনী-দরিদ্রকে এক করে দেখবার দায়িত্ব। পরমেশ্বর আবেগমথিত গলায় বলেন, 'ঠিক আছে, এবার বলো তোমার আর কী প্রশ্ন আছে?'

'স্যার হাতির দাম কীরকম হবে?'

'এটা একটা কথা। এই বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব। তবে কীরকম আর হবে? হাতির দাম তো ইঁদুরের মতো হবে না, হাতির দাম হবে হাতির মতো।'

কথাটার মানে ঠিকমতো বুঝতে না-পেরে বিজয় মাথা নাড়ল। বলল, 'কিন্তু স্যার, ইঁদুর বা হাতি কোনোটার দামই ঠিক আমাদের জানা নেই।'

'আহা, জানা হয়ে যাবে। সব কিছু নিয়ে অত ভাববে না বিজয়। দেখো না, রোজই তো আমরা কত কিছু জানতে জানতে চলেছি। এই ধর, আমরা কি জানতাম, এত লোক হাতি কেনবার জন্য পাগল হয়ে যাবে? জানতাম আমরা? মোটেই জানতাম না। আমাদের শুধু জানা ছিল, মানুষ খেতে পায় না। মানুষ পরতে পায় না। মানুষের ঘর নেই। সবটাই মান্ধাতা আমলের জানা। হাতি আমাদের জানার জানলা খুলে দিল বলতে পার। যাক তুমি অফিসারদের ডেকে পাঠাও। আমি মিটিং করব।'

পরমেশ্বরের জানার বহর দেখে বিজয় মুগ্ধ। মন্ত্রী তো কতই হয়, এ-রকম জ্ঞানী মন্ত্রী ক-জন? এঁর সঙ্গে কাজ করবার গর্বই আলাদা। সে তাড়াতাড়ি দপ্তরের অফিসারদের খবর দিল।

মিটিং-এ কিছু বিভ্রান্তি তৈরি হল।

একদল অফিসার বললেন, লটারিই ভালো। কয়েক হাজার আবেদনপত্রের মাঝখান থেকে গুটিকয়েককে বেছে নেওয়ার জন্য লটারি ছাড়া অন্য কোনো উপায়

নেই। এ-কথা পরমেশ্বরের পছন্দ হল না। লটারি মানে ভাগ্য। এই আধুনিক যুগে ভাগ্যের ওপর আত্মসমর্পণ তিনি মেনে নিতে পারেন না। নীতিতে লাগছে। সবকিছুর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করা যায়, নীতির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করা যায় না।

অন্য অফিসাররা তখন বললেন, তাহলে পরীক্ষা নেওয়া হোক। প্রথমে রিট্ন্ টেস্ট। রিট্নে কোয়ালিফাই করলে ভাইভা। সে-রকম হলে গ্রুপ ডিসকাশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে কোনো দুর্নীতির প্রশ্ন উঠবে না। যোগ্যতাই হবে আসল মাপকাঠি।

পরমেশ্বর মাথা নেড়ে বললেন, 'এটা ভালো। সবথেকে বড়ো কথা হল যোগ্যতা। আপনারা মনে রাখবেন, হস্তীশাবক বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের সামনে সবসময় একটাই বিষয় থাকবে। সেটা হল যোগ্যতা। আপনারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন।'

পরীক্ষা নিয়ে ছোটোবেলা থেকেই পরমেশ্বরের একটা দুর্বলতা আছে। পরীক্ষা মানেই ফলাফল। নিজের পরীক্ষার প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য তাঁকে হামেশাই মিথ্যে বলতে হয়। নানা ধরনের মিথ্যে। সবথেকে বেশি বলতে হয়, জেলের কথা। পরীক্ষার কথা উঠলেই তিনি বলেন, 'ভাই রে, জীবনে স্কুল কলেজে পরীক্ষা দেওয়ার সময় পেলাম কই? সেই সময়টা তো আমি জেলে অনশন করছিলাম। দেশ আগে না পরীক্ষা আগে রে ভাই?'

আজ তাঁরই তত্ত্বাবধানেই একটা পরীক্ষা হবে। ইচ্ছে করলে তিনি একজন পরীক্ষক হয়ে যেতে পারেন। জীবনে অন্য কোনো পরীক্ষার পরীক্ষক হতে পারেননি। পরীক্ষক হয়ে হাতি পরীক্ষার খাতাই না হয় দেখবেন।

পরীক্ষার আয়োজন শুরু হল। এলাহি আয়োজন। পশু (বড়ো) দপ্তরে ওভারটাইমের বন্যা। পরীক্ষার জন্য গোটা একটা স্কুলবাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়ে গেল। তৈরি হল অ্যাডমিট কার্ড। তাতেও হাতির ছবি। প্রশ্নপত্রের ব্যাপারটা পরমেশ্বর নিজের হাতে রাখলেন। কেন রাখলেন ঠিক বোঝা গেল না। প্রশ্নপত্রের ব্যাপারে শৈশব থেকে তাঁর একটা গভীর রাগ। সেটাও কারণ হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। মুখে কিছু বললেন না। কেউ জিজ্ঞেস করতেও সাহস পেল না।

প্রশ্নকর্তাদের নিয়ে পরমেশ্বর একদিন চলে গেলেন দিঘা। দিঘায় বসে নাকি প্রশ্ন লেখা হবে। এতে জিনিসটা গোপন থাকবে। হাতি-পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য জঙ্গলের দিকে কোথাও যাওয়া উচিত ছিল। পরমেশ্বর ইচ্ছে করেই সমুদ্র বাছলেন। এতে গোপনীয়তা জোরদার হবে। শুধু তাই নয়, তিনি নির্দেশ দিলেন, প্রশ্ন যেন কঠিন হয়। হাতি বিষয়ে একটি শব্দও রাখা চলবে না। পাবলিক যে হাতি নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিতে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এসে ধোঁকা খাবে। পাবলিককে ধোঁকা দেওয়ার মতো মজা কিছুতে নেই।

সুতরাং হাতি বাদ। বদলে প্রশ্নের অনেকটা জুড়ে রাখা হল জ্যোতির্বিজ্ঞান। চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারার অবস্থান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। কিছুটা প্রশ্ন থাকল,

রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর। যেমন, 'আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর' কবিতাটি কার লেখা? কবি এখানে প্রভাত বলিতে কীসের প্রভাত বোঝাতে চেয়েছেন? সেই প্রভাত কেমনভাবে প্রানের পর পশিল? এর সঙ্গে সামান্য অর্থনীতির প্রশ্ন। চাহিদা এবং জোগানের মিল ও অমিল। রচনা মাত্র একটা। পরমেশ্বর লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললেন, 'রচনাটা কিন্তু আমাকে ঠিক করতে দিতে হবে।'

অনেক ভাবনাচিন্তা করে পরমেশ্বর রচনা ঠিক করেছেন। রচনার বিষয়—একটি গ্রীষ্মের দুপুর।

প্রশ্নকর্তাদের একজন দুপুরে খেতে খেতে বললেন, 'ব্যাপারটা কেমন কেমন একটা হল না?'

মন্ত্রী ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন? কেমন কেমন হল কেন?'

'না মানে, হাতি নিয়ে পরীক্ষা অথচ হাতি সম্পর্কে কোনো কথা নেই!'

পরমেশ্বর বিরক্ত হলেন। বললেন, 'এমনটাই হয়। যে-বিষয়ে পরীক্ষা হয়, প্রশ্নে সে-সম্পর্কে কোনো কথা থাকে না। আপনি চিন্তা না-করে চিংড়ি মাছ খান দেখি। শঙ্করপুর থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি।'

পরীক্ষা রবিবার। তার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। দুটি ঘটনা দপ্তরের পক্ষে গৌরবের, একটি ঘটনা লজ্জার।

এক নম্বর ঘটনা হল, দুটি বিদেশি ব্যাঙ্ক প্রস্তাব পাঠাল, তারা হাতি কেনার জন্য মানুষকে ঋণ দিতে প্রস্তুত। সেই ঋণ হবে দীর্ঘমেয়াদি। অর্থাৎ বহু বছর ধরে শোধ দেওয়া যাবে। তার থেকেও আনন্দের বিষয়, মাননীয় মন্ত্রীর অনুরোধে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র মানুষের কথা মাথায় রেখে বিদেশি ব্যাঙ্ক সুদের হার খানিকটা কমিয়েও দিয়েছে। এই ঋণের নাম 'এলিফ্যান্ট লোন'।

দ্বিতীয় ভালো ঘটনা ঘটিয়েছে একটি দেশীয় কোম্পানি। তারা পশু (বড়ো) দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বাইপাসের ধারে একটি আধুনিক হাতিশালা বানাতে চায়। এর জন্য তারা মাত্র তিরিশ বিঘে জমি চেয়েছে। জমি পেয়ে গেলেই হাতিশালা তৈরির কাজে হাত দেওয়া হবে। বাড়ি হবে তেরো তলা। নীচে হাতিরা থাকবে। বাকি বারো তলায় শপিং মল। শপিং মলের নামও ঠিক হয়ে গেছে—আইভরি শপিং কমপ্লেক্স।

শুধু তিন নম্বরটা মারাত্মক।

হাতি পাইয়ে দেবার জন্য ঘুস নিতে গিয়ে পশু (বড়ো) দপ্তরের এক পিয়োন হাতেনাতে ধরা পড়েছে গত পরশু। হাতির তুলনায় ঘুষের পরিমাণ অতি সামান্য। মাত্র পঞ্চাশ টাকা! টাকা কম হলেও মন্ত্রী কড়া মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। পিয়োনটিকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। সেই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানকে দেওয়া হবে

সবসময়ের জন্য একটি গাড়ি এবং একজন দেহরক্ষী। এর জন্য যত খরচ হয় হবে। সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা, 'দোষীর' যেন সাজা হয়।

পরমেশ্বর সান্যাল অন্যরকম মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর হাঁটা চলাই বদলে গেছে। আগে জোরে হাঁটতেন, এখন হাঁটার মধ্যে একটা দুলকি চাল এসেছে। অনেকটা হাতির মতো। আগে কথা বেশি বলতেন। এখন বলেন কম। ঘনঘন টিভিতে ছবি, কাগজে ইন্টারভিউ। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে উদ্ধৃতি। জঙ্গলের সামান্য কয়েকটা হাতি যে তাঁকে রাতারাতি এত 'বড়ো' করে তুলবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। তবে 'বড়ো' হলেও সাধারণ মানুষকে পরমেশ্বর ভোলেননি। এ-বিষয়ে তাঁর নামে কমপ্লেইন কেউ করতে পারবে না। শেঠ ঝাণ্ডুরাম, গঙ্গারাম পাঁড়ে, কিষেণ ভুজিওয়ালাদের মতো গণ্যমান্যদের সঙ্গে যেমন দেখা করছেন, তেমনি গাঁ-গঞ্জ থেকে ছুটে আসা গরিবগুব্বোদেরও সময় দিচ্ছেন। ঘরের লোকের মতো 'তুই তোকারি' করে বলছেন, 'কী রে কিছু খেয়েছিস? পেট খালি নেই তো? দেখিস পেট কখনো খালি রাখবি না বাবা। খালি পেটে অ্যাসিড হয়। অ্যাসিড অতি মারাত্মক জিনিস। শরীর কুরে কুরে খায়।'

ইতিমধ্যে প্রশ্ন জানবার জন্য ওপরমহল থেকে চাপ আসছে। চেনাজানা অনেকেই সাজেশন চাইছে। পরমেশ্বর এতে রাগারাগি করছেন না। সাজেশন তো চাইবে। তিনি সুযোগের দুয়ার মানুষের সামনে খুলে দিয়েছেন, তা কি আর দ্বিতীয়বার আসবে? মানুষের এই উৎকণ্ঠা তিনি উপভোগ করছেন। দেখ হারামজাদার দল, যাকে দেখে এতদিন হাসতিস, তার কাছে এসে আজ কাঁদ।

পরীক্ষার দু-দিন আগে পরমেশ্বর আর একটা প্যাঁচ দিলেন। প্রশ্নপত্রের রচনাটা বদলে দিলেন। 'একটি গ্রীষ্মের দুপুর'-এর জায়গায় করে দিলেন 'এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যা।' বলা তো যায় না, রচনা যদি ফাঁস হয়ে যায়।

রবিবার সকাল থেকেই হলের সামনে পরীক্ষার্থীদের ভিড় উপচে পড়ছে। মানুষের ভিড়, গাড়ির ভিড়। পুলিশি ব্যবস্থা অপ্রতুল হওয়ার কারণে মানুষ গাড়ি সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই বয়স্ক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। তাদের অনেকের কপালেই দইয়ের ফোঁটা। কারো সঙ্গে এসেছেন বৃদ্ধ বাবা-মা। কেউ শেষ মুহূর্তের জন্য বইয়ের পাতা উলটে নিচ্ছে। কেউ বিড়বিড় করে মুখস্থ আওড়াচ্ছে। ভিড়ের মাঝে কে বলে উঠল, শুঁড় বিষয়ক একটি প্রশ্ন নাকি আসছেই আসছে। জনতার ভিড়ে অমনি গুঞ্জন উঠল, শুঁড়, শুঁড়, শুঁড়...। খানিক বাদে শোনা গেল শুঁড় নয়, ওটা হবে দাঁত। আবার গুঞ্জন উঠল, দাঁত, দাঁত, দাঁত...।

পরমেশ্বর চেয়ারে বসে দুলছেন। দুলছেন আর অল্প অল্প হাসছেন। তিনি বসে আছেন হেডমাস্টারের চেয়ারে। হাতি-পরীক্ষার পুরোটাই তিনি নিজের চোখে দেখতে চান। রোজ প্যান্ট শার্ট পরলেও আজ পরমেশ্বর পরেছেন ধুতি এবং সিল্কের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির গায়ে হালকা সুতোর কাজ। রোগা পাতলা, ফর্সা পরমেশ্বর সান্যালকে বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু।

সাজগোজ কি একটু বেশি হয়ে গেল? তা হোক। এটা একটা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট। লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্টের সময় সাজগোজ বেশি হলে ক্ষতি হয় না। তা ছাড়া কাগজের ফটোগ্রাফার, টিভি ক্যামেরা-ট্যামেরা সব আসবে বলেছে। সাজগোজ তো একটু বেশি দরকার।

বাইরে হট্টগোল যত বাড়ছে মন তত ভরে যাচ্ছে। আহা, একেই বলে সুখ। সুখে চোখ বুজে এল পরমেশ্বরের। আধঘুমে তিনি দেখতে পেলেন, বিশাল স্টেজ। স্টেজের পেছনে রজনীগন্ধার পাপড়ি দিয়ে লেখা—হস্তি বিতরণ অনুষ্ঠান। স্টেজে সারি সারি চেয়ার। তাতে বসে আছেন মানীগুণীরা। মাইক হাতে কাঁপা কাঁপা গলায় পরমেশ্বর বলছেন, 'মনে রাখবেন হাতি দিয়েছি। আরও দেব। দরকার হলে একই ভাবে বাঘ ভাল্লুক বিতরণেরও ব্যবস্থা হবে...।'

বিজয়ের ঠেলায় ধড়মড় করে উঠে বসলেন পরমেশ্বর।

'স্যার, উঠুন, শিগ্‌গিরই উঠুন স্যার।'

পরমেশ্বর চোখ কচলে বললেন, 'কী হয়েছে? হয়েছেটা কী?'

বিজয় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ভয়ংকর গোলমাল স্যার। মারাত্মক ব্যাপার। পুলিশ থেকে খবর দিচ্ছে। কতকগুলো হাতি স্যার দল বেঁধে ঢুকে পড়েছে!'

'হাতি ঢুকে পড়েছে! কী পাগলের মতো বকছ? কোথায় ঢুকে পড়েছে?'

'স্যার কোথায় ঢুকে পড়েছে বলতে পারব না। তবে ওরা স্যার খানিক আগে, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া পেরিয়ে বম্বে রোড ধরে দ্বিতীয় হুগলি সেতু পেরিয়েছে।'

'বল কী! হুগলি সেতু পেরিয়ে হাতি ঢুকছে? এটা কি জঙ্গলের রাজত্ব নাকি? অ্যাঁ, জঙ্গলের রাজত্ব? পুলিশ কী করছে? হোয়ার ইজ পুলিশ?'

'পুলিশ আছে স্যার। আরও ফোর্স যাচ্ছে। ব্যারিকেড করেও ওদের থামানো যাচ্ছে না। সম্ভবত ওরা স্যার এদিকেই আসছে।'

পরমেশ্বর এক মুহূর্তের জন্য থামলেন। বললেন, 'এদিকে আসছে! কেন এদিকে আসছে কেন?'

'তা বলতে পারব না। তবে স্যার এদিকেই আসছে। পুলিশ খবর দিয়েছে, এখনই যেন আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।'

পরমেশ্বর উঠে পড়লেন। বাইরে আওয়াজ নেই। পরীক্ষা মনে হয় শুরু হয়ে গেল।

'ক-টা হাতি আসছে বিজয়?'

বিজয় কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, 'স্যার, ছাব্বিশটা? টুয়েন্টি সিক্স স্যার। ওই তেরোটা বাচ্চার বাবা-মা মনে হয়।'

পরমেশ্বর জোরে পা চালাতে গিয়ে ধুতির কোঁচায় সামান্য হোঁচট খেলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'গাড়ি রেডি করেছ?' গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পরপরই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তাদের ডাক ভেসে এল। সেই ডাক গা হিম করা।

রামেশ্বরবাবুর ছাতা



তালা খোলার পরপরই খেয়াল হল রামেশ্বরবাবুর। বুকটা ধক করে উঠল। কোথায় গেল! কোথায় ফেলে এলেন?

আর দু-বছর পর অফিস থেকে রিটায়ার করবেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। একা মানুষ। ঝাড়া হাত-পা। অফিস ছুটি হলে বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। ইচ্ছে হলে কখনো-সখনো হাতের কাছে সিনেমা, থিয়েটারের হলে ঢুকে পড়েন। ভালো লাগলে পুরোটা দেখেন, ভালো না-লাগলে খানিকটা দেখেই 'দুচ্ছাই বলে ঘুমিয়ে পড়েন। কোনোদিন সোজা চলে আসেন নিজের পাড়ায়। 'আমরা সবাই' ক্লাবে তাসের আড্ডা বসে। অকশন ব্রিজ। সেখানে খানিকক্ষণ অন্যদের তাস খেলা দেখেন। কোনোদিন আবার তাও করেন না। বাস থেকে নামলেই রাস্তার ধারে শিবুর চায়ের দোকান। সেখানে বেঞ্চে বসে পরপর দু-ভাঁড় চা খান। সঙ্গে টোস্ট বিস্কুট। শিবুর সঙ্গে টুকটাক গল্প করেন। সামনে দিয়ে লোকেরা হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। গাড়ি ছোটে হুসহাস করে। দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। তারপর রাত বাড়লে ধীরে সুস্থে বাড়ি ফেরেন। রাতে বেশিরভাগ দিনই বাড়িতে রান্নাবান্নার ঝামেলা রাখেন না রামেশ্বর। ফেরার পথে হাতে বানানো রুটি কিনে নেন। ছোটো হলে চারটে, মাঝারি হলে তিনটে। বাজারের গায়েই রুটির দোকান। কখনো-সখনো ইচ্ছে হলে বাজারেও একবার ঢুঁ মারেন। শেষ বাজারে আনাজপাতি যদি কিছু পাওয়া যায়। তাহলে আর পরদিন সকালে ঝামেলা থাকে না। বেলা পর্যন্ত বিছানায় গড়ানো যাবে।

আজ অফিস ছুটির পর শিয়ালদার কাছে সিনেমা হলে ঢুকেছিলেন রামেশ্বরবাবু। তবে ঘুমোননি। ইন্টারভ্যালের পরই পালিয়ে এসেছেন। সিনেমা যে খুব খারাপ ছিল, এমন নয়। কিন্তু মন বসল না। বয়স বাড়লে এই এক মুশকিল। সব কিছুতে চট করে মন বসতে চায় না। পরপর তিনটে বাস ছেড়ে দিলেন রামেশ্বর।

বড্ড ভিড়। খানিকটা হাঁটলেন। তারপর মোটামুটি ফাঁকা একটা বাসে উঠে পাড়ায় ফিরলেন। বাজারে ঢুকে একটু আধটু বাজার করলেন। একটা ছোটো দেখে বেগুন, কিছুটা শিম, খানিকটা আলু। কাল শিম বেগুনের তরকারি খাওয়া যাবে। রাতের জন্য রুটি কিনে শিবুর দোকানে এলেন রামেশ্বর। তবে বেশিক্ষণ বসা হল না। শিবুর ছেলেটার জ্বর হয়েছে। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই দোকান বন্ধ করে বাড়ি ছুটল। ডাক্তারের কাছে যাবে। রামেশ্বরবাবুও বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। ফেরার পথে ক্লাবে দাঁড়িয়ে তাস খেলা দেখলেন কিছুক্ষণ।

বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রামেশ্বরবাবু পকেট হাতড়ে চাবি বের করলেন। জায়গাটা অন্ধকার। বাল্ব কেটে গেছে। ক-দিন ধরে বদলানোর কথা ভেবেও শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠছে না। অন্ধকারেই তালা খুলে ফেললেন রামেশ্বরবাবু। আর তখনই খেয়াল হল ছাতাটা নেই।

তালা খোলার সময় রোজই নিজের বাঁ-হাতের কবজিতে ছাতাটাকে ঝুলিয়ে রাখেন রামেশ্বরবাবু। ফোল্ডিং ছাতা নয়, পুরোনো কায়দার লম্বা ছাতা। যাকে বলে একেবারে ফুলসাইজ। কাঠের হাতলটাও বড়োসড়ো। কবজিতে ঝোলাতে কোনো অসুবিধে হয় না। তালা খোলার পর ঘরে ঢুকে আগে আলো জ্বালেন রামেশ্বর। দরজায় ছিটকিনি দেন, খিল তোলেন। দরজার পিছনে গায়ে সারি সারি হুক রয়েছে। তার একটায় ছাতাটাকে ঝুলিয়ে দেন যত্ন করে। এই অভ্যেস বহুদিনের। দীর্ঘ এগারো বছরের! ঠিকভাবে হিসেবে করলে তার থেকেও বেশি। এগারো বছর তিনমাস। কখনো এ-ঘটনার নড়চড় হয়নি। আজ হল। তালা খোলার পর রামেশ্বরবাবু বুঝতে পারলেন, কবজিতে ছাতা ঝুলছে না। তিনি ছাতাটা হারিয়ে এসেছেন।

আলো না-জ্বালিয়ে অন্ধকার ঘরেই দাঁড়িয়ে রইলেন রামেশ্বর। প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে সামলাতে ভাবলেন মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। অনেকসময় মাথা ঠান্ডা করে চিন্তাভাবনা করলে হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়। আগে কয়েকবার এ-রকম হয়েছে। চাবি, মানিব্যাগ, চশমা, পোস্টাপিসের পাশবই খুঁজে পাওয়া গেছে। আজ কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না! ছাতাটা কোথায় রেখে এলেন? অফিসে? সিনেমা হলে? বাসে না বাজারে? শিবুর চায়ের দোকানেও হতে পারে। আচ্ছা, তাসের আড্ডায় নয় তো? না, মনে পড়ছে না। সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। মাথা ঠান্ডা রাখার বদলে খুব দ্রুত রামেশ্বরবাবুর মন অশান্ত হয়ে উঠল। শরীরে অচেনা একধরনের অস্বস্তি শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি ঘামছেন। কাঁপা হাতে পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন রামেশ্বর। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। জল খাওয়া দরকার। অন্ধকারেই রান্নাঘরের দিকে এগোলেন রামেশ্বর। এগোতে এগোতে তাঁর মনে হল, কেন এ-রকম হচ্ছে। তিনি তো সোনার নেকলেস বা সিন্দুকের চাবি হারাননি। সামান্য একটা ছাতার জন্য মন এতটা চঞ্চল হয়ে উঠবে কেন? ছাতা হারানো তো আশ্চর্য কোনো ঘটনা নয়। ছাতা

তো সকলেই হারায়। জিনিস হারানো নিয়ে যদি কখনো সমীক্ষা হয় তাহলে অবশ্যই ছাতা থাকবে তালিকার ওপর দিকে। জীবনে কখনো ছাতা হারায়নি এমন মানুষ পাওয়া যাবে না। ট্রামে বাসে, অফিস কাছারিতে, দোকানে-বাজারে অহরহ ছাতা হারাচ্ছে। এমন মানুষও আছে যারা বছরের তিন-চারটে করে ছাতা হারাচ্ছে। অন্যরা যদি ছাতা হারানোর রাজা হয়, এরা হল ছাতা হারানোর সম্রাট। তাহলে? রামেশ্বরবাবুর কেন এমন হবে?

হওয়ার কারণ আছে। রামেশ্বরবাবুর ছাতা আর পাঁচজনের ছাতার মতো নয়। লোকে হয় ছাতা কেনে, নয় উপহার পায়। অনেকসময় অন্যেরটা ধার করেও কাজ চালায়। রামেশ্বরবাবু এই ছাতা পেয়েছিলেন ভারি আশ্চর্যভাবে। এক ভয়ংকর দুর্যোগের দিনে ছাতা যেন নিজেই এসেছিল তাঁর কাছে। একেবারে গল্পের মতো।

সেটা ছিল আষাঢ় মাস। আকাশ কালো করে সকাল থেকেই ঝেঁপে ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে। রামেশ্বরবাবুর শরীরটাও ভালো নয়। ক-দিন ধরে জ্বর জ্বর ভাব। বৃষ্টির বহর দেখে তিনি ঠিক করলেন, আজ অফিস কামাই করবেন। দুপুরে গায়ে চাদর জড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এমন সময় টেলিফোনে খবর এল পিসিমা অসুস্থ। রামেশ্বরবাবুর পিসিমা থাকতেন জনাইতে। বয়স অনেক। এর আগেও অনেকবার অসুখবিসুখ করেছে। কিন্তু এবার নাকি বাড়াবাড়ি অবস্থা। অক্সিজেন চলছে, যেকোনো মুহূর্তে খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে। ছেলেবেলায় এই পিসিমার বাড়িতে মাসের পর মাস থেকেছেন রামেশ্বরবাবু। জনাইয়ের মনোহরা খুবই বিখ্যাত মিষ্টি। একটা খেলে মুখে একবেলা স্বাদ থেকে যায়। পিসিমা নিয়ম করে সকালে দুটো, বিকেলে দুটো করে মনোহরা খাওয়াতেন ভাইপোকে। পিসিমার বাড়িতে যাওয়ার পিছনে এই মনোহরা একটা বড়ো কারণ ছিল। সেই মানুষটার বাড়াবাড়ি অবস্থা শুনে বাড়িতে বসে থাকা যায় না। তখন রামেশ্বরবাবুর একটা রেনকোট ছিল। সেটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে জনাই রোড স্টেশন। সেখান থেকে রিকশয় পিসিমার বাড়ি। পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে গেল। যদিও ততক্ষণে বৃদ্ধা পিসিমা অনেকটা সামলে নিয়েছেন। ভাইপোকে দেখে আরও যেন সামলে নিলেন। নাকে অক্সিজেনের নল নিয়েই বললেন, 'ওরে কে আছিস? রামকে আগে দুটো মনোহরা দে।'

এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। বৃষ্টিও থেমে গিয়েছিল। গোলমাল হল ফেরার সময়। স্টেশনে পৌঁছে রামেশ্বরবাবু বুঝতে পারলেন, তিনি তাঁর রেনকোট পিসিমার বাড়িতে ফেলে এসেছেন। গিয়ে যে নিয়ে আসবেন সে উপায় নেই। পথ অনেকটা। জলকাদায় আরও বেশি সময় লাগবে। এদিকে লাস্ট ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। রেনকোটের আশা ত্যাগ করলেন রামেশ্বরবাবু। আকাশ ভেঙে নতুন করে বৃষ্টি নামল। বিদ্যুৎ ঝলসে ঝলসে উঠল। স্টেশন শুনশান। টিকিট কাউন্টারের সামনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রামেশ্বর। জায়গাটা প্ল্যাটফর্ম থেকে খানিকটা দূরে। এখান থেকে ছুটে ট্রেনে উঠতে গেলে পুরোপুরি ভিজে যেতে হবে। ট্রেন যে

কোথায় দাঁড়াবে তারও ঠিক নেই। আগে থেকে প্ল্যাটফর্মে না-দাঁড়ালে মুশকিল। কিন্তু দাঁড়াবেনটা কীভাবে? খালি মাথায় বৃষ্টির তলায়? সে তো প্রায় আত্মহত্যার শামিল হবে। একেই শরীরের অবস্থা খারাপ। তার ওপর বৃষ্টিতে ভিজলে নিমোনিয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। ছাতা মাথায় অন্য কোনো যাত্রীও চোখে পড়ছে না যে বলবেন, 'দাদা আপনার ছাতায় একটু জায়গা হবে?' এই ঝড়বৃষ্টির রাতে কে মরতে শেষ ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করবে? মনে হয়, স্টেশনে এখন যাত্রী বলতে তিনি একাই। এমন সময় বৃষ্টির সাদা পর্দা ভেদ করে দূরে ট্রেনের আলো দেখা দিল। ট্রেন আসছে। মাইকে বৃষ্টি ভেজা স্যাঁতসেঁতে গলায় ঘোষণা হল—'হাওড়া যাওয়ার শেষ গাড়ি...।' রামেশ্বরবাবু অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য কিছু কি পাওয়া যাবে? একটা খবরের কাগজ? কাপড়ের টুকরো? ছেঁড়া পিচবোর্ড খানিকটা?

আর ঠিক তখনই ছাতাটা দেখতে পেলেন রামেশ্বরবাবু। ফাঁকা বেঞ্চে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কাঠের হাতল তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে যেন।

কার ছাতা? কে ফেলে গেছে? চারপাশে তাকালেন রামেশ্বরবাবু। গোটা স্টেশনে কেউ নেই। টিকিট কাউন্টারের আলোও নিভে গেছে। বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে টিনের শেডে। হাওয়া বইছে শোঁ শোঁ করে। একটা কুকুর কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে এক কোণে। অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকল চাপা হুইসল বাজিয়ে। রামেশ্বর আবার তাকালেন। ঝোড়ো হাওয়ায় ছাতাটা দুলে উঠল। যেন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে! গা ছমছম করে উঠল রামেশ্বরবাবুর। মুহূর্তখানেক ভাবলেন তিনি। কী করবেন? অন্যের জিনিস না-বলে নেওয়াটা ঠিক নয়। কিন্তু কাকে বলবেন? সময় নেই, যা করার এখনই করতে হবে। ভাবতে ভাবতে কাঁপা হাতে ছাতাটা তুলে নিলেন রামেশ্বর। মাথার ওপর মেলে ধরে ছুটলেন ট্রেনের দিকে।

সেই থেকে এই ছাতা সঙ্গে ছিল। টানা এগারো বছর তিনমাস। প্রথমদিনই জিনিসটার ওপর যে-মায়া তৈরি হয়েছিল, দিনে দিনে তা বেড়েছে।

পর পর দু-গ্লাস জল খেলেন রামেশ্বরবাবু। ঘরের আলো জ্বেলে ফ্যান বাড়িয়ে দিলেন ফুল স্পিডে। চেয়ারে বসে নিজের মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। ভালোই হয়েছে। এবার একটা নতুন ছাতা কেনা যাবে। বাহারি দেখে একটা নিতে হবে। অমন কিম্ভুতকিমাকার বেঢপ সাইজের জিনিস আজকাল চলে নাকি? বাসে ট্রামে নিয়ে চলতে কষ্ট। এই তো অফিসের সুহাস কেমন চমৎকার একটা ছাতা আনছে। ওর ভায়রাভাই না শালা হংকং থেকে এনে দিয়েছে। তিনটে ভাঁজ করলে এইটুকু হয়ে যায়। ব্যাগে তো ঢুকছেই। সে-রকম হলে পকেটেও রাখা যাবে। অতটা না-হলেও কাছাকাছি একটা নিলেই চলবে। ভাবতে ভাবতে দরজার দিকে চোখ পড়ে গেল রামেশ্বরবাবুর। শূন্য হুক। গত এগারো বছর তিনমাস ধরে এদিকে যখনই তাকিয়েছেন, ছাতাটাকে দেখতে পেয়েছেন। আজ খাঁ খাঁ করছে। মনটা ভারী হয়ে গেল রামেশ্বরবাবুর। খুব প্রিয় কেউ না-বলে বিদায় নিলে যেমন হয় সে-রকম মনে

হচ্ছে। এতক্ষণ নিজেকে যেটুকু সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন রামেশ্বরবাবু সবটাই মুছে গেল নিমেষে। তিনি আবার মুষড়ে পড়লেন।

এতদিন একটা ছাতা টিকিয়ে রাখার ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন। বেশিরভাগ লোকই বিশ্বাস করে না। চোখ কপালে তুলে বলে, 'একই ছাতায় এগারো বছর! অসম্ভব। হতেই পারে না। নিশ্চয় যোগ-বিয়োগে কোথাও ভুল হচ্ছে। ছাতাতেও ভুল হতে পারে। রামেশ্বরবাবু মাঝে হয়তো আরও দু-তিনখানা কিনেছিলেন। একই রকম দেখতে বলে গুলিয়ে ফেলছেন। ভাবছেন, পুরোনোটাই সঙ্গে রয়ে গেছে। বয়স তো কম হল না। এই বয়েসে হিসেবে যেমন গোলমাল হয়, চেনাচিনিতেও ভুল হয়। মানুষ চিনতেই ভুল হয়ে যায় তো ছাতা।' তবে কয়েকজন সত্যিটা জানে। যেমন রামেশ্বরবাবুর অফিসের সহকর্মীরা, বাড়িওলা বিভূতিবাবু, পাশের বাড়ির ক্লাস ফোরে পড়া মেয়ে কাজল। সহকর্মীরা হাসি ঠাট্টা করে বলে, 'রামদা, ছাতাটার ফটো তুলে গিনেস বুকে পাঠিয়ে দিন। বলা যায় না, ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়ে যেতে পারে।' রামেশ্বরবাবু এই হাসি ঠাট্টা গায়ে মাখেন না। মুচকি হেসে ফাইলে মন দেন। বাড়িওলা মানুষটা মন্দ নয়। তবে সুযোগ পেলেই জ্ঞান দেওয়া স্বভাব। তিনিও বেশ কয়েকবার বলেছেন, 'এবার জিনিসটা বদলে ফেলুন রামেশ্বরবাবু। আজকাল অনেক সুন্দর সুন্দর ছাতা এসেছে বাজারে। টেকসই, দামও কম।'

রামেশ্বরবাবু মৃদু হেসে বলেছেন, 'বদলে তো ফেলেইছি। কতবার যে এই ছাতার কাপড়, শিক, হাতল পালটালাম তার ঠিক আছে বিভূতিদা? এই তো সেদিন অফিস থেকে বেরিয়ে দেখি ভেতরের সেলাই খুলে ফর্দাফাঁই অবস্থা। ছাতাওলা ধরে ঠিক করিয়ে নিলাম। অসুবিধে কী? চলছে যখন চলুক না।'

বাড়িওলা তর্ক থামান না। বলেন, 'সবই যখন পালটেছে, গোটাটা পালটাতে সমস্যা কোথায়?'

রামেশ্বরবাবু শান্ত গলায় বলেন, 'সমস্যা আছে। জামা, জুতো পালটালে তো আর পুরো মানুষটা পালটানো যায় না।'

বাড়িওলা হেসে ওঠেন। বলেন, 'কার সঙ্গে কার তুলনা! আপনি এমনভাবে বলছেন, আপনার ওই ধ্যাড়ধ্যাড়ে ছাতা যেন ছাতা নয়, মানুষ! হা হা।'

রামেশ্বরবাবু লজ্জা পান। বুঝতে পারেন, কথাটা বলে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। নিজেকে সামলে বললেন, 'না না, তা নয়, তবে এতদিনের পুরোনো জিনিস ফেলতে মন চায় না।'

ছোটো মেয়ে কাজলের কিন্তু মনে এসব প্যাঁচ নেই। সে ছুটিছাটার দিন সকালে 'রামদাদু'র বাড়িতে বেড়াতে আসে। নিজের মনে খেলে আর বকবক করে। রামেশ্বরবাবু বিস্কুট দিলে খায়। ভুলে গেলে নিজেই চেয়ে নেয়। ছাতার বয়স শুনে গম্ভীর মুখে বলে, 'রামদাদু, ওকে কি আমি দাদা ডাকব? ছাতাদাদা?'

রামেশ্বর হেসে ফেলেন। বলেন, 'ডাকতে পারিস। অসুবিধে কিছু নেই। ডাকলে মনে হয় সাড়া দেবে।'

কাজল বলে, 'তুমি গল্পটা বল।'

রামেশ্বর বলেন, 'কোন গল্পটা?'

কাজল চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, 'ওই যে কীভাবে তুমি ছাতাটা পেয়েছিলে সেই গল্পটা?'

রামেশ্বরবাবু মনে মনে খুশি হন। মুখে বিরক্তির ভান দেখিয়ে বলেন, 'ওই গল্প তো অনেকবার তোকে বলেছি কাজল।'

কাজল আবদার করা গলায় বলে, 'তবু আবার বল।'

রামেশ্বরবাবু গুছিয়ে গল্প বলতে শুরু করলেন, 'সেদিন ছিল বৃষ্টির দিন। আমি গিয়েছিলাম জনাইতে আমার পিসিমাকে দেখতে...।'

রামেশ্বরবাবু উঠে পড়লেন। মনকে শক্ত করলেন। খোঁজ নিতে হবে। এখনো রাত বেশি হয়নি। হলেই-বা কী? বাড়ির কেউ হারালে রাত হয়েছে বলে কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা যেত? কথাটা ভেবে রামেশ্বর নিজেই ভুরু কোঁচকালেন। যতই পুরোনো হোক, ছাতা কি কখনো বাড়ির কেউ হতে পারে? এ-রকম একটা উদ্ভট কথা তার মাথায় এল কেন?

ক্লাবঘর, শিবুর বন্ধ চায়ের দোকান, বাজার, রুটির দোকান ঘুরে রামেশ্বরবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তিনি শুধু ক্লান্ত নন, মনের দিক থেকেও অনেকটা ভেঙে পড়েছেন। কোনো লাভ হল না। বরং অপমানিত হতে হল। পিনা নামের এক অল্পবয়সি ছেলে রাতে ক্লাবঘরে শোয়। সে টেবিলের ওপর বিছানা পাতছিল। রামেশ্বরবাবুর কথা শুনে চোখ নাচিয়ে বলল, 'তাহলে আপনার সেই ছাতার এতদিনে একটা গতি হল? ঘাড় থেকে নামল এতদিনে?'

রামেশ্বরবাবু করুণ গলায় বললেন, 'একটু ভালো করে দেখ না পিনা। খাঁজেখোঁজে কোথাও পড়েও তো থাকতে পারে। ভুল করে কেউ নিয়ে যায়নি তো?'

পিনা আরও হেসে বলল, 'খেপেছেন? ওই আদ্যিকালের ছেঁড়া-খোঁড়া, জোড়াতাপ্পি দেওয়া জিনিস কে নেবে?' একই কথা বলল অফিসের কেয়ারটেকার শশাঙ্ক। রাতে রামেশ্বর ফোন করলেন অফিসে। শশাঙ্ক কর্মীদের ফেলে যাওয়া জিনিস তুলে রাখে। ঘুমভাঙা গলায় শশাঙ্ক বলল, 'আপনার ওই ছাতা পেলে কী আর তুলে রাখতাম স্যার? ডাস্টবিনে ফেলে দিতাম। কাল সকালে কর্পোরেশনের গাড়ি এসে নিয়ে যেত।'

রাতে খেতে বসে খাওয়া হল না রামেশ্বরবাবুর। খাবার নেড়েচেড়ে উঠে পড়লেন। খালি পেটেই শুয়ে পড়লেন। অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করলেন। ঘুম আসছে না। চোখ বুজলেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে পরিচিত চেহারাটা। কালো শরীরে লম্বা কাঠের হাতল। হাতলে হালকা ফুল পাতার নকশা। কে জানে বেচারি কোথায় পড়ে আছে এই রাতে। মনটা হু হু করে উঠল রামেশ্বরবাবুর। অন্য কেউ বুঝবে না, কিন্তু তিনি তো জানেন কত বড়ো দুর্যোগের দিনে সে পাশে এসেছিল।

হাতল তো নয়, যেন বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল! তারপর এতটা বছর সুখে দুঃখে একসঙ্গে কেটেছে। এসব কথা কাউকে বলা যায় না। লোকে পাগল বলবে। বলবে, 'মাথার ডাক্তার দেখান। আমার একজন পরিচিত ডাক্তার আছে। যদি বলেন তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিই।'

এপাশ-ওপাশ করতে করতে শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লেন রামেশ্বরবাবু। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন—তাপ্পি দেওয়া ছাতার হাতল ধরে আকাশে উড়ছেন। ঝকঝকে আকাশ। ফুরফুরে হাওয়া। পাশ দিয়ে পাখি উড়ে গেল। গোত্তা মেরে চলে গেল একটা ঘুড়ি। অনেক নীচে ঘিঞ্জি শহর। বড়ো বড়ো বাড়ি, ফ্লাইওভার আর সরু সরু রাস্তা। যানজটে সব থমকে আছে। রামেশ্বরবাবু দিব্যি চলেছেন উড়তে উড়তে। চমৎকার লাগল দেখতে!

রাতে যে-স্বপ্ন 'চমৎকার' বলে মনে হয়েছিল, সকালে ঘুম ভাঙার পর তাকে 'দুঃস্বপ্ন' মনে হল রামেশ্বরবাবুর। আটান্ন বছরের একটা মানুষ যদি ছেলেমানুষের মতো ছাতা হাতে ওড়বার স্বপ্ন দেখে সেটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কী? নিজেই বুঝতে পারলেন, এ-রকম চলতে থাকলে সত্যি সত্যি মাথার ডাক্তার দেখাতে হবে। মুখ-টুখ ধুয়ে, কড়া করে চা বানালেন রামেশ্বর। চা খেতে খেতে সিদ্ধান্ত নিলেন, আজই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। ওই ছাতার কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে একেবারে। আর সেটা একমাত্র সম্ভব...।

অফিস যাওয়ার পথে বাস গুমটি আর শিয়ালদার সিনেমা হলে একবার খোঁজ নিয়ে গেলেন রামেশ্বরবাবু। ইচ্ছে ছিল না, তবু খোঁজ নিলেন। মনে যেন একটুও খচখচানি না-থাকে। বাস গুমটির লোকজন বলল, কাল শুধু একটা মানিব্যাগ পাওয়া গেছে। ভেতরে সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা। সিনেমা হলের লাইটম্যান গোলাপি রঙের লেডিস ছাতা এনে দেখাল। ইভনিং শোয়ের পর পাওয়া গেছে সিটের তলায়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন রামেশ্বর। ভাবলেন, যাক, তিনি সবরকম চেষ্টাই করলেন। কেউ আর তাঁকে দোষ দিতে পারবে না। কথাটা ভেবে নিজের মনেই হাসলেন, কে দোষ দেবে? ছাতা?

রাতে বাড়ির তালা খোলার সময় আজও রামেশ্বরবাবু বাজারের থলিটা মাটিতে নামিয়ে পকেট হাতড়ে চাবি বের করলেন। আজও তাঁর বাঁ-হাতের কবজিতে ছাতা ঝুলছে। নতুন ফোল্ডিং ছাতা। প্লাস্টিকের খাপে যত্ন করে ভাঁজ করা। সুন্দর জিনিস। দোকানদার খুলে দেখিয়ে দিয়েছে। হাতলের বোতাম টিপতেই এক ঝটকায় ফনফনে ডানা মেলে দিল! ভারি পছন্দ হয়েছে রামেশ্বরবাবুর। দামও একটু কমিয়েছে দোকানদার। শুধু ছোটো হাতল বলে কবজিতে সামান্য লাগছে। ও কিছু নয়। ক-দিনের অভ্যেসে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালালেন রামেশ্বরবাবু। দরজার ছিটকিনি তুলে শূন্য হুকে যত্ন করে ঝুলিয়ে দিলেন নতুন ছাতা। চমৎকার মানিয়েছে। সবাই ঠিকই বলেছিল। পুরোনো দিনের ঢাউস জিনিসটায় গাদাখানেক জায়গা নষ্ট হচ্ছিল। গুনগুন করে শ্যামাসংগীত গাইতে

গাইতে শোবার ঘরে এলেন রামেশ্বরবাবু। এতক্ষণে মনটা হালকা লাগছে। নিজের ছেলেমানুষির জন্য কাল রাতে ভালো করে ঘুম হয়নি। আজ খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দিতে হবে। তার আগে জমিয়ে স্নান। আলনার কাছে এসে জামাকাপড় নিতে হাত বাড়ালেন রামেশ্বর। আর তখনই জিনিসটা দেখতে পেলেন!

পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেলেন রামেশ্বরবাবু। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। যা দেখছেন সেটা সত্যি তো? নাকি এও তাঁর পাগলামি?

না সত্যি। আলনার একপাশে কাপড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর এগারো বছর তিনমাসের সঙ্গী, বিপদের বন্ধু! লম্বা কাঠের হাতলওলা, গায়ে তাপ্পি লাগানো সেই ছাতা!

মুহূর্তখানেক স্থির থেকে ফিক করে হেসে ফেললেন রমেশ্বর। ফিসফিস করে বললেন, 'হিংসুটে।'

রবিবার সকালে কাজল বিস্কুট খেতে খেতে বলল, 'কী করে খুঁজে পেলে রামদাদু?'

রামেশ্বরবাবু কাজলের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কী করে আবার? নিজেই ফিরে এল।'

কাজল বিস্কুট খাওয়া থামিয়ে বলল, 'অ্যাঁ! ছাতা নিজে ফিরে এল? তা কখনো হয়?'

রামেশ্বরবাবু চোখে হেসে বললেন, 'কেন হবে না? আমি তাকে এত খুঁজছি জেনেও সে ফিরে আসবে না? ভালোবাসা সবাই বুঝতে পারে রে কাজল। তবে সবাইকে অবশ্য অন্য কথা বলেছি। বলেছি, আমিই ভুল করে ছাতাটাকে আলনার পাশে রেখেছিলাম। তোকেই শুধু সত্যিটা বললাম। কেন বললাম জানিস? ছোটোরা সত্যি কথা বিশ্বাস করে, বড়োরা চট করে বিশ্বাস করতে চায় না।'

রাঙাপথ

সন্দীপের মুখ হাসিহাসি।

অথচ এই মুহূর্তে সন্দীপ যা করছে তাতে তার মুখ হাসিহাসি হওয়ার কথা নয়। হওয়ার কথা উলটো। একেবারে চোখে জল আসার অবস্থা না হলেও থমথমে তো হবেই। তাহলে এই ছেলের মুখে হাসি কেন! তবে কি অন্য কোনো ঘটনা আছে?

সন্দীপ বসে আছে তার ফ্ল্যাটের ঘরে, টেবিলের সামনে। টেবিলের ওপর এক তাড়া কাগজ। সন্দীপ একটা করে কাগজ তুলছে এবং যত্ন করে ছিঁড়ছে। ভাবটা এমন যেন সে কাগজ ছেঁড়া বিষয়ে কোনো পরীক্ষা দিতে বসেছে। একটু পরেই এগ্‌জামিনার আসবে। ছেঁড়া কাগজের প্রতিটা টুকরো মেপে দেখবে মাপ সমান কি না। সকাল আটটা থেকে সন্দীপ এই ছেঁড়াপর্ব শুরু করেছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব শিগ্‌গিরই কাজ শেষ হবে। কম্পিউটার থেকে ফাইল ডিলিট করে দিলেই দ্রুত ঝামেলা চুকে যেত। ছ-টা ফাইল 'ডিলিট' করতে ছ-সেকেন্ডও সময় লাগে না। কিন্তু সন্দীপ তা করেনি। সে প্রিন্ট বের করে নিয়েছে। হাতে ছিঁড়ছে। নিশ্চয় এর পিছনে কারণ আছে।

একটা ছাব্বিশ বছরের ঝকঝকে বুদ্ধিমান ছেলে সাতসকালে বসে কাগজ ছিঁড়তে পারে, কিন্তু সেই সময় মুখ হাসিহাসি থাকবে কেন? কাগজগুলো যা-তা কাগজ নয়। এর জন্য টানা পনেরো দিন এই ছেলেকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। শেষ তিনটে রাত জাগা গেছে। তাহলে হাসি কীসের? মাত্র দু'বছর বিয়ে হয়েছে সন্দীপের। স্ত্রী-র নাম মণিদীপা। চমৎকার মেয়ে। চার বছর আগে 'কাননবালা কনস্ট্রাকশন' নামে এক কোম্পানি'তে কর্মজীবন শুরু করেছিল সন্দীপ। তার পোস্টের নাম ছিল অদ্ভুত। 'আইডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট'। ভাবনার সহকারী। মালিককে বিভিন্ন প্রোজেক্টের আইডিয়া সাপ্লাই করতে হত। এখন চাকরি ছেড়ে

নিজে ফার্ম খুলেছে। মজার কথা হল, নিজের পুরোনো পোস্টের নামেই ফার্মের নাম রেখেছে সে। 'আইডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট'। 'আইডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট'-এর খ্যাতি হচ্ছে। নাম ছড়াচ্ছে। 'আইডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট'-এর সুপারহিট কাজগুলোর একটা হয়েছে ডুয়ার্সে। জঙ্গলের ভেতর প্রাইভেট রিসর্টের জন্য খানকতক 'গাছ বাড়ি'র আইডিয়া তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে মই বেয়ে উঠে যাওয়ার পর মই সরিয়ে নেওয়া হয়। কথায় আছে, গাছে তুলে মই কাড়লে বিরাট বিপদ। এখানে ব্যাপার উলটো। আর সেটাই এই আইডিয়ার ইউনিক পয়েন্ট। ট্যুরিস্টদের চমকে দেয়। গাছ বাড়িতে উঠলে ফাইভ স্টার আয়োজন। রাতে জানলার ওপাশে পেঁচা এসে বসে। চোখ ঘোরায়। সকালে গাছের ডালেই ব্রেকফাস্ট টেবিল। ইচ্ছে করলে টারজানের কায়দায় দড়ি ধরে ঝুলে এ-গাছ থেকে ও-গাছে যাওয়া যায়। অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। এই আইডিয়ার জন্য সন্দীপের ফার্ম একটা বড়ো ব্রেক পেয়েছে।

সেই ছেলের আজ কী হল!

যে কাগজগুলো সন্দীপ এতক্ষণ ধরে নষ্ট করল সেগুলো ছিল তার 'আইডিয়া'। কাজের ভাষায় যাকে বলে 'কনসেপ্ট'। মোট সাতটা কনসেপ্ট ছেঁড়া হয়েছে। তৈরি করতে পরিশ্রম হয়েছিল। হওয়ারই কথা। মুম্বাইয়ের খুব বড়ো পার্টির অর্ডার। পার্টি বাইরের হলেও কাজটা হবে কলকাতায়। বাইপাসের ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকটা জমি নিয়ে বসে আছে ওরা। আইডিয়া খুঁজছে। এত বড়ো পার্টির অর্ডার পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল সন্দীপ! অনেক টাকা। কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা হল, চাকরি জীবনের শুরুতে ঠিক এ-রকমই একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছিল সে। মালিক ডেকে বলেছিল—'একটা বাজার বানাব। মার্কেট। তুমি এমনও জিনিস ভাব যা আগে কখনো হয়নি।' এরাও তাই বলেছে। সেই শপিংমল! মুম্বাইয়ের পার্টি মেল করে জানিয়েছে—'এমন শপিংমল, মার্কেট প্লেসের ডিজাইন করুন, যা কলকাতা, বাংলার মানুষের মন প্রাণের ভেতরে আছে।'

কথা খুবই জটিল। প্রায় ধাঁধার মতো। 'মন প্রাণের ভেতরে আছে' কথাটার অর্থ কী? ব্যবসায় 'বুঝতে পারিনি' বলেও কোনো কথা হয় না। 'আইডিয়া' বিক্রি ব্যবসায় তো আরও হয় না। পনেরো দিন ধরে যে কনসেপ্টগুলো তৈরি করে সন্দীপ সেগুলোতে বাংলার মানুষের 'মন প্রাণ' খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল—

কনসেপ্ট এক : শপিংমলে সারাদিন বাজবে বাউল গান আর ফোক।

কনসেপ্ট দুই : শাড়ি আর ধুতি পাঞ্জাবির বিরাট আয়োজন থাকবে। তাঁত থেকে তসর। ব্র্যান্ড থেকে বুটিক।

কনসেপ্ট তিন : শপিংমলে মিলবে শুধু বাঙালি খাবার। শুক্তো টু ইলিশ মাছের পাতুরি। ডেজার্টে দই-রসগোল্লা, ছানার পায়েস। পান-জর্দার দোকানের নাম হবে—'যা চান তাই পান'।

কনসেপ্ট চার : থিম হবে বাঙালির আড্ডা। নানান ধরনের আড্ডার ব্যবস্থা থাকবে মলে। লিফ্‌ট দিয়ে উঠলে কফি হাউস। ভিড় না-থাকলেও স্পিকারে চাপা

গুঞ্জন শোনা যাবে অবিরত। সেই গুঞ্জন কলেজস্ট্রিট কফিহাউস থেকে টেপ করে আনা হবে। হাতিবাগান, বাগবাজারের স্টাইলে বানানো হবে লাল রঙের রোয়াক।

কনসেপ্ট পাঁচ : থার্ড বা ফোর্থ ফ্লোরে বিক্রিবাটা হবে না। হবে মিউজিয়াম। বিষয় বাংলা এবং বাঙালি। বাংলার নবাব বাদশা থেকে নবজাগরণ। মণীষীদের ছবি, মডেল, জীবনী। লাইট অ্যান্ড সাউন্ডে ঝটপট ঝটপট আওয়াজ তুলে বাঙালি বাবু পায়রা ওড়াবেন। ঘুঙুর বাজিয়ে নাচবে বাইজি।

কনসেপ্ট ছয় : মলে ঢুকতেই চমকে দেবে বাংলার নেচারাল বিউটি। দেয়াল জোড়া ফটোতে দীঘা, দার্জিলিং, সুন্দরবন। সাউন্ড বক্স থেকে ভেসে আসবে সমুদ্র গর্জন, রয়েলবেঙ্গলের হালুম।

কনসেপ্ট সাত : এই শপিংমল হবে রবীন্দ্রনাথের। তিনি থাকবেন সর্বত্র। একটা ফ্লোরে থাকবে তাঁর লেখা, তাঁকে নিয়ে লেখা যাবতীয় বইয়ের সম্ভার। একটা ফ্লোর হবে শুধু তাঁর গানের। কোথাও বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার খুলে বসবে রবীন্দ্রযুগের সাজপোশাকের দোকান। সেখানে সিল্ক আর খদ্দরের জোব্বা মিলবে, মিলবে কাদম্বরী দেবী, মৃণালিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীদের স্টাইলের শাড়ি, ব্লাউজ, গাউন, লেস দেওয়া জ্যাকেট। বিক্রি হবে সেই আমলের নকশা করা গয়নাগাটি। মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা হবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি নিয়ে।

সাত নম্বর কনসেপ্ট ছেঁড়ার সময় সামান্য হাত কেঁপেছিল সন্দীপের। মায়া হয়েছিল। যতই হোক রবীন্দ্রনাথ বলে কথা। তবু মুখ হাসিহাসি করে নিজেকে শান্ত করে সন্দীপ। তার বিশ্বাস আট নম্বর ভাবনা এলেই সে ক্লিক করবে। ঠিক আগেরবারের মতো।

ভাবনা এল না, ঘরে এল মণিদীপা। সে কখনো এত সকালে স্নান করে না। আজ করেছে। কোথাও বেরোবে নাকি? ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল মণিদীপা। অবাক হয়ে তাকাল ছড়ানো কাগজের টুকরোগুলোর দিকে। সন্দীপ বোকার মতো হেসে বলল, 'সরি।'

মণিদীপা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কীসের সরি!'

'কনসেপ্ট পছন্দ হয়নি না। তৈরি করে ছুঁড়ে ফেলেছি। তবে চিন্তা নেই, এবার যেটা আসবে দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট অ্যান্ড ফাইনাল।'

অন্য কোনো স্ত্রী হলে ঘরের এই অবস্থা দেখে ভয়ংকর রেগে যেত। মণিদীপা রাগল না। সে বিয়ের আগে সন্দীপের পাগলামি যেমন পছন্দ করত, এখনো করে। এই কারণেই মেয়েটা এত চমৎকার। সে হাতের তোয়ালে দিয়ে চুলের জলকণা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'কী করে বুঝলে ফাইনাল হবে?'

সন্দীপ মুখের হাসিভাব বাড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, 'ফ্রম অতীত মণি। চার বছর আগে মেঘ-বৃষ্টি নামে একটা শপিংমলের প্ল্যান করেছিলাম তোমার মনে আছে? তখনো সাত সাতটা প্ল্যান ছিঁড়ে ফেলি। এই কারণেই কম্পিউটারে ফাইল না-মুছে প্রিন্ট বের করে নিয়েছি। ছিঁড়তে যাতে অসুবিধে না হয়।'

মণিদীপা হেসে ফেলল। বলল, 'পার বটে। তা আট নম্বরটি তোমার মগজে আসবে কবে? আটদিন পরে?'

সন্দীপ তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। হাত ছুঁড়ে বলল, 'খেপেছ? আজ বেলা তিনটের সময় পার্টি আসবে অফিসে। আমার প্রেজেনটেশন দেখবে। তারপর ইয়েস-নো কিছু একটা জানিয়ে ছুটবে ফিরে যাওয়ার ফ্লাইট ধরতে। কঠিন সমস্যায় পড়েছি মণি। ক্যান ইউ হেল্প মি?'

মণিদীপা অবাক হয়ে বলল, 'আমি! আমি তোমাকে কী সাহায্য করব?'

'পাশে থেকে। বিপদের সময় স্ত্রী পাশে থাকলে মনে জোর বাড়ে। স্ত্রী সুন্দর হলে জোর বেশি বাড়ে।'

সন্দীপ এগিয়ে গিয়ে মণিদীপার হাত ধরল। মণিদীপা হাত সরিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, 'সরি ডার্লিং, ভেরি সরি। আজ আমি তোমার পাশে থাকতে পারব না। কারণ আজ আমি আউটিং-এ যাচ্ছি। আমার কলেজের বন্ধু মিমি লন্ডন থেকে এসেছে। ওর সঙ্গে বেরোচ্ছি।'

'শপিং-এ যাচ্ছ?' সন্দীপ বিরক্ত গলায় বলে।

মণিদীপা স্বামীর থুতনিতে হাত দিয়ে বলল, 'সারাদিন শপিংমল, শপিংমল করে শপিং ছাড়া কিছু বুঝতে পারছ না। আমরা যাচ্ছি একটা গ্রামে। হুগলি বর্ধমানের বর্ডারে। কী যেন নাম গ্রামটার...কী যেন নাম...।'

'গ্রামে! কেন গ্রামে কেন? এখন তো পুজো নয় যে গ্রামের পুজো দেখবে! নাকি তোমার ওই বন্ধুর দেশের বাড়ি?'

মণিদীপা বলল, 'ওসব কিছু নয়। মিমির ছেলে-মেয়ে কোনোদিন এখানকার গ্রাম দেখেনি, মিমি সেই কারণে গ্রাম দেখার প্রোগ্রাম করেছে। আমি গাইড। ছেলে-মেয়েদুটো দারুণ একসাইটেড শুনলাম। আমরা সারাদিন গ্রামে কাটাব। বিকেলে কাছাকাছি একটা হাট দেখতে যাব। মিমি বলেছে বেতের ঝুড়ি কিনবে। বোঝ কাণ্ড। প্লেনে ওকে বেতের ঝুড়ি তুলতে দেবে? যাই হোক, আমার ফিরতে রাত হবে। টা টা। আর হ্যাঁ শোন, তোমার নাম্বার এইট আইডিয়া মাথায় এসে গেলে কাজের মাসিকে দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করে দিয়ো।'

কথা শেষ করে মণিদীপা এগিয়ে এসে মুখ তুলে স্বামীর বাঁ-গালে শব্দ করে একটা চুমু খায় তারপর একগাল হেসে বলে, 'ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। গ্রামটার নাম রাঙাপথ। বেস্ট অব লাক।'

মণিদীপা চলে যাওয়ার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আট নম্বর আইডিয়া মাথায় চলে আসে সন্দীপের। দ্রুত হাতে ল্যাপটপ চালু করে সে। টাইপ করে লিখতে থাকে—

'শপিংমলের গোটাটাই তৈরি হবে একটা গ্রামের আদলে। ছড়ানো ছিটোনো কুঁড়েঘর, পুকুরঘাট, গোরুর গাড়ি, লাঙল, ঢেঁকি, তুলসি মঞ্চ, বড়ো দিঘি—সব থাকবে। কুঁড়েঘরগুলো হবে দোকান। বাঁধানো পুকুরঘাটে বিশ্রাম। ছিপ ফেলে মাছ ধরার আয়োজন থাকবে। কাশ্মীরের ডাল লেকে যেমন ফুল ফলের দোকান জলে

ভেসে বেড়ায়, এখানেও তাই হবে। বোট শপিং। সিনথেসাইজার, গিটার, একতারা, ডুগডুগি নিয়ে বাউল গানের আখড়া বসবে গ্রামের একপাশে। আধুনিক অডিটোরিয়াম হবে এমন কায়দায় যে মনে হবে খোলা মাঠে 'বায়োস্কোপ' দেখানো হচ্ছে। সপ্তাহে একদিন হাট বসবে এই গ্রামে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ওরিজিনাল হাটের ডিজাইন এনে বানাতে হবে। একেক সপ্তাহে একেক গ্রামের হাট। সেখানে মাটির হাঁড়ি থেকে গরম জিলিপি, বেতের ঝুড়ি বিক্রি হবে ফ্যান্সি দামে। সব কিছুর জন্য নামি দামি স্পনসর জোগাড় করতে হবে। বিদেশী কোম্পানি ডাকতে পারলে সবথেকে ভালো। এতে শপিংমল কেতাদুরস্ত এবং ঝাঁ চকচকে থাকবে। যেমন কুঁড়েঘরগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে জাপানের কোনো গাড়ি কোম্পানি, তুলসি মঞ্চ দেখবে সুইডেনের ঘড়িওলারা, গোরুর গাড়ি টিপটপ রাখবে মার্কিনি জিনস, পুকুর ঘাটের দায়িত্ব পাবে ফরাসি পারফিউম, বাউল মঞ্চ...এই শপিংমলের নাম হবে রাঙাপথ।'

এক শনিবার

এক শনিবার সন্ধেবেলা ঘটনাটা ঘটল। জনার্দনবাবু স্ত্রীকে ডেকে বললেন...।

জনার্দন সামন্ত এখন আর মর্নিংওয়াক করেন না। এক বছর আগেও জনার্দনবাবু মর্নিংওয়াক করতেন। পাক্কা দু-কিলোমিটার ঘাম ঝরিয়ে হাঁটতেন। তারপর বাজার সেরে, মোড়ের চায়ের দোকান থেকে মাঝারি সাইজের মাটির ভাঁড়ে চা খেয়ে বাড়ি ফেরা। দুধ এবং চিনি জনার্দনবাবুর জন্য নিষিদ্ধ। ভাঁড়-চায়ে তিনি দুটোই খেতেন। খাওয়ার সময় মনকে বোঝাতেন, মাটি অতি উপকারী বস্তু। যাবতীয় বিষ সে শুষে নিতে জানে। তাঁর বেলাতেও নেবে। দুধজনিত 'অ্যাসিড' এবং চিনিজনিত 'সুগার'-এর বিষ তাঁর গায়ে লাগতে দেবে না। মাটির ভালো নাম মৃত্তিকা না হয়ে হওয়া উচিত ছিল নীলকণ্ঠ।

জনার্দনবাবু মর্নিংওয়াক বন্ধ করলেও হাঁটা বন্ধ করেননি। মর্নিংওয়াকের বদলে তিনি এখন করেন ইভনিং-ওয়াক। সান্ধ্যভ্রমণ। ঠিক বিকেল আর সন্ধের মাঝামাঝি সময় পাড়ার পার্কে চক্কর দেন। গুনে গুনে ছাব্বিশ চক্কর। বছরখানেক আগে তিনি কোনো এক বিদেশি পত্রিকায় পড়েছিলেন, পঁয়ষট্টি বছর বয়স হয়ে গেলে, মানুষের শরীরে যে আলো বাতাসের প্রয়োজন সেটা একমাত্র পাওয়া সম্ভব আলো আর আঁধারের সন্ধিক্ষণে। এই সময় বাতাসের ওজন এবং আলোর ইনফ্রা রে হিসেব করলে নাকি এমন একটা অনুপাত পাওয়া যায় যা মানবদেহের বহু রোগ নিরাময়ের উপযোগী। এরপরেই 'সন্ধিক্ষণ' খোঁজেন জনার্দনবাবু। 'সন্ধিক্ষণ' পাওয়া যায় দুটো হাফে। ফার্স্ট হাফ কাকভোরে। যখন রাত ফুরিয়ে দিন শুরু হচ্ছে। সেকেন্ড হাফ সন্ধে নাগাদ। ফার্স্ট হাফ নিতে হলে ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়তে হবে। সেটা সম্ভব নয়। তাই সেকেন্ড হাফ বেছেছেন তিনি। জনার্দনবাবু এখন বিকেল সন্ধের মাঝখানে হাঁটেন। এতে নাকি উপকারও পেয়েছেন। ঘুম ভালো হচ্ছে। শকুন্তলাদেবী এ-কথা মানেন না। তিনি ভুরু কুঁচকে স্বামীকে বলেন, 'তুমি

আবার কবে কম ঘুমোলে! বুড়ো হলে মানুষের ঘুম কমে, তোমার তো রিটায়ার করার পর থেকে ঘুম বেড়েছে দেখছি। আগে শুধু রাতে ঘুমোতে, এখন দুপুরেও ঘুমোচ্ছ। কোনো কোনোদিন বেলা পর্যন্ত বিছানায় গড়াচ্ছ।'

জনার্দনবাবু স্ত্রীর অজ্ঞানতায় দুঃখ পান। বলেন, 'আহা শকুন্তলা, ঘুম মানে শুধু চোখ বুজে ঘুম নয়। আরও বেশি কিছু। ঘুমের ভেতরে বিভিন্ন লেয়ার থাকে। যাকে বলে স্তর। এই স্তরের ওপরই ঘুমের ভালো মন্দ, ঠিক বেঠিক নির্ভর করে। একটা স্তর ভালো তো, অন্যটা দুর্বল। একটা ছটফটে তো অন্যটা ঝিম ধরা। হারমোনিয়ামের রিডের মতো। বাঁধায় গোলমাল হলে সুরেও গোলমাল। ঘুমের সা রে গা মা পা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। যে ঘুমোয় সে-ই শুধু জানতে পারে। তাও চেতনে পারে না, অবচেতনে পারে। আমি লক্ষ করে দেখছি, আমার সান্ধ্যভ্রমণের পর ঘুমের সবকটা স্তরই চমৎকার মিলেমিশে থাকে। তুমি যদি চাও আরও ডিটেইলসে ব্যাপারটা বোঝাতে পারি।'

শকুন্তলাদেবী বললেন, 'না চাই না। যতসব হাবিজাবি কথা। তুমি তোমার হারমোনিয়াম ঘুম নিয়ে থাক। কণির ফোন করার সময় হয়ে গেছে। তুমি কি কণিকে কিছু বলবে?'

জনার্দনবাবু হতাশ গলায় বললেন, 'না বলব না।'

কণি, কণিকা। জনার্দনবাবু-শকুন্তলাদেবীর মেয়ে। চমৎকার মেয়ে, ডাক্তার। বস্টনে থাকে, হাসপাতালে চাকরি করে। সেখানেই বিয়ে করেছে। বর আরও চমৎকার। অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত। লেখাপড়ার মানুষ। কলেজে পড়ায়। কলেজে ক্লাস না-থাকলে লাইব্রেরিতে গিয়ে মোটামোটা ইতিহাসের বই খুলে বসে থাকে। বাড়ি ফিরতে ভুলে যায়। কণিকা হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে ডেকে নিয়ে যায়। কণি প্রতিদিন দু-বেলা করে তার বাবা-মাকে টেলিফোন করে। একবার হাসপাতাল যাওয়ার আগে, একবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে। অভিজ্ঞান সপ্তাহে একবার করে শ্বশুর শাশুড়ির কুশল সংবাদ নেয়। প্রতি সপ্তাহে একবার করে শ্বশুর শাশুড়ির কুশল সংবাদ নেওয়া সহজ কথা নয়। বস্টন তো দূরের কথা, বর্ধমানে থাকা জামাইরাও এ-কাজ করে না। শকুন্তলাদেবীর মামাতো দিদির জামাই তো একবার গড়িয়াহাটের মোড়ে শাশুড়িকে চিনতেই পারেনি। ফুটপাথের ভিড়ে নীচু গলায় বলেছিল, 'দিদিমা, একটু সাইড দেবেন প্লিজ।' সেই 'শাশুড়ি' টানা তিনদিন খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। অনেকে বলেছিল, উনি নাকি জামাইয়ের না-চেনার থেকে 'দিদিমা' ডাকায় বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন। 'দিদিমার' বদলে 'দিদি' বা 'ম্যাডাম' বললে এই দুঃখ হত না। শুধু মেয়ে নয়, জনার্দনবাবুর দুই ছেলে আর তাদের বউয়েরাও খুব ভালো। এমন নয় যে তারা কলকাতায় থাকে, তারাও বাইরে থাকে। বড়ো ছেলে অতীশ, ছোটো ছেলে দীপঙ্কর। অতীশ থাকে জলন্ধর। দীপঙ্কর বহরমপুর। অতীশ ব্যাবসা করে। দীপঙ্কর দেড়খানা কাজ করে। ফুল টাইম রাজনীতি, হাফ টাইম নাটক। অতীশের বিরাট রোজগার। তিনতলা বাড়ি। দু-দুটো গাড়ি।

দীপঙ্করের রোজগার সামান্য। দুটো দল থেকেই অল্প মাসোহারা পায়। রাজনৈতিক দল এবং নাটকের দল। দীপঙ্কর আর পাঁচটা রাজনীতির লোকের মতো নয়। সে সৎ। তার স্ত্রী সৃজনী শিল্পকলা জগতের মেয়ে। বাবা প্রেমাংশু শান্তিনিকেতন কলাভবনের শিক্ষক ছিলেন। সৃজনীর ভারি সুন্দর গানের গলা। সে বহরমপুর স্কুলের বাংলার শিক্ষক। নিজের একটা গানের স্কুল আছে। মিষ্টি স্বভাবের জন্য তাকে স্কুলের মেয়েরা আড়ালে 'আঙুর দিদি' বলে ডাকে।

প্রথম ছেলে হওয়ার পর জনার্দনবাবু চেয়েছিলেন তার নাম হোক অতীশ দীপঙ্কর। শকুন্তলাদেবী রাজি হলেন না। তিনি হাসপাতালের বেডে শুয়েই আপত্তি জানালেন।

'এ আবার কেমন নাম?'

'কেমন নাম মানে, মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্করের নাম শোননি?'

'তোমার ছেলে যে মহাজ্ঞানী হবে বুঝলে কী করে?'

জনার্দনবাবু উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'নাম কি আর আগাম বুঝে হয়? তা ছাড়া নামের চাপেও অনেক সময় অনেক কিছু হয়েও যায়। আমার এক বন্ধুর নাম ছিল...।'

শকুন্তলাদেবী মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'থাম, অত বড়ো নাম চলবে না।'

বাধ্য হয়ে শুধু অতীশে জনার্দনবাবুকে থামতে হল। তবে ইচ্ছে পূর্ণ হল পরের ছেলেকে দিয়ে। ছোটো ছেলের নাম রাখলেন দীপঙ্কর। তিনি যখনই কথা বলেন, 'অতীশ দীপঙ্কর' একসঙ্গে বলতে পছন্দ করেন। তবে শকুন্তলাদেবীর কথা সত্যি হয়েছে। বড়োছেলে মহাজ্ঞানী হয়নি। বরং মহামূর্খই হয়েছে বলা যায়। কোনোরকমে স্কুল শেষ করেছে। হায়ার সেকেন্ডারিতে সেকেন্ড ডিভিশন। তাও নীচের দিকে। কলেজে ভরতি হয়েও পুরো টানতে পারেনি। মাঝখানে পড়াশোনা থামিয়ে ব্যাবসা। ইট বালি সাপ্লাই দিয়ে শুরু। এ-শহর থেকে সে শহর করে শেষ পর্যন্ত বাংলা ছেড়ে পাড়ি দেয় বাইরে। এখন জলন্ধরে। পরিশ্রম করে নিজে নাটবল্টুর কারখানা দিয়েছে। কারখানার নাম 'টাইট'। কয়েকবছরে 'টাইট' হইচই কাণ্ড করে ফেলল। ব্যাবসা বিরাট। সরকারি অর্ডারে হাবুডুবু অবস্থা। লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা হলেও অতীশ ছেলে অতি ভালো। তার পাঞ্জাবি বউ নীতিকাও ভালো। কতবার যে সে শ্বশুরশাশুড়িকে জলন্ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছে তার শেষ নেই। অতীশ বলেছে, 'বাবা, তুমি তো রিটায়ার করেছ, এবার আমার বিজনেসে এসে বসো। আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হই।'

জনার্দনবাবু সিটিয়ে যান। বলেন, 'না, বাপু এই বুড়ো বয়সে আর নতুন করে ব্যাবসা শিখতে পারব না।'

'তোমার কোনো চিন্তা নেই। আমি সব শিখিয়ে দেব। তোমার তো আমার মতো কাউডাং মাথা নয় বাবা, তোমার মাথা হল কাউমিল্ক মাথা। তিনদিনে সব জেনে যাবে।'

জনার্দনবাবু গাঢ় গলায় বলেন, 'বাজে কথা বলো না। গাদাখানেক কলেজ

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি থাকলেই মাথা ভালো হয় না। যার যে দিকে ন্যাক সেখানে কিছু করতে পারল কি না সেটাই আসল। তোর ন্যাক ব্যাবসায়। তুই তাতেই করেছিস। তোর ন্যাক যদি লেখাপড়ায় হত তাহলে হয়তো তুই চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হতিস। আজ তুই একজন শিল্পপতি। কার থেকে কম?'

'কী যে বল বাবা! তোমার আবার বেশি বেশি। শিল্পপতি কীসের? বানাই তো নাটবল্টু।'

জনার্দনবাবু স্নেহের হাসি হাসেন। বলেন, 'নাটবল্টু কি আর যা-তা জিনিস রে বাপু? নাটবল্টু ছাড়া কোন জিনিসটা চলে? মানুষেরও নাটবল্টু লাগে। ব্রেইনে যদি নাটবল্টু ঢিলে হয়ে যায় তাহলে কী অবস্থা হয়? হা হা।'

নীতিকাও শকুন্তলাদেবীকে পাঞ্জাবে ডাকে। ভাঙা বাংলায় বলে, 'বাড়ি টাড়ি বেচে চোলে আসুন মাইজি। এখানে ভাংড়া শিখবেন।'

শকুন্তলাদেবী হাসতে হাসতে বলেন, 'এই বুড়ো বয়েসে আর ভাংড়া শিখে কাজ নেই।'

অতীশ বাবা-মায়ের জন্য গাড়ি কিনে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছে। জনার্দনবাবু খুশি হয়েছেন, শকুন্তলাদেবী রাজি হননি।

'এই বয়েসে গাড়ি দিয়ে কী হবে? আমরা যাই কোথায়?'

অতীশ বললে, 'কোথাও যেতে হবে না মা। গ্যারেজে রেখে দেবে। মাঝে মধ্যে গঙ্গার ধারে বাবাকে নিয়ে যাবে।'

'খেপেছিস? বাড়িতেই তোর বাবাকে সহ্য হয় না, তার ওপর আবার গঙ্গার ধার!'

'গঙ্গার ধারে সহ্য হবে মা। তুমি একবার ট্রাই করে দেখ। আমি একটা সুইফট বুক করে দিচ্ছি।'

'লক্ষ্মী সোনা আমার, সুইফট্, লেট কিছু বুক করতে হবে না।'

দীপঙ্করের দাদার মতো বাবা-মাকে গাড়ি কিনে দেওয়ার ক্ষমতা নেই, কিন্তু সুযোগ পেলেই বহরমপুর থেকে ছানাবড়া পাঠায়। সৃজনীর শান্তিনিকেতন ব্যাকগ্রাউন্ড থাকার কারণে ফোনের বদলে হাতে লিখে শ্বশুর-শাশুড়িকে চিঠি পাঠায়। সুন্দর চিঠি। মাথায় নিজের হাতে একটুখানি কলকা এঁকে দেয়। শকুন্তলা দেবী শিল্পী পুত্রবধূর এইসব চিঠি অতি যত্নে রেখে দেন। প্রতিবেশীকে গর্ব করে দেখান। তার লেখা শেষ চিঠিটা এ-রকম—

মা, কেমন আছ? বাবার সঙ্গে রোজ ঝগড়া হচ্ছে? হলে বুঝবে সব ঠিক আছে। নইলে সমস্যা। দীপঙ্কর খুব ঝামেলায় পড়েছে। ওকে কাউন্সিলর ইলেকশনে দাঁড়াতে বলছে। ও তো কিছুতেই রাজি নয়। বলছে, জিতলেই সর্বনাশ। খারাপ হয়ে যেতে হবে। এদিকে দলের কথা শুনতেই হবে। আমি বলেছি, এক কাজ কর, তুমি ইলেকশনে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে করে হারো। দলের কথা শোনা হল, আবার খারাপও হতে হল না। আইডিয়া কেমন? বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে জানাবে। টুংরি খুব ঠাকুমা

ঠাকুমা করছে। স্কুল খোলা না-থাকলে সল্টলেকে নিয়ে যেতাম। চার বছরের মেয়ে কিছু বুঝতে চায় না। তোমরা এসো না। দু-দিন থেকে যাও। নাকি তোমার আর বাবারও স্কুল খোলা? দুজনেই ভালো থাকবে। রোজ ঝগড়া করবে। নিয়ম করে প্রেশার, সুগার মাপাবে। আমার, দীপঙ্করের প্রণাম নেবে, তবে আমাকে বেশি আশীর্বাদ করবে। পরের বাড়ির মেয়ে বলে কথা।

পুঃ১ একটা গোপন খবর দিতে ভুলে গেছি। বস্টন থেকে দিদি এবং জলন্ধরে বসে বড়দা একটা ভয়ংকর প্ল্যান করছে। কাউকে বলতে চাইছে না। সামনের গ্রীষ্মে ওরা আমাদের সবাইকে আমেরিকা নিয়ে যেতে চায়। ওরাই ভাগাভাগি করে প্লেনের টিকিট কাটবে। কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাপার। আমি বলেছি, তোমরা শুধু বাবা-মাকে নিয়ে যাও। আমাদের তিনজন বাদ। দিদি শুনছে না। মা, যে করেই হোক তোমাকে এটা আটকাতে হবে। দীপঙ্কর কিছুতেই এত টাকা খরচ করতে দেবে না। ওকে তো তুমি চেনো। তবে একটা ভালো খবর, খুব শিগ্‌গিরই, অভিজ্ঞানদা কলেজের হিস্টরিকাল ট্যুর নিয়ে আমেরিকা থেকে উড়ে আসছে। দীপঙ্কর ওকে গোটা মুর্শিদাবাদ ঘুরিয়ে দেখাবে। টুংরি পিসেমশাইকে দেখবে বলে এখন থেকেই লাফাচ্ছে। তার ধারণা, যারা ইতিহাস নিয়ে লেখাপড়া করে তারা বাবর, আকবরের, শেরশাহের আত্মীয় হয়। তখন তোমাদের সবাইকে আসতে হবে। দাদাদেরও। বিনিপয়সার গাইড কিছুতেই ছাড়া যাবে না।

পুঃ২ মা, এই শ্রাবণ-বেলা বাদল ঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা গানটার স্বরলিপি কি তোমার জানা আছে? আমি কোথাও পাচ্ছি না।

ইতি সৃজনী।

চোখের জল দু-প্রকার। সুখের এবং দুঃখের। পুত্রবধূর চিঠি পড়ে শকুন্তলা-দেবীর চোখে যে-জল এল সেটা সুখের। তিনি গানের খুব বেশি কিছু জানেন না। সেই কোনকালে কলেজে পড়ার সময় শিখেছিলেন। এখন ভুলেই গেছেন। চর্চাও বন্ধ অনেককাল। অথচ সৃজনী স্বরলিপি জানতে চেয়ে কীভাবেই না তাঁকে সম্মান দিল। সম্মান না ভালোবাসা? শকুন্তলাদেবী চোখের জল লুকিয়ে ড্রয়িংরুমে গেলেন। জনার্দনবাবুর পাশে বসে চিঠিটা এগিয়ে বললেন, 'নাও।'

'কী এটা?'

'দেখতে পাচ্ছ না?'

'চিঠি মনে হচ্ছে।'

'মনে হওয়ার কী আছে। দেখাই তো যাচ্ছে।' বিরক্ত হলেন শকুন্তলাদেবী।

'কার চিঠি?'

'খুলে দেখই না।'

মানুষের বোধ হয় এটাই স্বভাব, চিঠি পাওয়ার জন্য সবসময় ব্যস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু চিঠি হাতে পেয়ে গেলে সহজে পড়তে চায় না। চিঠি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন জনার্দনবাবু। তারপর পড়লেন। একবার পড়লেন, দু-বার পড়লেন।

আশ্চর্যের কথা, স্ত্রীর মতো তাঁর চোখেও জল এল। সুখের জল। তিনিও চোখের জল লুকোলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে নিজেকে সামলে বললেন, 'মেয়েটার হাতের লেখা বড়ো সুন্দর। তাই না?' যেন এটাই আসল, চিঠির কথাগুলো নয়।

এর কিছুদিন পরেই এক শনিবার ঘটনাটা ঘটল।

সান্ধ্যভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরলেন জনার্দনবাবু। জনার্দনবাবু সাধারণত ছ-টা কুড়ি বাইশের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসেন। গরমকালে একটু দেরি হয়। সেদিন ফিরলেন ছ-টা পনেরো মিনিটে। নিজের ঘরে এসে হাত মুখ ধুয়ে পোশাক বদলালেন। তারপর খাটে বসে শকুন্তলাদেবীকে ডাকলেন।

'কী হয়েছে? চা খাবে তো?'

'না, কিছু খাব না। তুমি সবাইকে খবর দাও।'

চমকে উঠলেন শকুন্তলাদেবী। মানুষটা বলে কী! সবাইকে খবর দিতে চায় কেন। তিনি কয়েক পা এগিয়ে আসেন খাটের দিকে। জনার্দনবাবু বসে আছেন পা ঝুলিয়ে। পায়জামা পরা পা দুটো একটু একটু নড়ছেও। গলায় উদ্‌বেগ এনে শকুন্তলাদেবী বললেন, 'সবাইকে খবর দেব! খবর দেব মানে?'

জনার্দনবাবু স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'মনে হচ্ছে মারা যাব। তুমি ছেলে-মেয়েদের খবর দাও।'

শকুন্তলাদেবীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি স্বামীর বুকে হাত রাখলেন। বললেন, 'সে কী গো! এসব কী অলক্ষুণে কথা বলছ? মারা যাবে কেন? বুকে ব্যথা করছে?'

'না।' সহজভাবে বললেন জনার্দনবাবু।

'তাহলে? পেটে, মাথায়?'

'না, কোথাও কিছু হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে মারা যাব।'

শকুন্তলাদেবীর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসার জোগাড়। তিনি স্বামীর কপালে, গলায় হাত দিলেন। না, জ্বর টর তো কিছু নেই। ধরে শুইয়ে দিতে চাইলেন। জনার্দনবাবু অবাক গলায় বললেন, 'শোয়াতে চাইছ কেন? আমার তো শরীর খারাপ হয়নি!'

'না হলে না হয়েছে, তুমি আগে তো শোও।' এবার কাঁধ ধরে চাপ দিলেন শকুন্তলাদেবী।

জনার্দনবাবু বললেন, 'মারা যাব বলে এখনই শুতে হবে নাকি? আগে থেকে কাজ এগিয়ে রাখতে চাইছ?'

'চুপ, একদম বাজে কথা বলবে না। আমি ডাক্তার সেনকে ডাকছি।'

জনার্দনবাবু এবার পা দুটো খাটের ওপর তুলে বাবু হয়ে বসলেন। এটা তাঁর সবথেকে পছন্দের বসার ভঙ্গি। বললেন, 'ডাকতে পারো। কিছু লাভ হবে না। যা ঘটবার তা তো ঘটবেই। তুমি ছেলে-মেয়েদের আসতে বল। কণি কত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে? ওকে নিয়েই সমস্যা হবে। প্লেনের টিকিট পাবে? মনে হয় পেয়ে

যাবে। ওখানে নানারকম ব্যবস্থা আছে। দেশে বাবা মরছে শুনলে ওরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একটা কিছু করে দেবে। নিজেরা নিজেদের বাপ-মা, ভাইবোনকে তো চেনে না, তাই অন্যদের জন্যে করে। অতীশকে বল আজ রাতেই রওনা দিতে। জলন্ধর থেকে প্লেনের টিকিট পেতে অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া ওর টাকাপয়সা আছে। আমাদের দেশে টাকাপয়সা থাকলে সব হয়। নীতিকা যেন আসে। দীপঙ্কর এখনই গাড়ি-টাড়ি একটা ভাড়া করে নিক।' কথা থামিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন জনার্দনবাবু। বললেন, 'বারোটা-একটার মধ্যে পৌঁছে যাবে। সৃজনী, টুংরিকে নিয়ে এত রাতে রওনা হতে বলতাম না, কিন্তু হাতে সময় বেশি আছে বলে মনে হচ্ছে না শকুন্তলা।'

শকুন্তলাদেবী এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বললেন, 'তুমি থামবে? থামবে তুমি?'

জনার্দনবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন, 'এই দেখ, তুমি কান্নাকাটি শুরু করলে কেন? কান্নার তো অনেক সময় পাবে। তুমি দেখছি, সত্যি সব কাজ আগে গুছিয়ে রাখতে চাইছ।'

স্বামীর হাসি দেখে স্বস্তি পেলেন শকুন্তলাদেবী। যে মানুষ এক্ষুনি 'মারা যাবে' সে কখনো পা নাড়িয়ে নাড়িয়ে হাসতে পারে?

'চুপ কর।'

'ঠিক আছে, চুপ করছি। তুমি গিয়ে ছেলে-মেয়েদের টেলিফোন কর। না-পারলে তোমার মোবাইলটা আমাকে দাও। আমিই বলছি, তোরা এবার বাড়ি আয়, তোদের বাবা মরছে।'

কথা শেষ করে আওয়াজ করে, হেসে উঠলেন জনার্দনবাবু।

'আর এক মিনিটও এ-ঘরে থাকব না। যত সব ঠাট্টা তামাশা!'

রাগ দেখিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন শকুন্তলাদেবী। ঠিকই করলেন, রসিকতারও একটা সীমা থাকে। জনার্দনবাবুর উদ্ভট কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্য তিনি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন, তার মানে এই দীর্ঘ সময় নার্ভাস হয়ে থাকবেন। তিনি শক্ত মনের মানুষ। এতদিন সংসার করছেন। ছেলে-মেয়ে কেউ হাতের কাছে থাকে না। সবই তো একা একা সামলান। তিনি ছেলে-মেয়েকে ফোন না-করে ডাক্তার সেনকে কল দিলেন। বহুদিনের পরিচিত।

'কী হল আবার?'

শকুন্তলাদেবী বললেন, 'বুঝতে পারছি না, আপনি একবার আসুন। বলছে মরে যাব।'

'বলেন কী! এক্ষুনি যাচ্ছি।'

ডাক্তার এসে সব দেখেশুনে বললেন, 'এভরিথিং ওকে। প্রেশার, পালস, জিব, গলা সব ঠিক আছে। তবু আপনি আমার গাড়িতে উঠুন। ইসিজি করাব।'

গাঁইগুঁই করেও জনার্দনবাবু গেলেন। ইসিজি রিপোর্ট স্বাভাবিক এল। একটু

স্বাভাবিক নয়, বেশি স্বাভাবিক। রক্তের ফোঁটা নিয়ে মেশিনে সুগার মাপা হল। কোনো গোলযোগ নেই। ডাক্তার সেন একটা হালকা ঘুমের ওষুধ দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'আর যদি মরে যাব মরে যাব বলে আমাকে কল দেন, তাহলে কিন্তু আমিই মরে যাব।'

জনার্দনবাবু বাড়ি ফিরে বললেন, 'তুমি অকারণ দেরি করছ শকুন্তলা। ছেলে-মেয়েদের খবর দাও।'

শকুন্তলাদেবী তাড়াতাড়ি স্বামীকে ঘুমের ওষুধ আর রাতের খাবার খাইয়ে দিলেন। তারপর জনার্দনবাবু ঘুমিয়ে পড়ার পর এক এক করে ছেলে-মেয়েদের ফোন করতে বসলেন। জমিয়ে বসলেন। গায়ে একটা হালকা চাদর দিলেন। চাদর দেওয়ার মতো সময় হয়নি, তবু কেন জানি শকুন্তলাদেবী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় গায়ে চাদর দিতে ভালোবাসেন। মনে হয় বাড়িতে বসে মুখোমুখি কথা বলছেন।

প্রথমে কণিকা। কণিকা বলল, 'মা, তুমি চিন্তা কোরো না।'

'আমি চিন্তা করছি না।'

'বাবার বয়স হয়েছে। বয়স হলে মানুষের মনে এ-রকম একটা ডেথ ফিয়ার আসে।'

'আমারও তো বয়স হয়েছে। কই আমার মনে তো আসছে না!'

'আহা, সবার কেন আসবে, কারো কারো আসে। তুমি এক কাজ কর বাবাকে একটা সিটি স্ক্যান করাও। তারপর সব রিপোর্ট আমাকে মেল করে দাও। ঠিক আছে, তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমি সেনকাকুর সঙ্গে নিজে কথা বলব।'

শকুন্তলাদেবী একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'তুই একবার জামাইকে নিয়ে আসবি নাকি?'

সুদূর বস্টন থেকে কণিকার বিস্মিত গলা ভেসে এল সল্টলেকে।

'কী বলছ মা! আমরা কেন যাব! বাবার তো কিছুই হয়নি! নার্ভ রিল্যাক্সের ওষুধ খেলে কাল পরশুর মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাও...।'

শকুন্তলাদেবীর এই বেয়াড়া আবদারে চমৎকৃত মেয়ে কণিকা—'তাও কী মা? আমি হাসপাতাল থেকে অকারণে ছুটি নেব? বাবার যদি কিছু হত তাহলে না হয় একটা কথা ছিল মা। আর অভিজ্ঞানের কী অবস্থা তুমি জান না। সাতদিন হল "সাইলেন্স অফ সাইলেন্ট এরা" নিয়ে স্নান খাওয়া ভুলে ডুব মেরেছে।'

'সাইলেন্স অফ সাইলেন্ট এরা! সেটা কী?'

কণিকা হেসে বলল, 'ইতিহাসের বই। মেসোপটেমিয়া যুগের রাজনীতি।'

শকুন্তলাদেবী বুঝলেন, আমেরিকা থেকে ওদের আসতে বলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। বরং অতীশদের আসাটা অনেক সহজ হবে। জলন্ধর থেকে ঘন ঘন প্লেন। অতীশ সব শুনে চিন্তিত গলায় বলল, 'কণি কী বলল?'

'কণি বলল কিস্সু হয়নি। বয়স হলে এ-রকম মাঝে মাঝে নাকি হয়। তবু তুই যদি একবার আসিস। বুড়ো মানুষটা দেখতে চাইছে...।'

'ইমপসিবল। এখন কলকাতা যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না মা। সিরিয়াস কিছু হলে আমি যেতাম। এই মুহূর্তে প্রায় এক কোটি টাকার অর্ডার নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। জাহাজের জন্য নাট বল্টু সাপ্লাই। আমি পোর্টব্লেয়ারে যাচ্ছি কালই। তুমি যদি বোঝ নীতিকাকে পাঠাতে পারি। আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়, বাবাকে কাল পরশুর মধ্যে যদি এখানে ফ্লাই করিয়ে আনি। আমার ফার্ম হাউসে কটা দিন থাকবে। পিয়োর ঘি দেওয়া চাপাটি আর নিজের খেতের ডাল খাবে। ফালতু চিন্তা মাথা থেকে পালাবে। আসবে?'

শকুন্তলাদেবী বললেন, 'থাক। ও রাজি হবে না। তুই বরং কাল বাবার সঙ্গে কথা বলে নিস।'

দীপঙ্করের মোবাইল বন্ধ। বাড়িতে সৃজনী ফোন ধরল। সে টুংরিকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। ঘটনা শুনে খিলখিল করে হাসতে শুরু করল। শকুন্তলাদেবী বিরক্ত গলায় বললেন, 'হাসছিস কেন?' শকুন্তলাদেবী তাঁর এই পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের মতোই 'তুই' সম্বোধন করেন।

'হাসব না। তুমি বাবার প্ল্যানটা বুঝতে পারলে না মা? হি হি।'

'প্ল্যান! কী প্ল্যান?'

'বাবা আসলে আমাদের সবাইকে দেখতে চান। তাই মরে যাচ্ছি বলে ভয়ে ঘাবড়ে দিচ্ছেন। যাতে আমরা সবাই ছুটে কলকাতায় চলে যাই। হি হি। তুমি ডাক্তার-টাক্তার ডেকে... হি হি।'

হাসি শুনে শকুন্তলাদেবীর মন খুব হালকা হয়ে গেল। সত্যি তো ব্যাপারটা হাসির। তিনি পুত্রবধূকে ছদ্ম ধমক দিয়ে বললেন, 'অ্যাই চুপ কর। হাসবি না। কাল পরশু তিনজনে মিলে চলে আয় তো। নাতনিটাকে অনেকদিন দেখি না।'

সৃজনী আঁতকে উঠল।

'যাব? খেপেছ নাকি মা? এখন যাব কী করে? তোমার ছেলে নতুন নাটক ধরেছে। মানিকবাবুর গল্প। রিহার্সাল নিয়ে পাগল পাগল হয়ে আছে। এই দেখ না, এত রাতেও বাড়ি ফেরেনি। তা ছাড়া টুংরির পরীক্ষা, আমার গানের ক্লাস আছে না?'

শকুন্তলাদেবী লজ্জা পেলেন। সত্যি তো এত কাজকর্ম ফেলে ওদের আসার জন্য চাপ দেওয়াটা ঠিক নয়। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঠিক আছে, যখন ফাঁকা হবি তখন না হয় এক-দুদিনের জন্য ঘুরে যাস।'

সৃজনী ঝিনঝিনে মিষ্টি গলায় বলল, নিশ্চয় যাব। তবে বাবাকে আগে বলতে হবে, আমি বেঁচে থাকব, আমি বেঁচে থাকব, আমি বেঁচে থাকব। তারপর যাব। হি হি...।'

এবার শকুন্তলাদেবীও হেসে ফেললেন। ফোন রেখে দেওয়ার আগে সৃজনী

বলল, মা, এই শ্রাবণ-বেলা বাদল ঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা গানটার কোনো খবর পেলে?'

এই গল্পের দুটো শেষ। একটা সত্যি শেষ, একটা মিথ্যে শেষ। পাঠকরা সত্যি শেষটা জানেন। তাই সেটা আর আমি বলছি না, আমি বলছি মিথ্যে শেষটা।

ঠিক এক সপ্তাহ পর, এক শনিবার...।

ইভনিংওয়াক সেরে বাড়ি ফিরলেন জনার্দনবাবু। ফিরে চমকে উঠলেন। চমকে ওঠবারই কথা। একমুখ হাসি নিয়ে দরজা খুলল কণিকা! পিসির পিছন থেকে কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চার বছরের টুংরি। নিজেকে ধাতস্থ করতে-না-করতে রান্নাঘর থেকে গন্ধ পেলেন ঘিয়ের। সেখানে পাঞ্জাবি রেসিপিতে হালুয়া বানাচ্ছে নীতিকা। তাই এত ঘিয়ের গন্ধ। জনার্দনবাবু বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। ড্রয়িংরুমে রাজনীতি নিয়ে তুমুল ঝগড়া করছে দুই ভাই। আলাদা আলাদা করলে অতীশ আর দীপঙ্কর। একসঙ্গে অতীশ দীপঙ্কর। জনার্দনবাবু যে বাড়ি ফিরেছেন সে খেয়ালও তাদের নেই! না-থাকুক। বহুবছর পর দুই ছেলের ঝগড়া শুনছেন জনার্দনবাবু। মনে মনে বললেন, আহা! ঝগড়া চলুক। সারারাত ধরে চলুক। অধ্যাপক অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত এত ঝগড়ার মধ্যেও 'সাইলেন্স অফ সাইলেন্ট এরা' বইটা নিয়ে এককোনায় ঘাপটি দিয়ে বসে আছে। সৃজনী ট্রেতে সাজানো চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। শ্বশুরমশাইকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, 'সেকী! বাবা, আপনি এখনো বেঁচে আছেন?'

জনার্দনবাবুর সবটাই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তিনি লুকিয়ে নিজের পায়ে চিমটি কাটলেন।

সুবর্ণরেখা



একটা গল্প শুনবেন? প্রেমের গল্প। 'এক ছিল ছেলে আর এক ছিল মেয়ে' ধরনের বস্তা পচা প্রেম নয়। ইন্টারেস্টিং প্রেম। নিয়ম হল সব ধরনের ইন্টারেস্টিং জিনিসেই কিছু-না-কিছু ঝামেলা থাকে। আমার এই গল্পের ঝামেলার অংশ হল, গল্পটা গোপনীয়। এতই গোপনীয় যে গল্পটা শুধু ইন্টারেস্টিং নেই, সিরিয়াসও হয়ে গেছে। ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে বিরাট অশান্তি হয়ে যেতে পারে। তাই এই ধরনের গল্প শুরুর একটু পরেই বলতে হয়, 'থাক্, আমি অন্য এক প্রেমের গল্প বলছি।

এই গল্পের বেলাতেও আমি বলছি, থাক, আমি অন্য গল্প বলছি।'

সেই অন্য গল্পটা এইরকম—

প্রত্যেক কলেজেই এক-দুজন ছেলে থাকে যাদের বুকে থাকে উথাল পাতাল প্রেম। বই খাতার সঙ্গে সেই প্রেম নিয়ে তারা বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর শুরু হয় প্রেমের ঘনঘটা। কলেজে আসার সময় বাসে প্রেম। কলেজে ঢোকার মুখে গেটে প্রেম। তারপর লবিতে প্রেম। প্রফেসারের লেকচার শুনতে শুনতে ক্লাসে প্রেম। ক্লাস শেষ হয়ে গেলে নোট চালাচালিতে প্রেম। ক্যান্টিনে টেবিল চাপড়ে গান গাইতে গাইতে প্রেম। ইউনিয়নরুমে ঝগড়া করতে করতে প্রেম। গেট মিটিঙে জ্বালাময়ী ভাষণের সঙ্গে প্রেম। পরীক্ষার আগে সাজেশন বদল করতে গিয়ে প্রেম। পরীক্ষায় পাশ করলে আনন্দে প্রেম। ফেল করলে দুঃখে প্রেম। সব মিলিয়ে এরা হয় অফুরন্ত প্রেমের অধিকারী। এদের সব ফুরোয়, কিন্তু প্রেম ফুরোয় না। খুব দ্রুত কলেজে এদের নাম হয়ে যায় 'প্রেম সম্রাট'।

আমাদের কলেজের রাহুল ছিল সেই 'প্রেম সম্রাট'। রাহুলের চেহারা ছিল ফুরফুরে ধরনের। মনটাও ফুরফুরে। ছেলে-মেয়েরা তাকে দেখলে অবাক হয়ে যেত। এত প্রেমের মধ্যে ফুরফুরে ভাব থাকে কী করে! একটাতেই তো সবার নাকানিচোবানি অবস্থা। রাহুলের টেনশন হয় না? এর রহস্য কী?

রহস্য হল, রাহুলের কোনো প্রেমই তিনদিনের বেশি স্থায়ী হত না। সোম থেকে বুধ সে হয়তো হিস্ট্রির মধুমিতার সঙ্গে ঘুরল, ক্যান্টিনে ডিমের ডেভিল ভাগ করে খেল, বৃহস্পতিবারই পাশে পেল বাংলার নবনীতাকে। নবনীতাকে নিয়ে চলে গেল কোনো মারকাটারি সিনেমা দেখতে। দু-দিন কাটতে-না-কাটতে শনিবার তাকে দেখা গেল তিনতলার লবিতে। ইকনমিক্সের সোহিনীকে পাশে নিয়ে গুজগুজ করছে। চোখ-মুখ সিরিয়াস। যেন কেইনসের থিয়োরি নিয়ে গভীর আলোচনা চলছে। বুধবার সেই সোহিনী ভ্যানিশ। তখন তার প্রেমিকা ফিজিক্সের চৈতালি। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রাহুল চলে গেছে কফিহাউস। কফি পকৌড়া নিয়ে তিন ঘণ্টা। আজ আর কেন একজনও হেমন্ত বা মান্নাকে পাওয়া যায় না তাই নিয়ে আক্ষেপ। চৈতালি হয়তো মেরে কেটে দিন চার টিকে গেল। সোমবার এল ঝর্না। ফিলজফির ঝরনা। থার্ড পিরিয়ডের পর পোর্টিকোর একপাশে ঝরনাকে বসিয়ে মুগ্ধ হয়ে নিৎসের দর্শন বুঝতে লাগল রাহুল। আধুনিক জীবনে নিৎসের দর্শন না রিলকের কবিতা কোনটা বেশি প্রয়োজনীয়? ও, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। রাহুল ছিল ইংরাজির ছাত্র।

এখন প্রশ্ন দুটো। এক নম্বর প্রশ্ন, এত মেয়ের সঙ্গে রাহুল প্রেম করার সুযোগ পেত কী করে? মেয়েরা তাকে অ্যালাউ করত কেন? এবং দু-নম্বর প্রশ্ন—এত তাড়াতাড়ি প্রেম কেটে যেতই-বা কী করে! এমন তো নয় যে ঝরনা মধুমিতার কথা জানত না। বা চৈতালি সোহিনীকে দেখেনি রাহুলের সঙ্গে ঘুরতে? তারপরেও তো প্রেম করেছে। তাহলে পালায় কেন? নাকি রাহুলই পালায়?

প্রেম বিষয়টাই অতি দুর্বোধ্য এবং অস্পষ্ট। তার সঙ্গে বিভ্রান্তিকরও বটে। মানবমনে প্রেম কেন আসে? কেনই-বা সে চলে যায়? বহু গবেষণার পরও এ-নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় নি। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে এই বিষয়ে একটা বড়ো কাজ হয়েছিল জাপানের ওকাহামা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গবেষণার বিষয় ছিল, 'প্রেমের গতিপ্রকৃতি'। সাড়ে চার বছরে মোট তেইশটি পেপার জমা পড়ে। তার মধ্যে একটি গবেষণাপত্রে প্রেমকে 'জটিল ব্যাধি' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। বলা হয়, আদিম যুগ থেকে মানুষ এই অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে। কখনো কখনো অসুখ নিজে থেকেই সেরে যায়। তখন মানুষ রোগমুক্ত হয়। কখনো সারে না, অসহায়ভাবে অসুখটিকে বহন করতে হয়। গবেষণাপত্রটিতে প্রস্তাব হিসেবে লেখা হয়েছিল, পরিতাপের বিষয় হল, সভ্যতা এগিয়েছে কিন্তু আজও অসুখটিকে অবহেলা করা হচ্ছে। আধুনিক পৃথিবীতে এটা ঠিক নয়। বিজ্ঞানীদের উচিত রোগ নিরাময়ের নির্দিষ্ট ওষুধ খুঁজে বের করা। সেটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাতে সে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে। এই গবেষণাপত্রটির কথা কীভাবে যেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাঁস হয়ে যায়। তারপরই বিরাট কেলেঙ্কারি হল। ওকাহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রেমিক প্রেমিকারা তীব্র বিক্ষোভ দেখাল। দেশজুড়ে একদিনের জন্য 'প্রেম বয়কট' কর্মসূচি পালিত হল। মিডিয়া শুরু করল হইচই। পত্রপত্রিকায় লেখা হল—মানবজীবনের মধুরতম 'সুখ'টিকে গবেষকরা 'অসুখ' আখ্যা দিয়ে অপমান

করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত এই গবেষণপত্র বাতিল করা। শেষপর্যন্ত তাই হল। একটু বেশিই হল। প্রেমের গতিপ্রকৃতি সংক্রান্ত গোটা প্রকল্পটিই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাতিল বলে বিজ্ঞপ্তি দিলেন।

আসলে প্রেম সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নের উত্তরই সহজ নয়। জাপানেরবেলাতে যেমন এ-কথা সত্য, রাহুলের ব্যাপারেও এ-কথা সত্য। খুব দ্রুত বুঝতে পারলাম প্রেম বেশিদিন টিকবে না জেনেও মেয়েরা রাহুলের প্রেমে পড়ত। কারণ রহস্যময়। মেয়েরা যেমন কবির প্রেমে পড়ে, তেমন খুনির প্রেমেও পড়ে, পড়ে না? তবে রাহুলের মধ্যে প্রেমে ফেলবার গুণ ছিল, কিন্তু সেই প্রেম টিকিয়ে রাখবার গুণ ছিল না। মধুমিতা, চৈতালি, নবনীতা, সোহিনীরা কি প্রেম টিকিয়ে রাখতে চাইত? একেবারেই না। রাহুলও কি চেয়েছে কখনো? মনে হয় না। এই বিষয়ে তিনটি আলাদা আলাদা কথোপকথন উল্লেখ করা যেতে পারে।

মধুমিতা এবং অঞ্জনার কথা।

অঞ্জনা—কীরে মধু, রাহুলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল!

মধুমিতা (মুখ বেঁকিয়ে)—একসঙ্গে ছিলাম কখন যে ছাড়াছাড়ি হবে?

অঞ্জনা—সেকী! এই তো সেদিন ক্যান্টিনে বসে ডেভিল ভাগ করে খেলি: খেলি না?

মধুমিতা—ডেভিল ভাগ করে খাওয়া মানেই প্রেম নাকি! তাহলে তো আমি কলেজে ঢোকার পর থেকে একশো একচল্লিশ জনের সঙ্গে প্রেম করেছি। বেশিও হতে পারে।

অঞ্জনা—আমার ওপর রাগ করছিস কেন মধুমিতা? রাগতেই যদি হয় রাহুলের ওপর রাগ কর।

মধুমিতা—বয়ে গেছে। ওই ছেলে রাগ করারও যোগ্য নয়। বিরাট গাধা একটা। দেখবি ফাইনালে ডাব্বা খাবে। দেখ অঞ্জনা, আমার বাবার ইচ্ছে জামাই হবে ডাক্তার। মা চায় ইঞ্জিনিয়র। এই অবস্থায় আমি যদি এই ফেলটুটাকে বিয়ে করতে চাই তাহলে দুজনেই নির্ঘাত সুইসাইড করবে।

এবার নবনীতা আর সুমনের কথা।

সুমন—হ্যাঁরে নবনীতা, রাহুলের সঙ্গে কোনো গোলমাল হল নাকি?

নবনীতা (কঠিন গলায়)—কেন!

সুমন (সামান্য ঘাবড়ে)—না, সে-রকম কিছু নয়। কদিন আগে তোদের দুজনকে দেখলাম একসঙ্গে সিনেমা যাচ্ছিস, আজ দেখছি কথা বন্ধ, দুজন দুজনকে দেখলে ছিটকে যাচ্ছিস, তাই বলছিলাম...।

নবনীতা (ঠোঁট বেঁকিয়ে)—দুর দুর, ওই ছেলে যে অমন ক্যাবলা না মিশলে বুঝতেই পারতাম না। আমি ভাই সব পারি, ক্যাবলা পুরুষমানুষ সহ্য করতে পারি না।

সুমন—তাই নাকি! ক্যাবলামির কী করল রাহুল?

নবনীতা—কী করেছে? ওকে জিজ্ঞেস কর না। তোদের তো বন্ধু।

সুমন (উৎসাহ ভরে)—প্লিজ বল।

নবনীতা (মুখ ঘুরিয়ে)—না, বলতে পারব না।

সুমন (আরও উৎসাহে)—বল না, আমি কাউকে বলব না।

নবনীতা (চোখ পাকিয়ে)—সত্যি কাউকে বলবি না?

সুমন (মিনতি ভরা গলায়)—বলছি তো।

নবনীতা (গলা নামিয়ে)—সেদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে আমি...।

নবনীতা চুপ করে গেল।

সুমন (ব্যগ্রভাবে)—সিনেমা দেখতে গিয়ে কী হয়েছে?

নবনীতা (থমকে দাঁড়িয়ে, এবং মুচকি হেসে)—একটা চড় খাবি। বলব না। রাহুল ঘেমে নেয়ে একশা। আমি বললাম, থাক তাহলে।

এবার ঝরনা। ঝরনার সঙ্গে কেউ কথা বলেনি। সে নাকি রাহুলকে একটা চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠি দেখেছে সৌম্য। রাহুলই দেখিয়েছে। ব্যথিত মুখে দেখিয়েছে রাহুলই। চিঠিটা এ-রকম—

রাহুল,

আমার স্বপ্ন, একজন সাহসী মানুষের সঙ্গে জীবন কাটাব। তোমার সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছিল, তখন ভেবেছিলাম, তুমি একজন সাহসী মানুষ। কিন্তু সেদিন যা ঘটল তাতে আমার ধারণা চুরমার হয়ে গেল। সেদিন হাতিবাগানের মোড়ে আমার ছোটোকাকাকে দেখে তুমি যে কাণ্ড করলে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। হ্যাঁ এটা ঠিকই যে আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার ছোটোকাকা একজন রাগী মানুষ। একটু রাগী নয়, বেশি রাগী। আমি এও তোমাকে বলেছিলাম যে কোনো ছেলে তার ভাইঝির সঙ্গে মিশুক এটা উনি বরদাস্ত করতে পারেন না। বলেছিলাম, হায়ারসেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর পর পাড়ার একটি ছেলে আমাকে চিঠি দিয়েছিল বলে ছোটোকাকা তার কান মুলে দিয়েছিলেন। ছেলেটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। বলে, আমার কান মুলছেন কেন? চিঠি তো আমার নয়, চিঠি আমার মেজদার। উনি চিঠি লিখে ঝরনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ছোটোকাকা তখন সেই ছেলের আর একটা কান মুলে বলেন, এটা তোমার মেজদার জন্য। এই গল্প বলার জন্য তুমি অমন আচরণ করবে? আমাকে ফেলে... ছি ছি। এই তোমার চরিত্র। ভীরু, কাপুরুষ...।

ঝরনার চিঠিতে 'আচরণ' কী বলা ছিল না। পরে জানা গেল, সেদিন রাহুল আর ঝরনা রিকশ করে যাচ্ছিল। ঝরনার ছোটোকাকাকে দেখে রাহুল রিকশ থেকে ঝাঁপ দেয়।

যাই হোক, এই হল তিন কথোপকথন, না, তিন নয়, দুই। আর একটি চিঠি। সব মিলিয়ে রাহুলের প্রেম ভেঙে যাওয়ার কারণ খানিকটা বোঝা যাচ্ছে। যতই তিনদিন অন্তর নতুন নতুন প্রেমে পড়ুক রাহুল, মেয়েরা অল্পদিনেই টের পায়, এই

ছেলে লেখাপড়ায় লবডঙ্কা। 'গাধা'ই বলা যায়। অন্তত মধুমিতা তো তাই বলেছে। তার সঙ্গে ক্যাবলা এবং ভীতু। ফুরফুরে চেহারা বা মন নিয়ে এইসব মণিমুক্তোর মতো গুণ রাহুল তার প্রেমিকাদের কাছ থেকে লুকোতে পারে না। তারা ছেড়ে পালায়। তবে এখানে একটা সন্দেহ আছে। সত্যি কি রাহুল তার এই গাধা, ক্যাবলা এবং ভীতু স্বভাব লুকিয়ে রাখতে পারে না? নাকি চায় না? সুন্দরী প্রেমিকার জন্য লেখাপড়ায় মন দিতে সমস্যা কোথায়? বিরাট কোনো ভালো রেজাল্ট তো নয়, মাঝারি গোছের একটা পাশ করলেই তো চলে। সিনেমা হলের অন্ধকারে প্রেমিকাকে চুমু না-খাক, হাত চেপে ধরতে তো কোনো অসুবিধে নেই! এখনই বুক ফুলিয়ে প্রেমিকার ছোটোকাকার সামনে গিয়ে না-দাঁড়াক, কানমলার ভয়ে রিকশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়াটাওতো কোনো কাজের কথা নয়। তাই না? তবে কি রাহুল আসলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে চায়? প্রেমটা তার কাছে খেলার মতো? শুধু তার কাছেই-বা কেন বলছি? মধুমিতা, নবনীতা, ঝরনা, সোহিনীরা ইচ্ছে করলে অবশ্যই তাদের ভালোবাসার মানুষকে খানিকটা শিক্ষিত, অনেকটা স্মার্ট, পুরোটা সাহসী করতে পারত। প্রেমের ইতিহাসে এ-রকম উদাহরণ গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যাবে। মেয়ের চাপে পড়ে ছেলে পালটে গেছে। একটু পালটায়নি, একেবারে উলটে গেছে।

সব মিলিয়ে প্রেম সম্রাট রাহুলকে নিয়ে সবাই বিভ্রান্তির মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। বিভ্রান্তিটা খানিকটা মজার, খানিকটা জটিলও। অন্তত কোনোভাবেই সহজ সরল আর পাঁচটা প্রেমের মতো নয়।

এরপরেই একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনা মারাত্মক।

তখন থার্ড ইয়ার। মেয়েটার নাম রাগিণী। শান্তশিষ্ট, গুড গার্ল টাইপের মেয়ে। চেহারাও সে-রকম। সাদামাটা। দুটো বছর কলেজে ছিল, কিন্তু খুব একটা নজর কাড়েনি। কলেজ এমন একটা জায়গা যেখানে সুন্দরীরা একটা স্তর পর্যন্ত স্পেশাল পাত্তা পায়। ছেলেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হওয়ার আগে পর্যন্ত। একেবারে 'বন্ধু' হয়ে গেলে বা 'দল' পাকিয়ে ফেললে কোন মেয়ে ফর্সা, কোন মেয়ে কালো, কার নাক টিকোলো, কে খেঁদা নাকের, কার চোখ টানা টানা, কারটা কুতকুতে কেউ তাকিয়েও দেখে না। মাথাও ঘামায় না। তখন সবাই সমান। সবাই সুন্দর। রাগিণী কোনো দলে ছিল না। নিজের মতো কলেজে আসত, চলে যেত নিজের মতো। হইচইতে যোগ দেয়নি কখনো। ফাংশন-টাংশন থাকলে বসত মাঝের দিকে। উঠে যেত মাঝপথেই। সন্ধে হওয়ার আগেই। হঠাৎ একদিন খবর হল, রাগিণী আর রাহুলকে নাকি একসঙ্গে দেখা গেছে গড়িয়াহাটের মোড়ে। দুজনে ফুচকা খাচ্ছে। রাগিণী জড়োসড়ো, গম্ভীর। রাহুল হাসাহাসি করছে। হাত পা ছুড়ছে। যেন ফুচকা কোনো হাসির খাবার। এই খবরে কেউ চমকাল না। রাহুলের প্রেম তো, ম্যাক্সিমাম তিন দিন। তবে কিনা শেষপর্যন্ত ওই গুড গার্লটাকেও পাকড়াল! তিনদিন নয়। কেটে গেল তিন সপ্তাহ। রাগিণী আর রাহুলকে কখনো দেখা গেল চিড়িয়াখানায়,

কখনো ময়দানে, কখনো ভিক্টোরিয়ায়। একদিন সুব্রত হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, 'গড়িয়াহাটের মোড়ে দুজনে ফুচকা খাচ্ছে।'

অভিজিৎ বলল, 'জানি। রাহুল হাসছে, রাগিণী গম্ভীর। তাই তো?'

সুব্রত বলল, 'না। উলটো।'

অভিজিৎ বলল, 'মানে!'

'রাহুল গম্ভীর, রাগিণী হাসছে।'

অভিজিৎ ভুরু কুঁচকে বলল, 'সে কী!'

সুব্রত চোখ গোলগোল করে বলল, 'তাই। রাগিণীকে দেখে মনে হচ্ছে ফুচকা কোনো হাসির খাবার।'

অভিজিৎ বিড়বিড় করে বলল, 'বলছিস কী! ঘটনা তবে সিরিয়াস দিকে এগোবে?'

হ্যাঁ, সিরিয়াস দিকেই এগোল।

বুধবার সাতসকালে রাহুল গিয়ে হাজির হল কল্যাণের বাড়ি। বাকিটা কল্যাণের মুখ থেকে শোনা যাক—

'রাহুলের চুল উশকোখুশকো। জামাকাপড় এলোমেলো। চোখদুটো লাল। বোঝাই যাচ্ছে, রাতে ঘুম হয়নি। একদিন নয়, বেশ কয়েকদিন। আমি বললাম, কী হয়েছে?

রাহুল বলল, 'কেলেঙ্কারি।'

আমি বললাম, 'কী কেলেঙ্কারি?'

রাহুল বলল, 'আমাকে বাঁচা।'

আমি বললাম, 'কী হয়েছে সেটা তো বলবি।'

রাহুল বলল। রাগিণী তার প্রেমে পাগল। সর্বক্ষণ চোখে হারাচ্ছে। যে মেয়ে দু-দিন আগেও ছেলেদের দিকে তাকাত না, সে এখন রাহুলের থেকে চোখ সরাতে পারে না। রাহুল তাকে অনেক বুঝিয়েছে। বুঝিয়েছে, সে লেখাপড়ায় মোটেও জুতসই নয়। স্মার্টনেস বলতে কিছু নেই। বরং ক্যাবলা। সিনেমা হলের অন্ধকারে...। পারবে না। ঘেমে নেয়ে একশা হবে। সবথেকে বিচ্ছিরি হল, সে একজন ভীতু মানুষ। গার্ল ফ্রেন্ডের কাকা, মামাকে দেখলে রিকশ থেকে লাফ মারে। সম্পর্ক এগোলে রাগিণীকেই জলে পড়তে হবে। নরমাল জল নয়, পড়তে হবে পানাপুকুরে। রাগিণী তাই শুনে ছলছল চোখে বলেছে সে পানাপুকুরেই পড়তে চায় এবং পড়বেও। আর তার কথা নাকি সব সত্য নয়। ইচ্ছে করলেই রাহুল পড়াশোনায় মন দিতে পারে। এখনো হাতে সময় আছে। স্মার্ট ছেলে মানেই মেয়েদের চুমু খাওয়া নয়। আর সাহসের প্রশ্ন? প্রেমিকার মামা, কাকাকে দেখে ভয়ে রিকশ থেকে লাফ মারা নাকি দারুণ রোমান্টিক একটা ব্যাপার। পা ভাঙলে আরও ভালো। প্রেমিককে দেখতে ফল নিয়ে বাড়ি যাওয়া যাবে। ভাঙা পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া যাবে। রাগিণীর মুখে এসব শুনে রাহুলের কান্নাকাটির অবস্থা। সে শেষ

খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। বলে, চরিত্রেও তার গোলমাল আছে। বহু মেয়ের সঙ্গে সে প্রেম করেছে। সেই প্রেমের আয়ু তিন-চার দিন হলেও, প্রেম তো। রাগিণী এ-কথা শুনে ঠোঁট উলটে বলছে, বেচারি। মধুমিতা, নবনীতা, সোহিনী, ঝরনা তোমাকে চিনতে পারেনি। পারলে ওরা নিশ্চয় আমার মতোই তোমাকে ধরে রাখত। ভালোবাসায় বেঁধে ফেলত। পরে পস্তাবে। এটা নতুন কিছু নয়। এ-রকম অনেক হয়েছে। এই পর্যন্ত বলে রাহুল কেঁদে ফেলল।

'কী হবে কল্যাণ? আমাকে যে মেয়েটা ছাড়তেই চাইছে না।'

কল্যাণ বলল, 'ভালোই তো পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা হল।'

রাহুল কল্যাণের হাত ধরে বলল, 'পাকাপাকি! খেপেছিস নাকি। আমি ওসব পারব না। আমার অভ্যেস নেই। ভাই যে করেই হোক আমাকে একটা পালাবার উপায় বলে দে।'

কল্যাণ তাকে বোঝাতে গেল। বলল, 'পালাবার কী আছে? মেয়েটা তোকে এত ভালোবাসে এটা কি কম কথা?'

'না, বেশি কথা। তুই এবার কথা বন্ধ কর। আমাকে রাগিণীর কাছ থেকে পালাবার পথ বলে দে।'

কল্যাণ বলল, 'এক কাজ কর, কলেজে আসা বন্ধ কর।'

রাহুল হতাশ গলায় বলল, 'করেছি। লাভ হয়নি। রাগিণী ফোন করছে।'

'তাহলে ফোন বন্ধ কর।'

রাহুল ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তাও করেছি। রাগিণী বাড়ি পৌঁছে গেছে।'

তাহলে বাড়ি থেকে পালা।

রাহুলের ভুরু কুঁচকে বলল, 'বাড়ি থেকে পালাব কেমন করে?'

কল্যাণ বলল 'মামা, মাসি, কাকা কারো একটা বাড়িতে গিয়ে কদিনের জন্য গা ঢাকা দে। কলকাতার বাইরে হলে সবথেকে ভালো। পরীক্ষার বেশি দেরি নেই। কলেজেও পুজোর ছুটি পড়ে যাচ্ছে। বাড়িতে বলবি, কলকাতায় থাকলেই হাজার অশান্তি। তাই নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করার জন্য কলকাতা ছাড়ছি। আছে কোনো জায়গা? দিন দশ পনেরো লুকিয়ে পড়লেই, রাগিনী বুঝতে পারবে তোর কোনো ইন্টারেস্ট নেই। হয় রাগ করবে, নয় অপমানিত হবে। যাই হোক, তোর সঙ্গ ছেড়ে পালাবে।'

রাহুল ফিসফিস করে বলল, 'আমার কেউ নেই। তুই একটা ব্যবস্থা করে দে না ভাই।'

এই পর্যন্ত বলে কল্যাণ থামল। সবাই বলল, 'তারপর কী হল।'

কল্যাণ হাই তুলে বলল, 'কী আর হবে। রাহুলকে পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের ঘাটশিলার বাড়িতে। বাড়িতে এখন কেউ নেই। চাবি দিয়ে বলেছি, নিশ্চিন্তে গিয়ে থাক।'

সুব্রত বলল, 'ঘাটশিলা!'

'হ্যাঁ ঘাটশিলা। চমৎকার জায়গা। আমাদের বাড়ির পাশেই সুবর্ণরেখা নদী। নদীর পাড়ে বসার জন্য পাথর আছে। প্রেম করার জন্য দুর্দান্ত। আমাদের প্রেম সম্রাট না হয়, প্রেম থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকবে। মন্দ কী?'

অভিজিৎ বলল, 'অবশ্যই মন্দ। তুই এটা ঠিক করলি না। বেচারি রাগিণী।'

ক্লাসের সময় হয়ে গেল। কল্যাণ উঠতে উঠতে মুচকি হেসে বলল, 'বেচারি রাহুলকে বল। লুজার তো ও-ই। অমন চমৎকার একটা মেয়েকে হারাল। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আফটার অল রাহুল আমাদের বন্ধু। বিপদে পড়ে আমাদের কাছে এসেছে।'

গল্প আর সামান্য বাকি।

আড়াই দিনের মাথায় ঘাটশিলা থেকে ফিরে এল রাহুল। স্টেশন থেকে নেমে সোজা কল্যাণের বাড়ি। চুল উশকোখুশকো। চোখ দুটো লাল। বোঝাই যাচ্ছে, রাতে ঘুম হয়নি। দরজা খুলে কল্যাণ অবাক।

'রাহুল তুই! কী হয়েছে? চলে এলি কেন?'

রাহুল মাথা নামিয়ে বলল, 'জানি না। এই নে তোর ঘাটশিলার বাড়ির চাবি।'

গল্প কি শেষ? না আরও একটু বাকি।

এর বেশ কয়েকবছর পর আমি আর রাগিণী ঘাটশিলা বেড়াতে গেছি। আমাদের সাড়ে তিন বছরের ছেলে বুলু নদীর ধার ছেড়ে কোথাও যেতেই চাইছে না। সে ছোটাছুটি করছে। আমরা বসে আছি একটা বড়ো পাথরে। সন্ধ্যা নামছে। রাগিণী আমার কাঁধে মাথা রেখেছে। আমি ধরে আছি তার হাত। রাগিণী নদীর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কী সুন্দর না রাহুল?'

আমি গাঢ় স্বরে বললাম, 'এখনই সুন্দরের কী দেখলে রাগিনী? দাঁড়াও একটু পরেই চাঁদ উঠবে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাবে চারপাশ। কলেজে পড়ার সময় একবার এসেছিলাম এখানে। রাতে জ্যোৎস্না দেখে.. ।'

রাগিণী বলল, 'কলেজে পড়বার সময় এখানে এসেছিলে! কবে? কখন? কই আমাকে বলনি তো রাহুল!'

নার্ভাস আমি যখন উত্তর খুঁজছি, তখন চারপাশ উথালপাতাল করে চাঁদ উঠল আকাশে। জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে নদী।

ইস গোড়াতে বলব না বলে প্রতিজ্ঞা করেও গল্পটা সেই বলে ফেললাম তো? অন্যায় হল। দেখবেন, রাগিনী যেন জানতে না-পারে। জানলে বিরাট অশান্তি করবে।

চোর-পুলিশ



আমাদের টেনশন হচ্ছে। টেনশনের কারণ একটা নয়, দুটো। এক নম্বর কারণ, ঠিক দশদিন পরেই শুরু হচ্ছে। আর দু-নম্বর কারণ হল, গত দু-বছর আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এবারও যদি হতে পারি তাহলে পরপর তিনবার হবে। একেবারে হ্যাটট্রিক। হ্যাটট্রিকের সম্মানই আলাদা। সকলেই তাকিয়ে আছে, আমরা কি পারব? এতেই টেনশন ডাব্‌ল হয়ে গিয়েছে।

আমরা অবশ্য খুব পরিশ্রম করেছি। গত একমাস ধরে খেটেছি। কিন্তু শুধু নিজেরা খাটলেই তো হবে না। যাদের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি তাদের ক্ষমতাটাও তো দেখতে হবে। আমাদের থেকে 'অন্যরা' কীসে কীসে এগিয়ে আছে জানতে হবে। 'ওদের' খবরাখবর পাওয়ার জন্য আমরা গুপ্তচর লাগিয়েছিলাম। গুপ্তচরের নাম সুমন মুনশি। ফুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাস নাইনের ছাত্র সুমন বোকাসোকা মুখ করে আমাদের 'শত্রু শিবির'গুলোতে ঘুরেছে আর 'গোপন সংবাদ' এনেছে। এতদিন যেসব খবর পেয়েছি সেগুলো নিয়ে চিন্তা নেই. কিন্তু কাল বিকেলে সুমন যা বলল তাতে আমাদের মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছে। ঘটনা সত্যি হলে বিপদ। আমাদের 'হ্যাটট্রিক' করার আশায় ছাই পড়বে। এই কারণে আজ সন্ধেবেলা আমাদের জরুরি মিটিং বসছে। বিপদ থেকে বাঁচার পথ খোঁজা হবে।

ঘটনা প্রথম থেকে বলি।

এক-একটা জায়গার এক-এক কারণে নামডাক হয়। যেমন পবনপুরের খ্যাতি ফুটবল ম্যাচে। ফুটবল ম্যাচ নিয়ে সেখানে একমাস ধরে হইহই চলে। আশপাশের কুড়ি-পঁচিশটা ক্লাব নাম দেয়। খেলার দিনগুলোতে দর্শকে মাঠ একেবারে ভেঙে পড়ে। ফাইনালের দিন তো এলাহি কাণ্ড হয়। আবার মল্লিকডাঙার খ্যাতি হল দুর্গাপুজোয়। সেখানকার ক্লাবগুলো দারুণ জাঁকজমক করে পুজো করে। মনভরানো প্রতিমা, চোখধাঁধানো আলো, অবাক করা মণ্ডপ। সঙ্গে প্রতিদিন পাত পেড়ে খাওয়া, ধুনুচি

নাচ, জলসা, যাত্রা। পুজো নিয়ে ক্লাবগুলোর মধ্যে রেষারেষিও আছে। কার প্রতিমা ভালো, কার আলো বেশি ঝলমলে। পুজোর ক-দিন সুযোগ পেলেই আমরা মল্লিকডাঙায় ছুটি। আবার কল্যাণগড়ের নাম মাছ ধরায়। সেখানে বড়ো-বড়ো দিঘি রয়েছে। গোটা আষাঢ় মাস জুড়ে মাছ ধরার কম্পিটিশন হয়। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ে। দিঘির পাড়ে ঢাউস ছাতা মাথায়, হাতে ছিপ নিয়ে সবাই বসে থাকে। ছিপগুলোও যেমন-তেমন নয়, জাম্বো ছিপ। মাছ টোপ গিলে ছুট মারলে ছিপের হুইল বনবন করে ঘোরে, বাতাসে শনশন করে আওয়াজ হয়। মাছ ধরার লোভে কলকাতা থেকেও অনেকে আসে। রবিবার হাইওয়েতে গাড়ির ভিড় লেগে যায়। আমাদের ফুলপুরও নাম করেছে। তবে ফুটবল, দুর্গাপুজো বা মাছ ধরায় নয়, নাম করেছে নাটকে। পাঁচ বছর ধরে আমাদের এখানে 'একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা' শুরু হয়েছে। হাই স্কুলের মাঠে স্টেজ বানিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। প্রথম এক-দু-বছর জমতে একটু সময় লেগেছিল। বেশি কেউ নাম দিত না। একদিনেই প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যেত। এখন চলে টানা তিনদিন। ফুলপুরের ছোটো, বড়ো, মেজো সব ক্লাবই নাম দেয়। এই প্রতিযোগিতার কারণে ফুলপুরে বেশ কয়েকটা নাটকের দলও গড়ে উঠেছে। রোজ দুটো করে নাটক হয়। তারপরেও চাপ বাড়ছে। কে জানে এরপর হয়তো সাতদিন ধরে চলবে।

এই তিনদিন ফুলপুর উৎসবে মেতে ওঠে। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে রঙিন পতাকা, সঙ্গে আলো। হাইওয়ে আর রেলস্টেশনের সামনে বিরাট-বিরাট গেট। সেখানে বড়ো-বড়ো করে লেখা, 'ফুলপুর নাটক প্রতিযোগিতা'। স্কুলমাঠের পাশে মেলা বসে যায়। শুধু যে এই তিনদিনের জন্য ফুলপুর নাটক নিয়ে মেতে থাকে তা কিন্তু নয়। পাড়ায়-পাড়ায় রিহার্সাল চলে প্রায় এক মাস ধরে। কোনো-কোনো ক্লাব, দল তার চেয়েও বেশি সময় নেয়। এই সময় বাইরের কেউ যদি প্রথম ফুলপুরে আসে, তা হলে ঘাবড়ে যেতে পারে। এক-একটা পাড়ায় এক-একরকম ডায়লগ, এক-একরকম আওয়াজ। কোনো ক্লাবঘরে রাজার হুঙ্কার, কোনো বন্ধ জানলার ওপাশে ভূতের হাসি। কোথাও আবার হেডমাস্টারমশাইয়ের ধমক কোথাও স্বাধীনতা সংগ্রামীর ভাষণ, কোথাও বাউল গান, কোথাও ব্যান্ডের গিটার। কোনো গলিতে হয়তো পরিচালকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। কোনো বাড়ির একতলা থেকে ভেসে আসে প্রম্পটারের ফিসফিসানি। স্টেজে, উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় প্রম্পট করতে হবে, তাই রিহার্সালেও এক কায়দা। এত কিছু শুনে ফুলপুরের নতুন অতিথি চমকে যেতেই পারেন। সেইসঙ্গে অবশ্য আনন্দ পাবেন। ফুলপুর থেকে ফিরে গিয়ে তিনি সকলকে বলবেন, 'দারুণ একটা ব্যাপার দেখে এলাম। বাপ রে! নাটক নিয়ে সবাই খেপেছে!'

ফুলপুর নাটক প্রতিযোগিতায় পরপর দু-বার জিতে যাওয়ায় অন্যরা আমাদের হিংসে করে। আমরা বয়সে অনেকের চেয়েই ছোটো। তবুও আমরা জিতেছি। আমরা কী করব? বিচারকরা এসেছিলেন বাইরে থেকে। তারা সকলে নাটকের

এক-একজন নামি মানুষ। কেউ অভিনয় করেন, কেউ পরিচালক, কেউ স্টেজ সাজান। তাঁরা তিনদিন ধরে অত নাটক দেখে আমাদের নাটককেই সেরা বলেছেন। নিশ্চয়ই সবদিক বিচার করেই বলেছেন। আমরা কী করব?

আসলে আমাদের সবচেয়ে বড়ো গুণ হল, আমরা নিজেরাই সব করি। নিজেরা নাটক লিখি। নাটকের ভিতরে যেসব গান থাকে আমরা লিখি, সুর দিই। স্টেজ সাজানোর জন্য যা-যা দরকার হয় সেগুলো ভাড়া করি না। অন্য কাউকে দিয়ে বানাইও না। বড়ো-বড়ো বোর্ড, রঙিন কাগজ দিয়ে নিজেরাই তৈরি করে ফেলি। আমাদের দেবরূপ খুব সুন্দর হাতের কাজ পারে, ছবিও আঁকে চমৎকার। ও দৃশ্য বুঝে-বুঝে জিনিস বানিয়ে দেয়। কখনো মুখোশ, কখনো যুদ্ধের ঢাল, কখনো ঝুলন্ত জানলা, কখনো ফাঁসির মঞ্চ। গতবার আমাদের নাটকের নাম ছিল 'বারান্দা'। সপ্তর্ষির লেখা নাটক। নাটকে একটা বারান্দার কথা আছে। নাটকের দিন দেখি দেবরূপ একটা আস্ত বারান্দা বানিয়ে ফেলেছে! তক্তাপোশের উপর কাঠের রেলিং, পিছনে দরজার ফ্রেম। সেখানে পর্দা। বারান্দার টবে গাছ, খালি খাঁচা আর উপরে একফালি দড়িতে ক-টা জামাকাপড়ও ঝুলছে। নাটকের সময় যখন কেউ পর্দা সরিয়ে প্ল্যাটফর্মটার উপর এসে দাঁড়াচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, সত্যি দরজা খুলে বারান্দায় এসেছে! হয়তো এইসব কারণেই বিচারকরা আমাদের পছন্দ করে ফেলেন। অন্যরা হিংসে করলে আমরা কী করব?

আমাদের শত্রু বেড়েছে। সেই কারণে এবার সব কিছু আমরা খুব গোপন রেখেছি। কেউ জানে না এ-বছর আমরা একটা হাসির নাটক নিয়ে প্রতিযোগিতায় যাচ্ছি। চোরের গল্প। লিখেছে সায়ন। গল্পটা একরকম ভারি মজার। শ্যামাপদ গড়গড়ি ছাপোষা, ভালোমানুষ। একদিন মাঝরাতে তাঁর ঘরে চোর ঢুকেছে! খুটখাট আওয়াজে শ্যামাপদবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখেন চোর হাতুড়ি, স্ক্রুড্রাইভার, করাত দিয়ে আলমারি খোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু আলমারি কিছুতেই খুলছে না। বেচারি ঘেমে গিয়েছে। গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে! চোরের এই পরিশ্রম দেখে মায়া হয় শ্যামাপদবাবুর। তিনি চোরকে আলমারির চাবি দিতে চান। মজার ব্যাপার হল, চোর কিছুতেই চাবি নেবে না। সে বলল, "আমি চোর বলে কি আমার প্রেস্টিজ নেই স্যার? আমি ভিক্ষে করে আপনার কাছ থেকে চাবি নেব? তারপর সেই চাবি দিয়ে আলমারি খুলে চুরি করব? ছি ছি!"

শ্যামাপদবাবু বললেন, 'আহা, তুমি তো চাইছ না, আমি নিজে থেকেই দিচ্ছি। রাত জেগে এত কষ্ট করছ দেখে আমার খারাপ লাগছে। নাও, লজ্জা কোরো না, চাবি ধরো।'

চোর বলল, 'তা হবে না স্যার। চোরের নিয়মই হল নিজের কায়দায় কাজ করা। নিজের কায়দাতেই সে জানলার গ্রিল ভাঙবে, নিজের কায়দাতেই দরজার ছিটকিনি খুলবে, নিজের কায়দাতে আলমারির সিন্দুক ভাঙবে। তারপর চুরির কাজ সেরে নিজের কায়দাতেই ছাদ টপকে পালাবে। এত সব কায়দা শেখার জন্য ওস্তাদের কাছে ট্রেনিং

নিয়েছি। এখন যদি আপনার কাছ থেকে চাবি নিয়ে চুরি করি, তাহলে সেটা বিরাট লজ্জার ব্যাপার হবে। সবাই জানবে, আমি চুরির কায়দাকানুন কিছুই শিখিনি। চোর মহলে আমার নাম হবে ফেলু চোর। এটা আমি হতে দিতে পারি না স্যার। আমাকে মাপ করবেন। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।'

শ্যামাপদবাবু বললেন, 'আরে বাপু! তোমার চিন্তা নেই। আমি কাউকে বলব না।'

চোর কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'এই যে স্যার শব্দ পেয়ে আপনার ঘুম ভেঙেছে তাতেই আমার নম্বর কাটা গেল।'

'নম্বর! তোমাকে আবার নম্বর কে দেবে?'

চোর এবার কান্না-কান্না গলায় বলল, 'ওস্তাদ দেবে। আমি স্যার চুরির হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় তিনটে সাবজেক্টে ফেল মেরেছিলাম।'

শ্যামাপদবাবুর চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। তিনি বললেন, 'চুরির হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা! বল কী হে!'

'হ্যাঁ স্যার। আমাদেরও রেগুলার পরীক্ষা হয়। পাঁচিল বেয়ে হাঁটা, ধরা পড়লে চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছুড়ে পালানো আর পা টিপে-টিপে ঘুরে বেড়ানো। তিনটে পেপারেই তিরিশের কম পেয়েছি। এখন অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিচ্ছি। এবারও যদি পাশ করতে না-পারি, আমাকে স্যার এক ক্লাসেই থাকতে হবে।'

খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের এই নাটক দেখতে-দেখতে দর্শকদের হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ার কথা। তার উপর চোরের পার্ট করছে নির্মাল্য। দারুণ করছে। ও এবারও ফুলপুর নাটক প্রতিযোগিতায় সেরা অভিনেতার প্রাইজটা পাবে। নির্মাল্য যে এবার অভিনয় করছে, বাইরের কেউ জানে না। দেবরূপ স্টেজ সাজানোর যা পরিকল্পনা করেছে সেটাও চমকে দেওয়ার মতো। স্টেজের একপাশে একটা জানলা থাকছে। সেখান দিয়ে চাঁদ দেখা যাবে। থালার মতো বড়ো। নাটক যত এগোবে সেই চাঁদ একটু-একটু করে সরে যাবে। একদম শেষে বাইরে ফুটে উঠবে ভোরের আলো। গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য আমরা রিহার্সাল ক্লাবঘরে করছি না। করছি টুটুনের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে। অন্য ক্লাবের সবাই, 'কিশোর সংঘ'র ব্যাপারে বিশেষভাবে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছে। পারছে না। আমাদের সবার মুখে কুলুপ আঁটা। পরিকল্পনা একটু ফাঁস হয়ে গেলেই সর্বনাশ। নকল হয়ে যেতে পারে। হয়তো কোনো দল চোরের ব্যাপারটা নকল করে বসল, কেউ হয়তো শ্যামাপদ গড়গড়ির মতো একটা চরিত্র বানিয়ে নিল, কেউ আবার ওসব কিছু না-করে শুধু জানলার বাইরে ঝুলে থাকা চাঁদটাই ঢুকে দিল। ব্যস, আমাদের চমক শেষ, মজাও নষ্ট। বিচারকরা ভাববেন, আরে! এ-রকম আগের কোন নাটকে দেখলাম না? এতে যারা নকল করবে তাদের হয়তো কোনো লাভ হবে না, কিন্তু আমাদের ক্ষতি হবে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মতো। সেইজন্যই এত গোপনীয়তা। এমন সময় সুমন খবর আনল...।

আমি চিন্তিত গলায় বললাম, 'ছেলেটার নাম কী?'

সুমন বলল, 'গৌরব। গৌরব নাগ।'

নির্মাল্য ভুরু কুঁচকে বলল, 'গৌরব! 'আমরা সবাই' ক্লাবে গৌরব নামে কেউ আছে বলে তো জানতাম না!'

সুমন গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি কি ভুল খবর এনেছি বলে তোর মনে হচ্ছে নির্মাল্য?'

নির্মাল্য বলল, 'হতেই পারে। তুই হয়তো ভুল নাম শুনেছিস।'

সুমন রাগ দেখিয়ে বলল, 'তাহলে আমি চুপ করে গেলাম, আর কোনো কথা বলব না।'

নির্মাল্য ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'না বললে বয়ে গিয়েছে।'

নির্মাল্যকে নিয়ে এই একটা মুশকিল। সুমনের সঙ্গে তার ঝগড়া লেগেই আছে। ছুতোনাতা একটা পেলেই হল। কে বলবে সে সুমনের চেয়ে বড়ো? এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে? আমি হাত তুলে দু-জনকে থামিয়ে বললাম, 'তোরা তো অদ্ভুত! এখন কি আমাদের ঝগড়া করার সময়? এত বড়ো একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে আর তোরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিস!'

দেবরূপ সুমনের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'রাগ করিস না, বল, আর কী খবর পেয়েছিস?'

সুমন ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে বলল, 'বলব না। আমি যদি ভুল খবর আনি, তাহলে সেই খবর শুনে তোদের লাভ কী?'

নির্মাল্য রেগেমেগে বলল, 'বাড়াবাড়ি করিস না সুমন।'

সুমন চিৎকার করে বলল, 'একশোবার করব। হাজারবার করব।'

এরপর শুভায়ন দু-জনকে ধমক দিয়ে শান্ত করল। বলল, 'এটা নিজেদের বিষয় নয়, "কিশোর সংঘ" ক্লাবের প্রেস্টিজের বিষয়। সুমনের খবরের ভিত্তিতে আমাদের একটা কিছু প্ল্যান করতে হবে। নে সুমন, মাথা ঠান্ডা করে সবটা বল।'

সুমন একটুক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, 'সবই তো বললাম। "আমরা সবাই" ক্লাবের ছেলেরা সৌরভ বলে একজনকে পেয়েছে। জানতে পেরেছি, এই ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষার পর মাসখানেকের ছুটিতে ফুলপুরে মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছে। এসে দেখে, নাটক নিয়ে হইচই হচ্ছে। পাড়ায়-পাড়ায় রিহার্সাল। বাড়িতে-বাড়িতে আলোচনা। এতে খুব মজা পায়। মামাকে বলে, "আমিও নাটক করব। তুমি কোনো একটা দলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও।" ভদ্রলোক তখন আলাপ করিয়ে দেন "আমরা সবাই" ক্লাবের নাটক পরিচালক অবন্তী সেনের সঙ্গে। অবন্তী সেনকে চিনিস তো?'

আমি বললাম, 'কেন চিনব না? গতবার অবন্তীদার নাটকটা অল্পের জন্য আমাদের কাছে হেরে গিয়েছিল। খুব ভালো করেই মনে আছে। ওদের অভিনয়ে কিছু গোলমাল ছিল। নইলে ওরাই জিতত।'

সুমন বলল, 'এবার মনে হয় সেটাই হবে।'

দেবরূপ বলল, 'মানে? ওরাই চ্যাম্পিয়ন হবে?'

সুমন দেবরূপের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'অত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? আগেই তো বলেছি, এবার আমাদের বিপদ আছে। অবন্তীদা প্রথমে ওই ছেলেকে ভাগিয়ে দিচ্ছিল। তারপর একটা ছোটো রোল দিয়েছে। যতই হোক, ওর মামা রিকোয়েস্ট করেছেন। কিন্তু সেই ছোটো রোলেই নাকি ছেলেটা মাত করে দিচ্ছে। নাটক দারুণ জমে গিয়েছে। ওরা বলছে, এবার সেরা নাটকের প্রাইজ ওরাই পাচ্ছে। কেউ আটকাতে পারবে না।'

আমি ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললাম, 'রোলটা কিসের?'

সুমন নীচু গলায় বলল, 'যত দূর খবর পেয়েছি, পুলিশের।'

নির্মাল্য বলল, 'অ্যাঁ! বলিস কী! এ তো 'কিশোর সংঘ'-র চোর বনাম "আমরা সবাই"-এর পুলিশের লড়াই!'

সুমন বাঁকা চোখে নির্মাল্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'লড়াইতে "কিশোর সংঘ"র পরাজয় নিশ্চিত। চোর পাকড়াও হবে। কোমরে দড়ি বেঁধে আমরা সবাই-এর পুলিশ তাকে হাজতে নিয়ে যাবে।'

নির্মাল্য লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'তুই আমাকে অপমান করছিস সুমন। তুই ভালো করেই জানিস চোরের পার্টটা আমি করছি।'

সুমন হাসি চেপে, অবাক হওয়ার ভান করে বলল, 'যা বাবাঃ! তোকে কেন অপমান করতে যাব? তুই কি সত্যি চোর?'

"আমরা সবাই"-এর গেম সেক্রেটারি তমালকে টিফিনে এক প্লেট ঘুগনি খাইয়ে সব খবর বের করে নিয়েছি। তমালই বলল, সৌরভ এমন পার্ট করছে যে মনে হচ্ছে, একেবারে সত্যিকারের পুলিশ অফিসার। ওর অভিনয় দেখতে গিয়ে প্রম্পটার পর্যন্ত প্রম্পট করতে ভুলে যাচ্ছে।

সায়ন হতাশ গলায় বলল, 'ওদের নাটক কি আমাদের মতো হাসির নাটক?'

সুমন বলল, 'না, শুনেছি উলটোটা। দুঃখের নাটক। একজন পুলিশ অফিসার...।'

আমি হাত তুলে বললাম, 'থাক, থাক আর নাটকের দুঃখের গল্প শুনে কাজ নেই। আমাদের নিজেদের অবস্থাই যখন দুঃখের হয়ে গিয়েছে। যে করেই হোক একটা কিছু করতে হবে। ওই সৌরভ ছেলেটাকে আটকাতে হবে।'

দেবরূপ বলল, 'আটকাতে হবে মানে। কীভাবে আটকাব?'

সুমন বলল, 'মারধোর করে হাত-পা ভেঙে দেওয়ার কথা বলছিস নাকি?'

নির্মাল্য বলল, 'গাধার মতো কথা বলিস না। এটা কি ফুটবল খেলার মাঠ যে ল্যাং মেরে ফেলে দিবি?' এই প্রথম টুটুন কথা বলল। চোখ বড়ো-বড়ো করে বলল, 'আচ্ছা, কিডন্যাপ করলে কেমন হয়? ধর, ওদের শো-এর ঠিক আগের দিন, আমরা ওই ছেলেকে ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে এলাম...তারপর হাত-পা বেঁধে এই চিলে-কোঠার ঘরে...নাটক হয়ে গেলেই ছেড়ে দেব...কেমন হবে?'

দেবরূপ বলল, 'হেরে যাওয়ার ভয়ে এই ছেলের তো দেখছি মাথার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। সত্যি সত্যি জেল খাটবার প্ল্যান করছে। আরে বাবা, এটা কি তোর নাটক? ওই ছেলেকে ধরে এনে তুই বেঁধে রাখবি আর ওরা সবাই আঙুল চুষবে? পুলিশ ডাকবে। পুলিশ এসে আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে।'

আমাদের পরিচালক সপ্তর্ষি এতক্ষণ চুপ করেছিল। মন দিয়ে আমাদের কথা শুনছিল। এবার খানিকটা যেন অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আমার মাথায় একটা প্ল্যান আসছে।'

আমি ঢোক গিলে বললাম, 'কী প্ল্যান? গোলমালের কিছু নয় তো?'

সপ্তর্ষি হেসে বলল, 'না, গোলমালের নয়, বরং উলটোটা। হাসতে-হাসতে বুক ফুলিয়ে কাজটা করা যাবে।'

নির্মাল্য আর সুমন একসঙ্গে বলল, 'কী সেটা?'

সপ্তর্ষি সিরিয়াস মুখ করে বলল, 'তার আগে সুমন বল তো তোর ওই সৌরভ ছেলেটার নাটক করার শখ কেমন?'

সুমন হাত উলটে বলল, 'এ আর বলার কী আছে? বোঝাই তো যাচ্ছে খুব শখ। মামাবাড়ি বেড়াতে এসে মানুষ নাটক দেখে বলে শুনেছি, নাটক করে বলে তো কখনো শুনিনি। তার উপর একটা ছোটো রোলেও রাজি হয়ে গিয়েছে। শুনেছি ও নাকি অবন্তীদাকে বলেছিল, আপনি আমাকে একবার স্টেজে ওঠার সুযোগ দিলেই হবে। ফুলপুরের নাটক কম্পিটিশনে আমি যোগ দিতে পারলেই খুশি।'

সপ্তর্ষি বাঁ-হাতের তালুতে নিজের ডান হাত দিয়ে ঘুসি মেরে বলল, 'ব্যস্‌, এতেই হবে। আমার প্ল্যান হয়ে গিয়েছে। তোদের কথা দিচ্ছি, ওই ছেলে "আমরা সবাই" ক্লাবের নাটকে নামবে না। ওর সঙ্গে আমার একটু কথা বলার দরকার। এই দায়িত্ব সুমন তোর। তুই ওদের গেম সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বল। দরকার হলে আর এক প্লেট ঘুগনি খাওয়া। তারপর ম্যানেজ করে কালই সৌরভকে আমার কাছে নিয়ে আয়। শুধু একটা কথা...'

নির্মাল্য বলল, 'কী কথা?'

সপ্তর্ষি নির্মাল্যর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'কথাটা তোকে আলাদা করে বলব।'

দু-দিনের মাথায় ম্যাজিকের মতো ঘটনা ঘটল। টুটুনদের চিলেকোঠায় আমরা সৌরভকে দেখতে পেলাম। "আমরা সবাই" ক্লাবের পুলিশ "কিশোর সংঘ"-তে এসে চোর হয়ে গিয়েছে! সপ্তর্ষি তাকে মন দিয়ে পার্ট বোঝাচ্ছে। জোরকদমে চলছে রিহার্সাল। একমাসের কাজ দশদিনে শিখে নিতে হবে না? সৌরভ দারুণ উত্তেজিত। শুধু উত্তেজিত নয়, খুশিও। 'পুলিশ' থেকে 'চোর' হতে পেরে খুশি কিনা বোঝা যাচ্ছে না, তবে খুশি বড়ো রোল পেয়ে। শুধু বড়ো রোল নয়, একেবারে নাটকের মেন রোল। 'আমরা সবাই'-এর নাটকের রিহার্সালে ও যতই ভালো অভিনয় করুক, নাটকটাকে উতরে দিক, অভিনয়ের সুযোগ তো ছিল মাত্র অল্প

কিছুক্ষণের। আর এখানে সারাটা সময় স্টেজে থাকবে। সারাক্ষণ দর্শকদের হাততালি পাবে। এই লোভ সামলানো যায়? সপ্তর্ষি এই সুযোগটাই নিয়েছে। সুমন ওকে ধরে নিয়ে এসেছিল। সপ্তর্ষি তাকে বলছে, 'ভাই, তুমি যখন এত ভালো অভিনয় কর, তোমার আরও বড়ো রোল পাওয়া উচিত। তুমি তো আর "আমরা সবাই" ক্লাবের কেউ নয়, ওদের সঙ্গেই যে তোমাকে অভিনয় করতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। তোমার মামা তোমাকে প্রথমেই আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারতেন। যাক, যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখনও সুযোগ আছে। আমরা "কিশোর সংঘ"-র পক্ষ থেকে তোমাকে একটা বড়ো চরিত্রে কাজ করার সুযোগ দিতে চাইছি। আমাদের ক্লাবের যে-ছেলেটি এই রোলে পার্ট করছিল তার নাম নির্মাল্য। সে তোমার জন্য স্যাক্রিফাইস করতে চায়। আত্মত্যাগ। রোলটা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছে। বলেছে, তুমি ফুলপুরের অতিথি। তোমাকে সম্মান দেওয়াটাই আমাদের প্রধান কাজ। এবার তুমি রাজি কি না বলো। রাজি হলে আজই ক্লাব বদলে চলে এসো। হাতে মাত্র দশদিন সময়। খুব খাটতে হবে।'

সৌরভ লাফাতে-লাফাতে চলে এসেছে। 'আমরা সবাই' আটকানোর চেষ্টা করেছিল, পারেনি। সত্যি তো সৌরভ তাদের ক্লাবের কেউ নয়। আমরা খুব খুশি। একেই বলে 'এক ঢিলে দুই পাখি মারা'। 'আমরা সবাই' ক্লাব একজন ভালো অভিনেতাকে হারিয়ে ধরাশায়ী হল, আর আমরা একজন ভালো অভিনেতাকে পেয়ে জেতার দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। ফুলপুর নাটক প্রতিযোগিতায় আমাদের হ্যাটট্রিক ঠেকায় কে? আমরা খুশি হব না?

আচ্ছা, নির্মাল্য কি খুশি হয়েছে? মনে হয় হয়েছে। তাকে সপ্তর্ষি বুঝিয়েছে। দলের জন্য তাকে এইটুকু ত্যাগস্বীকার করতেই হবে। সপ্তর্ষি কথা দিয়েছে, পরেরবার সে বড়ো রোল পাবেই। তাহলে সমস্যা কোথায়? মনে হয় সমস্যা নেই। তবে দু-দিন পর থেকে নির্মাল্য সন্ধেবেলা রিহার্সালে আসা বন্ধ করে দিল। একদিন আমার সঙ্গে বাজারে দেখা। শুকনো হেসে বলল, 'পার্ট যখন করছি না তখন সময় নষ্ট করে লাভ কী বল? তার চেয়ে বাড়িতে বসে বইপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি। ক-দিন পরেই তো রেজাল্ট বেরোবে। উঁচু ক্লাসের পড়া, আগে থেকে দেখে রাখা ভালো।'

আমার কেমন সন্দেহ হল। সুমনকে বললাম। সুমন এমনিতেই নির্মাল্যর উপর চটা। সে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'রাগ করলে বয়ে গিয়েছে। ওই ছেলে নির্মাল্যর চেয়ে অনেক ভালো পার্ট করছে। দেখিস, দশদিনেই বাজিমাত করে দেবে।'

'তাও তুই একবার খবর নে সুমন। আমার কেমন জানি লাগছে। সত্যি-সত্যি কি ও সন্ধেবেলা পড়াশোনা করছে? নাকি অন্য কিছু...'

খবর জোগাড় করতে সুমন ওস্তাদ। সে একদিন সন্ধেবেলা সটান নির্মাল্যর বাড়িতে গিয়ে হাজির। নির্মাল্য সত্যি বই-খাতা নিয়ে বসে ছিল। সুমনকে খাতির করে ঘরে বসাল। বাড়িতে রসগোল্লা ছিল। সুমনকে প্লেটে করে দুটো রসগোল্লা

দিল। সুমন বেরিয়ে আসার সময় মুচকি হেসে বলল, 'আমি জানতাম তুই আসবি। তোদের সঙ্গে নাটকের দিন দেখা হবে। "কিশোর সংঘ" নাটক করবে আর আমি থাকব না, তা কখনো হাতে পারে?'

সুমন আমার কাছে এসে বলল, 'না, ছেলেটা সত্যি বইপত্র নিয়ে বসে।'

পরের ক-দিন আমাদের মাথা থেকে নির্মাল্য উধাও হয়ে গেল। আমরা নাটকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পতাকা, আলো, ঝলমলে গেটে ফুলপুরও সেজে উঠল। স্কুলমাঠে তৈরি হল স্টেজ। বিচারকরা আসতে শুরু করে দিয়েছেন। আমাদের টেনশন বাড়তে লাগল। রিহার্সাল এক বেলার জায়গায় দু-বেলা করে দেওয়া হল। 'কিশোর সংঘ' আর 'আমরা সবাই'-এর নাটক প্রথম দিনেই পড়েছে। প্রথমে আমাদের, তারপর করবে ওরা। ভালোই হল। গোড়াতেই টেনশন শেষ হয়ে যাবে। বাকি দিনগুলো হালকা মনে জমিয়ে বসে অন্যদের নাটক দেখতে পারব।

আমাদের নাটক যে কী দারুণ হল তা মুখে বলে বোঝানো যাবে না। নাটক শেষের পর দর্শকদের হাততালি থামতেই চায় না। শুধু হাততালি নয়, সঙ্গে হাসি। চোরের পার্টে সৌরভ ভেলকি দেখিয়ে দিল। নাটক শেষ হওয়ার পর স্টেজে এসে তাকে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করতে হল। সকলে জানতে চাইছে, ছেলেটা কে? একে তো ফুলপুরে আগে কখনো দেখেনি। সপ্তর্ষি স্টেজে উঠে মাইক হাতে বলল, 'চোরকে দেখা যাবে কী করে? সে কি দিনের ফটফটে আলোয় ঘুরে বেড়াবে? সে দেখা দেবে গভীর রাতে।' আর একচোট হাততালি আর হাসি।

আধঘণ্টা বিরতির পর শুরু হল 'আমরা সবাই'-এর নাটক। আমরা একেবারে স্টেজের সামনে গিয়ে জমিয়ে বসলাম, দেখি ওরা কী করে।

যা দেখলাম তাতে আমাদের চোখ একেবারে ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম। সবার মুখ হাঁ। সেই হাঁ বন্ধ হল নাটক শেষ হওয়ার পর। চোর-পুলিশে যে পুরো বদলাবদলি হয়ে গিয়েছে। পুলিশ যেমন চোর হয়েছে, চোর তেমন হয়েছে পুলিশ! ধাঁধার মতো লাগছে কি? লাগারই কথা। 'আমরা সবাই'-এর নাটকে পুলিশের পার্ট করল আমাদের নির্মাল্য! সত্যি ছোটো রোল, কিন্তু তাতেই সবাইকে কুপোকাত করে দিয়েছে! নাটকের শেষ দৃশ্যে গুন্ডা ধরতে গিয়ে পুলিশ অফিসার জখম হবেন। নির্মাল্যর পার্ট দেখে সেই সময় সবার চোখে জল। সত্যি কথা বলতে কী, আমারও! নাটক শেষ হলে দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগলেন। উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দেওয়া একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার। এমনকী, বিচারকরা পর্যন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুমন মাথা চুলকে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'নির্মাল্য আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। আমার গুপ্তচরগিরি ফেল মেরেছে। সন্ধেবেলা বাড়ি গিয়ে দেখলাম বেটা পড়ছে, তার মানে অন্য সময় রিহার্সাল দিত। আমাকে একটা জোর শিক্ষা দিল।

আমরা সুমনের কথায় কান না-দিয়ে হাততালি দেব বলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম।

সেবার ফুলপুর নাটক প্রতিযোগিতার রেজাল্ট কী হয়েছিল?

আমরাই 'সেরা দল' হয়েছি। পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে হ্যাটট্রিক করেছি। কিন্তু আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। ফুলপুরের সবাই এখন জেনে গিয়েছে 'কিশোর সংঘ' নাটকের জন্য জেতেনি, জিতেছে নির্মাল্যর জন্য। সেদিন সৌরভ আমাদের কাছে চলে আসার পর নির্মাল্য 'আমরা সবাই' ক্লাবের ছেলেদের কাছে যায়। তাদের তখন মাথায় হাত। দশদিন আগে অভিনেতা চলে গিয়েছে, নাটক বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। নির্মাল্য বলল, 'হঠাৎ করে অভিনেতা চলে যাওয়ায় তোমরা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছ? নাটক বন্ধ করে দিতে হচ্ছে তো? যদি রাজি হও, ওই পার্ট আমি করে দেব। কথা দিচ্ছি, আমার অভিনয় কারো চেয়ে খারাপ হবে না। তবে একটা শর্ত আছে। কম্পিটিশন থেকে তোমাদের নাম তুলে নিতে হবে। তোমাদের নাটক হবে নাটকের জন্য, প্রাইজের জন্য নয়। যদি রাজি থাক বলো।' ওরা লাফিয়ে উঠে রাজি হয়ে গেল।

ঘটনার বহুদিন পরে একদিন নির্মাল্যকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এ-রকম করলি কেন? এভাবে আমাদের অপমান না-করলেই কি হত না?'

নির্মাল্য হেসে বলল, 'অপমান কোথায় করলাম? ''কিশোর সংঘ'' যা করেছিল সেটা আসলে চুরি। প্রাইজের লোভে অন্য নাটকের অভিনেতা চুরি করেছিল। সৌরভ বেচারিকে সেই চোরের পার্টই করতে হল। কাজটা আমার পছন্দ হয়নি। মনে হল, পুলিশ সেজে তোদের একটু শিক্ষা দিই। খারাপ করেছি?'

আমি চুপ করে রইলাম।

শ্রাবণের ধারা

আজ বাইশে শ্রাবণ। মন খারাপ করা দিন। এই দিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আজ ঘটুরও মন খারাপের দিন। কারণ আজ তাকে ছেড়ে...

বেকার যুবকদের সকাল ন-টার আগে ঘুম ভাঙার কোনো নিয়ম নেই। ন-টাও যথেষ্ট আগে। এই সময় যার ঘুম ভাঙে তাকে অনায়াসে 'আর্লি রাইজার' বলা যায়। মনে রাখতে হবে বেকারদের 'আর্লি রাইজার' আর 'সাকার'দের 'আর্লি রাইজার' এক জিনিস নয়। 'সাকার'দের ঘুম ভাঙার অর্থ শয্যাত্যাগ। বেকারদের ঘুম ভাঙার অর্থ শয্যাত্যাগ নয়। নিদ্র্যাত্যাগ। ঘুম ভাঙলেই হবে। বিছানা ছাড়ার কিছু নেই। তারপরও আরও ঘণ্টাখানেকের মতো ছাড় আছে। একে বলা হয় 'গ্রেস টাইম'। সমাজ সংসার বেকারদের কাজকর্মের তেমন সুযোগ দিতে পারেনি, তবে অন্য নানা ধরনের সুযোগ সুবিধে দিয়ে রেখেছে। 'গ্রেস টাইম' সেগুলোর একটা। এটাও কম নয়। এই এক ঘণ্টার অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে মিনিট কুড়ি হল গড়াগড়ি পর্যায়। খাটের এপাশ থেকে ওপাশ। ওপাশ থেকে এপাশ। খাট ছোটো হলে চক্রাকারেও ঘোরা যাবে। মিনিট কুড়ি মোবাইল ফোনে 'জরুরি' আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে। আরও কুড়ি মিনিট চিত হয়ে শুয়ে পা নাড়াতে হবে। এটা হল ফ্রেশ মাথায় ভাবনা চিন্তার টাইম। নিজের চিন্তা সারাদিন ধরে করা যায়। কিন্তু দেশ ও দশের চিন্তার জন্য তরতাজা মস্তিষ্ক প্রয়োজন। সকাল ছাড়া সেই মস্তিষ্ক কোথায়? এসবের মাঝখানে মাঝখানে বাড়ির অন্য সদস্যদের গালমন্দ ভেসে আসে। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো। সেই গালমন্দ গায়ে মেখে নেওয়া যায় না। তাচ্ছিল্য করতে হয়। ভেবে নিতে হয়, এগুলো আসলে হিংসে। যারা বেলা পর্যন্ত শুয়ে গড়াতে পারে না, খেটে খেটে মরে, তাদের হিংসে।

আমাদের এই সামান্য কাহিনিটির নায়কের নাম ঘটু। সে একজন বেকার যুবক।

চাকরিবাকরি, ব্যাবসাপাতি কিছু নেই। কলেজ টপকে শুয়ে বসে আছে। বয়স পঁচিশ বছর কয়েকমাস। বেকারত্বের নিয়ম অনুযায়ী তারও বেলা পর্যন্ত তার বিছানার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থাকার কথা। কিন্তু কিছুদিন হল সে ভোর সাড়ে পাঁচটায় মুখ বেজার করে ঘুম থেকে উঠছে। ছ-টা পনেরোতে আরও মুখ বেজার করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছে। বাড়ির সবাই অবাক। পাড়ার লোকেরা আড়চোখে তাকায়। বন্ধুরা হাসাহাসি করে। বেকার মর্নিংওয়াক করে—এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখনো শোনেনি। তা ছাড়া ঘটু ওয়াক করে না। দৌড়ে গিয়ে ট্রামে উঠে পড়ে। কারণ রোজই তার লেট হয়ে যায়। কীসের লেট? কার কাছে লেট?

লেট হয় অচিরার কাছে। গত বৈশাখ মাসে অচিরা নামে এই সুন্দর ফুটফুটে মেয়ের সঙ্গে ঘটুর প্রেম হয়েছে। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে প্রেমের দিনক্ষণ ছিল পঁচিশে বৈশাখ প্রভাত। সেদিন 'লেবুতলা সাংস্কৃতিক সংঘ' নিজেদের ক্লাবে স্টেজ বানিয়ে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের ব্যবস্থা করেছিল। ঘটুর বন্ধু বিশুর আলো মাইকের বিজনেস। সরস্বতী পুজো, বিশ্বকর্মা, পঁচিশে বৈশাখে অর্ডার বেশি। লোকের টান পড়ে। বিশু বন্ধুবান্ধবের হাতে পায়ে ধরে ম্যানেজ করে। রিকশয় লাইট মাইক তুলে তাদের এদিক-ওদিক পাঠায়। ঘটু গেল লেবুতলা। সেখানে অচিরার একটাই গান ছিল। 'মেঘ বলেছে যাব যাব'। সেই সময় আবার মাইকে হল বড়ো ঝামেলা। আচমকা ঘর ঘর, ঘর ঘর আওয়াজ শুরু। আওয়াজ চলতেই থাকল। সবাই বলল, 'মেঘের গান বলে মাইকে মেঘ ডাকছে।' ঘটু অনেক কষ্ট করেও মাইকের মেঘ গর্জন থামাতে পারল না। থামাবে কী করে? সে যন্ত্রপাতির তেমন কিছুই জানে না। গায়িকা তো রেগেমেগে তাকে এই মারে সেই মারে। ধমকের পর ধমক। সেই ধমক বিকেলের দিকে প্রেমের চেহারা নিল। হৃষিকেশ পার্কে দুজনে দেখা করল। মাইক ও শিল্পীর মিলন ঘটল।

রাগের মধ্যে দিয়ে মানব মানবীর প্রেম নতুন কিছু নয়। আকছার ঘটেছে। কিন্তু খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঘটু বুঝতে পারল তার ফুটফুটে সুন্দরী, সুমিষ্ট গলার প্রেমিকার রাগ মারাত্মক। কথায় কথায় ধমক দিতে সে বিশেষ পছন্দ করে।

অচিরার মর্নিং কলেজ। থার্ড ইয়ার চলছে। ফার্স্ট ক্লাস ছ-টা চল্লিশ। তার আগে ঠিক দশ বারো মিনিট সে আমাদের ঘটুর সঙ্গে হৃষিকেশ পার্কের কোনায় দেখা করে। টাইম হয়ে গেলেই আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে কলেজের দিকে ছোটে। রোজ ঘুম চোখে ছুটে এসে প্রেম করতে ঘটুর একেবারেই মন চায় না। সে চায় অচিরার কলেজ ছুটির পর আসতে। অচিরাকে সে-কথা বলেওছিল। অচিরা ঝাঁঝিয়ে ওঠে—

'আমি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠব, আর তুমি বিছানায় পড়ে পড়ে নাক ডাকবে, এটা কেমন কথা? ছি ছি। মেয়েদের তুমি এমন চোখে দেখ?'

ঘটু আমতা আমতা করে বলে, 'না, এইটুকু তো সময়, দশ মিনিট মাত্র টাইম। কোনো কোনোদিন তাও থাকে না। আমি দাঁড়িয়ে থাকি তুমি হাত নেড়ে চলে যাও। একেকদিন হাত নাড়ারও সময় পাও না। তাকাও না পর্যন্ত। তাই বলছিলাম তোমার

ক্লাস শেষ হওয়ার পর যদি দুপুরে আসতাম, বেশ বেড়াতে যাওয়া যেত। গঙ্গার ঘাট, নন্দন, আজকাল সবাই সিটি সেন্টারে যায়।'

'চুপ। একদম চুপ। তুমি সকালে আসবে, দুপুরেও আসবে। আর যদি সকালে না-আস, তাহলে কখনোই আসবে না। আমি খেটে মরব আর তুমি নাক ডেকে ঘুমোবে? মামারবাড়ি পেয়েছ? এই রে দেরি হয়ে গেল। এস কে পি-র ক্লাস একমিনিটও লেট করা চলবে না। লেট হলে বাইরে।'

অচিরা দৌড় লাগায়। ঘটু হৃষিকেশ পার্কের কোনায় বেঞ্চ খুঁজে বসে পড়ে। কোনো কোনোদিন ঘুমিয়েও পড়ে বেচারি। মনে মনে ভাবে অসুবিধে কিছু নেই। বেকার ছেলের বাড়িতে গিয়ে ঘুমোনোও যা, পার্কে ঘুমোনোও তাই। বরং এই ঘুমের মধ্যে একটা প্রেমিক প্রেমিক ভাব থাকে। ঘটু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোনো কোনোদিন স্বপ্ন দেখে। অচিরা আর সে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। অচিরা গান করছে—'মেঘ বলেছে যাব যাব'। ঘটু খুব আবেগ দিয়ে গুনগুনিয়ে গলা মেলাতে যায়। গলা মেলে না। বিগড়োনো মাইকের মতো 'ঘড় ঘড়' আওয়াজ বেরোতে থাকে। অচিরা ধমক লাগায়—'এই চুপ কর, চুপ কর দেখি। ভুল সুরে গান গাইবে না একদম।'

ঘুমের মধ্যেই ঘটু চুপ করে যায়।

শুধু গান নয়, নিজের নাম নিয়েও ঘটু সেদিন অচিরার কাছে বিরাট ধমক খেল। ধমকেই ঘটনা শেষ হল না। ঘটনা এগোল আরও অনেক দূর। একেবারে ভয়ংকর দিকে। শেষ পর্যন্ত।

ঘটু শুনলেই বোঝা যায় এটা ডাকনাম। নিশ্চয় অন্য কোনো নাম আছে। স্কুল কলেজের নাম। চাকরি পেলে অফিসের নাম। বিয়ের সময় পুরুত ঠাকুর যে-নাম উচ্চারণ করবেন সেই নাম। তাকে বলে ভালো নাম। আমাদের ঘটুর ক্ষেত্রেও ঘটনা তাই। তারও আর একটা নাম আছে। কিন্তু সেই নাম ভালো নাম নয়। ঘটুর থেকেও খারাপ নাম। সেই নাম নিয়ে ছোটোবেলা থেকে ঘটু লজ্জায় আছে। লজ্জা পাওয়ারই কথা। সেই নাম হল ঘটকেশ্বর। এই যুগে ঘটকেশ্বর কারো নাম হয়? ছেলে-মেয়েদের কায়দা মার্কা নাম রাখাটাই এযুগের ফ্যাশন। যে নাম যত কঠিন সেই নাম তত ভালো। যার নামের মানে বলতে গিয়ে সবাই ঘেমে নেয়ে একশা হয় সে-ই হল আসল হিরো। সেই জায়গায় ঘটকেশ্বর! ছি ছি। স্কুলের বন্ধুরা ঘটুকে খেপাত। ঘুঁটে বলে ডাকত। বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে ঘটু কত কান্নাকাটি করেছে। মা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, 'কিছু করা যাবে না রে বাবা। কিছু করা যাবে না। বাড়ির গুরুদেব নাম ঠিক করে দিয়েছেন। সেই নাম একমাত্র তিনিই রাখতে পারেন, তিনিই ফেলতে পারেন।'

ঘটু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলত, 'বাড়ির গুরুদেবকে বল আমার নাম ফেলে দিতে।'

মা বলল, 'আচ্ছা বলব। উনি এখন দেওঘরে। শীতে আসবেন। তখন বলব।'

বাবার কানে খবর গেল। ছেলে নাম বদলাতে চায়। রাগী মানুষ আরও খেপে

গেলেন। বললেন, 'যার মাথায় ঘুঁটে তার ঘুঁটে নামে লজ্জা কীসের হে? ছেলেকে কানে ধরে চড় দাও। নাম থেকে ঘুঁটে না-সরিয়ে মাথা থেকে ঘুঁটে সরাতে বল।'

মা লুকিয়ে লুকিয়ে ঘটুকে বলল, 'তুই চিন্তা করিস না। গুরুদেব এলেই আমি বলব। যা এখন পড়তে বোস। বাবা রাগ করবে।'

শীত পড়ার মুখে গুরুদেব মারা গেলেন। ঘটুর নাম আর বদলানো হল না।

অচিরা এই ঘটনা শুনল। শুনে বিরাট খেপে গেল।

'আমাকে যদি বিয়ে করতে চাও এখনই এই নাম বদলাও।'

ঘটু অসহায়ভাবে বলল, 'বিয়ের সঙ্গে নাম বদলানোর কী আছে? বিয়ের পরে মেয়েদের পদবি বদলায়। বিয়ের জন্য ছেলেদের নাম বদলাবার কথা শুনিনি তো কখনো!'

ধমকে উঠল অচিরা।

'থাম দেখি। ঘটকেশ্বর নামে কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। তোমাদের গুরুদেব মারা গেছেন বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে?'

'কী করে বদলাব অচিরা? জন্মের পর বিচ্ছিরি অসুখে পড়েছিলাম। যায় যায় অবস্থা। হেঁচকি তুলছি। এমন সময় গুরুদেব ঘটকেশ্বর নামে এক কবিরাজের ওষুধ এনে খাইয়ে দিলেন। আমি বেঁচে গেলাম। গুরুদেব বললেন, 'ছেলের নাম রাখ ঘটকেশ্বর কবিরাজ। তাহলে ছেলে আর কোনোদিন বড়ো অসুখে পড়বে না। পড়লেও কোনো সমস্যা নেই। নামের মধ্যেই ডাক্তার রইল। অসুখ নিজে থেকে সারবে। বাবা কবিরাজে রাজি হল না। তখন শুধু ঘটকেশ্বর।'

'চুপ। একদম চুপ। তোমার গুরুদেব নাম দেওয়ার কে? নাম দেবেন আমার গুরুদেব।'

'তোমারও গুরুদেব আছেন! তিনি আবার কে রে বাবা!'

ঘটু ঘাবড়ে যায়। নিজের নাম কাণ্ডের পর গুরুদেব শুনলেই তার ভয় ভয় করে।

অচিরা ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমার গুরুদেব কে বুঝতে পারছ না। উনিই তো আমার নাম রেখেছেন।'

'তাই বুঝি! বাঃ। ভারি সুন্দর নাম রেখেছেন। এ-রকম সুন্দর নাম কখনো শুনিনি। তোমার গুরুদেবকে আমার প্রণাম জানিয়ো।'

অচিরা হেসে বলল, 'আচ্ছা জানাব। অচিরা নামটা শোননি আগে কখনো?'

ঘটু ঠোঁট উলটে বলল, 'কই না তো!'

অচিরা মুখের হাসি মুছে ঠোঁটের কোণে হাসল। বলল, 'এলাকে চেন? হৈমন্তী? দামিনী? মৃণ্ময়ী? চেন এদের?'

ঘটু বলল, 'কই না তো! তোমাদের কলেজে পড়ে বুঝি? কেমন জানি পুরোনো পুরোনো নাম। তাই না? মনে হচ্ছে ফিটন গাড়ি চেপে ঘুরতে বেরিয়েছে। হা হা।'

অচিরা এবার হাসি মুছে গম্ভীর হল। বলল, 'বোকার মতো হেসো না। সুচরিতা? বিমলা? বিনোদিনী? কমলা? এদের জান না? নামগুলো চেনা ঠেকছে না?'

ঘটু উৎসাহ নিয়ে বলল, 'কমলাকে চিনি। কমলা আমার ছোটোমাসির বাড়িতে রান্না করে। ঝালের হাত বেশি।'

অচিরা বিস্ফারিত চোখে বলে, 'কমলা রান্না করে! তুমি ষোড়শী বলে কারো কথা শুনেছ? ললিতা? রাজলক্ষ্মী? সুরমা? মৃণাল?'

গড়গড়িয়ে বলতে থাকে অচিরা।

ঘটু নার্ভাস গলায় বলে, 'উরি বাবা, এত মেয়ের নাম বলছ কেন? আমি এদের চিনব কী করে? আমি তো মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়িনি। আমার কেমন ভয় করছে অচিরা। কোনো গোলমাল হয়নি তো?'

অচিরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে সামনের দাঁড়ানো ভ্যাবলা মুখের যুবকটির দিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'নলিনী বলে কারো নাম শুনেছ? সৌদামিনী? রতন?'

ঘটু হেসে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'রতন শুনেছি আমাদের পাড়ায় সাইকেল সারানোর দোকান আছে। হারামি ছেলে। চেন ঠিক করতে করতে টিউবে পিন মেরে দেয়। তখন টিউবও ঠিক করতে হয়।'

অচিরা কখনো পার্কের বেঞ্চে বসে না। এই পথে কলেজের বহু মেয়ের যাতায়াত আছে। শুধু মেয়ে নয়, টিচাররাও শর্টকাট করে। দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি। তবু অচিরা আজ ধপ করে বেঞ্চে বসে পড়ল। ঘটুও পাশে বসে পড়ে। নরম গলা করে বলে, 'এইসব নামই কি তোমার গুরুদেবের দেওয়া অচিরা? যাই বল, এই নামও ঘটকেশ্বরের মতো সেকেলে কিন্তু।'

অচিরার কান্না পাচ্ছে। কলেজে পড়া ফুটফুটে মেয়ের প্রেমিক হতে গেলে রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প উপন্যাস গাঁক গাঁক করে পড়তে হবে আর ঠোঁটের গোড়ায় চরিত্রদের নাম মুখস্ত রাখতে হবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু যে মেয়ের নাম অচিরা এবং যার সঙ্গে আলাপ খোদ পঁচিশে বৈশাখে তার সঙ্গে জীবন কাটাতে হলে দু-একটা জিনিস তো জানতেই হবে। এ ছেলে তো বিরাট হাঁদা! সত্যি ঘুঁটে। একটা তো দূরের কথা। আধখানাও জানে না। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছে কি না সন্দেহ হচ্ছে। অথবা শুনলেও নিশ্চয় ভুলে গেছে। হায় রে! এত গল্প উপন্যাসের একটাও উলটে দেখেনি। অথচ স্কুলে পড়েছে। কলেজও পাশ করেছে। তবু একজনকেও চিনতে পারল না! ভয়ংকর। হরিবল। বাঙালিই তো? না-হলেই বা কী এসে যায়? আজকাল জাপানি ছেলে-মেয়েরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলে। সেদিন টিভিতেই দেখাচ্ছিল—কলকাতায় এসেছে চিনা শিল্পপতিরা, শান্তিনিকেতনে গেছে বেড়াতে। সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেছে—কোটোবারো ভেবেচিনু আপোনা বুলিয়া, টোমারো চরোনে ডিব রিডয়ও কুলিয়া...। আহা! সেই গান শুনে বাবা মুগ্ধ! মা মুগ্ধ! ছোটকা মুগ্ধ! দিদুর চোখে জল। বাবা গদগদ গলায়

বলল—'দেখ দেখ, চেয়ে দেখ একবার। এমনি একটা জাতি এত বড়ো হয় না। নিজের ভাষা নয়, নিজের দেশ নয়, অথচ কত আবেগ দেখিছিস!'

সেই বাড়িতে এই ছেলেকে জামাই করে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যতই দুঃখ হোক। নিজের মনকে দ্রুত শক্ত করল অচিরা। ইতি টানতে হবে এখানেই। দরকার হলে চোখের জল দু-ফোঁটা পড়বে। পড়লে পড়বে।

ঘটু বলল, 'আরে বাবা, গুরুদেবটা কে সেটা তো বলবে? তোমার বন্ধুদের এত নাম দিয়েছেন! ঠিক আছে বলতে হবে না, তুমি একদিন আমাকে ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে চল। তিনি চার পাঁচটা নাম বলবেন। তুমি তার থেকে একটা আমার জন্য বেছে দেবে। কোর্টে গিয়ে সেই নাম নিয়ে নিলেই হবে।'

অচিরা কঠিন চোখে ঘটুর দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘক্ষণ। তারপর লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠান্ডা গলায় বলল, 'থাক, তার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে কথা আছে ঘটু। আমার কলেজ ছুটি পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবে।'

বিবাহের ক্ষেত্রে মিউচ্যুয়াল সেপারেশন যেমন হয়, ঘটু অচিরার প্রেমের ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা হল। অচিরাই করল। তবে করল একটু অন্যরকম ভাবে। রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া দিয়ে। সে বলল, 'পঁচিশে বৈশাখ দিয়ে যা শুরু হয়েছিল বাইশে শ্রাবণেই তা শেষ করা ভালো ঘটু।'

ঘটু ঘাড় গুঁজে বসে আছে। তার ঘুম ঘুম পাচ্ছে। সেই সকাল থেকে টানা ধকল চলছে। সত্যি কথা বলতে কী সে এখনো জানে না, ঠিক কোন অপরাধে অচিরা তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শুধু বুঝতে পারছে, নাম নিয়ে একটা কোনো গোলমাল হয়েছে। নিজের বাপ-মায়ের ওপর রাগ হচ্ছে ঘটুর। বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি যা ভালো বুঝবে অচিরা। যেমন বলবে।'

অচিরা লম্বা করে নাক টানল। ভেতরে একটা কান্না কান্না ভাব।

'রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে আমাদের প্রেম হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুদিনেই আমরা সেই প্রেমের ইতি টানব।'

'টানব।'

'পরশু বাইশে শ্রাবণ। লেবুতলার ফাংশানে আমার গান আছে। তুমি আসবে। সেখানেই আমাদের শেষ দেখা হবে। এরপর তুমি আর পাঁচটা বেকার ছেলের মতো মহানন্দে পড়ে পড়ে ঘুমোতে পারবে। ভোরবেলা উঠতে হবে না।'

ঘটু বলল, 'আচ্ছা ঘুমোব।'

আজ সেই বাইশে শ্রাবণ। ঘটু চলেছে লেবুতলা। চলেছে রিকশায়। পায়ের কাছে মাইকের চোঙা। আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিও পড়ছে। বিশু ঘটুকে একটা ভাঙা ছাতা দিয়েছে। তার জন্য দেয়নি। মাইক লাইটের জন্য দিয়েছে। মানুষ ভিজুক। যন্ত্রপাতি যেন না ভেজে। ঘটু সেই ছাতা খুলে চোঙার ওপর ধরে আছে। তার মন খারাপ। অচিরা আজ তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মাইক-টাইক নিয়ে ঘটুকে রিকশা থেকে নামতে দেখে অচিরা চমকে উঠল। ভিড় থেকে সরে দাঁত কিড়মিড় করে বলল. 'আবার তুমি এসেছ!'

ঘটু আকাশ থেকে পড়ল। নীচু গলায় বলল, 'সেকী তুমিই তো আসতে বললে। বললে না?'

'তোমাকে আসতে বলেছি। এসব লটঘট নিয়ে আসতে বলেছি?'

'বিশুর লোকের টানাটানি। একা সব অর্ডার সামলাতে পারছে না। আমাকে অনেক করে বলল, তুই বাঁচা। আমি ভাবলাম যাচ্ছি যখন নিয়েই যাই...।'

অচিরা চাপা গলায় ধমক দিল। বলল, 'চোপ। খালি বাজে কথা। আজ যদি পঁচিশে বৈশাখের মতো তোমার মাইকে গোলমাল হয়েছে, মজা বুঝিয়ে ছাড়ব। সেদিন শুধু ধমক দিয়েছিলাম, আজ গলা টিপে ধরব।'

অচিরাকে আজকে বেশি সুন্দর লাগছে। মেঘ রঙের শাড়ি পরেছে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর যেরকম রং হয় মেঘের। সঙ্গে সাদা মুক্তোর মালা, সাদা দুল। চোখে যেন কী লাগিয়েছে! মনে হচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছে। মুছতে ভুলে গেছে। অদ্ভুত না?

মন খারাপের মধ্যেও অচিরার এত রাগ দেখে ঘটু ফিক করে হেসে ফেলল। শান্ত গলায় বলল, 'বাইশে শ্রাবণ এত রাগারাগি করতে নেই অচিরা।'

অচিরার গা চিড়বিড়িয়ে উঠল। চোখ পাকিয়ে বলল, 'চোপ। বেশি বাইশে শ্রাবণ দেখায়, বিরাট পণ্ডিত এসেছেন। রবিঠাকুরের কিস্স্যু জানে না।...। বড়ো বড়ো কথা...!'

ঘটু এক পা সরে এল। নীচু গলায় চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'কে বলল কিছু জানি না? একটা গান জানি। ভেবেছিলাম তোমাকে আজ গাইতে বলব। কিন্তু তোমার যা মেজাজ দেখছি সাহস হচ্ছে না।'

অচিরা থতোমতো খেয়ে গেল। এই ছেলে রবীন্দ্রসংগীত জেনে এসেছে! হয় রসিকতা করছে, নয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোনটা? মাথা খারাপ হলে ঠিক আছে। প্রেমিকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সাময়িক মাথা খারাপ হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু রসিকতা করলে বুঝতে হবে সাহস বেড়েছে। ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেও ধমক দরকার।

'কীভাবে গান জানলে? রেডিয়োতে শুনেছ?' বেঁকা চোখে তাকিয়ে বলল অচিরা।

'না নিজেই বেছেছি। কাল রাতে বড়দির গীতবিতান ঝেড়ে নিয়ে রাত জেগে বাছলাম।'

অচিরা সামান্য হাসল। বলল, 'ভাগ্যিস গীতবিতান কী সেটা অন্তত জান। তা কার জন্য গান বাছলে?'

ঘটু খুবই অবাক হল। এ আবার কী প্রশ্ন!

'কেন তোমার জন্য। তুমি গাইবে। বললাম তো!'

‘আমি গাইব! কোন গান?’

ঘটু গলা আরও নামিয়ে গান বলল। অচিরা চমকে ওঠে। হাঁদাটা বলে কী!

পঁচিশ বৈশাখের মতো বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠানে মাইকের সমস্যা হল না। সমস্যা হল অন্য। অচিরা যখন গান শুরু করল, বৃষ্টি নামল অঝোরে। তার মধ্যেই অচিরা ঘটুর বেছে আনা গান গাইতে থাকল—

‘আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে/তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণগগনতলে...।’

গান এত ভালো হল যে সবাই বৃষ্টির কথা ভুলেই গেল। ভিজেই গান শুনতে লাগল। সবথেকে বেশি ভিজল মাইকম্যান ঘটু।

কাল কী হবে কেউ বলতে পারে না। শুধু আমি পারি। কাল সকাল ছ-টা বেজে পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের ঘটু হৃষিকেশ পার্কের কোনায় চলে আসবে। বাইশে শ্রাবণের বৃষ্টিতে বিচ্ছিরি রকম ভেজার কারণে তার ঠান্ডা লেগেছে। সে ঘন ঘন হাঁচছে। অচিরা তার সামনে এসে রাগী রাগী গলায় বলবে, ‘এই যে ঘটুবাবু, দয়া করে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলুন তো। হাঁচি খুব ছোঁয়াচে রোগ।’

পুটুরানি

শর্মিষ্ঠা মিত্রকে দেখতে অতিরিক্ত সুন্দর। ঘাড় পর্যন্ত কোঁকড়ানো এক মাথা সাদাচুল। লম্বা টিকোলো নাক। চশমার পিছনের গভীর দুটো চোখে একইসঙ্গে শিক্ষা আর প্রতিভায় ঝকঝক করছে। যত বয়স বাড়ছে মানুষটা যেন আরও আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে শ্রদ্ধা জাগে। মনে হয়, এখনই দীর্ঘ গ্রীবা তুলে, মাথা হেলিয়ে উনি গেয়ে উঠবেন—।

'তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ...কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি...।'

আহা! গান শোনার দরকার হয় না, কল্পনা করলেই আনন্দে বুক ধুকপুক করে ওঠে।

দীননাথের বুকও ধুকপুক করছে। তবে ধুকপুক করছে গানের আনন্দে নয়, ধুকপুক করছে ভয়ে। শর্মিষ্ঠা মিত্রর মতো বড়ো শিল্পীর ঘরে তার মতো হতদরিদ্র মানুষ একেবরেই বেমানান। দীননাথ নিজেও সেটা বুঝতে পারছে। বুঝতে পেরে টেবিলের উলটোদিকে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতদুটো জোড় করা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, কোনো অপরাধ করে ক্ষমা চাইতে এসেছে।

ঘটনা যদিও তা নয়। দীননাথ আজ সকাল সাতটা পাঁচের লোকাল ধরে কলকাতায় এসেছে তার চোদ্দো বছরের মেয়ে পুটুরানির হয়ে দরবার করতে। এসেছে খুবই ভয়ে ভয়ে। শর্মিষ্ঠা মিত্র কোনো চাট্টিখানি বিষয় নয়। মন্দারপুরের মতো এক অখ্যাত গ্রাম থেকে তার মতো এক অতি সাধারণ একজন মানুষ দেখা করতে এলে তিনি কেন দেখা করবেন? দারোয়ান ডেকে বের করে দেবেন। দারোয়ান ঘাড় ধরে বলবে—'বেরিয়ে যাও'। আবার ঘাড় নাও ধরতে পারে। শিল্পী মানুষের দারোয়ান। তার মধ্যেও শিল্পী ভাব থাকতে পারে। হয়তো বিনয়ের সঙ্গেই বলবে—

'আপনি এবার আসুন ভাই। বেলা বাড়লে রোদ চড়বে। বাড়ি ফিরতে কষ্ট পাবেন। অনেকটা পথ। নিন, আমার হাতটা ধরেন, আমি আপনাকে সাবধানে গেট পার করে দিচ্ছি।'

আসতে চাইছিল না দীননাথ। একরকম বাধ্য হয়েই আসতে হল। একমাত্র মেয়ে পুঁটুরানি নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ধামড়া মেয়ে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দিলে তার মায়ের কী করা উচিত? উচিত চুলের ঝুঁটি ধরে দুটো থাবড়া লাগানো। এমন থাবড়া যাতে পুরো একটা দিন গালে আঙুলের ছাপ থাকে। তার বদলে মেয়ের মাও কাঁদতে বসল। ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না। স্বামীকে বলল, 'একবার যাও না। গিয়ে বল না ওনাকে। হাতে পায়ে ধর।'

দীননাথ খেপে গিয়ে বলল, 'ওর কাছে যাব! খেপেছ নাকি?'

মেয়ের মা চোখের জল মুছে ঝাঁঝ দেখাল।

'খেপব কেন? আমাদের পুঁটু কি খারাপ গায়? এতজনে এতদিন ধরে এত প্রশংসা করলে সে কি শুধুমুদু? আর পাঁচজন সুযোগ পেলে ও কেন বাদ পড়বে?'

দীননাথ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'কেমন ভালো গায় সে তো দেখতেই পেলাম। কত ছেলে-মেয়েরাই না গাইবে। কলকাতায় অত বড়ো ফাংশন হবে। শর্মিষ্ঠা মিত্রর মতো অমন বড়ো শিল্পীর সঙ্গে ছবি বেরোবে পত্রিকায়। টিভিতে দেখাবে। তোমার মেয়েই শুধু বাদ পড়লে! কেন পড়লে? ভালো গায় বলে?'

দীননাথের কথার মধ্যে যতটা না ব্যঙ্গ ছিল তার থেকে দুঃখ ছিল বেশি। মন্দারপুর বালিকা বিদ্যামন্দিরে প্রায় তিনশো মেয়ে আছে। এতদিন শুনে এসেছিল তাদের মধ্যে পুঁটুর গলাই সেরা গলা। যে-গান শোনে চট করে তুলে ফেলে। দিদিমণিরা দশ মুখে প্রশংসা করে। অবাক হয়ে বলে, 'কারো কাছে না-শিখেও এমন সুন্দর কী করে গাও তুমি!'

পুঁটু লজ্জা পেয়ে বলে, 'জানি না।'

স্কুলের হাবিজাবি যে অনুষ্ঠানই হোক, পুঁটুর ডাক পড়ে। তার গান ছাড়া ফাংশন বন্ধ। একবার তো স্বাধীনতা দিবসে মেয়ের বিরাট জ্বর এল। বড়দি নিজে রিকশ নিয়ে এসে পুঁটুকে নিয়ে গেলেন। পুঁটু জ্বর গায়ে গাইল—'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' স্কুলের মাঠ হাততালিতে ভরে গেল। কেন গেল? তাহলে কি সবাই মিথ্যে? সবাই ভুল?

মেয়ের মা বলল, 'মোটেই শুধু পুঁটু বাদ নয়, আরও অনেকেই বাদ পড়েছে। হ্যাঁরে পুঁটু কজন বাদ পড়েছে রে?'

পুঁটু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'কেউ বাদ পড়েনি মা। আমাদের স্কুল থেকে শুধু আমার নামই পাঠিয়েছিল। বড়দি বলল, শর্মিষ্ঠা মিত্র কলকাতায় খুব বড়ো ফাংশন করবেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের চেয়েছেন। আমাদের স্কুল থেকে তুমি যাবে। যাতায়াতের খরচ আমাদের।'

দীননাথ হুংকার দিয়ে বললেন, 'এসব তো জানি। আবার বলিস কেন?'

পুঁটু মাথা নামিয়ে মিনমিন করে বলল, 'আমি গানের জন্য বাদ পড়িনি।'

দীননাথ চোখ বড়ো করে বললেন, 'সে কী! গানের জন্য বাদ পড়িসনি তো কীসের জন্য বাদ পড়েছিস? নাচের জন্য? হল গান, আর তুই বাদ পড়লি নাচে? ফাজলামো হচ্ছে?'

পুঁটু নাক টেনে বলল, 'আমি গেয়েছিলাম, তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি, ওই যে আসে, আসে, আসে। শর্মিষ্ঠা মিত্র আমার গান খুব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার গলা বড্ড মিষ্টি, শুনতে খুব ভালো লাগছে। কিন্তু উচ্চারণে গোলমাল হচ্ছে। তুমি এখন থেকে উচ্চারণ প্র্যাকটিস করবে। এখন যেতে পার। কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি কি গানটা গেয়ে শোনাব তোমায়?'

দীননাথ ধমক দিয়ে উঠলেন, 'চোপ। একদম গাইবি না। আজ থেকে তোর গাওয়াগায়ি সব বন্ধ। এতবড়ো একটা সুযোগ নষ্ট করে আবার বলে কিনা গাইব? ছ্যা ছ্যা। আর পাবি এই সুযোগ? পাবি কখনো? শর্মিষ্ঠা মিত্রর মতো এত বড়ো একজন শিল্পী নিজে অনুষ্ঠান করছেন। এত বড়ো কাজ উনি আর কখনো করবেন? আবার দেড়শো বছর পরে যদি কেউ করে...ইস্...।'

দীননাথের ধমকধামকে মেয়ে এবং মেয়ের মায়ের কান্না বাড়ল। বাড়বারই কথা। সত্যি সুযোগটা বড়ো ছিল। একবার চান্স পেলে মেয়েটার ভাগ্য খুলে যেত। শর্মিষ্ঠা মিত্রর অনুষ্ঠানে গান গাওয়া মানে বিরাট ব্যাপার। যারা শর্মিষ্ঠা মিত্রর গান কখনো শোনেনি তারাও বলে, ওরে বাবা শর্মিষ্ঠা মিত্র। কাউকে কিছু না-বলে নিজেই সকালের গাড়িটা ধরল দীননাথ। মেয়ের গানের জন্য তাকে কিছুই করতে হয়নি। সে আপন মনেই গেয়েছে। শর্মিষ্ঠা মিত্রকে গান শোনাতে স্কুলের দিদিমণিরাই পুঁটুকে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়। দারোয়ানের ঘাড় ধাক্কাটা না হয় তার বাবাই খেয়ে আসুক।

দীননাথ আবার বলল, 'দিদিমণি, কোনোভাবে হয় না? একবার দেখেন না চেষ্টা করে।'

শর্মিষ্ঠা মিত্র মৃদু হেসে বললেন, 'এটা কি চেষ্টা করবার জিনিস ভাই? আমি কী করব বলুন?'

মজার কথা হল শর্মিষ্ঠা মিত্র'র বাড়িতে কোনো দারোয়ান নেই! থাকলেও চোখে পড়েনি দীননাথের। শিল্পীর ঘরের বাইরে ভিতরে ভক্তদের ভিড়। সেই ভিড় হালকা হতেই দীননাথ ঢুকে পড়েছে। শর্মিষ্ঠা মিত্র'র সামনে অজস্র কাগজ। তিনি উলটে দেখছেন। এগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট, পরিকল্পনা। পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে বিভিন্ন হলে, মঞ্চে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে এইসব অনুষ্ঠান হবে। একবার চোখ বুলিয়ে দেখার জন্য অর্গানাইজাররা শর্মিষ্ঠা মিত্র'র কাছে পাঠিয়েছে! তারা বড়ো কিছু চাইছে না। উনি যদি দু-একটা সংশোধন করে দেন বা মন্তব্য লিখে দেন তা-ই অনেক। স্ক্রিপ্টের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে।

দীননাথ মাথা চুলকে বলল, 'আপনি আর একটা সুযোগ দিয়ে দেখেন।'

এই ধরনের কথায় অন্য যে কেউ হলে ধৈর্য হারাত। শর্মিষ্ঠা মিত্র সহজভাবে উত্তর দিলেন।

'তা কি হয়? একজনকে সুযোগ দিলে যে সবাইকে দিতে হবে। তাই না? তা ছাড়া আমি যাদের বাদ দিয়েছ সংগত কারণেই বাদ দিয়েছি। রবীন্দ্রগানের বিশুদ্ধতা রক্ষা ছাড়া অন্য কিছু বিচার করিনি। মনে হয় না আমার ভুল হয়েছে। এই অনুরোধ আপনি আমায় করবেন না।'

শর্মিষ্ঠা মিত্র'র শরীর ভালো নয়। বয়স হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা বসে থেকে তিনি কাজ করতে পারেন না। অন্য সময় হলে এই স্ক্রিপ্ট দেখার বোঝা তিনি নিতেনই না। পরিশ্রমে ডাক্তারের কড়া নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু এবার ডাক্তারের কথা শুনলেন না শর্মিষ্ঠা মিত্র। বহুবছর পঁচিশে বৈশাখ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। থেকেছেন আড়ালে। এত কোলাহল তাঁর কোনোকালেই পছন্দ নয়। সবাইকে লুকিয়ে নির্জনে কোথাও গিয়ে কবিগুরুর গানে মগ্ন থেকেছেন। তাঁকে কাছে পেয়েছেন। নিভৃতে পুজো সেরেছেন। এবার কিন্তু সে-রকম হচ্ছে না। শিল্পী পঁচিশ বৈশাখের নানারকম অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। তার কারণ এবার রবীন্দ্রনাথের দেড়শোতম জন্মদিন। শর্মিষ্ঠা মিত্রর কাছে এর গুরুত্ব আলাদা। দেড়শো হিসেবে আলাদা নয়, আলাদা এত দীর্ঘ সময় ধরে একজন মানুষ কোটি মানুষের 'প্রাণের মানুষ' হয়ে টিঁকে থাকার কারণে। ভুল ভ্রান্তি, বিকৃতির বহু ঝড় ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। হচ্ছেও। শর্মিষ্ঠা মিত্র'র কাছে দেড়শো একটা উপলক্ষ মাত্র। তিনি চান এই জন্মদিনে আর একবার ঝলসে উঠতে। কবির শুদ্ধতা রক্ষায় নিজেকে উজাড় করে দিতে। তিনি যা শিখেছেন, যেভাবে শিখেছেন শেষবারের মতো তার কিছুটা এই প্রজন্মের মধ্যে রেখে যেতে। নির্ভুল, নিখুঁত রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নতুন করে জেদ চেপেছে মনে। শরীরে সেই শক্তি নেই। মনে আছে। কে না জানে শিল্পীর কাছে মনের জোরই আসল। যখন রবীন্দ্রসৃষ্টি থেকে কপিরাইট উঠে গিয়েছিল, শর্মিষ্ঠা মিত্র সাংবাদিকদের বলেছিলেন, রবীন্দ্রগান যদি নষ্ট করার চক্রান্ত হয়, তাহলে পথে নেমে ছেলে-মেয়েদের গান শেখাবেন। পত্রপত্রিকায় সে-কথা প্রচার হয়েছিল। সে-কথা রাখতে পারেননি। দেড়শো বছরকে সামনে রেখে যতটা পারা যায় চেষ্টা করছেন। প্রতীকের মতো। তাই আড়াল সরিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। শুধু পরামর্শ নয়, সরাসরি নিজেও একটা অনুষ্ঠান পরিচালনার পরিকল্পনা করেছেন। গত একবছর ধরে তাঁর প্রস্তুতি চলেছে গোপনে। একেবারে ছোটো ছেলে-মেয়েরা গান গাইবে সেখানে। খবর গোপন থাকেনি। সাংবাদিকরা জানতে পেরে তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, শুধু ছোটোরা কেন? শর্মিষ্ঠা মিত্র শান্ত গলায় বলেছিলেন, তাল, লয়, উচ্চারণ আর গায়কীর বিধিনিষেধে যদি বাঁধতে হয় তাহলে অল্পবয়েসেই বাঁধতে হবে। গান গাওয়ার শুরুতেই বোঝা দরকার রবীন্দ্রগানে সীমাবদ্ধতা অনেক। সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে যে মুক্তি সেটাই মধুর। নদী কূলের পাহারায় চলে বলেই তার

এত সৌন্দর্য। কূল ছাপিয়ে গেলে ভয়ংকর। ছোটোরা এই সত্য মানে সহজে। না-মানলে জোর করে মানাতে হবে।

শর্মিষ্ঠা মিত্র কত বছর পরে যে নিজে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন তার ঠিক নেই। চারদিকে হই চই পড়ে গেছে। কোনো কোনো পত্রিকা ইতিমধ্যে লিখেছে— সত্যি সত্যি এবার পথে নেমেছেন শর্মিষ্ঠা মিত্র। এই বয়েসে, অসুস্থ শরীরে প্রমাণ করছেন রবীন্দ্রনাথের গানই তার আসল জীবনী শক্তি। এই শক্তি তিনি জীবন দিয়ে রক্ষা করতে চান।

দীননাথ শুকনো গলায় বলল, 'দিদিমণি, আপনি বললে ঠিক হয়ে যাবে। আপনিই সব।'

'আপনি ভুল করছেন, আমি সব নই। যদি সব হতাম, তাহলেও এ-কাজ আমি করতে পারতাম না। আমাকে মাপ করবেন।'

'ছোটো মেয়ে, বেচারি অনেক আশা করেছিল। বাদ পড়েছে শুনে খুবই কান্নাকাটি করছে।'

কথাটা বলে লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নামাল দীননাথ।

গত এক বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন শর্মিষ্ঠা মিত্র। কখনো গ্রামগঞ্জের স্কুলে নিজে গিয়ে হাজির হয়েছেন, কখনো খবর শুনে ছেলে-মেয়েদের ডেকে এনে গান শুনেছেন। এখন পর্যন্ত বাছাই হয়েছে কুড়ি জন। বাদ পড়েছে দেড় হাজারেরও বেশি। বাদ দেওয়ার কাজ এখনো চলছে। বাদ দেওয়ার ব্যাপারে শর্মিষ্ঠা মিত্র খুঁতখুঁতে এবং কঠোর। এ ব্যাপারে কোনোরকম সমঝোতা করছেন না। তাঁর ধারণা তিনি যতটা চেয়েছিলেন, ততটা না-পারলেও কাছাকাছি যেতে পারছেন। কলকাতার সবথেকে বড়ো হলে ব্যবস্থা হয়েছে। পঁচিশ বৈশাখ বিকেলে সেই মঞ্চে উঠবে ছোটোরা।

'আপনার মেয়ের নাম কী? স্কুলের নাম কী? কোন ক্লাসে পড়ে?'

'আমার মেয়ের নাম পুঁটু। পুঁটুরানি। মন্দারপুর বালিকা বিদ্যানিকেতনের ক্লাস সিক্সে পড়ে।'

'পুঁটু! আমি তার ভালো নাম জানতে চাইছিলাম।'

দীননাথ অল্প উত্তেজনা অনুভব করব। ভালো নাম জানতে চাইছেন কেন? তবে এখনো কি আশা আছে?

'প্রিয়ংবদা। প্রিয়ংবদা মণ্ডল। লেখাপড়ায় ভালো নয়, নৃত্যগীতে খুবই উৎসাহী।'

টেবিলের ড্রয়ার খুলে জাবদা একটা খাতা বের করলেন শর্মিষ্ঠা মিত্র। যেসব ছেলে-মেয়েরা বাদ পড়েছে তাদের নাম, ঠিকানা রয়েছে এখানে। পাশে কেন বাদ পড়েছে সেই মন্তব্য। কাজটা পরিশ্রমের, তবু শর্মিষ্ঠা মিত্র করেছেন যত্ন নিয়ে। ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য এই কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। শুধু গবেষণাই নয়, যারা রবীন্দ্রগানকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে চাইবে তাদের কাছে এটি হবে আকর গ্রন্থের

মতো। শর্মিষ্ঠা মিত্রর মনে বাসনা রয়েছে, কোনো প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলে এখনই এটি বই হিসেবে প্রকাশ করে ফেলার। শুধু ভবিষ্যতে প্রজন্ম কেন, বর্তমানে যারা রবীন্দ্রগান করছে তারা নিজেদের ভুল ত্রুটি জানুক। খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে প্রিয়ংবদা মণ্ডলের নাম খুঁজতে লাগলেন শর্মিষ্ঠা মিত্র।

'নৃত্যগীতে উৎসাহ থাকা ভালো, কিন্তু শুধু উৎসাহ থাকলে তো চলবে না, নৃত্যগীত শিখতে হয়।'

দীননাথ খানিকটা কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ল। বলল, 'মেয়ের মায়ের খুবই শখ মেয়ে গান শেখে। তার দাদামশাইয়ের বাড়ি গান-বাজনার বাড়ি ছিল। কিন্তু আমার সামর্থ্য নাই দিদিমণি।'

'গান শেখাতে তো খুব বেশি খরচ হয় না।'

আবার লজ্জা পেল দীননাথ। বলল, 'যেটুকু খরচ তাও সমস্যা। বিনিপয়সায় কেউ কেউ লেখাপড়া দেখিয়ে দেয়, নাচ গান শেখায় না। আর বলিই-বা কী করে বলুন? শখ আহ্লাদ নিয়ে গরিব মানুষের কথা বলতে নেই। আপনি একটু দেখেন দিদিমণি, মেয়ে খুবই ভেঙে পড়েছে। খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।'

শর্মিষ্ঠা মিত্র হাসলেন। বললেন, 'সে কী! খাওয়া বন্ধ করে দেবে কেন? তবে ভেঙে পড়েছে জেনে আমি খুশি হচ্ছি। বাদ পড়ার বেদনা থেকে ওই মেয়ে নতুন করে এগিয়ে চলবার মন্ত্র পাবে।'

শর্মিষ্ঠা মিত্রর হাসি তার গানের মতোই সুন্দর। মানুষকে মুগ্ধ করে দেয়। স্বভাবও চমকে দেওয়ার মতো। এত বড়ো একজন শিল্পী, অথচ এক বিন্দু অহংকার নেই! বড়ো মানুষরা বোধ হয় এমনই হয়। নইলে অচেনা অজানা এক মেয়ের বাবাকে কেউ এতটা সময় দেয়? দীননাথ যখন ঘরে ঢুকে বলেছিল, 'দিদি, আমার একটা কথা ছিল।' উনি বারণ করেননি। শান্ত গলায় বলেছিলেন, 'বলুন।'

খাতার পাতা ওলটানো বন্ধ করলেন শর্মিষ্ঠা মিত্র।

'এই যে পেয়েছি। প্রিয়ংবদা মণ্ডল। মন্দারপুর বালিকা বিদ্যানিকেতন। আপনার মেয়ের গলা তো সুন্দর।'

দীননাথ সোজা হয়ে দাঁড়াল। দাঁত বের করে হাসল একগাল। মেয়ের গুণে গর্বিত বাবার হাসি। তারপর বড়ো করে নিশ্বাস নিয়ে বলল, 'আপনার মতো মানুষ যখন সুন্দর বলছেন, তখন আর চিন্তা নেই।'

শর্মিষ্ঠা মিত্র মুখ তুলে বললেন, 'শুধু গলা সুন্দর নয়। এই দেখুন আমি নিজে হাতে লিখে রেখেছি এই মেয়ের গান শুনলে মন ভরে যায়।'

'তবে! তবে বাদ পড়ল কেন!' অবাক গলায় বলল দীননাথ। তার ধাঁধার মতো লাগছে।

হাতের জাবদা খাতা বন্ধ করলেন শর্মিষ্ঠা মিত্র। বন্ধ করে আবার সুন্দর করে হাসলেন। নীচু অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, 'খাতায় দেখলাম লিখেছি উচ্চারণে কিছু ত্রুটি আছে।'

‘শুধু উচ্চারণের জন্য বাদ! এ কেমন কথা *দিদিমণি?’ বিড়বিড় করে বলল* দীননাথ।

চকিতে ঘাড় তুললেন শর্মিষ্ঠা মিত্র। এলোমেলো হয়ে থাকা সাদা চুল কেঁপে উঠল ঘাড়ের কাছে। ঝকঝকে চোখ দুটোকে শানিত করে বললেন, ‘শুধু উচ্চারণ! উচ্চারণকে আপনি এত সহজ করে দেখছেন! শ্রী পুঁটুরানির বাবা, রবীন্দ্রনাথের গান অত সহজ জিনিস নয়। এর বন্ধন, সুর এবং বাক্যের পারস্পরিক সংগতিবোধ আছে। নিবিড় সংযোগ আছে। উচ্চারণ যদি ঠিক না হয় সুর, তাল, মাত্রা সবেতেই টান পড়ে। গানের রসবোধে লাগে ধাক্কা। শব্দের সঠিক উচ্চারণেই ভাবের সঙ্গে সুরের মিলন মাধুর্য তৈরি হয়। সামান্য ত্রুটি সেখানে বড়ো ব্যাঘাত ঘটায়। রবীন্দ্রনাথের গানে কথাই প্রধান। সুরের সুষ্ঠু প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সেই কথা প্রাণ পায়। নিজেকে প্রকাশ করে। কথাই যদি ভুলভাবে উচ্চারিত হয়, তাহলে আর রইল কী?’

শর্মিষ্ঠা মিত্র থেমে চোখ থেকে চশমা খুললেন। রুমাল দিয়ে কাচ মুছতে লাগলেন যত্ন করে। দৃশ্যতই তিনি বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ। হতচকিত দীননাথ এইসব কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি। মনে সাহস এনে ঢোক গিলে সে বলল, ‘একটা কথা বলব?’

চোখে চশমা ফিরিয়ে নিয়ে শর্মিষ্ঠা মিত্র খানিকটা কঠিন গলায় বললেন, ‘ঠিক একটা কথাই বলবেন কিন্তু। আমার অনেক কাজ বাকি।’

‘আপনি যে বললেন পুঁটুর গানে মন ভরে গেছে...।’

মুখ তুললেন শর্মিষ্ঠা মিত্র। ক্ষণিকের জন্য যেন উত্তর খুঁজলেন।

‘ঠিকই বলেছি। কিন্তু সেই মনকে প্রশ্রয় দিইনি। রবীন্দ্রনাথ যেমন গাইতে হয় দীর্ঘ অনুশীলনের পর, তেমন শুনতেও অনুশীলন লাগে। বাইরে থেকে শুধু মন ভরালেই হয় না। ভেজাল পড়লে কোনো কোনো সময়ে খাবারের স্বাদ বাড়ে, তাকে কি মেনে নেওয়া যায়? রবীন্দ্রনাথের গানও তাই। দেখতে হয় খাঁটি পথে চলেছে কি না। নিজের শিক্ষাকে সন্তুষ্ট করতে হয়। প্রকৃত শ্রোতা জানে, রবীন্দ্রসংগীতের আবেদন যেমন কথা সুরের আড়ালে রয়েছে, তেমন কথা সুরের বেড়াজালেও রয়েছে। আপনার মেয়েকে এই বেড়াজালটি আরও ভালো করে চিনতে হবে। আমি আশীর্বাদ করি, একদিন-না-একদিন সে পারবে। তার সেই ক্ষমতা আছে। তাকে আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বলবেন।’

পুঁটুকে কী বুঝিয়ে বলবে দীননাথ? সে তো নিজেই বুঝল না। এটাই স্বাভাবিক। বড়ো মানুষের কথা হল বড়ো কথা। সে কথা সবসময় বোঝা যায় না। চেষ্টা করাটাই বোকামি। মানুষটা তার সঙ্গে যে এতটা সময় কথা বলেছে এই পরম পাওয়া। নাতি নাতনিকে গল্প করতে পারবে—‘জানিস একবার তোর মা আমাকে... আমি তো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গেলাম...।’

আজ পঁচিশে বৈশাখ। কলকাতা শহর থেকে অনেক দূরে মন্দারপুরের অচেনা

অজানা এক ভাঙা ঘরে, রাতের উঠোনে বাপ-বেটিতে বসবে মাদুর পেতে। দুজনেরই মন খুব খারাপ। একটু পরেই কলকাতার মস্ত বড়ো হলে শর্মিষ্ঠা মিত্র কুড়ি জনকে নিয়ে গান শুরু করবেন। শুরুতে তিনি কী গাইবেন তা নিয়ে পত্রপত্রিকায় খুব আলোচনা হয়েছে। কেউ লিখেছে—উনি গাইবেন, 'কী হল আমার, বুঝি বা সখী', কেউ লিখেছে উনি গাইবেন—'কে গো অন্তরতর সে'। তবে জোর দিয়ে কেউ কিছু বলতে পারেনি। অতবড়ো মানুষের কথা জোর দিয়ে বলা যায়?

পুঁটুরানি ফিসফিস করে বলবে, 'বাবা, আমি কি খুব খারাপ গাই?'

'হ্যাঁ মা, তুমি খুব খারাপ গাও।'

'আমি কবে ভালো গাইতে পারব বাবা?'

দীননাথ হাত বাড়িয়ে মেয়ের চুলে হাত বুলিয়ে বলবে, 'ঠিক জানি না মা...তবে অবস্থা এখনো খুব খারাপ। এত খারাপ যে মনে হচ্ছে তোমার ভালো গাইতে আরও দেড়শো বছরও লেগে যেতে পারে। তাতে সমস্যা কিছু নেই। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স হবে মাত্র তিনশো। তিনশো বছরের বুড়ো মানুষটা মন ভরে তোমার গান শুনবে।'

কথা শেষ করে হা হা আওয়াজে হেসে উঠবে দীননাথ। সে ভাববে, তার হাসিতে মেয়েও যোগ দেবে। পুঁটুরানি যোগ দেবে না। সে তখন মৃদু গলায় গাইবে—

'...গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে খ্যাপার মতো/সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী—/সে যে আসে আসে আসে...।'

অমাবস্যার আর দেরি নেই। আকাশে চাঁদ একফালি। সেই একফালি চাঁদ আকাশ বাতাসকে ফিসফিসিয়ে বলবে, 'আহা রে মেয়েটা বড়ো ভালো গায়! মন ভরে যায়!'

রাজার পার্ট



নাটকের আগে পরিচালকের বাড়ি পাহারা দেওয়ার কথা কেউ কখনো শুনেছে? তাও আবার খালি হাতে নয়, একেবারে লাঠিসোঁটা হাতে পাহারা? বাড়ি পাহারা হয় চোর ডাকাত তাড়াতে। এই পাহারা হয়েছিল 'রাজা' তাড়াতে। 'রাজা' দেখলেই রে রে করে তেড়ে যেতে হবে। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও ঘটনা কিন্তু সত্যি এবং একেবারে টাটকা।

কল্যাণদা আমাদের 'চ্যাম্পিয়ন' ক্লাবের নাটকের ডিরেক্টর। গত সতেরো বছর ধরে তাঁর পরিচালনায় পুজোর সময় নাটক হয়ে আসছে। সেই নাটক প্রতিবছর সুপারহিট। প্যান্ডেল, প্রতিমা, আলোয় অন্য ক্লাবের পুজো এগিয়ে থাকলেও, নাটকে আমরা সবাইকে টেক্কা দিই। অষ্টমীর দিন রাতে নাটক হয়। প্যান্ডেলের পাশেই স্টেজ। পাড়া একেবারে ভেঙে পড়ে। ভলান্টিয়াররা ভিড় সামলাতে হিমশিম খায়। নাটকের পরের কটাদিন আমরা, 'চ্যাম্পিয়ন' ক্লাবের মেম্বাররা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াই। ভাবটা এমন যেন আমাদের জন্যই নাটক এত জমেছে। কৃতিত্ব যদিও পুরোটাই কল্যাণদার।

সন্ধেবেলা ক্লাবঘরে ঢুকে সেই কল্যাণদা ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। কাঁধের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, "আমি নেই। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও বাপু।"

আমি বললাম, "নেই মানে! এই তো দিব্যি আছেন। আমরা সবাই আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। নেই বললেই হবে?"

কল্যাণদা ফোঁস ধরনের একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এখন দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু কটাদিন এভাবে চললে দেখতে পাবে না। ঘরবাড়ি ছেড়ে আমাকে পালাতে হবে। দেশ ছাড়ব। একটা ভালো দেখে পাহাড়-টাহাড়ের খবর দিয়ো। সাধু সন্ন্যাসীদের মতো সেখানে গিয়ে থাকব। কেউ খুঁজে পাবে না।"

মঞ্জিল সিরিয়াস ছেলে। সে চিন্তিত গলায় বলল, "কী বলছেন কল্যাণদা! আমরা তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। ধাঁধার মতো লাগছে। আপনি আমাদের নাটকের ডিরেক্টর। আপনি এখন পাহাড়ে গেলে কী করে চলবে?"

কল্যাণদা চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়ে বললেন, "কী করে চলবে জানি না, তবে আমি পারব না।"

শীর্ষ বলল, "কী পারবেন না?"

কল্যাণদা এবার পিঠ সোজা করে আমাদের সবার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "আমি এবার নাটকের ডিরেকশন দিতে পারব না। কিছুতেই পারব না। যা শুরু হয়েছে তাতে সত্যি আমাকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে।"

কল্যাণদার পরিচালনার নাটক এমনি এমনি সুপারহিট হয় না। সামান্য পুজো প্যান্ডেলের নাটক নিয়ে কল্যাণদা যা খাটাখাটনি করেন আশেপাশের কোনো ক্লাবের নাটক পরিচালকরা তার আদ্দেকও করে না। সারাবছর ধরে নাটক লেখেন। তারপর শুরু হয়, অভিনেতা বাছাই। আমাদের ক্লাবের নিয়ম হল, বাইরের কাউকে নেওয়া চলবে না। অভিনেতারা সবাই আমাদের পাড়ার বাসিন্দা হবে। তিন মাস আগে ক্লাবে খাতা খোলা হয়। বাঁধানো বেঁটে খাতা। খাতার ওপরে লেখা—'আমি অভিনয় করতে চাই'। সেই খাতায় নাম, ঠিকানা লেখাতে হয়। তারপর শুরু হয় বাছাই। বাছাই পর্বটি ভয়ংকর। প্রতি বছরই দুশো-আড়াইশো নাম জমা পড়ে। গত বছরই দুশো বাহান্ন জনের নাম ছিল। আসলে নাটক সুপারহিট হয় বলে সবাই অভিনয় করতে চায়। কল্যাণদা কিন্তু ভীষণ খুঁতখুঁতে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবার পরীক্ষা নেন। পছন্দ হলে তবেই চান্স। এ ব্যাপারে কোনোরকম নড়চড় হবে না। কেউ কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেছিল—"অভিনেতা বাছাবাছিতে এত সময় দেওয়ার কী দরকার? পুজোর সময়ের নাটক। একদিনের মোটে ব্যাপার।" কল্যাণদা গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছিলেন, "ওটাই সবথেকে বেশি দরকার। নাটকের গল্প, পোশাক, আলো, মঞ্চসজ্জায় গোলমাল হলে ম্যানেজ করা যায়। কিন্তু অভিনয় খারাপ হলে ম্যানেজ করা যায় না। পুরো নাটকটাই নষ্ট হয়ে যায়।"

নাটক করে কল্যাণদা 'চ্যাম্পিয়ন' ক্লাবের দুর্গাপুজোর নামডাক অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা কখনো তাঁর বিষয়ে নাক গলাই না। উনি যেমনটি চান তেমন করেন। আমরা শুধু অপেক্ষা করে থাকি এবারের নাটক কেমন হবে? গতবারের থেকে ভালো? নাকি সতেরো বছরের সেরা?

সেই কল্যাণদা যখন এসে বললেন এবার আর নাটক করব না, তখন মাথায় বাজ পড়ল।

ক্লাবে তখনো সবাই আসেনি। একজন দুজন করে ভিড় বাড়ছে। আমরা 'ভাসান কমিটি'র মেম্বাররা শুধু এসেছি। মিটিঙে বসব বসব করছি। পুজো একেবারে ঘাড়ের ওপর। এখন সকাল বিকেল দু-বেলা করে মিটিং। হাজাররকম কমিটি তৈরি হয়ে গেছে। প্রতি বছরই হয়। মণ্ডপ কমিটি, প্রতিমা কমিটি, চাঁদা কমিটি, প্রসাদ কমিটি,

আলো কমিটি থেকে শুরু করে ধুনুচি নাচ কমিটি, ভাসান কমিটি, ফাংশন কমিটি। এখানেই শেষ নয়। কমিটির সঙ্গে উপকমিটিও আছে। ইংরেজিত যাকে বলে 'সাবকমিটি'। যেমন আলো কমিটির মধ্যে আছে প্যান্ডেলের আলো উপকমিটি এবং প্যান্ডেলের বাইরের আলো উপকমিটি। নিয়ম হল, প্যান্ডেলের আলো উপকমিটির মেম্বাররা প্যান্ডেলের বাইরের আলোকসজ্জা নিয়ে কোনোরকম ট্যাঁ ফু করতে পারবে না। করলেই ঝগড়া। প্রসাদ কমিটির মধ্যেও ভাগাভাগি। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—তিন তিনটে উপ প্রসাদ কমিটি আছে। এতে পাড়ার মেয়েরা আছে। নিজেদের মধ্যে জোর লড়াই। সপ্তমীর প্রসাদে শাঁকালু থাকলে অষ্টমীতে পেয়ারা ঢুকবে। নবমী উপকমিটি তখন একঝুড়ি আপেল নিয়ে আসে। শুধু নাটক নিয়ে আমাদের কোনো কমিটি, উপকমিটি নেই। কল্যাণদার কথাই ফাইনাল। সেই কল্যাণদা বেঁকে বসলে কী করে হবে!

আর্য তাড়াতাড়ি করে কল্যাণদার পাশে চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসল। শান্ত করার ভঙ্গিতে বলল, ''আহা, কী হয়েছে সেটা তো বলবেন।''

কল্যাণদা বললেন, ''বলাবলির কিছু নেই।''

বোঝাই যাচ্ছে মানুষটা বাড়াবাড়িরকম ঝামেলার মধ্যে পড়েছেন। নিশ্চয় নাটক নিয়ে কোনো গোলমাল। হিসেবমতো এখন অভিনেতা বাছাইয়ের কাজ শেষ করে রিহার্সাল শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। নীল তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাইরে থেকে চা নিয়ে এল। কল্যাণদার দিকে এগিয়ে বলল, ''নিন, আগে গরম চা খেয়ে মাথা ঠান্ডা করুন দেখি।'' কল্যাণদা চা শেষ করলেন। ভুরু দুটো কুঁচকে আছে। দেখে মনে হল, যতটা রেগে আছেন তার থেকে বিরক্তি অনেক বেশি। কী নিয়ে বিরক্তি? শেষ মুহূর্তে নিজের লেখা নাটক মনে ধরছে না? একটু আধটু বদলে নিলেই তো হয়। স্টেজের মাপ-টাপ নিয়ে আমাদের ওপর রেগে যাননি তো? সে-রকম হলে স্টেজ কয়েক ফুট বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। এতে আর সমস্যা কী? আচ্ছা, অভিনেতা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি তো? হয়তো কল্যাণদা এবার এমন নাটক লিখেছেন যেখানে পাকাপোক্ত সব অভিনেতা লাগবে। পাড়ার লোকদের নাটক করায় উৎসাহ অনেক, কিন্তু তারা তো আর পাকাপোক্ত অভিনেতা নয়। প্রায় সকলেই প্রথম স্টেজে ওঠে। জীবনের প্রথম অভিনয়। কল্যাণদার মজা হল, উনি আবার অভিজ্ঞদের থেকে নতুনদের নিয়ে কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন। কেউ হয়তো আগে চান্স পেয়েছে, ভালো অভিনয় করে প্রশংসাও পেয়েছিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত কোনো সুযোগ নেই। তাকেও পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে। কল্যাণদা বলেন, ''আগের চরিত্রে ভালো করেছে মানে এই চরিত্রেও ভালো অভিনয় করবে এমন কোনো মানে নেই। তা ছাড়া নতুন কেউ সুযোগ পেলে তার চেষ্টা অনেক বেশি হয়। মন প্রাণ ঢেলে কাজ করে। সে ভাবে আমিও পারি, আমিও দেখিয়ে দেব। পুজোর নাটকে এটাই আসল। অভিনেতাদের মধ্যে আমিও পারি, আমিও দেখিয়ে দেব মনোভাব থাকতে হবে।''

তাহলে গোলমালটা কোথায়? আমি তো মাথা ঘামিয়েও কিছু বের করতে

পারছি না। টেনশন হচ্ছে। নিশ্চয় আমার মতো শীর্ষ, নীল, মঞ্জিল, মন্দারেরও টেনশন হচ্ছে। কল্যাণদা মানুষটা ভালো। তিনি মিছিমিছি রাগ, বিরক্ত দেখাবেন না।

মন্দার বলল, "নিন, কল্যাণদা এবার ঘটনা বলুন।"

কল্যাণদা বললেন, "বলে লাভ হবে না।"

আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম, "নাটক নিয়ে কোনো গোলযোগ হয়েছে? আমাদের কিন্তু খুব চিন্তায় ফেললেন।"

কল্যাণদা একটুখানি চুপ করে রইলেন। মনে হয়, আমাদের টেনশন আঁচ করতে পারলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, গোলযোগ নাটক নিয়ে। কিন্তু সেই গোলযোগ শুনে তোমরা কিছু করতে পারবে না। পরিস্থিতি খুবই জটিল।"

এবার আমরা সবাই মিলে কল্যাণদাকে চেপে ধরলাম। বললাম, "ঘটনা না-শুনে কিছুতেই ছাড়ব না।"

কল্যাণদা বললেন, "ঘটনা শুনতে হলে আগে তোমাদের নাটকের গল্পটা জানতে হবে।"

আমরা ডবল উৎসাহ নিয়ে বললাম, "অবশ্যই শুনব।"

কল্যাণদা গল্পটা বললেন।

দারুণ মজার নাটক! রূপকথা, আবার রূপকথাও নয়! রূপকথার সঙ্গে মিশে আছে এই সময়ের অনেক কিছু। নাটকে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকন্যা, রাজকুমার সবাই আছে। আবার রাজার কানে আছে মোবাইল ফোন, মন্ত্রীর হাতে ল্যাপটপ। রাজকন্যা মেকআপ বক্স নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, রাজকুমার ফেসবুকে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে ব্যস্ত থাকে। রানিমা অন্দরমহলে বসে সোনার বাটা থেকে পান বের করে কুটুস করে পান খান আর টিভিতে দুঃখের সিরিয়াল দেখে ফিচফিচ করে কাঁদেন! সেনাপতি ঢাল তলোয়ারের পাশাপাশি বন্দুকের নল পরিষ্কার করে। রাজসভার গায়কদের হাতে এস্রাজ, বীণা যেমন আছে, তেমন গিটারও পিছন থেকে উঁকি মারে। অন্য রাজাদের মতো এই রাজাও বাইরে বের হন হাতির পিঠে চড়ে। তবে হাতির সামনে সাইরেন বাজে, হাতির মাথায় লাল আলো জ্বলে দপদপ করে। রাজা বেরোবেন শুনলে মন্ত্রীর লাল আলো নিয়ে ছোটাছুটি করে। মাহুত মুখ গোমড়া করে বলে, "সাইরেনের আওয়াজ শুনলে হাতি যে খেপে যায় মন্ত্রীমশাই।" রাজা শুনে হুংকার দিয়ে বলেন, "ফাজিল হাতির কান ধরে চড় লাগাও। বেটার এত বড়ো সাহস! রাজার কথা অমান্য করতে চায়।" আমরা নাটকের গল্প শুনতে শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়লাম। সময়টাই যাচ্ছে গুলিয়ে। কখনো মনে হচ্ছে আগের সময়ের গল্প, কখনো মনে হচ্ছে এই সময়ের গল্প। নাটক আরও খানিকটা এগোনোর পর দেখা দেবে নানারকম সমস্যা। রাজার মোবাইলে সিগন্যাল নেই। মন্ত্রীর ল্যাপটপে সফটওয়্যার গড়বড় করছে। দুর্বল ইন্টারনেটের জন্য রাজকুমার ফেসবুক খুলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাচ্ছে। রাজকন্যা তার মেকআপ বক্সের জন্য পিঙ্ক পার্ল লিপস্টিক পাচ্ছে না। বাজারে লোক পাঠিয়েও লাভ হচ্ছে

না। তারা খালি হাতে ফিরছে। বেচারি রাজকন্যা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে। সেনাপতি রাজার কাছে কমপ্লেইন করেছে, তার সৈন্যরা ঢাল তলোয়ার জানে, কিন্তু গুলি বন্দুক নিয়ে হিমশিম খায়। সমস্যায় সমস্যায় রাজা একেবারে জেরবার। এই সময়ে রানি তাকে জানালেন, তাঁর অন্দরমহলের টিভিতে নাকি সব চ্যানেল আসে না। ফলে অনেক সিরিয়াল তিনি দেখতে পান না। আজই এর একটা বিহিত করতে হবে। রাজ্যের রানি হয়ে তিনি যদি পছন্দমতো টিভি সিরিয়াল দেখতে না-পান তাহলে রাজত্ব রেখে লাভ কী? এরপরই রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন, অনেক হয়েছে। আর নয়। আর পুরোনো সময়ে পড়ে থাকবেন না। তল্পিতল্পা গুটিয়ে সবাইকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে আধুনিক সময়ে চলে যাবেন। সেখানে রাজত্ব না-থাকুক মোবাইল ফোনের সিগন্যাল, ল্যাপটপের সফটওয়্যার, ইন্টারনেট কানেকশন, টিভি সিরিয়াল তো থাকবে। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যাবে, গোটা রাজপরিবার হাতে ব্যাগ, সুটকেস, কাঁধে ঝোলা নিয়ে রওনা হয়েছে।

নাটক শুনে আমরা হাততালি দিয়ে উঠলাম। কোনো সন্দেহ নেই, এই নাটক সতেরো বছরের সেরা নাটক হতে চলেছে। তাহলে ঝামেলা কীসের? কল্যাণদা এবার ঝামেলার কথা বললেন। ঝামেলা শুনে আমরা অবাক। এমনও হয়?

নাটক জমজমাট লিখলেও কল্যাণদা মনের মতো 'রাজা' খুঁজে পাচ্ছেন না। অভিনয় পরীক্ষায় যারা পাশ করেছে তাদের দিয়ে সব পার্টই হচ্ছে, কিন্তু রাজার পার্টে আটকে যাচ্ছে। যাকেই নিচ্ছেন সে ফেল মারছে। শিখিয়ে পড়িয়েও হচ্ছে না। রাজার মধ্যে একটা নির্লোভ ভাব থাকতে হবে। অতবড়ো রাজত্ব ছেড়ে চলে যাওয়া তো মুখের কথা নয়। এদিকে খবর রটে গেছে, রাজা পাওয়া যাচ্ছে না। খবর শুনে অভিনেতারা সকলেই রাজার পার্টের জন্য লাফিয়ে পড়ল। রাজরাজড়া নিয়ে নাটক এই প্রথম। আবার কবে হবে তার ঠিক নেই। হয়তো হবেই না। সকলেই ভাবছে একবার রাজা সাজতে পারলে প্রেস্টিজ বিরাট। কটাদিন পাড়ায় বুক ফুলিয়ে চলা যাবে। অনেককেই কল্যাণদা ধমক দিয়ে ভাগিয়েছেন। কাউকে কাউকে বুঝিয়ে বলেছেন, বাস্তবে রাজা মন্ত্রীর আলাদা গুরুত্ব থাকতে পারে, নাটকে সবাই সমান। তবে ধমক বা বোঝানোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লাভ হয়নি। রাজা সাজার জন্য আবেদন নিবেদন ক্রমশ বাড়ছে। শুধু তাই নয়, যারা গোড়াতে অভিনয় পরীক্ষায় ফেল মেরেছিল তাদের কেউ কেউ মিষ্টির বাক্স হাতে কল্যাণদার বাড়িতে গিয়ে হাজির হচ্ছে। আর একবার যদি সুযোগ পাওয়া যায়। পাড়ার এক নেতা নাকি কার হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন—'মাননীয় পরিচালকমশাই, পত্রবাহক আমার ভাইপো। দেখতেই পাচ্ছেন চেহারা সুন্দর। লম্বা চওড়া, গায়ের রং ফর্সা। আমার বিশ্বাস রাজার ভূমিকায় একেই সবথেকে বেশি মানাবে। তবে ছেলের গলার আওয়াজটা একটু মিনমিনে। তাতে কী এসে যায়? সব রাজার যে গলার আওয়াজ গমগমে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। মিনমিনে গলার রাজা কি ইতিহাসে নেই। বড়ো কথা হল পত্রবাহক আমার ভাইপো। আশাকরি আপনি একেই সুযোগ দেবেন।' মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে

টেলিফোন আসছে। ছেলের বাবা-মা সেই ফোনে কল্যাণদার কাছে কান্নাকাটি করছে। একবার রাজার পার্ট পেলে ছেলের ভবিষ্যৎ নাকি খুলে যাবে। আজকাল বড়ো বড়ো চাকরির ইন্টারভিউতে নাচ, গান, অভিনয়তে নম্বর দেওয়া হয়। রাজার পার্ট পেলে নম্বর একেবারে হু হু করে বাড়বে। গত রবিবার দুপুরে লোকাল থানার ওসি তার শালাকে নিয়ে হাজির হলেন। সেই ছেলে একেবারেই রোগা পাতলা। রাজা তো দূরের কথা বড়োজোর তালপাতার সেপাইয়ের রোলে তাকে মানাতে পারে। কিন্তু ওসি সাহেব একেবারে নাছোড়বান্দা। তিনি কল্যাণদাকে বলছেন, শালা যদি 'রাজা' হতে পারে তাহলে কল্যাণদার আর চিন্তা নেই। চোর ডাকাত কোনোদিন বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দেবে না। তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। তিতিবিরক্ত কল্যাণদা এরপর বাড়ির দরজায় নোটিশ লাগালেন—'রাজার পার্ট চাহিয়া লজ্জা দিবেন না।'

এতে ভিড় কমল। কল্যাণদা ভাবলেন, যাক ঝামেলা কেটেছে, এবার মন দিয়ে 'রাজা' খোঁজা যাবে। কিন্তু শনিবার চরম ঘটনা ঘটে গেছে।

কল্যাণদার বৃদ্ধা মা গিয়েছিলেন বোনের বাড়ি। ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। রিকশ চেপে ফিরছিলেন। বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখেন গেটের পাশে অন্ধকারে কী যেন একটা নড়াচড়া করছে! জিনিসটার সাজ বড়ো কিম্ভূত। গায়ে ঝলমলে জোব্বা, মাথায় চকমকে পাগড়ি, কোমরে তলোয়ার দুলছে! কল্যাণদার বৃদ্ধা মা ভয় পেয়ে "ভূত, ভূত" বলে রিকশ থেকে লাফ দিলেন এবং গর্তে পড়ে পা মচকালেন। চিৎকার শুনে বাড়ির ভেতর থেকে কল্যাণদারা সবাই ছুটে এলেন। বিরাট হইচই শুরু হয়ে গেল। কী ব্যাপার না, আমাদের পাড়ার ভণ্ডুরামজি ভয়ংকর কাণ্ড করেছেন। তিনি কোনো ঝুঁকি নেননি। প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করে রাজার পোশাক বানিয়ে ফেলেছেন। একেবারে ঢাল তলোয়ার সমেত। সেই পোশাক পরে সোজা চলে এসেছেন কল্যাণদার বাড়ি। পোশাক দেখে যদি পরিচালকের মন গলে, রাজার পার্টে সুযোগ পাওয়া যায়। ভণ্ডুরামজির খরচ করতে অসুবিধে নেই। তার বিরাট ঝোলাগুড়ের কারবার আছে। তিনি ভেবেই রেখেছিলেন, 'রাজা' হতে পারলে নাটকের পুরো খরচ তিনি দেবেন। পরিচালকের বৃদ্ধা মা যে ঠিক ওই সময় রিকশ চেপে বাড়ি ফিরবেন এবং তাঁকে দেখে 'ভূত' ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এটা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না।

ঘটনা শেষ করে কল্যাণদা কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন, "তোমরাই বল, এরপরে নাটক করা যায়? আমার মা বেচারি এখনো যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। নিশ্চিন্ত হয়ে যে মনের মতো রাজা খুঁজব সে উপায়ও নেই। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে। কেন যে মরতে এমন নাটক লিখতে গেলাম। খুব বোকামি হয়ে গেছে। এখন আর সময়ও নেই যে নতুন করে লিখব। তাই বলছিলাম, এবার আর পারব না। নাটক ক্যানসেল।"

মঞ্জিল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আলবাত পারবেন। একশোবার পারবেন।"

নীলও জোর গলায় বলল, "শুধু পারবেন না, এই নাটকটাই হবে।"

আর্য বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত মনে মনের মতো রাজা খুঁজুন কল্যাণদা। বাকিটা আমরা দেখছি।"

এদের কথায় কল্যাণদা খুব একটা আশার আলো দেখলেন বলে মনে হল না। বললেন, "এতগুলো নকল রাজা আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তাদের হটিয়ে আসল জনকে যে কী করে বের করে আনব বুঝতে পারছি না...।"

আমি বললাম, "আসল রাজাকে ধরে আনার দায়িত্ব আপনার, সে আমরা পারব না। কিন্তু নকল আর লোভী রাজাদের হটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যান।"

কল্যাণদা চিন্তিত মুখেই বাড়ি গেলেন। আমরা বসলাম মিটিঙে। নাটক নিয়ে কমিটি নেই, সুতরাং 'ভাসান কমিটি'র মিটিং করতে বাধা কোথায়? তা ছাড়া এও একরকমের ভাসান। দুর্গাপুজোর আগেই নাটকের ভাসান হয়ে যাচ্ছে! এ হতে পারে না। মিনিট দশ পনেরোর আলোচনাতেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। সেদিন রাতেই ক্লাবের সকলকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হল।

পরদিন সকাল হতেই কল্যাণদার বাড়ি ঘিরে বসল 'চ্যাম্পিয়ন' ক্লাবের পাহারা। খালি হাতে নয়, একেবারে লাঠি হাতে পাহারা দিল ছেলেরা। পাহারা চলল সেই রাত বারোটা পর্যন্ত। দু-একজন 'রাজা' হতে চেয়ে কল্যাণদার বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করছিল। আমরা রে রে করে তেড়ে গেলাম। বেটারা পালানোর পথ পায় না। পাড়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ল খুব তাড়াতাড়ি। 'রাজা' হতে গেলে বিপদ আছে। পিঠে দু-ঘা পড়তে পারে। সত্যি সত্যি মারতে হল না কাউকেই। দু-দিনেই সব পরিষ্কার। যাকে বলে 'অল ক্লিয়ার'। কেউ আর ওদিকে ঘেঁষল না।

মজার ব্যাপার হল, কল্যাণদাও মনের মতো 'রাজা'ও পেয়ে গেলেন। আমাদের 'তেলেভাজা গোবিন্দ'! বাজারের ওপর গোবিন্দর তেলেভাজার দোকান সেই কারণে নাম 'তেলেভাজা গোবিন্দ'। সেই দোকানে মুড়ি বেগুনি খেতে খেতে কল্যাণদা একদিন আবিষ্কার করলেন গোবিন্দর মধ্যে একটা স্বাভাবিক 'রাজা রাজা ভাব' আছে। দিনের খরচপাতি উঠে গেলেই সে উনুন থেকে কড়া নামিয়ে ফেলে। তারপর বেঞ্চে চিত হয়ে শুয়ে পা নাচিয়ে গুনগুন করে গান ধরে। এই সময় কেউ তেলেভাজা কিনতে এলে ঝুড়িতে রাখা আলুর চপ, বেগুনি, ফুলুরি বিলিয়ে দেয় বিনা পয়সায়। ফুরিয়ে গেলে হাত জোড় করে বলে, 'কাল আসেন, আজ ডবল দাম দিলেও আর বানাতে পারব না। আমার মুড নাই।" কল্যাণদা মুগ্ধ হলেন। গোবিন্দকে অভিনয়ের কথা বলতে গোবিন্দ খুবই লজ্জা পেল। রাজার পার্ট শুনে তো আঁতকে উঠল। "আমাকে ছেড়ে দেন, আমাকে ছেড়ে দেন" বলে হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। কল্যাণদা কোনো কথা শোনেননি। গোবিন্দকে জোর করে ধরে নিয়ে যান বাড়িতে।

গোবিন্দ রাজার পার্ট কেমন করল? নাটক শেষ হওয়ার পর টানা পনেরো মিনিট ধরে হাততালি পেয়েছে। ভণ্ডুরামজি সোনার মেডেল দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। গোবিন্দ হাত জোড় করে বলল, "গরিব মানুষ, দোকানেই রাত কাটাই। সোনার মেডেল রাখব কোথায়? ও জিনিস আমাকে দেবেন না স্যার।"

ঝড়ের রাতে

অতিরিক্তরকম নার্ভাস হয়ে পড়লে মানুষের দু-রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। হয় অল্প অল্প ঘাম হয়, নয়তো হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। অর্কর একইসঙ্গে দুটোই হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে, আবার হাত পা ঠান্ডাও হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, শরীরের যাবতীয় গ্ল্যান্ড ফাংশন এলোমেলো হয়ে পড়েছে। তারা ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না।

অর্ক এমনিতেই একজন নার্ভাস প্রকৃতির ছেলে। তার ওপর ঘটনা যা ঘটেছে তাতে সেই নার্ভাস ভাব বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। কপালের সঙ্গে, অর্কর নাকের দু-পাশেও ঘাম জমেছে এখন। শুধু হাত পা ঠান্ডা হয়নি, শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে চিনচিনে ঠান্ডা ভাব একবার উঠছে, একবার নামছে। সে শিমুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা কী হল!'

শিমুল কাঁধের ব্যাগটা সোফার ওপর ছুড়ে ফেলে হাসিমুখে বলল, 'কোনটা?'

শিমুল বেশিরকমের সুন্দরী। বড়ো বড়ো চোখ, টিকোলো নাক, টানা ভুরু আর এক মাথা কোঁকড়ানো চুলের মধ্যে একটা ঝলমলে ভাব রয়েছে। দেখলে মনে হয় না তার বয়স এখন চব্বিশ বছর তিনমাস, মনে হয় না মাত্র এক বছর হল সে মাল্টিন্যাশনাল এক ব্যাঙ্কে সিস্টেম প্রোগ্রামার হিসেবে চাকরিতে যোগ দিয়েছে এবং এক বছরের মধ্যেই প্রোমোশন পেয়েছে। মনে হয়, এই মেয়ের বয়স এখনো আঠেরো-উনিশ। কলেজে যাওয়ার জন্য এখনই মাথায় ঝুঁটি বেঁধে তৈরি হবে। ঝুঁটি বাধার সময় তাড়াহুড়ো করে মাথার ক্লিপ খুঁজবে। ক্লিপ খুঁজে না-পেয়ে খোলা চুলেই ছুটবে। তার ওপর আজ তার সাজগোজের মধ্যে একটা 'খুকি খুকি' ভাব রয়েছে। সাদা ক্যাপরির ওপর নীল টপ পরেছে। টপের বাঁ-দিকে অল্প একটু নকশা। নকশা কলার থেকে কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় ফুলপাতা। কাছে এলে বোঝা যায় সেসব কিছু নয়। খানিকটা সুতোর হাবিজাবি। সুন্দর মেয়ের গায়ে

আছে বলে সেটাই চমৎকার লাগছে। শিমুলের পায়ে স্নিকার। সোফায় বসে পা দুটো লম্বা করে সামনে ছড়িয়ে দিল শিমুল। ছিপছিপে শরীরে একইসঙ্গে ক্লান্তি আর আলসেমির ভঙ্গি। ঘরের ঝলমলে আলোয় তার ক্যাপরি থেকে বেরিয়ে থাকা ফর্সা পা দুটো আকর্ষণীয় লাগছে।

অর্ক কোনোরকম আকর্ষণ বোধ করল না। উলটে তার গা বিরক্তিতে চিড়বিড় করে উঠল। নিজের নার্ভাস ভাব গোপন করে রাগ রাগ গলায় বলল, 'মানে আবার কী, যা ঘটল তার কথা জিজ্ঞেস করছি।'

শিমুল ফের হাসল। হাসতে হাসতেই সোফার একপাশ থেকে অন্যপাশে গেল। সোফার গদি বড়ো আর নরম। সামান্য নড়াচড়াতেই যেন ঢেউ খেলে ওঠে!

'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন অর্ক? আমি তো কিছু ঘটাইনি।'

'তুমি হাসছ!' অর্ক অবাক হয়।

'হাসব না তো কী করব? কাঁদব?'

এবার 'হো হো' আওয়াজ করে হাসল শিমুল। যে চার-পাঁচটি কারণে অর্ক এই মেয়ের প্রেমে পড়েছে তার একটা হল এই হাসি। অর্ক হয়তো স্বীকার করবে না, কিন্তু সম্ভবত এটাই কারণ নম্বর ওয়ান। শিমুলের হাসি, শিমুলের আর অন্য সব কিছুর থেকে সুন্দর। যতবারই দেখে ততবারই অর্ক এত মুগ্ধ হয় যে মনে হয় এই সৌন্দর্য সে জীবনে প্রথম দেখছে। কিন্তু এই মুহূর্তে মুগ্ধ হওয়ার বদলে তার রাগ হচ্ছে। কপালের ঘাম মোছার জন্য পকেট হাতড়ে রুমাল বের করতে গেল অর্ক। না, রুমাল নেই। উফ!

শিমুল সামান্য সরে এসে আধো আধো গলায় বলল, 'অর্ক, তুমি কি রাগ করছ?'

অর্ক নাক দিয়ে ফোঁস করে আওয়াজ বের করে বলল, 'না, রাগ করব কেন? খুব খুশি হচ্ছি। তোমার এই দাদা বউদির কাণ্ড দেখে হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করছে। এতদূর ডাকার পর... কত বড়ো ইরেসপনসিবল হলে এ-রকম করে একবার ভেবে দেখেছ?'

স্নিকার পরা ডান পাটা বাঁ-পায়ের ওপর আরাম করে তুলে দিয়েছে শিমুল। সেই পা নাড়াতে নাড়াতে শান্ত গলায় বলল, 'এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না অর্ক। তুমি কন্ডিশন ব্রেক করছ। বলেছিলে বিয়ের পর এক বছর আমার ওপর কোনো কারণে রাগ করবে না। এক সপ্তাহ কাটতে-না-কাটতে তুমি সেই শর্ত ভাঙছ।'

অর্কর রাগ আরও বাড়ল। শিমুলের কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যি সে এ-রকম বলেছিল। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? প্রেম করার সময় মানুষ অনেক কথাই বলে। সেগুলো কেউ ধরে বসে থাকে না। বসে থাকা যায়ও না। তা ছাড়া যেভাবে গত শনিবার দুম করে তাদের রেজিস্ট্রি হয়েছে তাকে কি ঠিক 'বিয়ে' বলা যায়? বিবাহিত হলেও তারা এখনো একসঙ্গে থাকে না। এমনকী হাতে গোনা দু-একজন ছাড়া কেউ তাদের বিয়ের খবর জানেও না। শিমুলের বাবা-মা অন্য জায়গায় বিয়ের জন্য

মেয়ের ওপর ভীষণ চাপ দিচ্ছেন। সেই কারণেই একটা 'লিগ্যাল প্রোটেকশন' নেওয়া হয়েছে মাত্র। আইন দিয়ে ঢাল বানানো। অর্কর এই বিয়েতে মোটেই সায় ছিল না। তার মতে এটা বাড়াবাড়ি হয়েছে। তাদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল। সে যতক্ষণ না একটা চাকরি পায় সেই পর্যন্ত অপেক্ষা। একটা বেকার ছেলে কথা নেই বলা নেই বিয়ে করে বসল! ছি ছি। লোকে শুনলে কী বলবে? শিমুলের তাড়াহুড়োর জন্য অবিবেচকের মতো কাজটা তাকে করতে হয়েছে। শিমুলের উচিত ছিল নিজের বাবা-মাকে বোঝানো। তাদের কাছ থেকে সময় নেওয়া। যতই সাক্ষী সাবুদ নিয়ে গিয়ে সই করে আসুক অর্ক এটাকে 'বিয়ে' বলে মানতেই পারছে না।

মেয়ের বাপ-মায়ের অবশ্য দোষ নেই। হঠাৎই হাতের কাছে লোভনীয় এক পাত্র এসে হাজির হওয়ায় তারা শিমুলের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। ছেলের বয়স একটু বেশির দিকে। সেটা কোনো ব্যাপার নয়। ব্যাপার হল, পাত্র প্রবাসী। আমেরিকার ফেমিংহাম শহরে নিজের ব্যাবসা। ফেমিংহাম বস্টন থেকে মাত্র এক ঘণ্টার ড্রাইভ। বিরাট গ্রসারি শপ। শুনতে মুদির দোকান মনে হলেও পাত্রবাবুর পয়সাকড়ি অগাধ। তেল, ডাল, নুন থেকে শুরু করে আখের গুড় পর্যন্ত কী না-পাওয়া যায় সেখানে। আসলে ওই ছেলের রয়েছে ফেলে যাওয়া বাংলার প্রতি হাবুডুবু ধরনের প্রেম! পা বিদেশে মন বাংলায়। নিজের জন্য পাত্রী খুঁজতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—'বাঙালি, ঘরোয়া, কমবয়সি, গৃহকর্মে নিপুণা, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। রবীন্দ্রসংগীত জানা বাধ্যতামূলক। শাক, ওল, মানকচু, থোড় ইত্যাদি রন্ধন প্রণালীর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তৎসহ বড়ি তৈরিতে পারদর্শিতা থাকলে ভালো হয়।' প্রাচুর্যের কোনো অভাব নেই। পাত্রের নিজের তিনটি গাড়ি এবং একটি ভ্যান রয়েছে। বাড়ির ছাদে সুইমিং পুল। তাতে হট ওয়াটারের ব্যবস্থা। বাগানে টেনিস কোর্ট।

বিজ্ঞাপন খুবই ইন্টারেস্টিং। আমেরিকাবাসী পাত্রের মানকচু স্পেশালিস্ট বউ চাওয়া সহজ কথা নয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই শিমুলের মা বিশেষ উৎসাহ বোধ করলেন। ছেলের শাক পাতা, বড়ি, রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি দরদ এবং ব্যাঙ্ক ব্যালান্স তাকে মুগ্ধ করল। তিনি গোপনে মেয়ের ছবিসহ সিডি মেলে পাঠিয়ে দিলেন। যদিও বড়ি তৈরি এবং শাক রান্না বিষয়ে শিমুলের কোনো জ্ঞান নেই। কার্যত মাইক্রোআভেনে দু-একটা শখের খাবার তৈরি ছাড়া সে রান্নাবান্নার কিছু জানেই না। জানতে চায়ও না। মেয়ের মায়ের অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। কথাবার্তা এগোলে এসব শেখাতে কতক্ষণ? সাত থেকে দশদিনের একটা ক্র্যাশ কোর্সে হয়ে যাবে। সল্টলেকে ছোটো বোনের ননদের বাড়িতে না হয় দিনকতক গিয়ে থাকবে। সেই মেয়ে নিরামিষ রান্নাবান্নায় এক্সপার্ট। ঝটপট শিখিয়ে দেবে। শিমুলের মাথাও পরিষ্কার। কম্পিউটার নাড়াঘাটায় যে এত ওস্তাদ, তার ওলকচু, মানকচু ম্যানেজ করতে কতক্ষণ? তিনি নিজেও যে একেবারে কিছু পারেন না এমন নয়। যদিও

সংসারে এসব খাওয়ার লোকের খুবই অভাব। শিমুল তো ছোঁয়ই না, শিমুলের বাবারও খাওয়াদাওয়ার আবদার নেই। ফলে বহু বছর তাকে আর এসব করতে হয় না। করতে হলেও একেবারে ন-মাসে ছ-মাসে। এ ছাড়া গানের ব্যাপারটাও আছে। ডিপ্লোমা, ডিগ্রি না-থাকলেও শিমুলের গানের গলা ভালো। স্কুলজীবনে সিনথেসাইজার কিনেছিল শখ করে। কলেজ পর্যন্ত টেনেছিল। অক্টোপাস না হিপোপটেমাস কী যে ছাইভস্ম নামে একটা ব্যান্ডে গানও গেয়েছে ক-দিন। গান তো নয়, চিৎকার। সেসব বন্ধ হয়েছে অনেক বছর। তবে এখনো গুনগুন করে খালি গলায় মাঝে মাঝেই গান করে। তার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত দু-একটা থাকে এই যা। সবথেকে বড়ো কথা হল, বিজ্ঞাপন দেখেই ছেলের মন বোঝা যাচ্ছে। এটা খুব বড়ো জিনিস। মানুষ দেখেও আজকাল আর মানুষের মন বোঝা যায় না। তাকে ধরা যায় না। সেই জায়গায় মাত্র দু-এক লাইনেই ছেলে ধরা দিয়েছে। এই ছেলে 'হিরের টুকরো' না হয়ে যায়ই না। দেখাই যাক না একবার। এইসব ভেবেই মেয়ের ফটো পাঠিয়ে দেওয়া হল সুদূর আমেরিকায়। তিনদিনের মাথায় উত্তর। ফটো পাত্রের পছন্দ। কলকাতায় এসে ফাইনাল কথা বলতে চায়। তবে একটা ব্যাপারে খুব কড়া। বিয়ের পর মেয়ের কিছুতেই চাকরিবাকরি করা চলবে না। ঘর সংসারে মন দিতে হবে। যা এতদিন শিমুলের কাছে তার মা-বাবা গোপন করেছিল, তা এবার বলতেই হল।

তারপর থেকেই গোলমাল।

গোলমালের প্রথম পর্যায় ছিল শান্তিপূর্ণ। পরের দিকে অবস্থা জটিল হল।

শিমুলের মা বললেন, 'ঘর সংসারেই মেয়ের আসল পরিচয়। এখানে তো আর তোকে ঝিয়ের মতো খাটতে হবে না, দু-একটা রান্নাবান্না আর ছেলেপুলে মানুষেই হ্যাপা শেষ। চোখ বুজে রাজি হয়ে যা শিমুল। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।'

'না-পাওয়া গেলেই মঙ্গল।'

'অমন করে বলছিস কেন? আমেরিকায় গিয়ে ঘর সংসার পাতবি, এ কী চাট্টিখানি কথা হল? ছেলের নিজের বাড়ি। অতগুলো গাড়ি। ছাদে সুইমিং পুল। গিয়ে টেনিস খেলা শিখে নিবি।'

'কে বলেছে মা চাট্টিখানি কথা? খুবই কঠিন কথা। কিন্তু আমি অত কঠিন কাজ করতে পারছি না।'

'এক কাজ কর, নিজে একবার ছেলের সঙ্গে কথা বল।'

'কী কথা বলব? বড়ির কীভাবে নাক তোলে? নাকি নটে শাকের রেসিপি?'

'আহা, রেগে যাচ্ছিস কেন? বিদেশে গিয়ে কত ছেলে-মেয়ে বখে যায়, এই ছেলে তো সে-রকম নয়। একটু বাঙালি রান্না খেতে চায়, বাংলা গান-বাজনা পছন্দ করে। যদি বলিস আমি তোর মেল আই ডি পাঠিয়ে দিই।'

শিমুল বলেছে, 'এ-বিষয়ে আর একটা কথাও নয় মা।'

শিমুলের মা বললেন, 'কেন? কথা নয় কেন? আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে আমি কথা বলব না তো কে বলবে? তুই?'

'কেউ বলবে না।'

মহিলা রাগে চোখ-মুখ লাল করে বললেন, 'আমি খবর পেয়েছি, তুমি আজকাল আজেবাজে ছেলেপিলেদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছ শিমুল। দু-পয়সার চাকরি করে আমার মাথা কিনে নিয়েছ নাকি?'

শিমুল হেসে বলেছে, 'তোমার মাথা কিনিনি, নিজের মাথা কিনেছি। আর সেই কারণেই চাকরি ছেড়ে আমেরিকা কেন, চাঁদে গিয়েও হেঁশেল ঠেলার মধ্যে নেই। ও ওখানে তো আবার হেঁশেল হয় না। উনুনের বদলে আভেন আর ঝাঁটার বদলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। শুনেছি আজকাল রোবট সিস্টেম চালু হয়েছে। কাজে বেরোনোর আগে প্রোগ্রামিং করে দিলেই হল। ফিরে এসে দেখা যাবে ঘরদোর সাফাই হয়ে গেছে। সরি মা, এই সবের মধ্যে আমি নেই।'

এই গোলমালের পরেও বাড়ির পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়নি। বরং উত্তাপ বেড়েছে। শিমুলের বাবাও গোলমালে প্রবেশ করেছেন এবং পুরোপুরি স্ত্রীর পক্ষ নিয়েছেন। নেওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্য কেউ হলেও নিত। সন্তানের এমন উজ্জ্বল, নিশ্চিন্ত জীবনের সুবর্ণ সুযোগ তিনি হেলাফেলা করতে পারবেন কেন? তিনি তো আর উন্মাদ নন।

সব ঘটনা শুনে অর্ক গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'ছেলে কেমন?'

শিমুল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কোন ছেলে?'

'কোন ছেলে আবার? যার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে।'

'ছেলে চমৎকার।'

অর্ক ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন? চমৎকার কেন?'

'সরু একটা গোঁফ আছে। হালকা ভুড়ি। সন্ধের পর বাড়িতে ফিরে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে। গান শোনে।'

অর্কর ভুরু আরও গভীর হল।

'কী করে জানলে? ফটো দেখেছ?'

'না। ওসব আমি দেখিনি।'

'তবে?'

'সিভি দেখে মনে হল। এ ছেলে সারাদিন গুড় বাতাসা বিক্রির পর পায়জামা পাঞ্জাবি পরে।'

অর্ক লম্বা নিশ্বাস টেনে বলল, 'তুমি কি রসিকতা করছ?'

শিমুল মিষ্টি করে হেসে বলল, 'হ্যাঁ করছি। তবে মা করছে না। মা ইজ সিরিয়াস। মেয়েকে বিয়ে না-দিয়ে ছাড়বে না। সমস্যা হল বাবা মায়ের সাইড নিয়েছে।'

'তুমি আমার কথা বলে দিচ্ছ না কেন?'

সেদিন এই আলোচনা হচ্ছিল পার্কস্ট্রিটের কফিশপে বসে। কফি মাগ হাতে শিমুল বলল, 'খেপেছ! একেই পরিস্থিতি ভলক্যানো হয়ে আছে। তার মধ্যে বেকার প্রেমিকের কথা বলে ঘি ঢালব নাকি? আগ্নেয়গিরিতে ঘি ঢাললে কী হয় জান?'

'এখন বেকার, পরে তো চাকরি পাবই।'

'সে যখন পাবে পাবে, তার আগে এই বিয়েটা তো আটকাতে হবে।'

অর্ক বলল, 'কীভাবে আটকাবে?'

শিমুল কফিতে চুমুক দিয়ে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলল, 'একটাই পথ। ওনলি ওয়ান; বিয়ে করে।'

অর্ক বিষম খেল। বলল, 'কী বললে?'

শিমুল বলল, 'বিয়ে করে বিয়ে আটকাব। বিষে বিষে বিষক্ষয় শোননি? তোমাকে বিয়ে করে আমার বিয়ে আটকাব। বাবা-মা বাড়াবাড়ি করলে ফট করে সার্টিফিকেট বের করে দেখাব। আরও বাড়াবাড়ি করলে আমেরিকায় সার্টিফিকেটের কপি পাঠিয়ে দেব। স্ক্যান করে সোজা মেল।'

'অসম্ভব। ইমপসিবল। তুমি ভেবেছটা কী? কাজকর্ম কিছু করি না। দাদার সংসারে থাকি। এই অবস্থায় বিয়ে করে তোমাকে তুলব কোথায়?'

শিমুল ঠোঁট উলটে বলল, 'বয়ে গেছে আমার। এখন ওঠাউঠির কোয়েশ্চেন আসছে কোথা থেকে? বিয়েটা করে রাখছি এই পর্যন্ত। বাবা-মা বেশি বাড়াবাড়ি করলে ফটাস করে বলে দেব। একটা লিগ্যাল প্রোটেকশন বলতে পার। এ-রকম তো কতই হয়। হয় না? আমার কলেজেই এরকম তিনটে কেস ছিল। দিয়াসি তো কেলেঙ্কারি করেছিল। অ্যাবরশন-ট্যাবরশন করে...।'

বিয়ে পর্যন্ততে যতটা ঘাবড়ে গিয়েছিল, অ্যাবরশন শুনে আরও ঘাবড়ে গেল অর্ক। ঢোক গিলে বলল, 'অন্য কোনো পথ নেই শিমুল? দেখ না ভেবে। এটা বড্ড রিস্ক হয়ে যাচ্ছে। জানাজানি হয়ে গেলে বিচ্ছিরি হবে। তোমার মা দুঃখ পাবেন।'

এবার ভুরু কোঁচকানোর পালা শিমুলের। অর্কর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'আর ইউ স্কেয়ারড? তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

অর্ক স্মার্ট হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আরে না না ভয় পাওয়ার কী আছে... সে-কথা বলিনি...বলছি যদি অন্য কোনো ওয়েআউট থাকত। আর একটা পকৌড়া বলি?'

কফি মাগে লম্বা চুমুক দিয়ে শিমুল বলল, 'পথ অবশ্যই আছে। মাকে হ্যাঁ বলে দিলেই সব ঝামেলা মিটে যায়। পাত্রকে শোনাবার জন্য দুটো গান বাছাও আছে। রবীন্দ্রসংগীত। একটা শোনাব পাকা দেখার দিন। একটা ফুলশয্যার রাতে। পাকাদেখার গানটা তোমার উদ্দেশে গাইব। আমি তারেই জানি তারেই জানি আমায় যে জন আপন জানে...। ফুলশয্যার গানটা ওই ছেলের জন্য। এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি—মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি। কেমন হবে?

অর্ক ফিসফিস করে বলে, 'স্টপ ইট! প্লিজ স্টপ।'

এরপর আর 'না' বলার উপায় ছিল না অর্কর। ঝিনুকের দূর সম্পর্কের এক দাদা বউদিকে সঙ্গে নিয়ে গড়িয়াহাটের রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে গোপনে সই করে এসেছে এক গনগনে রোদের দুপুরে। ব্যাক ডেটে ফর্ম ফিলাপ করতে অসুবিধে হয়নি। বাড়তি দুশো টাকায় সব ম্যানেজ হয়েছে।

সেই দাদা বউদিই আজ নেমন্তন্ন করেছে। তাদের নিউটাউনে নতুন ফ্ল্যাট। টাওয়ারে দশতলার ওপর। ডিনারের নেমন্তন্ন। শিমুলের মুখে শুনে অর্ক ক্ষীণ আপত্তি করেছিল।

'এসবের কী দরকার?'

শিমুল বলল, 'এর আবার দরকার অদরকার কী? নতুন বর বউকে তো সবাই নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। খাওয়ায় না? তেমনই ওরা বলেছে। কী আর এমন ব্যাপার? আমি অফিস থেকে চলে যাব। তোমার তো সে ঝামেলাও নেই। বেকার যুবক। তুমি আটটা নাগাদ চলে এসো। দশটার মধ্যে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে এলেই হবে। আমাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে তুমি চলে যাবে। ফিনিশ।'

'ঠাট্টা কোরো না শিমুল। আমরা নেমন্তন্ন খাওয়ার জন্য বিয়ে করিনি।'

টেলিফোনের ওপাশে হেসে ফেলল শিমুল।

'তাহলে কী জন্য করেছি? বাড়িতে বলতে পারব না, একসঙ্গে থাকতে পারব না, আবার ভালোবেসে কেউ ডাকলে যেতেও পারব না? তুমি বাড়াবাড়ি করছ। কাম অন। যদি মন না-চায় তাহলে ক্যানসেল করে দিচ্ছি। ওরা তো জোর করেনি। রেজিস্ট্রির সময় সাক্ষী ছিল। সেই কারণেই যাওয়া উচিত। তাছাড়া এই ফ্ল্যাটটা দাদারা নতুন কিনেছে। নিউটাউন একটা নতুন শহর। এয়ারপোর্টের কাছে। শুনলাম, ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে। সেটা একবার দেখাতে চাইছে। আমার তো মনে হয় ফ্ল্যাট-ট্যাটের ব্যাপারগুলো আমাদের এখন থেকেই বুঝে নেওয়া উচিত।'

'কেন!'

'বাঃ, কেন মানে! আজ-না-হোক, দু-দিন বাদে আমাদের লাগবে না?'

'আবার ঠাট্টা করছ?'

শিমুল হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ করছি। একদম টেনশন না-করে আটটার মধ্যে চলে আসবে। শোন নতুন জায়গা চিনতে সমস্যা হতে পারে তাই একসঙ্গে যাওয়া উচিত।'

'তুমি চেনো?'

'গৃহপ্রবেশের সময় মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম। আবছা আবছা মনে আছে। ওসব জায়গায় তো এখনো লোকজন প্রায় থাকে না, রাস্তাঘাটে জিজ্ঞেস করে নেব এমন কাউকে চট করে পাওয়া যাবে না।'

আজ আটটার পর সেই ফ্ল্যাটেই আসা হয়েছে। শিমুল, অর্ক দুজনে একইসঙ্গে

এসেছে। বিরাট হাউজিং কমপ্লেক্সের ভেতর ফ্ল্যাট। লোকজন সত্যি কম। ভেতরটা গাছপালা, আলো, ফোয়ারা, পার্ক দিয়ে সাজানো, কিন্তু ভীষণ নির্জন। আলোও অল্প অল্প। তাই সুন্দর আর রহস্যময়।

শিমুল বলল, 'বিউটিফুল।'

অর্ক বলল, 'ভূতুড়ে মনে হচ্ছে।'

শিমুল বলল, 'বাজে কথা বোলো না। ইস আমাদের যদি এখানে একটা ফ্ল্যাট থাকত। মনেই হয় না, কলকাতায় এত কাছে জায়গা আছে। আমি তপনদাকে বলব, একটা যদি দেখে দেয়।'

'কী যে বল শিমুল। আমরা কী করে এখন ফ্ল্যাট কিনব?'

'আমি কিনব। ইতিমধ্যেই আমি অফিসে হাউসিং লোনের ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু করেছি।'

'তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ।'

'দেখ বিয়ে যখন করে ফেলেছি, তখন সবটাই ভাবতে হবে।'

'আগে তো আমাকে একটা কাজকর্ম পেতে দেবে।'

'ওমা কাজকর্ম পেতে তোমায় কে আটকাচ্ছে? না-পেলেও ক্ষতি নেই। সবাই জানবে গৃহকর্মে নিপুণ একটা চমৎকার ছেলেকে আমি বিয়ে করেছি। মেয়েদের যদি গৃহকর্মে নিপুণা হতে লজ্জা না-থাকে তোমার আপত্তি কীসের? তার ওপর যদি শাক, কচু, থোড়ের প্রিপারেশন শিখে নাও তাহলে তো কথাই নেই।'

'তুমি কিন্তু আমাকে টিজ করছ শিমুল।'

শিমুল অর্কর হাতটা খপ করে ধরে বলল, 'যাঃ বাবা, নিজের সদ্য বিয়ে করা বরকে খেপাব না তো কাকে খেপাব?' এরপর শিমুল মাথা উঁচু করে অন্ধকার আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে ঝড় বৃষ্টি হবে।'

অর্ক চমকে মাথা তুলল। বলল, 'কেলেঙ্কারি। ঝড় বৃষ্টি হলে এখান থেকে আর ফিরতে হবে না।'

শিমুল বলল, 'কেন? তপনদা গাড়িতে বড়োরাস্তা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসবে।'

উঁচু লোহার গেট খুলে দিতে দিতে দারোয়ান ফ্ল্যাটের নম্বর জানতে চেয়েছিল। তারপর হাত তুলে বাড়িটা চিনিয়ে দিল। সেই বাড়ির নরম নীলচে আলো জ্বলা ইস্পাত রঙের একটুকরো লিফ্‌ট একটানে দশতলায় তুলে দিল শিমুল আর অর্ককে। দরজা খুলতে লম্বা করিডোর। সারি সারি কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অর্ক বলল, 'মনে হচ্ছে এই ফ্লোরে এখনো কেউ আসেনি। শুধু তোমার দাদা-বউদি এসেছে।'

শিমুল মুচকি হেসে বলল, 'দাদা-বউদিও আসেনি।'

'আসেনি মানে!' চমকে উঠল অর্ক।

'আরে বাবা, আসেনি মানে পাকাপাকিভাবে আসেনি। উইকএন্ডে এসে থাকে। শনি-রবি করে। নতুন জায়গা, নতুন শহর, এখনো তো জমেনি। বছরখানেকের

মধ্যে জমে যাবে। তা ছাড়া ছেলে-মেয়েদের স্কুল-টুলের ঝামেলা রয়েছে। অনেকটা দূর হয়ে যাবে।'

করিডোর শেষেই ফ্ল্যাট। নেমপ্লেটে শিমুলের দাদা বউদির নাম। শিমুল হাত বাড়িয়ে কলিং বেল টিপতে গিয়ে থমকে গেল। দরজার হাতলে কাগজ গোঁজা! কাগজ! কীসের কাগজ? শিমুল টেনে নিয়ে ভাঁজ খুলতেই দেখল কাগজটা একটা চিঠি। তার বউদির লেখা—

'স্নেহের শিমুল এবং অর্ক। তোমাদের দাদার অফিসের এক কলিগ হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমাদের দুজনকেই নার্সিং হোমে ছুটতে হচ্ছে। তাই নেমন্তন্ন করেও নিজেরা থাকতে পারলাম না। মোবাইলে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। লাইন পেলাম না। মনে হয় টাওয়ারে গোলমাল হচ্ছিল। এখানে অনেকসময় এ-রকম হয়। নার্সিং হোম পৌঁছে তোমাদের ফোনে ধরবার চেষ্টা করব। যাই হোক, দরজার বাঁ-দিকে যে লেটার বক্সটা দেখতে পাচ্ছ সেখানে ফ্ল্যাটের চাবি রেখে গেলাম। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়বে। খাবার-টাবার সব করা আছে। খুবই সামান্য আয়োজন। রুটি, চিকেন রেজালা, রেশমি কাবাব আর খানিকটা ফ্রায়েড রাইস। ডাইনিং টেবিলের হটকেসে সব রেখে গেলাম। ফ্রিজে পুডিং আর দুটো রাজভোগ রাখা আছে। বের করে নিয়ো। শিমুল, তুমি খানিকটা স্যালাড কেটে নেবে। কিচেনে শশা পেঁয়াজ টোমাটো রাখা আছে। যদি সে-রকম কিছু না হয় তাহলে আমরা অবশ্যই চলে আসব। প্লিজ নিজের মনে করে বাকিটুকু করে নিয়ো। ভালোবাসা জেনো।'

শিমুল কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিঠিটা অর্কর দিকে এগিয়ে দিল। তারপর লেটার বক্স হাতড়ে চাবি বের করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ফেলল স্বচ্ছন্দে।

সত্যি দারুণ সাজানো ঘর! একেবারে আধুনিক কায়দায় ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুমের একপাশে ওপেন কিচেন। দেয়ালে বড়ো বড়ো পেন্টিং। লাল রঙের সোফার সামনে নীচু কাচের টেবিল। একটু দূরে ডাইনিং টেবিলে হটকেস, প্লেট, গ্লাস সাজানো।

শিমুল দু-পাশে হাত ছড়িয়ে বলল, 'মার্ভেলাস। অ্যাই দরজাটা লক করে দাও।'

দরজা যতক্ষণ খোলা ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত একরকম ছিল, দরজা বন্ধ করেই নার্ভাস হয়ে পড়ল অর্ক। বন্ধ ঘরে সে আর শিমুল! অতিরিক্তরকম নার্ভাস লাগছে। সেটাই স্বাভাবিক। এ রকম কোনো পরিস্থিতির মধ্যে যে পড়তে হবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। এই প্রথম এ-রকম একটা কাণ্ড ঘটল।

শিমুল বলল, 'আমার ওপর কিন্তু একদম রাগ দেখানো চলবে না।'

'রাগ তোমার ওপর দেখাচ্ছি না, তোমার ওই দাদা বউদির ওপর দেখাচ্ছি। এটা কী হল? ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে ডেকে এনে তাঁরা চলে গেলেন!'

শিমুল হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। বলল, 'প্রথমত এটা মোটেই ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুর নয়। দ্বিতীয়ত ওরা ইচ্ছে করে চলে যায়নি, যেতে বাধ্য হয়েছে। আমার অফিসের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমিও যেতাম।'

'সেটা আমাদের জানিয়ে নেমন্তন্নটা ক্যানসেল করলেই তো হত।'

'পর্ণা বউদি চিঠিটায় তো লিখেছে ফোন পায়নি। আর নেমন্তন্ন ক্যানসেল করার কী হয়েছে? ফ্ল্যাটও রয়েছে, খাবারদাবারও রেডি। খেয়ে নিলেই তো হয়। তোমার খিদে পায়নি?'

অর্ক তার রাগ এবং নার্ভাস মিশ্রিত মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'না, পায়নি।'

শিমূল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার পেয়েছে। আমি এখন কফি বানাব এবং স্টার্টার হিসেবে রেশমি কাবাব সহযোগে খাব।'

'যা খুশি কর।'

শিমুল উঠে গেলে, অর্ক আরও অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। সে টেবিলের ওপর রাখা পুরোনো ম্যাগাজিন নিয়ে ওলটাতে লাগল। বিরক্তিকর। কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাগাজিন সরিয়ে রেখে উঠে পড়ল। মিনিট দুই ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বসে পড়ল ফের। দু-মগ কফি এনে শিমুল বলল, 'বউদি কিন্তু খুব সুন্দর করে সব সাজিয়ে রেখেছে। কফি-টফি পেতে একটুও অসুবিধে হল না। আমিও এ-রকম করব। ধর তুমি বাড়ি ফিরে দেখলে আমি নেই, তখন নিজেই চা কফি বানিয়ে খেতে পারবে।'

অর্ক ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'আদিখ্যেতা কোরো না শিমুল। আদিখ্যেতা ভালো লাগছে না।'

'তুমি অমন ছটফট করছ কেন? মনে হচ্ছে, কেউ তোমাকে জোর করে কনফাইনড্ করে রেখেছে।'

'বন্দী ছাড়া কী? এ-রকম একটা নির্জন জায়গায়...।'

শিমুল চোখ কপালে তুলে বলল, 'ওমা নির্জনই তো ভালো। স্বামী স্ত্রী দুজনে নির্জনে থাকাটা খারাপ হবে কেন! তার ওপর আমরা হলাম নবদম্পতি। আমাদের একা থাকতে হবে। দুটিতে লুটিতে...।'

কথা বলতে বলতে হেসে ফেলে শিমুল।

অর্ক কঠিন চোখে শিমুলের দিকে তাকাল। খোলা জানলা দিয়ে শিরশিরে হাওয়া আসছে। এটাও বাড়াবাড়ি করেছে মেয়েটা। ঘরের জানলাগুলো সব খুলে দিয়েছে।

শিমুল বলল, 'অমন কড়া চোখে তাকাচ্ছ কেন? নাও কফি খাও।'

অর্ক হাত বাড়িয়ে কফি নিল। বলল, 'কেউ যদি এখন এখানে এসে জিজ্ঞেস করে আপনারা কারা? এই ফ্ল্যাটে কী করছেন? কী বলবে?'

শিমুল ফিক করে হেসে ফেলল।

বলব আমরা মানুষ। দুটি মানুষ। নর এবং নারী। নাও কাবাব খাও। ফ্যানটাস্টিক! দাঁড়াও গান-বাজনা কিছু চালাই। এদের মিউজিক সিস্টেমটা কোথায়? উফ আমার যা ভালো লাগছে না! মনে হচ্ছে এটা আমাদের বাড়ি। আমার আর তোমার।'

অর্কর এবার কেমন যেন মনে হচ্ছে। শিমুলের এত আনন্দ কীসের?

‘কী পাগলামি শুরু করেছ!’

‘পাগলের মতো ভালো লাগছে তাই পাগলামি করছি। বেডরুমে গিয়ে দেখব ওখানে মিউজিক সিস্টেমটা আছে কি না?’

অর্ক চাপা গলায় ধমক দিয়ে বলল, ‘তুমি চুপ করে বোসো তো। এক কাজ কর, তোমার বউদিকে একটা টেলিফোন কর। জিজ্ঞেস কর তারা সত্যি সত্যি কখন আসবে।’

শিমুল এর মধ্যে কখন যেন পায়ের স্নিকার খুলে ফেলেছে। এবার টপের ওপরের দুটো বোতাম খুলে জামাটাকে ঢিলেঢালা করে নিল।

‘খেপেছ? আর ইউ ম্যাড? ফোন করতে যাব কেন? একটা এমারজেন্সি কাজে গেছে। ইস ঘামে গা চ্যাট চ্যাট করছে, একটা শাওয়ার নিলে হত। বাথরুমটা নিশ্চয় দুর্দান্ত। দাঁড়াও দেখে আসি। সে রকম হলে স্নান করে নেব। ওইটা বাথরুম না? না ওটায় যাব না, বউদির বেডরুমেরটায় যাই।’

কাঁচুমাচু মুখে অর্ক সরে গেল শিমুলের কাছ থেকে। বলল, ‘কী আরম্ভ করেছ। অন্যের বাড়িতে এসে স্নান!’

হাতের কফি মগ নামিয়ে শিমুল সত্যি সত্যি বন্ধ বেডরুমটার দিকে এগিয়ে গেল। হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছে অর্ক উত্তেজিত গলায় বলল, ‘তুমি থামবে?’

শিমুল ঘুরে দাঁড়িয়ে অর্কর মুখোমুখি হল। ভুরু কুঁচকে বলল, ‘কী ব্যাপার বল তো? হোয়াই ইউ আর সো নার্ভাস? এমন একটা করছ যেন আমরা চুরি করে এই ফ্ল্যাটে ঢুকেছি। আর যদি ঢুকেই থাকি তাহলেই-বা সমস্যাটা কোথায়? আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ। আমি এখন সাবান মেখে ভালো করে স্নান করব, তারপর একটা কাণ্ড করব।’

শিমুল ‘হো হো’ আওয়াজে হেসে উঠল। বুক কেঁপে উঠল অর্কর।

‘ছিঃ শিমুল এসব তুমি কী বলছ?’

শিমুল এ-কথায় পাত্তা না-দিয়ে বলল, ‘কী বল তো?’

অর্ক ঢোক গিলে বলল, ‘আমার তো এখন কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, গোটাটাই একটা প্ল্যান। তুমি ইচ্ছে করে তোমার দাদা বউদিকে সরিয়ে দিয়েছ। নিশ্চয় তোমার ওই বউদি তোমার সঙ্গে প্ল্যান করেছে।’

কথাটা শুনেও না-শোনার ভান করল শিমুল। ঠোঁট উলটে ভেংচি কেটে বলল, ‘স্নানের পর কী করব বললে না তো সোনা?’

‘তুমি সবটা জানতে বলেই তোমার এত ফুর্তি। তাই না? সত্যি কথা বল তো।’ ঢোক গিলে বলল অর্ক।

‘আর তোমার বুক ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল? সত্যি বাপু বিয়ের আগে কত বীরত্বই না দেখাতে। সুযোগ পেলেই হাত ধরা, পায়ে পা ছোঁয়ানো। সিনেমা হলে কতবার জড়িয়ে বসেছ বল তো। আর আজ বর হয়ে একেবারে ঘেবড়ে গেলে? হা

হা। দাঁড়াও আজ তোমার মজা দেখাচ্ছি। আজই আমাদের ফুলশয্যা হবে। এখানেই হবে।'

'ছি ছি, কী বলছ শিমূল! তোমার মাথা সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'তুমি আলো নিভিয়ে অপেক্ষা কর। আর যদি আলো নেভাতে না-চাও তাহলেও কোনো অসুবিধে নেই, জানলার পর্দাগুলো টেনে দিলেই হবে। এত ওপরে আর কে দেখছে? আর তাও যদি ভয় ভয় করে তাহলে বেডরুমে চলে এস গুডবয়ের মতো। ও-ঘরে নিশ্চয় জানলা খোলা নেই।'

কথাটা বলে হাসতে হাসতে শিমুল বন্ধ ঘরের দিকে রওনা হল। যাওয়ার সময় গলা ছেড়ে গান ধরল—'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার মুখের আঁচলখানি/ঢাকা থাকে না হায় গো, তারে রাখতে নারি...।'

শিমুল এমন সুন্দর গাইতে পারে! অর্ক আশ্চর্য হল। কই সে তো জানত না! তার থেকেও আশ্চর্যের কথা সত্যি সত্যি বাইরে ঝড় উঠছে! খুব জোর নয়, তবে দশতলা ভেসে যেতে লাগল উথাল পাতাল বাতাসে।

অতিরিক্তরকম নার্ভাস হয়ে পড়লে মানুষের শরীরে দু'রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। হয় অল্প অল্প ঘাম হয়, নয়তো হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। অর্কর একইসঙ্গে দুটোই হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে, আবার হাত পা ঠান্ডাও হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থাতে সে ঘরের আলো নিভিয়ে সোফার ওপর বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছে। তার ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে।

এমন সময় দরজায় খটখট আওয়াজ হল। অর্ক চমকে উঠল। কীসের আওয়াজ? কেউ এল? নাকি ঝড়ের আওয়াজ?

আমার গোপন খুশির দিন

আজ নবমী। কাল পুজো শেষ। আবার সেই রুটিন। ঘ্যান ঘ্যানে, একঘেয়ে। অ্যালার্ম দিয়ে ঘুম ভেঙে ওঠো রে, ঘস ঘস করে দাঁত মাজো রে, চিবিয়ে চিবিয়ে টোস্ট-অমলেট খাও রে, জুতো পরো রে, সেই জুতোতে ফিতে বাঁধো রে, কাজে ছোটো রে...উফ! সব মিলিয়ে খুবই দুঃখের। তাই মনের দুঃখে নবমীর দিন সবাই বেশি বেশি আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। যতটা প্রয়োজন তার থেকেও বেশি। এক্সট্রা আনন্দ। ভালো করে সাজগোজের পরে গালে কয়েক পোঁচ পাউডার লাগায়। পেতনির মতো লাগে। লাগুক। পেট পুরে খাওয়ার পর আর এক প্লেট বিরিয়ানির অর্ডার দেয়। শরীর হাঁসফাঁস করে। ঢেকুর ওঠে। উঠুক। যতটা জোরে হাসা উচিত তার থেকে বেশি জোরে হাসে। এমনকী যে-কথায় হাসবার নয়, সেই কথায় হাসতে হাসতে পেট চেপে বসে পড়ে। অন্যরা অবাক হয়, হলটা কী! মাথা কি পুরো গেল? নাকি আদ্দেক?

না, মাথা যায়নি। আসলে নবমীর দিন সকালে চেষ্টা করে মনকে ভুলিয়ে রাখতে। কিছুতেই যেন তার মনে না-পড়ে, আজ নবমী। কিন্তু তা হওয়ার নয়। মন অতি বেয়াড়া জিনিস। তাকে যেটা 'না' বলা হবে, সে সেটাই করবে। খাওয়াদাওয়া, হইচই, হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা, ঝলমলে আলোর মধ্যে সে অবিরত মনে করাবে, আজ নবমী, আজ নবমী, আজ নবমী...। সবার মনখারাপ হবে। মন খারাপ হয় না শুধু আমার।

পুজোর দিনগুলোর মধ্যে আমার সবথেকে প্রিয় হল নবমী। আমি সারাবছর নবমীর জন্য অপেক্ষা করে থাকি। নবমীর দিন অন্যরা মুখ শুকিয়ে ঘুম থেকে ওঠে। আমি উঠি হাসি হাসি মুখে। সবাই মুখ ভেটকে থাকে। আমি গুনগুন করে গাই। সিরিয়াস টাইপের গান। আমার গলা বেসুরো। তবে তার থেকেও বড়ো কথা হল নবমীতে গান। মনখারাপের দিন আমার এই ফুর্তি দেখে সকলে চোখ কটমট করে

তাকায়। গা চিড়বিড় করে। আমি পাত্তা দিই না। ন-টার মধ্যে শ্যাম্পু-ট্যাম্পু দিয়ে স্নান করে ফেলি। খোঁজ নিই লুচি-টুচি ধরনের কোনো ব্রেকফাস্ট তৈরি হল কি না। বারান্দায় বসে পা দুলিয়ে চা খাই। তার পর পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ি। সাদা চুড়িদার পায়জামা, ঘি রঙের পাঞ্জাবি। গলার কাছে সাদা সুতোর কাজ। ঘন কাজ নয়, হালকা কাজ। নবমীর সকালে আমি এই ড্রেসটাই পরি। একটা সময় পর্যন্ত পালটাতে হত। মাপের গোলমাল হত। এখন আর হয় না। হেসে-খেলে কয়েক বছর একই জিনিস চলে যায়। কেচেকুচে যত্ন করে তুলে রাখলেই হল। এর পর ফুরফুরে মেজাজে বেরিয়ে পড়ি। তবে শুধু ফুরফুরে মেজাজ নয়, তার সঙ্গে বুকের ধুকপুকানি আছে। এটা একটা রেয়ার কম্বিনেশন। ফুরফুরে মেজাজের সঙ্গে বুকের ধুকপুকানি যায় না। আর সেটাই ঘটনা। যে-ঘটনায় যা হওয়ার নয়, তাই হয়। যেমন নবমী মনখারাপ করার দিন, তবু আমার আনন্দ হয়। নবমী মুখ বেজার করার দিন, তবু আমার মুখ হাসিহাসি।

ঘটনাটা কী? চলেছি কোথায়?

ঘটনা গোপন। চলেছি পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে। কথাটা শুনে নিশ্চয় ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে। পুজো প্যান্ডেলে যাওয়া গোপন ব্যাপার হবে কেন? ওখানে কি চুরি-ডাকাতির ব্যাপার আছে? হ্যাঁ আছে। একরকম চুরির ব্যাপারই আছে। প্যান্ডেলে ইলা আসবে। সেই ছত্রিশ বছর আগের ইলা। চোদ্দো বছর বয়স। আসবে ঝলমলে লাল ফ্রক পরে। বসবে চেয়ার নিয়ে, প্যান্ডেলের এক কোনায়। বন্ধুরা ঘিরে থাকবে গোল করে। যেন রাজকুমারী। ইলার ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা চুলে থাকবে ফ্রকের সঙ্গে রং ম্যাচ করা ক্লিপ। পায়ে কালো জুতো, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সাদা মোজা। বড়ো বড়ো চোখ দুটোয় কাজল। নাও থাকতে পারে, তবু মনে হবে, কাজলে আঁকা। মেয়েটা দুটো গালে কি গোলাপি রং লাগিয়েছে? নাকি জামার রং ঠিকরে পড়েছে মুখে? হালকা পাউডার। কপালে এক চিলতে লাল টিপ। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে ইলা। ক্লিপের শাসন তুচ্ছ করে চুলের গোছা এসে পড়বে তার গালের ওপর, চোখের ওপর, ঠোঁটের ওপর। ইলা বার বার সেই চুল সরাবে। সরাতে সরাতে আবার হেসে উঠবে। ভিড়ের ভেতর থেকে এক মহিলা ডেকে উঠবে—'ইলা, অ্যাই ইলা, এদিকে আয় একবার।' ইলা চিৎকার করে বলবে—'এখন নয় মা, প্লিজ এখন নয়। আমি খুব বিজি।' তার পর আবার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বে কিশোরী। চুরি করে আমি ইলাকে দেখব। দমবন্ধ আমার। পলক পড়ছে না চোখের। ইলার প্রতিটা অকিঞ্চিৎকর ভঙ্গি আমার বুকে দামামা বাজাবে। মনে হবে, জীবনে এই হাসি, এই চোখ, এই ঠোঁট, এই ছিপছিপে শরীর আমি প্রথম দেখলাম। আমি শেষ দেখলাম। আমি কি ডানা মেলে উড়ে যাব? আমি গাছ হয়ে মেলে ধরব ডালপালা? আমি কী করব? কী করব আমি? কোনো এক সময় ইলা আলগোছে তাকাবে আমার দিকে। একবার, মাত্র একবারই।

আমি জোড় হাত করে মনে মনে বলব, 'মা দুগ্গা মা আমার, এই চোদ্দো বছর

বয়স কখনো তোমার কাছে কিছু চায়নি মা। আজ চাইছি। প্লিজ আর একবার, আর মাত্র একবার ইলা যেন আমার দিকে তাকায়, তুমি ব্যবস্থা করে দাও মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি...।'

ইলা তাকাবে। চলে যাওয়ার আগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে সে। ঘিরে থাকা বন্ধুদের লুকিয়ে, চুল ঝাঁকিয়ে ঘাড় কাত করে আরও একবার তাকাবে আমার চোখে। গোলাপি ঠোঁটের কোনায় একটু হেসে চলে যাবে গটমটিয়ে। আমি মূর্ছা যাব! এখন আমার পঞ্চাশ। চুলে পাক। চোখে পাওয়ার। অল্প বাত ধরেছে হাঁটুতে। এক ঘুমে আর রাত কাটে না। ভেঙে যায়। ছেলের কী হবে? কী হবে মেয়েটার? চারপাশে কত ঋণ। কী হবে তার? মিটবে তো? ডাক্তারবাবু বলেছেন, সুগারটা দেখিয়ে নিন। অভাবে আর প্রেশারে গিন্নির খিটখিটানি বেড়েছে। সারাদিন শুধু অনুশোচনা। 'এটা হল না, ওটা হল না...তুমি কিছু পারলে না। তুমি কিছু পারো না।' আমি সিঁটিয়ে থাকি। আমি পালিয়ে থাকি।

আজ চুলোয় গেছে সব। পারাপারির নিকুচি। আজ আমি ফুরফুরে মেজাজ আর বুকের ধুকপুকানি নিয়ে সেজেগুজে চলেছি পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে। আজ নবমী, আজ ইলার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

স্মৃতি

পঞ্চাশ বছর পর কাউকে এক ঝলক দেখেই চেনা খুব কঠিন। একেবারে অসম্ভবই বলা চলে। উমানাথ কবিরাজের বেলায় কিন্তু সেই অসম্ভব ঘটনাটাই ঘটল। উলটোদিক থেকে হনহনিয়ে হেঁটে আসা মানুষটাকে এক ঝলক দেখেই তিনি চিনতে পারলেন। আরে! কিঙ্কর না?

মানুষটার হাতে বেতের লাঠি। গায়ে ঢলঢলে পায়জামা, কনুই পর্যন্ত ফতুয়া। পায়ে সাদা কেডস। গায়ে একটা হাফ হাতা সুয়েটারও রয়েছে। নস্যি রঙের সুয়েট্যার। পাকাপাকি ভাবে সুয়েট্যার গায়ে দেওয়ার সময় এখনো আসেনি, তবে সকালের দিকে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব হচ্ছে। সেই ঠান্ডা ভাব বলে দিচ্ছে, শীত এল বলে। ঝলমলে আকাশ, পিকনিক, ফুলকপি, নলেনগুড়ের সন্দেশের আর বেশি দেরি নেই। মনে একটা আনন্দের ভাব আসে। তবে সিজন চেঞ্জের এই সময়টা মনের জন্য ভালো হলেও শরীরের জন্য তত ভালো নয়। দুম করে জ্বরজারি হয়ে যায়। বয়স্ক মানুষরা সকালের দিকটা গায়ে গরম কিছু দিতে শুরু করেছেন। উমানাথবাবুও দেন। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় পাতলা একটা চাদর জড়িয়ে নেন।

ভদ্রলোক এতক্ষণ হাঁটছিলেন মাটির দিকে তাকিয়ে। এবার মুখ তুললেন। চোখাচোখি হল। আর তখনই উমানাথবাবু মানুষটাকে পুরোপুরি চিনতে পারলেন। হ্যাঁ, কিঙ্করই! কিঙ্কর মিত্র। সেই বড়ো বড়ো চোখ, নাকের পাশে তিল, কপালের ওপর কাটা দাগ। ভুরু দুটো কুঁচকে আছে। স্কুল জীবনের বন্ধু কিঙ্কর। ভুরু দুটো সবসময় কুঁচকে থাকে। যেন বিরাট কোনো চিন্তার মধ্যে আছে। ক্লাসের সবাই নাম দিয়েছিল 'ভাবুকবাবু'। সেই কিঙ্কর হঠাৎ এখানে এসে হাজির হল কোথা থেকে!

কলকাতার গায়ে নতুন গড়ে ওঠা এই এলাকাটায় ছোটো বড়ো মিলিয়ে তিন-চারটে পার্ক আছে। তবে এই পার্কের নামটা সবথেকে সুন্দর। শাল-পিয়াল

উদ্যান। যদিও এখানে শাল বা পিয়াল কোনো গাছই নেই। তাতে কিছু এসে যায় না। নামটার মধ্যেই একটা স্নিগ্ধ, শান্ত ব্যাপার আছে। সেই কারণেই মর্নিংওয়াকের জন্য উমানাথ জায়গাটা পছন্দ করেন। ছ-টা বাজতে-না-বাজতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। বড়ো কোনো অসুখবিসুখ বা খুব বৃষ্টির সময় দু-একটা দিন বাদ না-দিলে কোনো কামাই নেই। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়েসেও একেবারে ফুল অ্যাটেনডেন্স!

লাল মোরমের রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন উমানাথ। কিঙ্কর নিশ্চয় চিনতে পারবে না। ক্লাস টু থেকে নাইন পর্যন্ত এক ক্লাসে পড়েছে। তারপর বাবার ট্রান্সফারের কারণে ছেলেটা চলে গেল নর্থ ইন্ডিয়া। প্রথম দিকে একটা দুটো চিঠি চাপাটি চলত। একবার টেলিফোনেও কথা হয়েছিল। ব্যস, তারপর আর যোগাযোগ নেই।

হাতে লাঠি, গায়ে নস্যি রঙের সুয়েট্যর পরা মানুষটা কাছে আসতে উমানাথ বুঝতে পারলেন, না, তার কোনো ভুল হয়নি। ওই তো ভুরু কুঁচকে আছে। বাপ্‌রে এখনো অভ্যেস যায়নি। শুধু কালোর বদলে ভুরু দুটো এখন ধবধবে সাদা। যাক, আরও একটু এগিয়ে যাক। তারপর পিছনে থেকে ডাকবে। 'ভাবুকবাবু' বলে ডাকলে কেমন হয়? বেটা বেজায় চমকে যাবে।

ছেলেবেলার বন্ধুকে উমানাথবাবুর কিন্তু চমকানো হল না। উলটে তিনিই চমকে গেলেন!

বৃদ্ধ মানুষটি সটান তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাঁ-হাতের লাঠিটাকে দুলিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "কীরে উমা, মিটিমিটি করে হাসছিস কেন?"

উমানাথবাবুর চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। একমুখ হেসে বললেন, "তুই আমাকে চিনতে পেরেছিস কিঙ্কর!"

কিঙ্কর মিত্র আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, "কেন পারব না? খুব পেরেছি, অনেক আগেই পেরেছি। তুই যখন পার্কে ঢুকেছিস তখনই দেখেছি। ধুতি পাঞ্জাবি, গায়ে চাদর আর চোখে চশমা থাকলে কী হবে, সেই তড়বড় করে হাঁটার বদ অভ্যেসটা তো ছাড়তে পারিসনি।"

উমানাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ডাকলি না কেন?"

কিঙ্কববাবু মিথ্যে করে চোখ পাকিয়ে বললেন, "জানিস না মর্নিংওয়াকের সময় মনসংযোগ নষ্ট হলে মর্নিংওয়াক আর কাজ দেয় না? আমাকে দেখলে আনন্দের চোটে যে তোর কী অবস্থা হত একবার ভেবে দেখেছিস? এই যে পার্ক ঘিরে এতগুলো চক্কর কাটলি সব একেবারে জলে যেত।"

না, কিঙ্করটা এখনো একইরকম মজাদার রয়েছে। কে বলবে বয়স পঁয়ষট্টি পেরিয়েছে। বয়স যত বাড়তে থাকে মানুষ তত খিটখিটে হয়ে যায়। ছেলেবেলার হাসি ঠাট্টা ভুলে যায়। এই ছেলে ভোলেনি। 'ছেলে' ভেবেই মনে মনে হেসে ফেললেন উমানাথ। এখন আর 'ছেলে' নয় 'বুড়ো'।

উমানাথ বললেন, "কেন বাপু, আমাকে দেখে তোমার বুঝি আনন্দ হয়নি?"

"হয়েছে, অবশ্যই হয়েছে। আমি কনসেনট্রেশন হারিয়ে তোর পিছু নিলাম। ধাওয়া করলাম বলতে পারিস। কিন্তু এই বয়েসেও যা জোরে হাঁটিস...ফিফটি ইয়ারস আগে হলে লাফঝাঁপ দিয়ে ধরে ফেলতাম। আজকাল বাতের ব্যথায় লাফঝাঁপ পারি না। তাই উলটোদিক দিয়ে এসে ধরে ফেললাম। একেবারে ক্যাচ কট।"

এবার দুই বৃদ্ধ একে অপরকে জড়িয়ে ধরে খুব খানিকটা হাসলেন। সেই হাসি এত জোরে হল যে পাশের জারুল গাছটা থেকে ক-টা পাখি ঘাবড়ে গিয়ে উড়ে গেল ডানা ঝাপটিয়ে। অন্য যারা এদিক-ওদিক হাঁটছিল, তারা মহা বিরক্ত হল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কঠিন চোখে। এই সাত সকালে এত হাসাহাসি কীসের হে?

দুই বৃদ্ধের তাতে কিছুই এসে গেল না। তারা হাসাহাসি মোটেই থামাল না। উলটে বাড়িয়ে দিল। ছেলেমানুষের মতো হাত ধরাধরি করে দুজনে গিয়ে বসল বেঞ্চে। শাল পিয়াল উদ্যানে এই ব্যবস্থাটা ভারি চমৎকার। মর্নিংওয়াকের মাঝখানে বসে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। গাছের ফাঁকে, জলের ধারে রকমারি বসার জায়গা।

"কিঙ্কর, তুই এখানে কোথা থেকে এলি?"

"আকাশ থেকে।"

"ঠাট্টা করিস না। আমি তো সতেরো বছর হতে চলল এখানে বাড়ি করে আছি।"

"বাপ রে একেবারে বাড়ি বানিয়ে ফেলেছিস! মনে আছে উমা, ভূগোল স্যার তোকে কেমন বলতেন?"

উমানাথবাবু বললেন, "মনে নেই আবার? খুব মনে আছে। ম্যাপ পয়েন্টিং-এ ভুল হলেই বলতেন, তোর কিছুই হবে না রে উমানাথ। কিছুই হবে না। সবাই দেখবি বাড়ি গাড়ি করে ম্যাপের মধ্যে ঢুকে গেছে, আর তুই ম্যাপের বাইরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছিস্।"

"ওভাবে নয়, এইভাবে মাথা নাড়তেন আর মুখ দিয়ে চুক চুক করে আওয়াজ করতেন!" কিঙ্কর মিত্র হাতের লাঠিটা বেঞ্চের ওপর শুইয়ে রেখে মাথা নেড়ে ভূগোল স্যারকে নকল করলেন।

উমানাথবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "স্যারের মাথা নাড়াও তোর মনে আছে!"

"ছিল না, এখন মনে পড়ছে। উমা, মনে পড়ে অঙ্কের তমালবাবু রেগে হেঁচে, কেশে, বিষম খেয়ে কী কাণ্ড করত? তমাল স্যারের টাইটেলটা মনে পড়ছে না। কী যেন ছিল বোস, না চট্টোপাধ্যায়?"

উমানাথ প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের হিস্ট্রি টিচার। সন তারিখ ভুল হলেই গাঁট্টা দিতেন। তুই সেই গাঁট্টার নাম দিয়েছিলি হিস্টোরিক্যাল গাঁট্টা।"

কিঙ্কর মিত্র ভুরু কুঁচকে বললেন "আচ্ছা উমা, উনি কী যেন পড়াতেন? ওই যে ক্লাসে গোলমাল করলেই পরদিন আস্ত একটা কবিতা মুখস্থ করে তবে স্কুলে আসতে হত। নাইনে একবার আমার কপালে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী। বাপ রে বাপ। রাত জেগেও সামলাতে পারলাম না। দশ বারো লাইনের পর ঘেমে নেয়ে একশা কাণ্ড করলাম। স্যার হেসে বললেন, ঠিক আছে ওতেই হবে। দশ লাইন সোনার তরীতেই তোর বাঁদরামির মাপ হয়ে গেছে। সেদিন নাতিকে গল্পটা বলছিলাম। সে তো হাসি থামাতেই পারে না। কিন্তু কিছুতেই মানুষটার নাম মনে করতে পারলাম না। এমনকি কী পড়াতেন সেটাও মনে পড়ল না। বাংলা? নাকি জিয়োমেট্রি?"

মর্নিংওয়াক শেষ করে মোটাসোটা এক ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে বেঞ্চের এক কোণে এসে বসেছিলেন। দুই বৃদ্ধের এইসব অদ্ভুত কথা কানে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে সন্দেহের চোখে তাকালেন। প্রথমে একটু সরে বসলেন। তারপর উঠে গুটিগুটি পায়ে সরে পড়লেন। সরে পড়ারই কথা। পাকা চুলের দুটো মানুষ যদি ভূগোল স্যারের গাঁট্টা আর বাংলা স্যারের শাস্তি নিয়ে মশগুল হয়ে গল্প করে তাহলে তাদের ধারেকাছে থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়। দুই বন্ধু এই ঘটনা লক্ষ্য করেছে। অন্য কেউ হলে লজ্জা পেত। এদের কিছু হল না। বরং পুরো বেঞ্চের দখল পেয়ে তারা খুশিই হল।

উমানাথবাবু বললেন, "এবার সিরিয়াসলি বল তো বাপু, তুমি এখানে হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলে?"

"বড়োছেলে এখানে ফ্ল্যাট কিনেছে। এলাহি ব্যাপার। চারতলার ওপর পাঁচ-পাঁচখানা ঘর। বউমা ফোন করে বলল, বাবা, দিল্লিতে কেন পড়ে আছেন? মাকে নিয়ে চলে আসুন। এখানে পাকাপাকি থাকুন আমাদের সঙ্গে। আমি বললাম, লিফ্‌ট না-থাকলে যাব না। এই বয়েসে আর সিঁড়ি ভাঙতে পারব না। কোমরের পজিশন ভেরি ব্যাড। অ্যাই উমা, স্কুলের সিঁড়ির ঘটনা মনে আছে তোর? কেমন রেলিং বেয়ে সর সর করে নেমে যেতাম?"

উমানাথবাবু উজ্জ্বল মুখে বললেন, "মনে নেই আবার? একবার টিফিনের সময় ওই ভাবে নেমে দেখি সিঁড়ির ঠিক নীচটায় হেডস্যার দাঁড়িয়ে। আমাকে পাকড়ালেন না তো যেন ক্রিকেট মাঠে ক্যাচ ধরলেন। কোন্ ক্লাস তখন? সেভেন? নাকি এইট?"

কিঙ্করবাবু কুঁচকে থাকা ভুরু আরও কুঁচকে বললেন, "মনে হয় এইট-ই হবে। ওই সময় থেকে তোর মধ্যে বাঁদর ভাব বেশি করে মাথাচাড়া দিয়েছিল।"

উমানাথ বন্ধুর পেটে খোঁচা দিয়ে বললেন, "এবার কিন্তু মার খাবি ভাবুক।"

কিঙ্কর মিত্র বললেন, "ছেলেবেলায় যতই ভাবুক বলে খেপাও না কেন বাছাধন, আমি কিন্তু এখানে ভেবেচিন্তেই এসেছি। ছেলেকে বললাম, আগে মাসকয়েক পরীক্ষামূলকভাবে থেকে দেখব। তারপর পাকাপাকি থাকার কথা চিন্তা করব। পছন্দ

হলে থাকব, নইলে আবার ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে দিল্লি ব্যাক। সেই পরীক্ষা চলছে।"

উমানাথ হেসে বললেন, "তোর পরীক্ষার ফলাফল কী?"

কিঙ্কর মিত্র মাথা নাড়িয়ে বললেন, "এখনো ফলাফলের সময় আসেনি। তবে তোদের এই শাল-পিয়াল উদ্যানটি আমার বড্ড মনে ধরেছে উমা। গাছপালা, ফুল, পাখিতে ছেড়ে যাওয়া বাংলার একটা গন্ধ পাচ্ছি। তোর সঙ্গে দেখা হতে, সেই গন্ধের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলার একটা স্বাদ যোগ হল।"

"স্বাদের কথা শুনে টিফিন টাইমের সেই হজমিগুলির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রে কিঙ্কর।"

কিঙ্করবাবু অভিনয় করে বললেন, "চুপ কর, চুপ কর উমা। জিবে জল চলে আসছে। আমি তো স্কুলে যেতামই তোর ওই হজমিগুলির লোভে। এখনকার মতো তখন কোথায় চিপস, কোথায় পিৎজা? শুনলাম, নাতির স্কুল ক্যান্টিনে নাকি মোমো বিক্রি হয়। বোঝ কাণ্ড! আমাদের তো ওইসব হাবিজাবিই সম্বল ছিল। উফ, কীভাবে যে, সবাই মিলে হজমিওলাটাকে ঘিরে ধরতাম।"

উমানাথ কবিরাজ ঝুঁকে পড়ে নীচু গলায় বললেন, "মনে আছে একবার টিচার্স রুমে অর্ডার সাপ্লাই করতে গিয়ে ছেলেদের কাছে হাতেনাতে লোকটা কেমন ধরা পড়েছিল?"

দুজনেই আওয়াজ করে হেসে উঠল। উমানাথবাবু হাত বাড়িয়ে কিঙ্কর মিত্রের ডান হাতের কনুইটা ধরলেন। বললেন, "তুই এখানে থেকেই যা কিঙ্কর। দুই বুড়োতে গল্পগুজব করে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব।"

বেঞ্চের পাশেই একটা জবা গাছের ঝাড়। লাল, হলুদ, সাদা ফুল ধরেছে সেখানে। সকাল বেলার অল্প ফোটা রোদে তাজা ফুলগুলো যেন হাসছে। কিঙ্করবাবু সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "লোভ হচ্ছে রে উমা, খুবই লোভ হচ্ছে। কিন্তু...। চল, বেলা বাড়ছে। দেরি দেখলে ছেলে দলবল নিয়ে বুড়ো বাপকে খুঁজতে না বেরিয়ে পড়ে।"

"কাল আসছিস তো?"

কিঙ্করবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আলবাত। তবে কাল থেকে কিন্তু মোটে বকর বকর নয়। এত কথা বললে মর্নিংওয়াকের এফেক্টই নষ্ট হয়ে যায়। যেটুকু ফ্রেশ এয়ার ভেতরে নিলাম, কথার সঙ্গে সব বেরিয়ে গেল। তোর সঙ্গে দেখা হয়ে দেখছি খারাপই হয়েছে।"

পরদিন শাল-পিয়াল পার্কে দুই বৃদ্ধের গল্পগুজবের পরিমাণ আরও বাড়ল। শুধু পরদিনই নয়, পর পর বেশ কয়েকটা দিন এই কাণ্ড চলল। পার্কের চারপাশে কোনোরকমে পাক কয়েক হেঁটে দুজনেই বসে পড়ে। ইতিমধ্যে নিরিবিলি দেখে একটা জায়গা বাছাও হয়ে গেছে। পার্কের মাঝখানে যে একটুখানি পুকুরের মতো আছে, তার পাশে। লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। পায়ের কাছে সারি সারি গাঁদা ফুলের গাছ। সেখানে একটা দুটো করে কুঁড়ি আসব আসব করছে। সেদিন তো

একটা কাণ্ড হয়ে গেল। দুই বন্ধু গিয়ে দেখল জায়গা দখল। অন্য তিনজন বসে আছে। কিঙ্কর মিত্র তো খেপে আগুন। এই মারেন তো সেই মারেন। উমানাথবাবু তার হাত টেনে ধরে ফিসফিস করে বললেন, "করিস কী? পার্কের বেঞ্চ তো আর ট্রেনের সিট নয়, যে আমরা রিজার্ভ করে রেখেছি।"

কিঙ্করবাবু তেড়েফুঁড়ে, হাতের লাঠি নাড়িয়ে বললেন, "একশোবার রেখেছি। ক্লাসে যে আমরা পাশাপাশি বসতাম তখন? তখন কি আমাদের নাম লেখা থাকত?" উমানাথ বন্ধুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "ছেলেমানুষি করিসনি কিঙ্কর। এটা ক্লাস নয়।"

দুই বন্ধুর আড্ডার সিংহভাগ জুড়ে শুধু স্কুলের দিনগুলো। মজার মজার ঘটনাগুলো যেন দল বেঁধে ফিরে আসতে লাগল দুই বৃদ্ধ মানুষের মনে! স্পোর্টসের ঘটনা মনে পড়ায় দুজনেই হাসল খুব। চোখ বাঁধা রুমালের ফাঁক দিয়ে দেখে ক্লাস সেভেনের অন্তু সেবার হাঁড়ির মাথা ভেঙেছিল। সরস্বতীর পুজোর আগের রাতে মেয়েদের স্কুল থেকে সুমন ফুল গাছের টব চুরি করে আনল ভারি সাবধানে। পরদিন সকালে দেখা গেল টবের গায়ে লেখা 'গার্লস স্কুল'। তখন আর সেই টব লুকোনোর জায়গা নেই। অ্যানুয়াল ফাংশনের ঘটনাও কম মজার নয়। ডাকঘর নাটক শেষ হওয়ার আগেই কল্লোল পর্দা ফেলে দিল। কেলেঙ্কারির একশেষ।

হাসি, আনন্দের মধ্যে সকালগুলো কাটতে লাগল উমানাথ কবিরাজ আর কিঙ্কর মিত্রের।

সাতদিনের মাথায় কিঙ্করবাবু গলা নামিয়ে বললেন, "হ্যাঁরে উমা, একবার স্কুলে যাবি?" উমানাথবাবুর চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। বললেন, "স্কুলে যাব! স্কুলে যাব মানে?"

"মানে কিছুই নয়। দুই বুড়ো একদিন চুপি চুপি গিয়ে নিজেদের লাল রঙের ছোট্ট স্কুলটা দেখে আসব। এখান থেকে আর কতদূর হবে?"

উমানাথবাবু বললেন, "বেশি নয়। গাড়িতে গেলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব। ছেলেকে বললে, অফিস যাওয়ার আগে একদিন ঘুরিয়ে আনবে।"

কিঙ্করবাবু বললেন, "না না কাউকে বলার দরকার নেই। এই বয়েসে স্কুল দেখতে যাচ্ছি শুনলে সবাই হাসবে। আমরা নিজেরাই যাব। একটা ট্যাক্সি ধরে নেব। তারপর শ্যামবাজার থেকে ট্রাম। ঠিক যেভাবে তখন যেতাম।"

উমানাথ ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, "কাঁধে বইয়ের ব্যাগ নিবি নাকি? ওয়াটার বটল? নাতিকে বলল একদিনের জন্য ধার পাবি মনে হয়।"

"ঠাট্টা নয় উমা। খুব ইচ্ছে করছে। সেই ছিমছাম দোতলা বাড়ি। সামনে বাগান। পাশেই খেলার মাঠটা। পিছনে ঝাপসা বট গাছটা নিশ্চয় আছে? ওই যে যেটায় দড়ি বেঁধে দোলনা টাঙানো হত?"

"মনে হয় আছে। বট গাছের আয়ু অনেকদিন। চল কালই একবার ঘুরে আসি।"

"চল।"

সারাদিন দুজনে চাপা টেনশনের মধ্যে কাটালেন।

কিঙ্করবাবুর নাতনি তিয়াস সন্ধেবেলা কম্পিউটার কোচিং থেকে ফিরে এসে বলল, "দাদু, তোমার মধ্যে কেমন একটা ছটফটে ভাব দেখছি। ব্যাপার কী বল তো?"

কিঙ্করবাবু তাঁর চোদ্দো বছরের নাতনির কথায় চমকে উঠলেন। ইজি চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, "ছটফটে। কই, কিছু না তো।"

তিযাস চেয়ারের চওড়া হাতলে বসে মুচকি হেসে বলল, "কিছু না বললে হবে?"

"দুর পাগলি মেয়ে। কিচ্ছু না। তুই উঠবি? চেয়ার ভাঙলে কিন্তু মায়ের কাছে বকুনি খাবি তিয়াস।"

নাতনিকে যা-ই বলুন, উত্তেজনায় রাতে ঘুম আসতে দেরি হল উমানাথবাবুর। স্কুল! আবার সেই স্কুল! পঞ্চাশ বছব আগেব সেই হইচই, হুল্লোড়, ঝগড়া, মারপিট, ভাব আর ভয় মাখা বাড়িটা কেমন আছে?

ট্রামে চড়াব পরিকল্পনা বাতিল করতে হল। কিঙ্কর মিত্রের হাঁটুর ব্যথাটা মাথা চাডা দিয়েছে। সুতরাং পুরোটাই ট্যাক্সিতে। সিটে হেলান দিয়ে কিঙ্করবাবু বললেন, "বুঝলি উমা, কাল রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারিনি। দু-বার উঠে জল খেলাম। বউমা আওয়াজ পেয়ে এসে বলল, বাবা, আপনাব শরীব-টরীর খারাপ নাকি?"

"সে কীরে! আমারও তো একই কাণ্ড। নাতনিটা তো প্রায় ধরেই ফেলছিল।"

ট্যাক্সি চালক ট্রাম লাইন ছেড়ে বাঁক নিতে উমানাথবাবু বললেন, "অ্যাই রোককে, রোক্‌কে। কিঙ্কর ওইটা আমাদের স্কুলবাড়ি না? ওই তো। ওই তো লেখা শ্রীমতী কিরণবালা স্মৃতি বিদ্যামন্দির।"

তাডাহুড়ো করে ট্যাক্সির দবজা খুলে নামলেন দুজনে। নেমেই থমকে গেলেন।

কোথায় বাগান! কোথায় মাঠ! দোলনা টাঙানোর বটগাছটাই-বা কোথায়? চারতলা একটা পেল্লাই বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ইট পাথর কংক্রিটেব ভিড়ে। লালের বদলে সেটার রং এখন ধূসর। হাঁটু সমান ভাঙা পাঁচিলের বদলে এক মানুষ উঁচু পাঁচিল চারধারে। ওপাশ থেকে ছেলেদের চাপা গুঞ্জন ভেসে আসছে ছেঁড়া ছেঁড়া। বিনরিন ধবনের একটা ইলেকট্রিক বেলেব আওয়াজ হতে সেই গুঞ্জনও থেমে গেল। মনে হয় স্কুল শুরু হল। লম্বা লোহার গেটের সামনে ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান। একটা ফুচকাওলা এগিয়ে আসতেই দারোয়ান রে রে করে তেড়ে গেল। তারপর এগিয়ে এল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুই বৃদ্ধের দিকে।

"আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন স্যার?"

দুই বন্ধুর কেউ-ই কথা বলতে পারছেন না। তাঁরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন। এই অচেনা বাড়িটা তাদের স্কুল! দারোয়ান আবার জিজ্ঞেস করল, "কাউকে খুঁজছেন?"

কিঙ্কর মিত্র এবার বিষণ্ণ গলায় ফিসফিস করে বললেন, "হ্যাঁ, খুঁজছি।"

"কাকে স্যার?"

উমানাথ কবিরাজ কষ্ট করে সামান্য হাসলেন। হাত তুলে বললেন, "থাক, তুমি বুঝবে না।"

ফেরার সময় গোটা পথটাই ট্যাক্সিতে চুপ করে বসে রইলেন দুজনে। পরদিন মর্নিংওয়াকে কামাই হল উমানাথের।

কিঙ্কর মিত্র দিল্লি ফিরে গেছেন। ফিরে যাওয়ার আগে বন্ধুকে যে-চিঠিটা লিখে গেছেন সেটা এক সকালে শাল-পিয়াল উদ্যানে বসেই পড়লেন উমানাথ।

"ভাই উমা, আমি চললাম। কলকাতায় মন টিকল না। আসলে অনেকদিন বাইরে থেকে অভ্যেস। এই বুড়ো বয়েসে সেই অভ্যেস থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। তার ওপর মনটা একেবারে ভালো নেই। সেদিন নিজেদের স্কুল দেখে চিনতেই পারলাম না! বড়ো বাড়ি, বড়ো গেট, বড়ো দেয়াল—কত কিছুই না বদলেছে। এমন কী ঘণ্টার আওয়াজটাও পালটে গেছে। খুব ভালো। এ-রকমটাই হওয়া উচিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই বদলানো দরকার। শুধু আমরাই একটা ছোটো ভুল করেছিলাম। এই বুড়ো বয়েসে ছেলেবেলার স্কুল দেখতে যাওয়াটা আমাদের একেবারেই উচিত হয়নি। কিছু কিছু সুন্দর স্মৃতি থাকে যা মনের মধ্যেই রাখতে হয়। তাকে টেনে বাইরে আনতে গেলেই বিপদ। সব তালগোল পাকিয়ে যায়। তখন আর চেহারা, রং কিছুই মেলানো যায় না। চোখ বুজলে যে-স্কুলটা ভেসে ওঠে সেটাই যত্ন করে ধরে রাখা উচিত ছিল আমাদের। তার কাছে আবার ছুটে যাওয়া ঠিক হয়নি। যাই হোক, ভালো থাকিস্...।"

চিঠি পড়া শেষ করে উমানাথবাবু উঠে পড়লেন। কোথায় যেন একটা পাখি ডেকে উঠল। হাওয়ায় ঠান্ডা ভাবটা আরও একটু বেড়েছে। শাল পিয়াল উদ্যানের লাল মোরামের রাস্তা দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলেন উমানাথ। হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনেই হাসলেন। কিঙ্কর চলে গেছে কে বলল? লাঠি হাতের বুড়ো মানুষটা চলে গেছে, কিন্তু হাফ প্যান্ট পরা দুষ্টু কিঙ্করটা তো তার মনের মধ্যে রয়ে গেছে। ভালোই হয়েছে। সুন্দর স্মৃতি মনের মধ্যে থাকাই ভালো। তাকে বাইরে টেনে আনলে গোলমাল হয়ে যায়।

চারমাথার মোড়



গোপালবাবুর পাড়ার চারমাথার মোড়টা খুব মজার। চারমাথার মোড়ে চারদিকে চারটে রাস্তা থাকার নিয়ম। এখানে চারটে রাস্তা নেই, তিনটে রাস্তা আছে। আর একটা রাস্তা ভ্যানিশ।

ভজা এই চারমাথার মোড়ে থাকে। সে এই পাড়ার গুন্ডা। প্রথমে ছুটকো ছিল, পরে নিজের চেষ্টায় ধীরে ধীরে বড়ো হল। যখন ছুটকো ছিল, তখন চারমাথার মোড়ে সাইকেলে হেলান দিয়ে বিড়ি টানত। স্কুলের মেয়েদের দেখলে শিস দিত। জোরে কিছু নয়, হালকা-পলকা শিস। ভজার রোজগারপাতি বলতে তখন ছিল পুজোর চাঁদা। গোপালবাবুর পাড়ায় হাজারটা ক্লাব। তাদের হাজার রকমের পুজোপার্বণ। চাঁদা তোলার জন্য লোক লাগে। ভজা কখনো এ-ক্লাবের হয়ে চাঁদা তুলত, কখনো ও-ক্লাবের হয়ে চাঁদা তুলত। সেখান থেকে টু পার্সেন্ট-থ্রি পার্সেন্ট কমিশন। তাতে আয় খুবই সামান্য। এরপর ভজা 'বড়ো' হল। তখনো চারমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত, তবে সঙ্গে মোটরবাইক নিল। বিড়ির বদলে সিগারেট। তখনো তার রোজগার সেই চাঁদা। কিন্তু, এবার মোটা চাঁদা। প্রোমোটারদের কাছ থেকে সেই চাঁদা আসত। ভজা দল পাকাল। দেশি রিভলভার কিনল। সেই রিভলভার দেখিয়ে জমি ক্লিয়ার করত, বাড়ির মালিককে তুলত, ভাড়াটে হঠাত। ফ্ল্যাট যারা কিনত তারা প্রোমোটারের জালিয়াতি নিয়ে প্রশ্ন তুললে ভয় দেখিয়ে আসত। ভজা দ্রুত নাম করল এবং রাজনীতির নেতাদের নজরে পড়ল। পাড়ায় যে-পার্টি ক্ষমতায়, তারা চট করে ভজাকে পাকড়ে ফেলল। তাদের হয়ে ভজা ইলেকশনের দিন ওই চারমাথার মোড়েই বোম মারল। গদাম। একদিন অপনেন্ট

পার্টির এক ছোকরাকে চারমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে পেটে গুলি করল ভজা। অপনেন্ট পার্টির ছেলেরা পাড়ায় তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ফেলল। মিটিং, মিছিল, পোস্টার। মাঝরাতে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল ভজাকে। ভজা তখন নেশা করে চুর। পরদিন সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে ছাড়া পেয়ে গেল ভজা। ক্ষমতায় থাকা দল ভজাকে ফিরিয়ে আনল বাইকে করে, মাথায় ফেট্টি। তারপর সেই চারমাথার মোড়ে মিটিং করল। ভজাকে মালা পরাল, স্লোগান দিল—মানছি না মানব না। এরপর ভজা কিনল গাড়ি। সেই গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত চারমাথার মোড়ে। গাড়িতে এফ এম বাজত। গ্লাস বোতলের টুংটাং আওয়াজ হত। সঙ্গে মেয়েদের হাসি। তারা হাসত আর বলত—'অ্যাই কী কর ভজাদা? সুড়সুড়ি লাগে মাইরি।'

গোপালবাবুর দুই মেয়ে। পুটু আর কুটু। বড়ো মেয়ে পুটু কলেজে উঠেছে। ছোটো মেয়ে কুটু স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। গোপালবাবু ভজাকে ভয় পান। খাতির করে চলেন। মেয়েদের নিয়ে পাড়ায় থাকতে হয়। গুন্ডা মস্তানকে ভয় পেতে হয়। ভজাকে দেখলে দাঁত বের করে হাসেন গোপালবাবু। বিজয়ার দিন বলেন—'শুভ বিজয়া'। পয়লা জানুয়ারিতে বলেন—'হ্যাপি নিউ ইয়ার'। যতটা তোয়াজ করা যায় আর কি। কোনোদিন ভজা উত্তরে হাসে। কোনোদিন পাত্তা দেয় না। না দিক। গোপালবাবুর কর্তব্য গোপালবাবু করেন। মনে শান্তি থাকে।

এই শান্তির সময়ে একটা কাণ্ড হল।

একদিন বড়োমেয়ে পুটুর ফিরতে রাত হল। বাড়িতে এসে কান্নাকাটি করতে লাগল। কী ব্যাপার? ভজার গাড়ি থেকে কে নাকি পুটুর হাত ধরে টেনেছে। গোপালবাবু তো ভজাকে কিছু বলতে পারবেন না, তাই বিচারের আশায় তিনি পার্টি অফিসে ছুটলেন। ওরা গোপালবাবুকেই ধমক দিল। বলল, 'ভদ্রলোকের মেয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে কেন? জানেন না, দিনকাল ভালো নয়? মেয়েকে শাসন করুন।' রাগে অপমানে ফুঁসতে ফুঁসতে গোপালবাবু গেলেন বিরোধী পার্টির অফিসে। ওরা বলল, 'ভজা হারামিটা বড্ড বেড়েছে, একবার ক্ষমতায় আসতে দিন না, দেখবেন কী কাণ্ড করি!' গোপালবাবু ভরসা পেলেন। বললেন, 'কী করবেন?' ওরা বলল, 'ওই চারমাথার মোড়েই ভজা নাক-কান মুলবে।'। খুশি হয়ে বললেন, 'সত্যি।' ওরা হেসে বলল, 'অন গড। আপনাকে শুধু একটা কাজ করতে হবে।' গোপালবাবু বললেন, 'কী কাজ?' ওরা বলল, 'আপনি শুধু আমাদের ভোটটা দেবেন।' গোপালবাবু ওদের ভোট দিলেন। ভজার পার্টি গো-হারান হারল। গোপালবাবু খুব খুশি। তবে বাইরে কিছু বুঝতে দিলেন না। এবার ভজার শাস্তি হবে। চারমাথার মোড়ে ভজা নাক-কান মুলবে। তিনি দেখতে যাবেন। সামনে

থাকবেন না, পিছনে ভিড়ে মিশে থাকবেন। সত্যি সত্যি ভজার শাস্তি হল। চারমাথার মোড়ে স্টেজ বেঁধে ভজা দল পালটাল। বলল, 'এতদিন যে-পার্টি করেছি, ভুল করেছি। এই দেখুন আমি নাক-কান মুলছি। আজ থেকে আমি পার্টি বদল করলাম।' খুব হাততালি হল। মাইকে গান বাজল—'আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে...।' দশদিন পরে গোপালবাবুর ছোটো মেয়ে কুটু একদিন দুপুরবেলা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল। চারমাথার মোড়ে দামি ফ্ল্যাট নিয়েছে ভজা। জোর করে কুটুকে সেই ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে...।

গোপালবাবুর পাড়ার চারমাথার মোড়টা খুব মজার। চারমাথার মোড়ে চারদিকে চারটে রাস্তা থাকার নিয়ম। এখানে চারটে রাস্তা নেই, তিনটে রাস্তা আছে। আর একটা রাস্তা ভ্যানিশ...।

দিনুবাবুর গলি

গলি তো কমবেশি সব পাড়াতেই থাকে। কিন্তু আমাদের পাড়ায় এমন একটা গলি আছে যার নাম শুনলে পাড়ার মানুষ হাতজোড় করে কপালে ঠেকায়। বলে, 'ওরে বাবা! মাফ করবেন, দিনেরবেলায় ওদিকে যাওয়া নেই।' গত একবছর ধরে ওই কাণ্ড চলছে। এই গলির নাম 'দিনুবাবুর গলি'। সমস্যা কী? দিনের আলোয় সেখানে ভয়ের কী আছে? ভূত বেরোয় নাকি?

পুরো নাম দীননাথ সামন্ত। পাড়ায় ছোটো-বড়ো সকলে ডাকে 'দিনুবাবু'। তিনি যে-গলিতে থাকেন, তারই নাম হয়েছে 'দিনুবাবুর গলি'। নামটা নিজে থেকেই হয়ে গিয়েছে। গলিটা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে বড়োরাস্তার মোড় পর্যন্ত। দু-পাশে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি। সরু বলে গলিতে গাড়ি ঢুকতে পারে না। রিকশা আর সাইকেল চলে। যাওয়ার সময় হয় প্যাঁক-প্যাঁক, নয়তো টিংটিং আওয়াজ করতে হয়। এ ছাড়া উপায় নেই। রাস্তা সরু, লোকের গায়ে ধাক্কা লেগে যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, হেঁটে যাওয়ার জন্যই এই গলি। গলি দিয়ে গেলে বড়োরাস্তা থেকে স্টেশন পর্যন্ত শর্টকাট হয়। বিশেষ করে ট্রেন ধরার তাড়া থাকলে তো খুব কাজে লাগে। কিন্তু যতই কাজের হোক, আমরা যারা এখানে থাকি তারা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করি যাতে 'দিনুবাবুর গলি'-তে ঢুকতে না হয়। দরকার হলে হাতে দশ মিনিট সময় বেশি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোই। দশ মিনিট হেঁটে স্টেশনে পৌঁছুই ঘুরপথে। গলি দিয়ে একান্তই যদি যেতে হয়, অনেকেই রিকশায় উঠে পড়ে। চালককে বলে, 'ভাই, মাথার উপরের হুডটা তুলে দিন। সামনের পর্দাটাও ফেলে দিন।' রিকশাচালক মুখ টিপে হাসে। পাড়ার রিকশাচালক কারণ জানে। তাই মুখ টিপে হাসে। এই গলিতে আমরা সাইকেলও ছোটাই বনবন করে।

সাধারণত রাস্তার নাম হয় বড়ো-বড়ো লোকের নামে। মৃত্যুর পরও মানুষ তাদের মনে রাখে। দিনুবাবু কে? কোনো বড়ো কাজ করেছেন? একেবারেই নয়।

মারাও যাননি। দিব্যি সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন। কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডা জলে স্নান করছেন। দাঁত বাঁধানোর পর থেকে নেমন্তন্ন বাড়িতে পরিবেশনের লোককে ধমক দিয়ে বলছেন, 'হাড় দেখে মাংস দাও। ভেবেছ কী? আমার দাঁত নেই?'

একটা সময় পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক ছিল। তখনও এই গলির নাম 'দিনুবাবুর গলি' ছিল না। একবছর আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন দিনুবাবু। তারপরই শুরু হল বিপদ। মানুষটার হাতে এখন অঢেল সময়। সকালে বাজার সেরে ঘর থেকে দুটো মোড়া নিয়ে বসেন নিজের বাড়িতে রোয়াকে। একটা মোড়ায় নিজে বসেন, আর-একটা রাখেন পাশে। গায়ে কোনোদিন ধুতি-পাঞ্জাবি, কোনোদিন লুঙ্গি-ফতুয়া। ঠান্ডা বাড়লে মাথায় মাঙ্কি ক্যাপও দেন। মাঝেমধ্যে ঢলঢলে প্যান্ট-শার্ট পরতে দেখা যায়। হাতে থাকে খবরের কাগজ। কোনো কোনোদিন ট্রানজিস্টার রেডিয়োটাও সঙ্গে রাখেন। পরিপাটি আয়োজন। প্রথমদিকে সমস্যা হয়নি। বরং ভালোই লাগত। বয়স্ক মানুষ সারাজীবন কাজে ডুবে থেকেছেন, এবার বিশ্রামের পালা। কিন্তু আসল ঘটনা শুরু হল মাসখানেক পর।

সেদিন গলি দিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন সমরেশ সমাদ্দার। আমরা ডাকি সমরেশজেঠু। ট্রেন ধরতে হবে। বাড়ির সামনে তাঁকে দেখতে পেয়েই রোয়াক থেকে হাঁক পাড়লেন দিনুবাবু, 'ও সমরেশ, যাচ্ছ কোথায়?'

সমরেশজেঠু হেসে বললেন, 'কলকাতা। ন'টা দশের ট্রেন।'

দিনুবাবু উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'আরে কলকাতায় তো রোজই যাও। আজ দুটো কথা শুনে যাও।'

সমরেশজেঠু বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'একটু তাড়া ছিল। আমি বরং অন্য-একদিন গল্প করব।'

দিনুবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'গল্প! তোমাকে গল্পের জন্য ডাকছি না, ডাকছি জরুরি কারণে।'

'আসলে ট্রেনের টাইম হয়ে গিয়েছে তো, তাই বলছিলাম।'

দিনুবাবু ধমক দেওয়ার গলায় বললেন, 'রাখ তোমার ট্রেন। আমাকে ট্রেনের টাইম শেখাও সমরেশ? ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স কলকাতায় যাতায়াত করেছি। আজ না হয় রিটায়ার করে বাড়ি বসে আছি।'

সমরেশবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'না, না, সে-কথা বলিনি।'

দিনুবাবু ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুড়ো হয়েছি, এখন আর আমার কথা শোনার সময় কোথায়? যাক, ছাড়ো ওসব। এখানে এসে বোসো দু'মিনিট। নাও এই মোড়াটায় বোসো'—খালি মোড়া এগিয়ে দেন দিনুবাবু।

সমরেশজেঠু গুটিগুটি পায়ে মোড়ায় বসে বললেন, 'বলুন।'

দিনুবাবু বললেন, 'না, তেমন কিছু নয়। কলকাতা নিয়েই। ধুলো, ধোঁয়ার ওই শহরের অবস্থা খুবই শোচনীয়। কলকাতায় দূষণের মাত্রা নাকি চড়চড় করে বাড়ছে।

তার উপর ভিড়ভাট্টা, জ্যাম তো আছেই। হাওড়া স্টেশনে নামলে দমবন্ধ হয়ে আসে। বাসে উঠলে গরমে প্রাণ আইঢাই করবে। ওদিকে বাসের মধ্যে পকেটমার গিজগিজ করছে। অন্যমনস্ক হলেই গেল! বাস থেকে নেমে দেখবে পকেট ফাঁকা।'

সমরেশজেঠু কব্জি উলটে দেখলেন ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমি পকেট সামলে রাখব, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।'

'আরে বাপু তুমি না হয় বাসে পকেট সামলালে, কিন্তু তারপর? বাস থেকে নেমে? এই ধরো, একবার আমি কলেজস্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে দু-টাকার বাদাম কিনেছিলাম। বললে বিশ্বাস করবে না ভাই, অর্ধেক বাদাম পচা।'

সমরেশজেঠু কাঁচুমাচু গলায় বললেন, 'দিনুবাবু ন-টা দশের ট্রেনটা তো চলে গেল! পাজি বাদামওয়ালার গল্প না হয় পরে শুনতাম!'

দিনুবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তুমি এমন করে বলছ যেন কলকাতা যাওয়ার ট্রেন একটাই! পরের ট্রেনে যাবে। সেটাও যদি মিস করো, তার পরের ট্রেনে উঠবে। কলকাতা যাচ্ছ, সেখানকার বিপদ-আপদের কথা শুনে যাবে না?'

সমরেশজেঠুর অবস্থা শোচনীয়। এভাবে চললে পরেরটাও মিস হবে। তিনি বললেন, 'আজ প্রথম নয়, আমিও অনেকদিন ধরে কলকাতা যাচ্ছি দিনুবাবু। সেখানকার অবস্থা আমিও জানি।'

'কচু জানো। তাহলে শোনো একবার কী হয়েছিল। তখন আমার চাকরির ছাব্বিশ বছর হয়ে গিয়েছে। অফিস পাড়ার প্রতিটা ইঞ্চি চিনি। একদিন তো অফিসে যাচ্ছি। হাতব্যাগ আর ছাতা। এতদিনের চেনা পথ, তবু এক ভয়ানক ঘটনা ঘটল। হঠাৎ গর্তে পড়ে বাঁ-পা গেল মচকে। আশপাশের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলাম, জলের কল না টেলিফোনের লাইন ঠিক করতে ভোরবেলাতেই রাস্তা কেটেছে। বোঝো! এজন্যই তো বলছি, যতই বাপু কলকাতায় ঘুরে বেড়াও, বিপদ যে কখন কীভাবে চলে আসবে, তুমি বুঝতেও পারবে না,' দিনুবাবু আওয়াজ করে হাসলেন।

সমরেশজেঠুও হাসলেন। তবে মজার নয়, শোকের হাসি। ঘড়ি বলছে, এবার পরের ট্রেনও স্টেশন ছেড়ে চলে গিয়েছে। আজকের মতো সব কাজ পণ্ড। সুতরাং সমরেশজেঠু গুছিয়ে বসলেন। দিনুবাবুও তাই দেখে খুশি। কথা বলার মানুষ পাওয়া গেল। সমরেশজেঠু বললেন, 'দিনুবাবু, কলকাতায় বিপদ-আপদ সম্পর্কে আর যা আপনার স্টকে আছে বলে ফেলুন। সব আজই শুনে যাই। ভিড় বাস, পকেটমার, পাজি বাদামওয়ালা, রাস্তায় গর্ত তো হল। আর কী আছে?'

দিনুবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'বলছি-বলছি, আরও অনেক ব্যাপার আছে। অত বড়ো শহর। তার কি ব্যাপারের অভাব হবে? এক কাপ চা খাবে নাকি?'

নিজের কাজের দফারফা হলেও দিনুবাবুর উপর সমরেশজেঠুর খানিকটা মায়া হল। সারাদিন একা থাকতে হয়। কথা বলার মানুষ পান না। হয়তো গল্প করার জন্য হাঁপিয়ে উঠছিলেন।

দু-দিন পর ফের একই ঘটনা ঘটল। এবার ঘটল আমাদের বাপ্পাদার সঙ্গে।

কলেজ থেকে ফিরছিল। কোচিংয়ে পড়তে যেতে হবে। শর্টকাট করার জন্য গলি ধরেছিল সে। বাড়ির রোয়াকে বসেছিলেন দিনুবাবু। বাপ্পাদা বাড়ির সামনে আসতেই হইহই করে উঠলেন, 'আমাদের বাপ্পা না? শুনে যাও একবার। কথা আছে।'

বাপ্পাদা দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, 'আমাকে কিছু বলছেন?'

দিনুবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আর কাকে বলব? এদিকে এসো।'

এরপর আর না-গিয়ে উপায় থাকে না। বাপ্পাদাও এগিয়ে গেল।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'কলেজে।'

'ও তুমি তো আবার কলকাতার কলেজে পড়।'

বাপ্পাদা মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, কেমিস্ট্রি অনার্স।'

দিনুবাবু গদগদ গলায় বললেন, 'বাঃ, খুব ভালো। বুঝলে বাপ্পা, কলকাতার মতো শহর হয় না। ওই শহরে বড়ো-বড়ো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। পড়াশোনার কত সুযোগ। কলকাতা আমাদের সকলের গর্ব। আমরা যারা সেখানে থাকি না তাদেরও গর্ব, আবার যারা সেখানে থাকে তাদেরও গর্ব।'

বাপ্পাদা মাথা চুলকে বলল, 'ঠিকই বলেছেন। তাই তো আমি কলকাতার কলেজে ভরতি হয়েছি।'

দিনুবাবু বললেন, 'এদিকে এসো। একটু জিরিয়ে যাও।'

বাপ্পাদা আমতা-আমতা করে বলল, 'দিনুবাবু, আমার টিউশনি আছে।'

'আরে বাবা, লেখাপড়া কি শুধু তোমরা একাই করছ? আমরা করিনি? জল-টল খেয়ে, মাথা ঠান্ডা করে পড়তে যাও, 'বলতে-বলতে দিনুবাবু পাশে রাখা জলের বোতল এগিয়ে দিলেন। বয়স্ক মানুষ জল এগিয়ে দিচ্ছেন, সেটা অগ্রাহ্য করে কি চলে যাওয়া যায়? দিনুবাবু তাকে একরকম জোর করেই উপরে তুললেন।

'আমি তো আর কলকাতার কলেজে পড়িনি, এখানকার কলেজেই পড়েছি। কিন্তু সময় পেলেই কলকাতায় চলে যেতাম।'

বাপ্পা ছটফট করতে লাগল, বলল, 'স্যার বসে থাকবেন।'

দিনুবাবু পাত্তা না-দিয়ে ফের শুরু করলেন, 'বুঝলে বাপ্পা, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বই ঘেঁটে বেরিয়ে পড়তাম কলকাতায় ঘুরতে। ময়দান, ভিক্টোরিয়া, ইডেন গার্ডেন্স, রবীন্দ্রসদন। কোনোদিন আবার চলে যেতাম মিউজিয়ামে। হাতে সময় থাকলে অ্যাকাডেমিতে নাটকও দেখতাম। কিছু না-করে শুধু কলকাতার পথে-পথে ঘুরে বেড়ালেও মন ভরে যায়। কত রকমের মানুষ, কত রকমের দোকানপাট। কেউ বেজায় ব্যস্ত, কেউ আমার মতো অলস হয়ে বসে আছে।'

বাপ্পাদা উঠতে গেল। দিনুবাবু হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললেন, 'কলকাতার মানুষগুলোও ভালো। দাঁড়াও, তোমাকে একটা গল্প বলি। তখন গরমের সময়। খুব তেষ্টা পেয়েছে। আমি ঢুকে পড়লাম একটা শরবতের দোকানে। এক গেলাস ফলের রস খেয়ে নিলাম।'

বাপ্পাদা কী করবে বুঝতে পারছে না। কেমিস্ট্রির বদলে ফলের রসের গল্প শুনে সময় চলে যাচ্ছে! কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, দিনুবাবু বাপ্পাদার হাত শক্ত করে ধরে আছেন। দিনুবাবু বললেন, 'গোলমাল লাগল শরবতের দাম দেওয়ার সময়। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, পয়সায় কুলোচ্ছে না। আমি তো ভয়ে কাঁপতে শুরু করলাম। এবার নিশ্চয়ই বড়ো ধরনের ঝামেলা লাগবে। অপমানের শেষ থাকবে না। কিন্তু ঘটনা যা ঘটল, শুনলে তোমার চোখ কপালে উঠে যাবে!'

ইতিমধ্যে বাপ্পাদের কোচিং থেকে মোবাইলে বন্ধুদের ডাক পড়ে গিয়েছে বেশ কয়েকবার, কী বলবে? দিনবাবুর কাছে গল্প শুনছি? বাধ্য হয়ে মোবাইল অফ করে দিল সে।

হাসি-হাসি মুখে দিনুবাবু বলে চলেছেন, 'আমার মুখ দেখেই শরবতের দোকানদার বুঝে ফেলেছে সামথিং গড়বড়। আমি কাচুমাচু করে বললাম, 'মাফ করবেন, পকেটের পয়সার অবস্থা না-বুঝেই...'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'বলতে হবে না, মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। ঘাবড়াবার কিছু নেই। তেষ্টার সময় এক গেলাস শরবত খেয়েছ তো কী হয়েছে! দাম দিতে হবে না। তুমি যদি চাও আর-এক গেলাসও খেতে পার।' ভেবে দ্যাখো! মানুষটা আমাকে জোর করে বসিয়ে আর-এক গেলাস আমপোড়ার শরবত খাইয়ে তবে ছাড়লেন। কলকাতা ছাড়া দুনিয়ার কোথাও এমন মানুষ পাবে?'

বাপ্পাদা বলল, 'না, কোথাও পাব না,' তারপর জোড় করে হাত ছাড়িয়ে, রোয়াক থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে নামল। তারপর দিল টেনে দৌড়। কোচিংয়ে ততক্ষণে আধঘণ্টা লেট।

পরের ঘটনা ঘটল সন্তুর ন-কাকার সঙ্গে। রোববার সকালে রান্নাঘরে মাংস চাপিয়ে সন্তুর ন-কাকিমা দেখলেন মশলাপাতিতে টান পড়েছে। ন-কাকাকে পাঠালেন বাজারে। ন-কাকা বললেন, 'চিন্তা নেই, জলদি আসছি।'

তখন কি আর ন-কাকা জানতেন, বাজারে যাওয়ার পথেই দিনুবাবুর হাতে পাকড়াও হবেন?

'অত ছুটতে-ছুটতে চললে কোথায় বিকাশ?' ডাক দিলেন দিনুবাবু।

'বাজারে যাচ্ছি' না-থেমেই উত্তর দিলেন ন-কাকা।

'এত বেলায় বাজারে!'

ন'কাকা এবার একটু দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। হেসে বললেন, 'না বড়ো কিছু নয়, সামান্য মশলাপাতি কিনতে যাচ্ছি।'

দিনুবাবু চোখ বড়ো করে বললেন, 'মশলাপাতি সামান্য? আরে বাপু, মশলাই তো রান্নার আসল জিনিস। মশলা ছাড়া আবার রান্না চলে নাকি? গুঁড়োমশলা, পাঁচফোড়ন, কালোজিরে, হলুদগুঁড়ো যদি আবিষ্কার না হত, তাহলে খাওয়া-দাওয়ার মজাই যেত নষ্ট হয়ে। সব মুখে বিস্বাদ লাগত। সেই মশলাকে বলছ সামান্য! একবার কী হল শোনো, আমার বড়োমামিমা ছিলেন দারুণ রাঁধুনি। আমরা

ওঁর হাতের রান্না খেতেই মামাবাড়িতে যেতাম। একবার পুজোর ছুটিতে গিয়ে দেখি...'

ঝাড়া একঘণ্টা মশলা বিষয়ক বকবকানি শুনে ছাড়া পেলেন ন-কাকা। ন-কাকিমা ততক্ষণে বাড়িতে রেগেমেগে মাংসের হাঁড়ি নামিয়ে ফেলেছেন। রান্নায় মশলা দেওয়া হয়নি। দুপুরে ন-কাকার খেতে বসে মনে হল, মাংসের ঝোল নয়, খাচ্ছেন ঘাস-পাতার ঝোল! মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। এর জন্য দিনুবাবুই দায়ী...

গলির পথে দিনুবাবুর এই 'চেপে ধরা'-র ঘটনা বাড়তেই লাগল। রোজই ঘটত। বাবলুর মেসোমশাইকে আটকালেন অফিস যাওয়ার সময়, তপুর দাদাকে পাকড়াও করলেন চাকরির ইন্টারভিউয়ের দিন, একঘণ্টা আগে রওনা দিয়েও জরুরি মিটিংয়ে ঠিক সময়ে হাজির হতে পারলেন না আর্যকাকু। এর সঙ্গে নতুন আর-এক বিপদ শুরু হল। মোড়া, জলের বোতল, চায়ের সঙ্গে এবার খাতা-পেন নিয়েও বসতে শুরু করলেন দিনুবাবু। বড়োদের সঙ্গে আমাদেরও ধরতে লাগলেন। নীলাদ্রিকে একদিন পাটিগণিত করালেন, দেবরূপকে শেখালেন ইংরেজি ট্রানস্লেশন। সৌম্য সেদিন সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল ফুটবল ম্যাচ খেলতে। তাকে ডেকে তিনপাতা হাতের লেখা করিয়ে তবে ছাড়লেন। এতদিন খবর একটু-একটু করে ছড়াচ্ছিল, এবার ছড়াল ঝড়ের বেগে। মুখে মুখে ওই গলির নাম হয়ে গেল 'দিনুবাবুর গলি'। সকলে বলতে লাগল, 'ভালো চাও তো ও-পথে যেয়ো না।' সন্ধের পর দিনুবাবু মোড়া, খবরের কাগজ, জলের বোতল, হাতপাখা নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলে তবে নিশ্চিন্ত। পথ তখন নিরাপদ, বাধাহীন। চলাফেরা চলবে।

পাড়ায় গোপন মিটিং হল। দরকারি একটা পথ সারাদিন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে থাকবে? এ কেমন কথা? অনেক ভাবনাচিন্তা হল, কথা হল বিস্তর। লাভ হল না। বয়স্ক মানুষ নিজের বাড়ির রোয়াকে বসে থাকলে, তাকে তো বারণ করা যায় না। তিনি তো কাউকে ইট-পাটকেল ছুড়ছেন না বা আবর্জনা ফেলছেন না! তাহলে দিনুবাবুর দোষটা কোথায়? একা মানুষ সারাদিন কথা বলার সঙ্গী খুঁজে পান না। বাড়িতেও কেউ থাকে না। স্ত্রী মারা গিয়েছেন, একমাত্র ছেলে চাকরি করে বিদেশে। তাই গলিতে কাউকে দেখলেই চেপে ধরেন। পাশে বসিয়ে দুটো কথা বলেন। সুতরাং করার কিছু নেই। মুখ ব্যাজার করে মিটিং শেষ করতে হল।

কিন্তু সেই মুখ ব্যাজার অবস্থা বেশিদিন থাকল না। কিছুদিনের মধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটল যাতে ঘটনা গেল একেবারে উলটে! রাতারাতি দিনুবাবু গলি হয়ে গেল বিখ্যাত। আমাদের পাড়ার গর্ব। গলি নিয়ে খবরের কাগজে খবর ছাপা, টিভিতে ছবি উঠল, দিনুবাবুর ইন্টারভিউ বেরোল। আমরা বুক ফুলিয়ে সকলকে বলতে লাগলাম, 'আমাদের পাড়াতেই আছে 'দিনুবাবুর গলি'?

কী করে এমন হল? সে এক চমকপ্রদ কাহিনি।

পাড়ার মানুষ গলি এড়াতে শুরু করলেও দিনুবাবু কিন্তু ভেঙে পড়েননি। এবার তিনি বাইরের মানুষ পাকড়াতে শুরু করলেন। যেমন নন্দীবাবুর শ্যালক,

বিজনকাকার মাসতুতো ভাই, ছোটনের বন্ধু। এরা এই পথ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে বিপদে পড়তে লাগল। দিনুবাবু রোয়াক থেকে ডেকে বললেন, 'এই যে মশাই, শুনছেন। চললেন কোথায়? এই পাড়ায় দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। যতীন নন্দীর বাড়ি? খুব ভালো। যতীন মানুষটা বড়ো চমৎকার। যাকে বলে পারফেক্ট জেন্টলম্যান। আজকালকার দিনে এমন ভদ্রমানুষ চট করে পাওয়া যায় না।'

স্বাভাবিকভাবেই অচেনা মানুষের মুখে জামাইবাবুর প্রশংসা শুনে নন্দীবাবুর শ্যালক গদগদ মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে আর ততই পড়েন ফাঁদে। পাক্কা চল্লিশ মিনিটের ধাক্কা সামলে তবে তিনি ছাড়া পান।

এ-রকমই এক নিঝুম দুপুরে চারজন মানুষ গলি দিয়ে হাঁটছিল। যাচ্ছিল স্টেশনের দিকে। হাতে বড়ো-বড়ো ব্যাগ। তাদের হাঁটা দেখে বোঝাই যাচ্ছিল, পথ চেনে না। মোড়া পেতে বসেছিলেন দিনুবাবু। চার যুবককে দেখে প্রবল উৎসাহে হাঁক পাড়লেন, 'এই যে ইয়ংম্যানের দল, হন্তদন্ত হয়ে চললে কোথায়?'

যুবকের দল হঠাৎ এই ডাক শুনে চমকে উঠল। মুখ ফিরিয়ে দিনুবাবুকে দেখে যেন খানিকটা স্বস্তি পেল। বয়স্ক মানুষ জবুথবু হয়ে বসে আছেন একা। তারা নিজেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে যেন কথা বলে নিল পরস্পর। একজন এগিয়ে এসে বলল, 'স্যার, স্টেশন যাওয়ার রাস্তা কি এটাই?'

দিনুবাবু ভুরু নাচিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'বলব কেন? আগে তোমরা এদিকে এসো।' সকলে নয়, এগিয়ে এল দুজন ছেলে! দিনুবাবু কৌতুক করে বললেন, 'স্টেশন যাওয়ার রাস্তা শুধু এটা কেন? আরও আছে!'

একটি ছেলে আরও দু-পা এগিয়ে এসে বলল, 'আরও আছে!'

দিনুবাবু হেসে বললেন, 'থাকবে না! তোমরা কেমন রাস্তা চাইছ?'

ছেলেটা চাপা গলায় বলল, 'যেটা দিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যায়।'

দিনুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তেমন একটা রাস্তা আছে বটে। রাস্তা ঠিক নয়, গলি। তা বাপু তোমরা তাড়াতাড়ি স্টেশনে যেতে চাইছ কেন?'

এবার লম্বা-চওড়া চেহারার একটি ছেলে ধমকের গলায় বলল, 'বেশি বকবক না করে রাস্তাটা চিনিয়ে দিন দেখি।'

দিনুবাবু বিরক্ত হলেন। ভুরু কোঁচকালেন। সন্দেহ হল। কেউ তো তাঁর সঙ্গে এভাবে ধমকে কথা বলে না! ছেলেগুলো কারা? দ্রুত ভেবে নিলেন দিনুবাবু। পরিচয় না-জেনে পথ চেনানো ঠিক হবে না। দিনুবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'একটা সহজ পথ বলতে পারি, কিন্তু সেখানে এই ভরদুপুরেও ভিড়ভাট্টা হবে।'

তিন নম্বর ছেলেটা অধৈর্য হয়ে বলল, 'ভিড় নয় ফাঁকা রাস্তা চাই।'

মনে-মনে প্রমাদ গুনল দিনুবাবু। এই নিঝুম দুপুরে ব্যাগ হাতে চার যুবক পাড়া ছাড়ার জন্য ফাঁকা পথ খুঁজছে কেন? এদের আটকাতে হবে। যে করেই হোক, আটকাতেই হবে। পথচলতি মানুষকে কীভাবে আটকাতে হয় সে টেকনিক আমাদের দিনুবাবুর মতো ভালো আর কে জানে। ঠান্ডা মাথায় তিনি সেই টেকনিক প্রয়োগ

করতে শুরু করলেন। কাজটা কঠিনই ছিল, তবে বেশিক্ষণ নয়। মিনিট তিন-চার নিজের ঢঙে হাবিজাবি কথা বলার পরই গলির মুখ থেকে হইহই চিৎকার ভেসে এল। সেই চিৎকার শুনে চার যুবকই উলটো দিকে দিল দৌড়। ততক্ষণে পাড়ার অনেকেই দলবেঁধে ছুটে এসেছে। দিনুবাবু হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন ছেলেগুলো সামনে পালাচ্ছে।

সেদিন স্টেশনের মুখেই চার ডাকাত ধরা পড়ে যায়, সঙ্গে ডাকাতির মালপত্র। সকলে বলল, 'দিনুবাবু যদি বকবক করে ওদের আটকে না-রাখতেন, তাহলে, এতক্ষণে ট্রেনে উঠে চম্পট দিত।' বিকেলের মধ্যেই দিনুবাবুর গলিতে পাড়ার মানুষ, পুলিশ, কলকাতার সাংবাদিকে ঠাসাঠাসি কাণ্ড হয়ে গেল। সকলে দিনুবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চায়। মজার কথা হল, যে-মানুষটা এতদিন লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য হাঁকপাঁক করতেন, তিনিই কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন। লজ্জা পেয়ে হাসতে লাগলেন মিটিমিটি!

এরপর পাড়ার সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিন হইচই করে সেই গলির মুখে মস্ত একটা বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হল। তাতে লেখা, 'দিনুবাবুর গলি'। ভুল হয়েছে?

নামকরা



আমরা বড়ো ধরনের বিপদে পড়েছি। 'বসন্তপুর মিলন সংঘ' এ-রকম বড়ো বিপদে আগে কখনো পড়েনি। এই বিপদের সঙ্গে ক্লাবের প্রেস্টিজ জড়িয়ে আছে। কী করব বুঝতে পারছি না। সন্ধেবেলা এমারজেন্সি মিটিং ডাকা হয়েছে। মিটিঙে দেখা হবে বিপদ থেকে বেরোনোর কোনো পথ পাওয়া যায় কি না। মনে হয় না পাওয়া যাবে।

আমাদের সকলেরই ভয়, শেষ পর্যন্ত ফাংশন বাতিল হয়ে যাবে। সত্যি যদি তাই হয় তাহলে ঘটনা মারাত্মক হবে। দুঃখ তো হবেই, তার থেকে বেশি হবে লজ্জার। 'বসন্তপুর শতদল সংঘ'-র ছেলেদের কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারব না। ওরা আমাদের দেখলে মুচকি মুচকি হাসবে। সেই হাসিতে, গা চিড়বিড় করে উঠবে।

আসলে 'বসন্তপুর শতদল সংঘ' আমাদের কম্পিটিটর ক্লাব। একটু কম্পিটিটর নয়, বাড়াবাড়ি ধরনের কম্পিটিটর। যদিও ওদের সদস্যদের সঙ্গে আমাদের সদস্যদের বাইরের সম্পর্ক খুবই সুন্দর। দেখা হলে কথা বলি, হাসি। স্কুল, কলেজ, কাজের জায়গায় ওরা আমরা পাশাপাশি বসি। বাসে দেখা হলে ওরা টিকিট কাটে। ট্রেনে দেখলে আমরা ঝালমুড়ি খাওয়াই। বিজয়া দশমীর দিন কোলাকুলি চলে। ওরা নাড়ু খাওয়ালে, আমরা নিমকি দিই। ওদের অনেকের সঙ্গে অর্কুটে ফেসবুকে আমাদের চ্যাট হয়। মোবাইলে মেসেজ চালাচালি করি। কিন্তু ক্লাবের বিষয়ে নো সমঝোতা। সব ব্যাপারেই জোর লড়াই। 'বসন্তপুর মিলন সংঘ' আর 'বসন্তপুর শতদল সংঘ'-র এই লড়াইয়ের কথা সবাই জানে। মজাও পায়। আমরা পাই না। এই বিষয়ে আমরা সিরিয়াস। আমাদের দেখাদেখি ওরা ফুটবল ম্যাচ শুরু করল। আমাদেরটা ছিল 'বসন্তপুর নকআউট'। ওরা করল 'বসন্তপুর লিগ'। আমরা ঠিক করলাম ওদের টেক্কা দেব। ফুটবলের সঙ্গে শুরু করলাম ওয়ান ডে ক্রিকেট। ওরা

পরের বছরই চালু করেছে টুয়েন্টি টুয়েন্টি। আমরাও ছাড়বার পাত্র নই। চ্যাম্পিয়ন টিমকে ওরা যত বড়ো ট্রফি দেয়, আমরা তার থেকে বেশি বড়ো দিই। এক ইঞ্চি হলেও বড়ো। ওদের ট্রফি কত ইঞ্চি বড়ো হচ্ছে সেটা জানার জন্য আমাদের ব্যবস্থা আছে। দোকানের এক কর্মচারীকে ম্যানেজ করে রেখেছি। গত বছর শীতে ওরা রেলের মাঠে করেছে—'অবিরাম সাইকেল চালানো'। কোচবিহার না জলপাইগুড়ি থেকে একজন 'সাইকেল ওস্তাদ'কে ধরে নিয়ে এসেছিল। সেই 'সাইকেল ওস্তাদ' টানা তিনদিন ধরে সাইকেল চালাল। খাওয়া দাওয়া, স্নান সব চলন্ত সাইকেলে। এমনকী ল্যাপটপে নেট খুলে গুগল্ সার্চ করতে লাগল! এই ঘটনা বসন্তপুরে খুব হইচই ফেলল। আমাদের প্রেস্টিজে লেগে গেল। 'বসন্তপুর মিলন সংঘ'কেও একটা কিছু করতে হবে। পরের মাসেই আমরা ব্যবস্থা করে ফেললাম। ঠিক করলাম সাইকেলের জবাব হবে সাঁতারে। 'অবিরাম সন্তরণ'। টানা তিনদিন সাঁতার চলবে। বহরমপুর থেকে 'সুইমার' আনা হল। যে সে সুইমার নয়, গঙ্গায় সাঁতরানো সুইমার। তাকে বসন্তপুর লেকে নামিয়ে দেওয়া হল। আমরা প্রচার করলাম, আমাদের সাঁতারু অনেক বেশি কেরামতি জানে। অবিরাম সাইকেল চালানোর সময় তো ঘুমোনোর ব্যাপার ছিল না। আমাদের সাঁতারু রাতে চিত সাঁতার দিতে দিতে ঘুমোবে। ব্যস রাতে লেকের পাড়ে মানুষ ভেঙে পড়ল। সেই ভিড় দেখে শতদলের মেম্বারদের মুখ শুকনো হয়ে গেল।

তবে আমাদের সবথেকে বড়ো লড়াই অ্যানুয়াল ফাংশন নিয়ে। 'বসন্তপুর মিলন সংঘ' আর 'বসন্তপুর শতদল সংঘ' দুটো ক্লাবই বছরে একবার করে এই ফাংশন করে। ক্লাবের জন্মদিনের ফাংশন। দারুণ জাঁকজমক হয়। সারাদিন ধরে অনুষ্ঠান চলে। প্রতিবারই আমরা নজর রাখি ওরা কী করছে, ওরাও একইভাবে খেয়াল রাখে। ওরা যদি কোনো বছর বাড়তি কিছু করে আমরা পরের বছর সেটা মিটিয়ে দিই। ভোরবেলা ভালো করে আলো ফুটতে-না-ফুটতে ক্লাবঘরের সামনে পতাকা উত্তোলন হয়। তারপর প্রভাতফেরি। আগে আমরা প্রভাতফেরি করতাম না। 'শতদল সংঘ' যে-বছর শুরু করল, তার পরের বছর থেকে আমরাও শুরু করে দিলাম। রঙিন ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন নিয়ে মিছিল। আমাদের ছিল স্পোর্টস। এখনো আছে। সকাল বেলা বয়েজ স্কুলের মাঠে শুরু হয়। এক-শো মিটার, দুশো মিটার দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প, গো অ্যাজ ইউ লাইক, মিউজিক্যাল চেয়ার। 'শতদল সংঘ' আগে স্পোর্টস করত না। আমাদের দেখাদেখি ওরাও এখন শুরু করে দিয়েছে। শুনেছি দু-একটা নতুন আইটেম মাথা খাটিয়ে বের করেছে। আগামী বছর দেখাবে। আমরা খোঁজখবর রাখছি। জন্মদিনের দুপুরে এলাহি খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হয়। দুটো ক্লাবেই হয়। আমরা শতদলের সবাইকে নেমন্তন্ন করি। ওরাও করে। এখানেও কম্পিটিশন আছে। কম্পিটিশন দু-রকমের। লড়াই চলে মেনু নিয়ে। বিশেষ আইটেম নিয়ে একবার আমরা চমকে দিই, একবার ওরা চমকে দেয়। কোনো বছর যদি আমরা ভেটকি মাছের ফ্রাই করি, পরের বছর ওরা করবে গলদা চিংড়ির

মালাইকারি। কোনো বছর যদি ওরা কলকাতার দই নিয়ে আসে, পরের বছর আমরা কৃষ্ণনগরে লোক পাঠাই সরপুরিয়া আনতে। দু-নম্বর লড়াই আদর আপ্যায়নে। শতদলের সদস্যরা খাবার সময় আমরা তাদের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। যত্নে যেন কোনো খামতি না-থাকে। একবার আমরা কেটারারের লোকজনকে সরিয়ে নিজেরা ওদের পরিবেশন করে খাইয়েছি। ওরা একেবারে গদগদ হয়ে পড়ল। যাওয়ার সময় কীভাবে ধন্যবাদ জানাবে বুঝতে পারল না। আমরাও মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে বলতে লাগলাম—"কেমন লাগল বাছারা? একে বলে খাতির। এবার আর কোনো উপায় নেই। সাতমুখ করে বসন্তপুরের সবাইকে 'মিলন সংঘ'-র প্রশংসা করতে হবে। ইচ্ছে না-থাকলেও করতে হবে।" মুখে অবশ্য অন্য কথা বললাম। বললাম, "না না, এতে ধন্যবাদ দেওয়ার কী আছে? তোমরা আমাদের ক্লাবের অতিথি। এইটুকু তো করতেই হবে।"

পরের বছর ওদের জন্মদিনে ওরা বদলা নিল। ছোটোখটো বদলা নয়, বড়ো বদলা। দুপুর বেলা গাড়ি পাঠিয়ে দিল। যেখানে হেঁটে যেতে সময় লাগে পাঁচ মিনিট, সেখানে গাড়ি! বাধ্য হয়ে 'মিলন সংঘ'-র সবাইকে গাড়ি করে নেমন্তন্ন খেতে যেতে হল। বসন্তপুরে এই খবর ছড়িয়ে গেল মুখে মুখে। অনেকেই বলতে লাগল "শতদল ক্লাবের তুলনা হয়! যতই রেষারেষি থাকুক ওরা সত্যি অতিথিকে যত্ন করতে জানে। নইলে ওইটুকু পথ গাড়ি চাপিয়ে নিয়ে যায়?" এই প্রশংসা শুনে আমাদের ক্লাবের ছেলেরা ফুঁসছে। বলছে, "পরের বছর আমরা ওদের ব্যান্ড বাজিয়ে নিয়ে আসব।"

জন্মদিনের হইচই কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর সন্ধে থেকে শুরু হয় মূল ফাংশন। প্যান্ডেল বেঁধে নাটক, গান, আবৃত্তি, নাচ। বলা বাহুল্য এই ফাংশন নিয়েও দুটো ক্লাবে প্রতিযোগিতা চলে। কোনোবার আমরা নাটক জমিয়ে দিই, কোনো বছর ওদের গান-বাজনার দিকটা দারুণ হয়। কোনো বছর আমাদের আবৃত্তি দশে দশ পেয়ে বসে থাকে। পরের বছর ওরা হয়তো নাচে মাতিয়ে দিল। আমরা দু-পক্ষই খুব ফাইট করি। কিন্তু সবসময় যে জুৎ করতে পারি এমন নয়। একবার শতদল ক্লাবের ছেলেরা সুকুমার রায়ের লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকটা করল। দারুণ হল। পরেরবার আমরা নাটকে খুব জোর দিলাম। নাটক আমাদের ভালোই হল। কিন্তু মার খেয়ে গেলাম গানে। যে-মেয়েটি গান গেয়ে মাত করে দেয়, তারই আগের দিন লেগে গেল ঠান্ডা। স্টেজে বসেই হাঁচতে লাগল। আমাদের প্রলয় রগচটা ছেলে। রেগেমেগে বলল, "নিশ্চয় শতদলের কেউ সর্দি কাশির ভাইরাস ছড়িয়ে গেছে।"

তবে একটা ব্যাপারে আমরা কেউ কাউকে ছাড়ি না। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করি। এক বছর আগে থেকে গোপনে কাজ শুরু হয়ে যায়। চারদিকে লোক পাঠানো। যোগাযোগ চলে। কারণ এটাই ফাংশনের আসল আকর্ষণ। আসল মর্যাদা। ঠিকমতো করতে পারলে ক্লাবের প্রেস্টিজ হু হু করে বেড়ে যায়।

এই প্রেস্টিজ হল 'বিশেষ অতিথি'। প্রতিবছরই আমরা একজন করে 'বিশেষ অতিথি' নিয়ে আসি। যাকে বলে ''স্পেশাল গেস্ট'। বসন্তপুরের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। এবার 'শতদল সংঘ' কাকে আনছে? এবার 'মিলন সংঘ'-র অনুষ্ঠানে কাকে দেখা যাবে? আমরা দুটো ক্লাবই চেষ্টা করি 'নামকরা' মানুষদের নিয়ে আসতে। খেলোয়াড়, ফিল্মস্টার, লেখক, নেতা, মন্ত্রী, গায়ক কেউ বাদ যায় না। যে যত 'নামকরা' আনতে পারবে তার তত দাম। তত অহংকার। ফাংশনের পর থেকে বুক ফুলিয়ে ঘুরতে পারব। 'নামকরা অতিথি' আনার ব্যাপারে কঠিন গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। কয়েকবছর আগে শতদলের ছেলেরা জেনে গিয়েছিল আমরা বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় মানব ভট্টাচার্যকে আনবার ব্যবস্থা করছি। ব্যস ওরা ভাংচি দিল। লতাপাতায় কোনো একটা যোগাযোগ বের করে মানব ভট্টাচার্যের শাশুড়িকে ধরে ফেলল। হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করল তিনি যেন কিছুতেই জামাইকে বসন্তপুর যাওয়ার জন্য অনুমতি না-দেন। জামাই কী করে শাশুড়ির কথা ফেলবে? মানব ভট্টাচার্য পায়ে চোট লেগেছে বলে এলেন না। আমরা হন্যে হয়ে অন্য 'নামকরা' খুঁজে বের করলাম। শুধু যে ওরা করে এমন নয়। আমরাও এই কাণ্ড করি। ওদের ক্লাবের ভেতর আমাদের চর আছে। নিয়মিত খবরাখবর দেয়। তাকে ঘুগনি আলুরদম খাইয়ে ধরে রাখতে হয়। সে একবার খবর দিল, শতদল তাদের জন্মদিনে ওয়েট লিফটার বামা গণেশকে নিয়ে আসছে। ওয়েট লিফটার শুনে নাক কোঁচকানোর কোনো কারণ নেই। সেটা ছিল অলিম্পিকের বছর। সে বছর বামা গণেশের খুব নাম। কাগজে লিখেছে—'অন্য কোনো ইভেন্টে না-হোক, অলিম্পিকে বামা গণেশকে পাঠাতে পারলে ভারত একটা মেডেল পাবেই পাবে।' এ-রকম একটা 'নামকরা'কে আনতে পারলে শতদল ক্লাবের হাঁকডাক বাড়বে। সুতরাং যে করেই হোক বামা গণেশকে আটকাতে হবে। পল্টু বলল, ''একমাত্র উপায় বামা গণেশকে যদি সত্যি সত্যি অলিম্পিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।''

আমি বললাম, ''দুর পাগলের মতো কথা।''

শুভ বলল, ''ওসবের দরকার কী? তার থেকে মেল আইডি জোগাড় করে ওনাকে একটা মেল পাঠিয়ে দিই। থ্রেট মেল। কিন্তু লিখব খুব কায়দা করে। লিখব, আপনি বসন্তপুরে এলে আমরা খুব খুশি হব। কিন্তু সঙ্গে একটা ফোল্ডিং মশারি নিয়ে আসবেন স্যার। এখানে খুব মশা। স্টেজেও হয়তো মশারি টাঙিয়ে বসতে হবে। যারা বেশি শক্তিশালী হয় তারা মশা মাছির মতো ছোটো জিনিসকে ভয় পায়।''

পরে জানতে পারলাম আসলে আমাদের চর নাম ভুল শুনেছে। বামা গণেশ নয়, শতদল যাকে আনছে তার নাম বাবা গণেশ। তিনি ওয়েট লিফটার নন, বংশীবাদক। চেহারা বাঁশির মতোই রোগা পাতলা।

গতবার 'শতদল সংঘ' একটা কাণ্ড করেছে। ওরা সবাইকে চমকে দিয়ে ঘোষণা

"অনেকবছর ধরে একঘেয়ে নামকরা মানুষদের দেখে দেখে বসন্তপুরের মানুষ ক্লান্ত। সেই নেতা, মন্ত্রী, লেখক, অভিনেতা, খেলোয়াড়, গায়ক। সবাই এখন অন্যরকম নামকরা মানুষকে কাছে পেতে চাইছেন। এবার আমরা সেই আয়োজন করেছি। ক্লাবের জন্মদিনের ফাংশনে এমন একজন নামকরা মানুষকে নিয়ে আসব যার নাম সবাই জানে না। সবাই চেনে না। তিনি নিজেকে আড়ালে রাখতে ভালোবাসেন। কিন্তু একদিন তাঁকে নিয়ে হইচই হবে। আমরা সেদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই না। শতদল সংঘ এবার তাঁকে সবার সামনে নিয়ে আসবে।'

এই ঘোষণায় বসন্তপুরের মানুষ সত্যি সত্যি আগ্রহ নিয়ে বসে রইল। আর আমাদের হতে লাগল টেনশন। ওরা কাকে নিয়ে আসছে? পরের বার আমরা টেক্কা দিতে পারব তো?

ওরা জয়দীপ পাল নামে গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একজনকে নিয়ে এল। মুখে বড়ো বড়ো গোঁফ দাড়ি। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। ইনি নাকি পাহাড়ে চড়েন। পর্বতারোহী। ছোটোখাটো বহু পাহাড় ডিঙোনো হয়ে গেছে। এবার এভারেস্টের দিকে নজর দিয়েছেন। কাঁধে সবসময় একটা ব্যাগ। পাহাড়ে চড়া অভিযাত্রীদের যেমন থাকে। সেখান থেকে নীল রঙের তাঁবু, হলুদ নাইলনের দড়ি উঁকি মারছে। একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি সঙ্গে দড়ি নিয়ে ঘুরছেন কেন?"

জয়দীপ পাল মৃদু হেসে বললেন, "হঠাৎ যদি সামনে কোনো পাহাড় পড়ে যায় তখন কী করব ভাই? গালে হাত দিয়ে তো বসে থাকতে পারব না, ডিঙোতে তো হবে। হবে না?"

পর্বত অভিযাত্রী জয়দীপ পালকে নিয়ে 'শতদল সংঘ' যে কত বাড়াবাড়ি করল তা বলে শেষ করা যাবে না। একেবারে সারাদিনের জন্য ধরে রাখল। সেই প্রভাতফেরি থেকে শুরু করে রাতের নাচ গান পর্যন্ত। দুপুরে সকলের সঙ্গে তিনি পাত পেড়ে বসে খেলেন। দেদার অটোগ্রাফ বিলি করলেন জয়দীপ। সন্ধের ফাংশনে সংবর্ধনা দেওয়া হল। আগাম এভারেস্ট জয়ের সংবর্ধনা। উপস্থিত অনেকে বলল, "শতদল সংঘ এবার একটা চমৎকার কাজ করল। সবাই তো চেনা নামকরা মানুষকে অতিথি করে, ওরা অচেনা নামকরা মানুষকে এনে চিনিয়ে দিল।" সবথেকে হিট করল মানুষটার ব্যাগ থেকে উঁকি দেওয়া নাইলনের দড়ি। অনেকদিন পর্যন্ত বসন্তপুরের মানুষের মুখে মুখে সেই দড়ির গল্প ঘুরল।

এবার আমাদেরও সে রকম ইচ্ছে ছিল। এমন 'নামকরা' কাউকে আনব যার নাম বসন্তপুরের অনেকে জানে না। শতদলের কায়দায় আমরা প্রথম তাঁর পরিচয় করিয়ে দেব। কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট হেমন্তদা অনেক আগেই অন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন। প্রায় ছ-মাস আগে গায়ক সুবিমল বাগচীর সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বিশেষ অতিথি হতে রাজিও হয়েছেন। সুবিমল বাগচী বড়ো গায়ক। তিনি এখন যে-গান করেন, সেটাই সুপারহিট হয়। সিডি বিক্রিতে সবসময় টপ টেন লিস্টে। সুবিমল বাগচী এলে বসন্তপুরে একটা জমকালো কাণ্ড হবে। আমরা বেজায়

উত্তেজিত। ঠিক করলাম, ওনার আসার কথা কাউকে জানানো হবে না। কার্ডেও নাম ছাপা হবে না। একেবারে ফাংশনের সময় ঘোষণা করে স্টেজে তোলা হবে। শতদলের ছেলেদের চোখ কপালে উঠবে। মাথায় হাত দিয়ে বসবে।

মাথায় হাত দিয়ে বসেছি আমরা। মোটে একটা দিন বাকি, গায়ক আজ সকালে প্রেসিডেন্টকে ফোনে জানিয়েছেন, তিনি বসন্তপুর আসতে পারছেন না। ওদিন তাঁর গানের রেকর্ডিং। হঠাৎ ঠিক হয়েছে। সুতরাং দুঃখিত।

কী হবে? সব কিছু ছাড়া ফাংশন হয়, কিন্তু বিশেষ অতিথি ছাড়া তো ফাংশন হয় না। তাহলে কি ফাংশন বাতিল?

সেই কারণেই এমারজেন্সি মিটিং। মিটিঙে বসে পল্লব বলল, "আমাদের মুখে চুনকালি পড়ে গেল।"

ঋদ্ধিমান কাঁচুমাচু মুখে বলল, "তখনই বলেছিলাম, নামকরাদের পিছনে ছুটলে একদিন বিপদে পড়তেই হবে।"

মৈনাকদা বলল, "আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ওদের সামনে আমরা মুখ দেখাব কী করে? শেষ মুহূর্তে আমরা কাকে পাব? কাউকে পাব না।"

রঞ্জনবাবু বললেন, "বসন্তপুরের কোনো গুণী মানুষকে বিশেষ অতিথি করলে কেমন হয়? বিমলদার দাদু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তাঁকে বলব?"

রগচটা প্রলয় বলল, "শতদলের ছেলেরা হাসবে। বলবে বাইরের কাউকে পায়নি তাই ঘরের মানুষ নিয়ে এসেছে।"

আমি বোকার মতো বলে বসলাম, "ফাংশনের তারিখটা বদলালে হয় না?"

সবাই রে রে করে উঠল। বলল, "মিলন সংঘ ক্লাবের জন্মদিন তুই পালটে দিতে বলছিস?"

হেমন্তদা বললেন, "আমার খুব খারাপ লাগছে। আমার জন্যই...।"

সোমনাথ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, "আমি একটা প্ল্যান দিতে পারি।"

আমরা সবাই মিলে বললাম, "কী প্ল্যান?"

সোমনাথ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "সবটা এখনই বলা যাবে না। তবে তোমরা যদি রাজি হও কালকে আমি কলকাতায় যাব। স্পেশাল গেস্টের ব্যবস্থা করে ফিরব। রাজি কি না বল।"

আমাদের 'সব' শুনে দরকার কী? আশার আলো দেখতে পাচ্ছি এটাই বড়ো কথা। মনে হচ্ছে, বিপদ থেকে বেরোনোর একটা পথ পাওয়া যাবে।

সত্যি পথ পাওয়া গেল। সোমনাথ পরদিন সকালের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেল। দুপুরে আমাকে ফোন করে জানাল, চিন্তা নেই। ফাংশন হবে। তুই সকলকে খবর দিয়ে দে। বিশেষ অতিথি পাওয়া গেছে। আমি বললাম, "হ্যাঁ রে নামকরা মানুষ তো?"

সোমনাথ ওপাশ থেকে বলল, "বোকার মতো কথা বলিস না। নামকরা না

হলে কখনো স্পেশাল গেস্ট করা যায়? আলবাত নামকরা। একশোবার নামকরা। তবে নিজে নয়, এই লোকের দাদু নামকরা।"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "দাদু নামকরা! সে আবার কী রে! কী মাথামুণ্ডু বলছিস? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

সোমনাথ হেসে বলল, "তোকে বুঝতে হবে না। শতদলের চোখ একবারে কপালে উঠবে। ওরা অন্যরকম নামকরা এনে হইচই ফেলেছিল না? এবার তার বদলা হবে। আমরা নামকরার নাতিকে এনে তুলকালাম করে দেব।"

"ভদ্রলোকের নাম কী?"

সোমনাথ বিরক্ত গলায় বলল, "ভদ্রলোকের নাম দিয়ে কী হবে? ওর দাদুর নাম ঘনশ্যাম বটব্যাল।"

"ঘনশ্যাম বটব্যাল! তিনি আবার কে?"

সোমনাথ রাগী গলায় বলল, "উফ্ তুই দেখছি, কোনো খবরই রাখিস না। ঘনশ্যাম বটব্যাল একসময় মস্ত বড়ো শিকারি ছিলেন! উনি একবার কাজিরাঙা ফরেস্টে...।"

"শিকারি!" আমি টেলিফোনেই ঢোক গিললাম।

ওপাশ থেকে সোমনাথ দিল ধমক। বলল, "কেন, শিকারিতে আপত্তি কীসের? দেখবি শিকারির নাতি আসছে শুনলে গোটা বসন্তপুর ভেঙে পড়বে। তা ছাড়া অন্য ব্যাপারও আছে। বিশেষ আকর্ষণ।"

"কী আকর্ষণ?"

সোমনাথ আমার এই প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে ফোন কেটে দিল।

স্টেজে আমরা সেভাবেই মানুষটার পরিচয় দিলাম—শিকারির নাতি। ধুতি ফতুয়া ক্যাম্বিসের জুতো পরা রোগা আর লম্বা চেহারার মানুষ। কথা খুবই কম বলেন। শুধু মিটিমিটি হাসেন। তবে সোমনাথের কথা সত্যি হল। আমাদের বিশেষ অতিথিকে দেখার জন্য ভিড় উপচে পড়ল। পড়বে নাই-বা কেন? শিকারির নাতি যে সবসময় কাঁধে একটা দোনলা বন্দুক নিয়ে বসে ছিলেন! বিশেষ আকর্ষণ। বন্দুক কাঁধে বিশেষ অতিথি কেউ কখনো দেখেছে? বসন্তপুর মিলন সংঘের জয়জয়কার হতে লাগল। আমরা বুক ফুলিয়ে ঘুরতে লাগলাম।

ঘটনা এখানে শেষ হলে ভালো হত। কিন্তু শেষ হল না। আর একটু আছে।

দু-দিন পরে শতদল সংঘের সেক্রেটারি অবিনাশের সঙ্গে বসন্তপুর স্টেশনে আমার দেখা। একপাশে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "তোদের সোমনাথ কাজটা ভালোই করেছে।"

আমি বললাম, "কোন কাজ?"

অবিনাশ মুচকি হেসে বলল, "নাটকের দল থেকে শিকারি নাতি ভাড়া করে আনার কাজ।"

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, "তোকে কে বলল?"

অবিনাশ আরও গলা নামিয়ে বলল, "আমি সব জানি। বন্দুকটার ভাড়া লেগেছে ষাট টাকা।"

আমি আরও রাগ দেখিয়ে বললাম, "খবরদার বাজে কথা বলবি না।"

অবিনাশ আমার পিঠে হাত রেখে বলল, "আরে বাবা, রাগ করছিস কেন? আমিও তো একই নাটকের দল থেকে পর্বতারোহী ভাড়া করেছিলাম। ব্যাগ, তাঁবু, দড়ির জন্য তিরিশ টাকা চেয়েছিল। পঁচিশ টাকার একপয়সাও বেশি দিইনি।"

আমি অবাক হয়ে অবিনাশের দিকে চেয়ে রইলাম। অবিনাশ হেসে বলল, "দুজনেই চুপ করে থাকি। সেটাই ভালো হবে। তাই না?"

ট্রেন এসে গেল।

ফ্ল্যাশব্যাক

আজ শেষদিন। কালই চলে যাওয়া। টেনশন বাড়ছে।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে টেনশন হয় ঝগড়া নিয়ে। সৃজার টেনশন বেড়েছে ঝগড়া না হওয়া নিয়ে। বান্ধবীর সামান্য ঠাট্টা যে এভাবে ঝামেলায় ফেলবে সৃজা ভাবতেও পারেনি। এটা অবশ্যই একটা বোকামি। এখনই উচিত বোকামি থেকে ঝেড়ে বেরিয়ে আসা। কিন্তু গত পাঁচদিনে সে পারেনি। আজ শেষদিনে পারবে বলে মনে হয় না। সমস্যা হল টেনশনের সঙ্গে সঙ্গে সৃজার ভেতরে একটা কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে কেঁদে ফেলতে পারে। কী বিপদ!

কান্না আটকানোর একটাই উপায়। প্রীতীশের সঙ্গে ঝগড়া করা। সৃজা খুব চেষ্টা করছে যাতে প্রীতীশের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। বড়ো কোনো ঝগড়া নয়, হালকা ধরনের ঝগড়া। ঝগড়ার কারণে খানিকটা সময় দুজনের কথা বন্ধ থাকবে। এই ঘণ্টাখানেকের মতো। না না, অত দরকার নেই মিনিট পনেরো কুড়ি কথা বন্ধ হলেই চলবে। বিয়ের সবে পনেরো দিন হয়েছে। এখন ঘণ্টাখানেক কথা বন্ধ করে থাকা অসম্ভব।

যদিও সৃজার এখন একেবারেই ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে না। তার ইচ্ছে করছে খাটে উঠে গিয়ে প্রীতীশকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে। পাশ থেকে জড়িয়ে ধরবে। মাথা থাকবে প্রীতীশের থুতনির কাছে। প্রীতীশ হাত দিয়ে তার চুলে বিলি কেটে দেবে আর টুকুস টুকুস করে কথা বলবে। জরুরি কিছু কথা নয়। হাবিজাবি কথা। যার বেশিরভাগেরই কোনো উত্তর হয় না। সৃজা তবু উত্তর দেবে। হাবিজাবি সব উত্তর।

'সৃজা, তুমি কি জানতে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে?'

'হ্যাঁ, জানতাম।'

'কবে জানলে? যেদিন আমার বাবা-মা তোমাকে দেখতে গিয়েছিল সেদিন?'

'না। তার আগে।'

'তার আগে! তার আগে মানে? যখন আমি বন্ধুদের নিয়ে তোমায় দেখতে গেলাম?'

'তারও আগে।'

'তারও আগে! বাপ রে! যখন মেজোমাসি তোমার বাবাকে চিঠি লিখেছিল—আপনার মেয়ের ফটো আমাদের পছন্দ হয়েছে। এবার আমরা একদিন...তখন?'

'উঁহু, তার থেকেও।'

'দুর সৃজা, তুমি যে কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না। তার আগে হবে কী করে? সে তো আমরা কাগজে পাত্রী চাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।'

সৃজা এবার খিলখিল করে হাসবে। বলবে, 'সেই ছোটোবেলা থেকেই জানতাম। তখন আমি ফ্রক পরি।'

'যাঃ, বাজে কথা বলছ। ওই বয়েসে কেউ বিয়ের কথা ভাবে?'

'ভাবে না। আমিও ভাবতাম না। একদিন মনে মনে জানলাম, তেইশ বছর বয়েসে প্রীতীশ নামে একটা সুন্দর দেখতে সুন্দর মনের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। সে অন্য কোনো মেয়ের দিকে না-তাকিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তখন ভাবতে শুরু করলাম।'

'তুমি ঠাট্টা করছ।'

'ওমা, ঠাট্টা করব কেন! বানিয়ে বলছি।'

'সেকী, বানিয়ে বলছ! বানিয়ে বলছ কেন!'

'বানিয়ে বলতে খুব ভালো লাগছে তাই বলছি। জীবনে একেকটা সময় এ-রকম হয়। সত্যির থেকে বানানো জিনিসে বেশি ভালো লাগে।'

'পাগলি কোথাকারে।'

'তুমি একটা পাগল।'

এইসব কথার মাঝখানে প্রীতীশ তাকে একটু একটু আদর করবে। আলগা আদর। গায়ে হালকা করে হাত দেবে। ঘাড়ে, কানের লতিতে ঠোঁট, নাক ছোঁয়াবে। শরীর শিরশির করে উঠবে। এসব প্রস্তুতিপর্ব। রাগের আগে যেমন আলাপ, ঝড়ের আগে যেমন ঠান্ডা বাতাস। এটাও তেমন। ঝড় উঠবে রাতে। ডিনারের পর।

কিন্তু এই মুহূর্তে এসবে মন দিলে চলবে না সৃজার। তাকে ঝগড়া করতে হবে। পাঁচদিন ধরে কম চেষ্টা করছে না সে। লাভ হচ্ছে না। ঝগড়ার প্রথম শর্ত হল কোনো একটা বিষয়ে দুজনকে দু-মত হতে হবে। সেটাই হচ্ছে না। সৃজা যা বলছে, প্রীতীশ মেনে নিচ্ছে। শুধু মেনে নিচ্ছে না, হাসিমুখে মেনে নিচ্ছে। যেমন, পরশু ভোরে সৃজা ইচ্ছে করে বলল, 'আজ আর সকালে বেরোব না। বেলা পর্যন্ত হোটেলের ঘরেই থাকব। খাটে শুয়ে গড়াব।' প্রীতীশ তখন বেরোনোর জন্য জামা,

জুতো, সোয়েটার পরে তৈরি। বেড়াতে এসে ভোরবেলা হোটেলের ঘরে বসে থাকার সে একেবারেই পক্ষপাতী নয়। সৃজা নিশ্চিত ছিল, তার এই সিদ্ধান্তে প্রীতীশ অবশ্যই আপত্তি করবে। প্রথমে নরমভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে। ভোর-বেলা পাহাড়ি দৃশ্য কত চমৎকার। গত দু-দিন, বেরিয়ে কত ভালো লেগেছে—এই সব। সৃজা তখনো রাজি হবে না। গায়ে লেপ চাপা দেবে। এতে প্রীতীশ নিশ্চয় খানিকটা বিরক্ত হবে। গলায় কঠিন ভাব আসবে।

'তোমার কি শরীর খারাপ সৃজা?'

'না শরীর ভালো।'

'সে কী! শরীর ভালো হলে ঘরে শুয়ে থাকবে কেন? আর তো মোটে দুটো দিন আছি।'

'দুটো দশটা যটা দিনই থাকি, এখন আমি বেরোব না। তুমি যদি চাও একা ঘুরে আসতে পার।'

এরপরই সৃজা গলায় জোর আনবে। বলবে, 'আমাকে কি সবসময় তোমার ইচ্ছেমতো চলতে হবে?'

প্রীতীশ বলবে, 'এসব কী বলছ সৃজা!'

'কী বলছি তুমি বুঝতে পারছ না? না-পারলে আর বুঝতে হবে না। প্লিজ লিভ মি অ্যালোন।'

এই কথা বলে সৃজা পাশ ফিরবে। ব্যাস, ঝগড়া শুরু।

হায় রে! এসব কিছুই হল না। সৃজা যেই বলল, 'আজ আর সকালে বেরোব না। বেলা পর্যন্ত হোটেলের ঘরেই থাকব। খাটে শুয়ে গড়াব।' প্রীতীশ অমনি জুতো-টুতো খুলে খাটের ওপর উঠে এল। বলল, 'খুব ভালো হবে। আজ সারাদিন তুমি আর আমি ঘরেই থাকব। বাইরে এসেছি বলে রোজ রোজ বেরোতে হবে এ-রকম কোনো মানে নেই। জানলা খুলে পাহাড় দেখব। জানলা খুলে পাহাড় দেখার আলাদা মজা আছে। নইলে জানলাগুলো পাহাড়ের দিকে মুখ করা কেন? দেয়ালের দিকে মুখ করা হতে পারত। হা হা।'

সৃজার গোটা পরিকল্পনাটাই গেল ভেস্তে। পরিকল্পনা করল পরদিন রাতেও। প্রীতীশ ঠিক করেছিল। ডিনার হবে হোটেলে। তিনদিন ওরা এখানে এসেছে। তিনদিনই হোটেলের বাইরের রেস্তোরাঁয় খেয়েছে। হোটেলের পিছনে চমৎকার একটা রেস্তোরাঁ আছে। পাহাড়ি পথে মিনিট দশ হাঁটতে হয়। পথটাও চমৎকার। বুনো, কেমন যেন ভেজা ভেজা। রেস্তোরাঁর নাম সামসি। একটুখানি রেস্তোরাঁ। জানলার দিকে টেবিল পেলে পাহাড়ের নীচে একফালি নদী দেখা যায়। নদীর নামও সামসি। অল্প অল্প আলো জ্বলে। টেবিলে দুজন করে বসার ব্যবস্থা। একেবারে হইচই নেই। সৃজা, প্রীতীশ দুজনেরই খুব পছন্দ হয়েছে। প্রীতীশের বেশি পছন্দ। সেই প্রীতীশই বলল, 'আজ এই হোটেলেই খাব।'

সৃজা বলল, 'কেন?'

প্রীতীশ হেসে বলল, 'হোটেলের ছেলেগুলো খুব ধরেছে। বলছে, সাব, আমাদের এখানকার ফুড খুব ভালো। একদিন টেস্ট করে দেখুন। আমি বললাম, ঠিক আছে তাই হবে।'

সৃজা এক মুহূর্ত ভাবল। এই চান্স নিতে হবে। ঝগড়ার একটা ছুতো পাওয়া গেছে। সে বলল, 'না, ঠিক নেই। আমি বাইরেই খাব।'

প্রীতীশ অনুরোধের ঢঙে বলল, 'আসলে ছেলেগুলো এত করে বলল।'

সৃজা ঠান্ডা গলায় বলল, 'বলল তো কী হয়েছে? আমি বাইরেই খাব। সামসির সুপটা দারুণ।'

প্রীতীশ এক গাল হেসে বলল, 'ঠিকই বলেছ। ওরা বলল তো কী হয়েছে? ওরা তো খাবে না, খাব আমরা। সুতরাং আমরাই ঠিক করব কোথায় খাব। সামসিতেই যাব এবং সেখানে সুপ খাব।'

সৃজা ভেঙে পড়ল। এবারও হল না! তাহলে কি আর হবে না? এ ছাড়াও টুকটাক আরও চেষ্টা চালিয়েছে সে। প্রীতীশ যখন আবদারের ভঙ্গিতে তাকে পায়জামা কুর্তা পরতে বলেছে, তখন লং স্কার্ট পরেছে। অন্য যেকোনো স্বামী হলে মুখ গোমড়া করত। প্রীতীশের হয়েছে উলটো কাণ্ড। সৃজার ড্রেস করা হলে সে বলল, 'ঠিক ডিসিশন নিয়েছ। আজ লং স্কার্টে তোমাকে বেশি সুন্দর লাগছে। মনে হয় বিকেলের দিকের আলো বলেই এটা হচ্ছে।' এখানেই শেষ নয়। আরও চেষ্টা আছে। সেটা অবশ্য খানিকটা 'অ্যাডাল্ট' চেষ্টা। প্রথমদিন দুপুরে সৃজা স্নানের জন্য সবে হোটেলের বাথরুমে ঢুকেছে। মিনিট পাঁচ পরে প্রীতীশ দরজায় নক করল। সৃজা তখন শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে সাবান মাখছে। জোর গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

প্রীতীশ নিচু গলায় বলল, 'একবার দরজাটা খুলবে?'

সৃজা সাবান হাতে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন?'

প্রীতীশ গাঢ় গলায় বলল, 'অ্যাই, খোল না।'

সৃজার ঠোঁটে একটু হাসির রেখা। সে দরজার কাছে সরে গিয়ে বলল, 'আগে কেন বল।'

'কিছু না, এমনি। উঁ উঁ।'

মুহূর্তখানেক ভাবল সৃজা। এটাই সুযোগ। ঝগড়ার মোক্ষম সুযোগ। গলা তুলে কড়া গলায় বলল, 'ছিঃ।'

প্রীতীশ কাতর গলায় বলল, 'প্লিজ সৃজা...একটিবার খোল।'

সৃজার খুব ইচ্ছে করল দরজাটা খোলে। খোলার আগে বুকের ওপর তোয়ালেটা এমনভাবে জড়িয়ে নেয় যাতে প্রীতীশের সামান্য টানেই সেটা সরে যায়। দাঁতে দাঁত কামড়ে নিজেকে সামলাল সে। দারুণ সুযোগ এসেছে। কিছুতেই

দরজাটা খুলবে না। পুরুষমানুষ 'ইচ্ছে'র সময় না-পেলে ভীষণ রেগে যায়। প্রীতীশও যাবে।

না, প্রীতীশ রেগে গেল না! সৃজা স্নান সেরে বেরোনোর পর উৎসাহ নিয়ে বলল, 'আজ বিকেলে একটা দারুণ জায়গা দেখতে যাব সৃজা। সানসেটের সময় ওখান থেকে তিনটে পিক গোলাপি দেখায়।'

প্রীতীশের গলা শুনে মনেই হল না একটু আগে সে সৃজাকে বাথরুমের দরজা খোলার জন্য কাকুতিমিনতি করছিল! যেন এমন কিছু হয়নি। সৃজা মনে মনে ভেঙে পড়ল। তাহলে কি মালার কথাই সত্যি?

কলকাতা ছাড়ার দিন সকালে মালা তাকে ফোন করেছিল। মালা সেই কলেজ জীবনের বন্ধু। খুব বকবক করে। কলেজে নাম ছিল মিস্ বকবকানি। সেই স্বভাব এখনো যায়নি। সৃজার বিয়েতে আসতে পারেনি বলে হুড়মুড় করে আরও বেশি কথা বলে বসল।

'কী রে হানিমুনে কবে যাচ্ছিস?'

'কাল।'

'একেবারে কাল! বাবা, বিয়ের ফুল বাসি না হতে হতেই হাত ধরে ছুটছিস? ভেরি গুড। ওসব জিনিসে দেরি না-করাই শুভ।'

সৃজা লজ্জা পেয়ে বলল, 'ভ্যাট, খালি অসভ্যতামি।'

'উনি বিরাট সভ্য এসেছেন রে। যাক, একেবারে ঠিক টাইমে ফোন করেছি। নইলে অ্যাডভাইজ দেওয়া হত না। তুই ভেগে যেতিস।'

সৃজা হেসে বলল, 'খারাপ কথা বলবি না মালা। মার খাবি।'

'খারাপ কথা নয়, কাজের কথা। হানিমুনে গিয়ে অবশ্যই প্রীতীশের সঙ্গে খানিকটা ঝগড়া করবি।'

'ঝগড়া!'

'হ্যাঁ, ঝগড়া। এমনি ঝগড়া না-হলে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করবি।'

সৃজা অবাক গলায় বলল, 'কী বলছিস আবোল-তাবোল? হানিমুন কি কেউ ঝগড়া করার জন্য যায়? যায় তো ভাব করতে।'

মালা চাপা গলায় ধমক দেয়। বলে, 'চুপ কর বোকা। হানিমুনের তুই কী বুঝেছিস? এমনভাবে বলছিস যেন দশটা হানিমুন করেছিস। হানিমুনে গিয়ে ঝগড়া না-করলে হানিমুনের দেবতা বিরাট রাগ করবেন। হানিমুনের দেবতার নাম জানিস?'

সৃজা থতোমতো খেয়ে বলল, 'হানিমুনের দেবতা! ঠাট্টা করছিস?'

'ওমা ঠাট্টা করব কেন? হানিমুনের দেবতা হলেন...যাক, নাম জেনে তোর লাভ নেই তুই দেবতার অভিশাপের কথাটা শুধু জেনে রাখ।'

'অভিশাপ! কী অভিশাপ?'

মালা ফোনে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হেসে বলে, 'কী আবার, ঝগড়া না-করলে বরের আদরে পুরো টেস্ট পাবি না। কোনোদিন মনে হবে নুন দিতে ভুলে গেছে, কোনোদিন মনে হবে আরও একটু ঝাল হলে ভালো হত, কোনোদিন মনে হবে মিষ্টির হাতটা বেশি। হি হি।'

সৃজার কান লাল হয়ে গেল। মোবাইলের কান বদল করে বলল, 'আবার খারাপ কথা?'

মালা এবার গলা সিরিয়াস করে বলল, 'না খারাপ কথা নয়, আসলে কী জানিস স্বামীকে পরীক্ষা করার এটা একটা টেকনিক। যেসব মেয়ের সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় তারা এই পরীক্ষায় দারুণ উপকার পেয়েছে। যদিও ঘটনা আমি বিশ্বাস করি না। তমালিকে মনে আছে? হিস্ট্রি অনার্স? মনে নেই তো...ওর খুব উপকার হয়েছিল। বেচারি কিছু জানতই না। হানিমুন গিয়ে টেকনিক অ্যাপ্লাই করল। সন্দেহ হল। পরে ঘটনা মিলে গেল। ওর বরের সঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই একটা মেয়ের অ্যাফেয়ার্স চলছে। অফিসে কাজ করে। বোঝ কাণ্ড। তমালি পুলিশে যাওয়ার ভয় দেখাতেই সেই ছেলে একেবারে কেঁচো।'

মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সৃজার। মালা এসব কী বলছে! সে শান্ত গলায় বলল, 'কী বলছিস মালা। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'দুর, অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? প্রীতীশ নিশ্চয় খুব ভালো ছেলে। ওর ওসব অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার থাকবে কোন দুঃখে? আসলে কী জানিস নিজে থেকে বুঝে নিতে তো কোনো দোষ নেই। যার সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটবে তার আগেরটুকু দেখে নিলে অনেক সুবিধে। সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাক।'

'কীভাবে বুঝব?' ফিসফিস করে বলল সৃজা। তার গলা কাঁপছে। কাঁপারই কথা। মাত্র চারদিন আগে যে পুরুষমানুষটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে তার পূর্ব প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে তো গলা কাঁপবেই।

'ভেরি সিম্পল। এটা একটা সাইকো অ্যানালিসিস বলতে পারিস। মনের বিশ্লেষণ। হানিমুনে গিয়ে ঝগড়া বাধাতে হবে। বড়ো কোনো ঝগড়া নয়, ছোটোখাটো ঝগড়া। হালকা পলকা ধরনের। দেখতে হবে স্বামী দেবতাটি ঝগড়া করছে কি না। যদি করে তাহলে বুঝতে হবে কোনো সমস্যা নেই। মানুষ নিখাদ। বউ যতই নতুন হোক, তার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় কোনো মেয়ের জায়গা নেই। সেই কারণেই বুক ফুলিয়ে ঝগড়া করার সাহস পাচ্ছে। হানিমুনে এসেও গলে যায়নি, বা বানিয়ে বানিয়ে গলে যাওয়ার ভান করছে না।'

এত পর্যন্ত বলে মালা চুপ করে গেল। সৃজা ঢোক গিলে বলল, 'আর যদি ঝগড়া না করে?'

মালা গলা গম্ভীর করে বলল, 'চিন্তা করিস না, প্রীতীশ নিশ্চয় ঝগড়া করবে।

ওই ছেলে সম্পর্কে তোর কাছ থেকে যতটা শুনলাম, তাতে আমি শিওর ও ঝগড়া করবেই। ওর কোনো প্রেম-ট্রেম ছিল না। খুবই ভালো ছেলে।'

সৃজা দম বন্ধ করে বলল, 'তাও তুই বল। যদি ঝগড়া না করে তাহলে কী বুঝব?'

মালা হাসল। বলল, 'বললাম তো বাপু তোর চিন্তা নেই।'

সৃজা বিরক্ত হল। বলল, 'আঃ, তাও বল।'

মালা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হানিমুনে স্বামী যদি ঝগড়া না-করে তাহলে বুঝতে হবে সমস্যা আছে। সেই পুরুষমানুষের ফ্ল্যাশব্যাকে কোনো নটঘট আছে। সেই কারণেই বউকে তোয়াজ করছে। লুকোতে চাইছে কিছু।'

সৃজা বলল, 'রাবিশ। তুই ঠাট্টা করছিস।'

মালা হেসে ফেলল। বলল, 'ঠিক বলেছিস। আমি ঠাট্টা করছি। ওসব কথা বাদ দে। হানিমুনে কোথায় যাচ্ছিস? পাহাড় না সমুদ্র?'

সৃজা বিরক্ত গলায় বলল, 'পাহাড়।'

'বিউটিফুল। হানিমুনে পাহাড় মানে ঠান্ডা, মানে ইয়ে খুব জমবে। লেপ থেকে দুজনে বেরোবি-ই না। ছেলের নাম কী দিবি ঠিক করেছিস? হিমালয় দিতে পারিস। পছন্দ? হি হি।'

সৃজাও হেসে ফেলল। বলল, 'বাপ রে, পারিসও বটে। একেবারে ছেলের নাম! এবার ছাড়। অনেক ঠাট্টা হয়েছে।'

কলকাতাতে ঠাট্টা বলে এলেও এখানে এসে ঝুঁকি নিতে পারল না সৃজা। মালার কথাটা গলার কাঁটার মতো মাথার ভেতর খচ খচ করছে। গত পাঁচদিন ধরে সে চেষ্টা চালাচ্ছে। গোটা হানিমুনপর্বে একবারের জন্য প্রীতিশ তার সঙ্গে ঝগড়া করেনি। পায়ে পা দিয়ে অনেক চেষ্টা করল, লাভ হল না। কোনো চেষ্টাই সফল হয়নি। টেনশন বেড়েছে। বাড়তে বাড়তে একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। হাতে আর সময় নেই। কালই হানিমুন শেষ। দুপুরে লাঞ্চের পরই জিপ নিয়ে এন জে পি নেবে যাবে। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতা। তাহলে কি মালার কথাই ঠিক? আগে প্রীতীশের আরও কোনো...দুর দুর, তা কী করে হবে? এই ক'দিনেই সৃজা বুঝতে পেরেছে, প্রীতীশের মতো স্বামী পাওয়া ভাগ্যের। খুব কেয়ারিং। দশদিনেই স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছে। মেয়েরা অনেক কিছু ভুল বুঝতে পারে। স্বামীর ভালোবাসা নিয়ে কখনো ভুল বোঝে না। মিস বকবকানি এমনিতেই একটা ঠাট্টাবাজ মেয়ে। সে কী-একটা ফালতু হানিমুন পরীক্ষা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল...। আচ্ছা, আসানসোলের ছোড়দিরও এ-রকম হয়েছিল না? হালকা হালকা যেন মনে পড়ছে। বিকাশদা অসম্ভব কেয়ারিং ছিল। বিয়ের পর পর এসে ছোড়দি খুব গল্প করত। হানিমুনের সময় পায়ে কাঁটা ফুটেছিল বলে ছোড়দিকে দার্জিলিঙের ম্যাল থেকে পিঠে চাপিয়ে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল। পরে জানা গেল, ওই লোকের আর একটা

সংসার আছে। বউ মেয়ে সব! ছোড়দিকে ছেড়ে চলেও গেল তার কাছে...ইস এখনই ঘটনা মনে পড়ল!

বেতের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সৃজা। তার কেন জানি কান্না কান্না পাচ্ছে। লোকটা কী, একটু ঝগড়া করলেই তো সব সমস্যা মিটে যায়। একটা চান্স নিতে হবে। শেষ সুযোগ।

প্রীতীশ খানিকটা দূরে খাটের ওপর বসে। কোমর পর্যন্ত লেপ ঢাকা। আজ রাতে আর 'সামসি' নয়। হোটেলেই ডিনারের অর্ডার হয়েছে। প্রীতীশ বলল, 'দুর পাঁচদিন বড্ড কম। হানিমুন করা উচিত মিনিমাম মাসখানেক ধরে।'

ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে আছে সৃজা। সামনে সাজগোজের জিনিস ছড়ানো। কাল সকালে উঠে এগুলো বক্সে ভরে নিতে হবে। এখন সে লম্বা নখের পরিচর্যা করছে। ঠিক পরিচর্যা নয়, একটা কিছু নিয়ে অন্যমনস্ক থাকতে হয় তাই থাকা। প্রীতীশ হাসি হাসি মুখে বলল, 'কী বললে না, হানিমুন একমাস হওয়া উচিত কি না?'

সামনের আয়নায় প্রীতীশকে দেখা যাচ্ছে। সৃজা একবার চোখ তুলে নামিয়ে নিল। কী সুন্দর! অসম্ভব। এই ছেলে খারাপ কিছু করতেই পারে না।

'করলেই পারতে। আপত্তি করেছিল কে?'

'দুর, অফিসে সাতদিন ছুটি দিতেই বেগোড়বাই করছিল। তবে এই জায়গাটা ফাইন। পাহাড়ে এলেই অন্যরকম লাগে। মনে হয় আমার মনটাও পাহাড়ের মতো।'

বিছানায় বসে কায়দা করে দু-হাত পাশে ছড়িয়ে দিল প্রীতীশ।

সৃজা গলায় ঝাঁঝ এনে বলল, 'একেবারেই নয়, পাহাড়ের থেকে সমুদ্র আমার অনেক বেশি ভালো লাগে।'

প্রীতীশ থতোমতো খেয়ে বলল, 'সেকী সৃজা! কাল যে বললে, পাহাড়ে তুমি দারুণ মজা পাও! বললে না?'

সৃজা থমথমে গলায় বলল, 'না-বলে উপায় কী? আমাকে জিজ্ঞেস করে তো আর তুমি হানিমুনের টিকিট কাটোনি।'

প্রীতীশ মাথা চুলকে বলে, 'আসলে তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে...।'

'একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। হানিমুন তো একজনের নয়, দুজনের।' সৃজার গলায় ঝগড়া ঝগড়া ভাব।

প্রীতীশ এবার হেসে ফেলল।

সৃজা মুখ ঘুরিয়ে, ভুরু কুঁচকে বলল, 'হাসছ কেন? এর মধ্যে হাসির কী পেলে? ভাগ্যিস কাল চলে যাচ্ছি, পাহাড়ে বেশিক্ষণ থাকলে আমার দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে।'

প্রীতীশ খাট থেকে নামল। এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে সৃজাকে জড়িয়ে ধরল।

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘ঠিক বলেছ, আমারও পাহাড়ের থেকে সমুদ্র অনেক বেশি ভালো লাগে। তবে তুমি থাকলে সব জায়গাই চমৎকার।’

সৃজা আর পারল না। প্রীতীশকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

প্রীতীশ অবাক হয়ে বলল, ‘একী সৃজা! তুমি কাঁদছ কেন?’

‘বেশ করছি। এক-শোবার কাঁদব। মালা একটা মিথ্যেবাদী। বল মিথ্যেবাদী কিনা, বল, বল...।’

প্রীতীশ আরও অবাক হয়ে বলল, ‘মালা! সে কে?’

‘একটা পাজি মেয়ে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে ওকে আমি খুন করব।’

শরীরে গভীর তৃপ্তি নিয়ে দুজনেই শুয়ে আছে লেপের তলায়। ঘরে হালকা সবুজ আলো। ছায়া ছায়া। সৃজা লেপের ভেতর থেকে হাত বের করে নাইটি খুঁজতে যায়। প্রীতীশ তাকে জড়িয়ে ধরল।

সৃজা হেসে বলল, ‘অ্যাই ছেলে, আবার দুষ্টুমি?’

প্রীতীশ ফিসফিস করে বলল, ‘জানো সৃজা, ভেবেছিলাম সারাজীবন লুকিয়ে রাখব, কিছুতেই তোমাকে বলব না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা অন্যায় হবে। তোমার মতো একটা সুন্দর মেয়েকে ঠকানো ঠিক না...তাই ঠিক করেছি বলেই ফেলব...। তখন আমি চাকরি খুঁজছি, ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়াই...।’

সৃজা প্রীতীশের হাতটা নিজের বুকের ওপর টেনে বলল, ‘চুপ কর।’

যবনিকা

অতিরিক্ত আনন্দ হলে মানুষ কী করে? হাসে? কাঁদে? নাকি ডিগবাজি খায়? কেশবের ইচ্ছে করছে, ডিগবাজি খেতে। বত্রিশ বছর বয়েসে ডিগবাজি খেলে সমস্যা কী? পিঠে, কোমরে, ঘাড়ে হেঁচকা লাগে? যে পরিমাণ আনন্দ হচ্ছে তাতে অল্প হেঁচকা লাগা কোনো সমস্যা নয়।

তবু ডিগবাজি থেকে পিছিয়ে গেল কেশব। তার কারণ সমস্যা হেঁচকা নয়, সমস্যা প্রতিমা। এই সাতসকালে স্বামীকে ডিগবাজি খেতে দেখলে প্রতিমার দু-ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এক, সে ঘাবড়ে যেতে পারে, দুই সে ভয়াবহ ধরনের রেগে যেতে পারে। ঘাবড়ে যাওয়ার দিন শেষ। সুতরাং চিৎকার শুরু করবে বলেই ধরে নেওয়াটা ভালো। চিৎকার করে এই এক কামরার বাড়ি মাথায় তুলবে। ডিগবাজির পরিকল্পনা স্থগিত রাখল কেশব। পরে ঘর ফাঁকা হলে সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। প্রতিমা আজকাল চেঁচামেচি বড্ড বাড়িয়েছে। সারাক্ষণ রেগে থাকে। যেন মাথায় হাঁড়ি নিয়ে ঘুরছে। হাঁড়ির মধ্যে গনগনে আগুন।

বেচারির দোষ দেখে না কেশব। দীর্ঘদিন স্বামীর রোজগারপাতি না-থাকলে যে কোনো মেয়েরই মাথায় আগুন নিয়ে ঘোরার কথা। সে তো আর বুঝতে পারছে না, তার স্বামী কেন দাঁত কামড়ে এতদিন অপেক্ষা করে আছে। একবার শুধু লেগে যাওয়ার অপেক্ষা। লেগে গেলেই চিচিং ফাঁক। তখন স্বামীর গর্বে এই মেয়েরই মাটিতে পা পড়বে না। পাড়ার দশটা লোকে বলবে—'দেখ, দেখ দেমাকি মেয়ে হাঁটে দেখ। মাটিতে হাঁটে তো না, যেন হাওয়ায় ভাসে।'

এই লাইনে অনেক সময়েই 'হঠাৎ লেগেছে'। যাকে বলে হঠাৎ হিট। বহু ইতিহাস আছে। বছরের পর বছর ঘষটে কিছু হল না, হঠাৎ একদিন কপাল খুলল। ফিল্মের বড়ো ডিরেক্টরের চোখে পড়ে গেল ফট করে। সেই লোক শো শেষের পর, ব্যাকস্টেজে চামচে পাঠাল। দু-দিন পরেই নতুন ছবিতে সাইন। রাতারাতি স্টেজ

থেকে পর্দায়। ফুটপাথ টু রাজপ্রাসাদ। এর জন্য অপেক্ষা লাগে। ওত পাতা লাগে। সব বড়ো কাজেরই এক নিয়ম। শিকারের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করবে শিকারি। নড়াচড়া চলবে না, ধৈর্য হারালে চলবে না। কেশবের জীবনে শিকার হল খ্যাতি, যশ। যশের পিছনে টাকা। এই সহজ যুক্তি সরলমতি প্রতিমাকে কে বোঝাবে? বিয়ের বছরখানেকের মাথায় একবার বোঝাবার চেষ্টা করেছিল কেশব। রোজগারপাতির মতো সামান্য জিনিসে তার মতো মানুষের কেন মন দেওয়া সাজে না, সে-কথা বলেছিল বউকে।

'টাকাপয়সার দিকে বেশি নজর দেওয়ার অর্থ হল কাদা ঘাঁটা। সবাই এ-কাজ পারে, গুণী মানুষ পারে না। বেশি কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করলে গুণী মানুষের গুণ কাদায় মিশে যায়।'

প্রতিমা চোখ কপালে তুলে বলল, 'এ তুমি কী কথা বল? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। বিয়ের পর থেকেই দেখি বাড়িতে শুয়ে বসে থাক। বিকেল হলে ফুলবাবু সেজে বেরোচ্ছ, রাতে ছাইভস্ম গিলে ফিরছ। এর মধ্যে গুণ বেগুনের কী আছে?'

'আহা, ওভাবে বলছ কেন প্রতিমা? ওসব না-খেলে আসল জিনিস বেরোয় না। ভেতরের প্রতিভা বাইরে আনতে তেল জল লাগে। শিল্পী মানুষ অমন একটু খায়-টায়।'

'কী মানুষ!'

'শিল্পী, আর্টিস্ট।'

'কী হাবিজাবি বলছ? তুমি আবার ওইসব কবে হলে? সকালেই গিলেছ নাকি?'

মাথা নাড়তে নাড়তে কেশব বলে, 'ছি ছি কী যে বল, সকালে খাব কেন? আমি আছি, ডাকের অপেক্ষায় আছি। ডাক এলেই দৌড় দেব।'

কেশবের আশ্বাস প্রতিমাকে আদৌ ভরসা দিতে পারল বলে মনে হয় না। সে হতাশ গলায় বলল, 'বিয়ের আগে শুনেছিলাম, মানুষটার রোজগারপাতি তেমন ভালো নয়। এখন দেখি মানুষটার রোজগারপাতির কোনো ইচ্ছাই নাই। সে খালি খায়দায় আর বাড়িতে ঠ্যাং নাচিয়ে শুয়ে থাকে। আমি তো কিছুই বুঝি না। এ কেমন মানুষ!'

কেশব বিড়িতে নিশ্চিন্ত টান দিয়ে বলে, 'বুঝবে প্রতিমা, অবশ্যই বুঝবে। যেদিন চান্স পাব সেদিন সবাই আমার কদর বুঝবে, তুমিও বুঝবে। চান্সটা হচ্ছে না তাই মুশকিলে আছি। তবে মুশকিল কাটতে বেশি দেরি নেই। চেষ্টা চরিত্র চালাচ্ছি। দেখ, ফট করে ঠিক একদিন লেগে যাবে। আর লেগে গেলেই কেল্লা ফতে। দু-দিন অন্যের দলে থেকে, নিজেই দল বানাব।'

'কীসের দল?'

চোখ আধখানা বুজে গদগদ গলায় কেশব বলল, 'দেখতে পাবে,...দেখতে পাবে...।'

প্রতিমা কড়া গলায় বলে, 'আমার দেখার দরকার নাই। কবে কী হবে তাই ভাবলে চলবে? সংসারে এখন টাকা লাগবে না?'

কেশব উদাসীন ভঙ্গিতে বলে, 'ওইটুকু ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। যাচ্ছেও তো। কিছু কাজকর্ম তো করি। হপ্তায় দু-তিনদিন টাকার ধান্দায় বেরোই। বেরোই না? তুমিই বল না, আটকাচ্ছে কোথাও? চাল ডাল তো আসছে।'

প্রতিমা কড়া গলায় বলল, 'চেয়েচিন্তে ধারদেনা করে এতদিন চলছে। আর কতদিন চলবে?'

মৃদু হাসে কেশব। বিজ্ঞ মানুষের ভঙ্গিতে বলে, 'বড়ো কাজের আগে ধারদেনা লাগে। একটা সময় সব দেনা মিটে যায়। বড়ো আর্টিস্টরা সবাই ধার করেছেন। এই যেমন সত্যজিৎ রায়, সত্যজিৎ রায়ের নাম শুনেছ? তিনি পর্যন্ত পথের পাঁচালি করতে গিয়ে ধার দেনায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন।'

'কী বললে! কী পাঁচালি?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেশব। স্ত্রীর দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে বলে, 'পথের পাঁচালির নাম শোননি। থাক, আর শুনে লাভ নেই। যাই হোক, মনে রেখ আমিও বড়ো কাজের মধ্যে আছি!'

প্রতিমা আকাশ থেকে পড়ে।

'তুমি কোন বড়ো কাজটায় আছ? শুয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচানো আর রাতে নেশা করে বাড়ি ফেরাটা বুঝি বড়ো কাজ! এই তোমার আর্টিস্ট হওয়া?'

কেশব হাত তুলে বলে, 'আহা, এখনো হইনি, তবে হব। তার জন্য সময় দিতে হবে না? সময় দেওয়াটাও একটা কাজ। বড়ো কাজ। তাড়াহুড়োয় কিছু হয় না গো।'

প্রতিমা ভুরু কুঁচকে বলে, 'বাজে কথা ছাড়। ঘরে বসে না থেকে এবার একটা পাকাপাকি কাজকর্মের খোঁজ কর। যে-কাজ পাও তাও তো দেখি দু-দিন পরে তাড়িয়ে দেয়। কাজ না-করলে তাড়িয়ে তো দেবেই। একদিন দুটো পয়সা আনলে, দশদিন আনলে না, এসব আর চলবে না। ওই ক-দিন পেটে কি খিল মেরে থাকবে? তা ছাড়া আগে যা হয়েছে হয়েছে। এখন আর তুমি একা মানুষ নও। বিয়ে করেছ। তোমার এখন দুটো পেট নিয়ে কারবার। পরে ছেলেপিলে হলে আরও লাগবে। ঘরে শুয়ে ঠ্যাং নাচানো বন্ধ কর।'

কথা শেষ করে মুখ নামায় প্রতিমা। কেশব অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কি আমার কথাটা বুঝতে পারলে না প্রতিমা! আমাকে যে অপেক্ষা করতে হবে এই কথাটা এতক্ষণ ধরে যে বোঝালাম!'

এবার প্রতিমা গলায় ঝাঁজ আনল।

'আমার বুঝে দরকার নেই। তুমি কাল থেকেই কাজের জন্য বেরোবে এই আমি বলে দিলাম।'

কেশব শুকনো ধরনের হাসল। হাত উলটে বলল, 'এইটা কী করে সম্ভব?'

'সম্ভব নয় কেন? পুরুষমানুষ রোজগার করবে না? সবাই করে।'

স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতায় কেশব বিশেষ দুঃখ পায়। বলে, 'সব পুরুষমানুষ আর আমি এক হলাম! কী করে কথাটা বললে তুমি?'

'কেন? তুমি কোন পাস্তুয়া হলে?'

বিয়ে হয়েছে বছরখানেক। এর মধ্যে বউয়ের মুখে এই ভাষা শুনে কেশব যতটা না বিস্মিত হয়, তার থেকে আহত হয় বেশি। পাস্তুয়া! এর মানে কী? নিশ্চয় কোনো রসিকতা। সে হাতের বিড়ি ফেলে মুখ ঘুরিয়ে প্রতিমার দিকে তাকায়। এই ঘুরে তাকানোয় বিন্দুমাত্র থমকে না-গিয়ে প্রতিমা ঝাঁঝের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। আবার বলল, 'তুমি কোন পাস্তুয়া বাপু যে ঘরে বসে বসে খাবে?'

এবার ঘাবড়ে গেল কেশব। প্রতিমার গলায় ধমক। ঠিক সরাসরি ধমক নয়, ধমকের হুমকি। সে অসহায় ভঙ্গিতে বলে, 'আসলে কী জানো প্রতিমা, ধর দুম করে চান্সটা পেয়ে গেলাম। এই ধর অমিয় সামন্তই ডেকে পাঠাল। বলল, নাও কেশব, তোমার জন্য পার্ট রেডি। ফট করে রাত জেগে মুখস্থ করে ফেল দিকিনি। তারপর রিহার্সালে আসবে। তখন কী হবে? চাকরিবাকরি করব না পার্ট করব? থিয়েটার অত সহজ জিনিস নয়। তার ওপর অমিয় সামন্তকে তো চেনো না, হেভি টাইট লোক। স্টেজে পার্ট ভুল হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু রিহার্সালে ভুল হলে বিরাট ক্ষতি। সবার সামনে এমন বকাঝকা দেয় যে তাবড় তাবড় অ্যাক্টর কেঁদে ফেলে।'

প্রতিমার চেহারা খুব খারাপ নয়। গায়ের রং ময়লা হলেও চোখদুটো বড়ো। সেই বড়ো চোখ আরও বড়ো করে বলল, 'অমিয় সামন্ত। সেটা আবার কে? নিশ্চয় কোনো বদ লোক।'

একজন মানীগুণী মানুষ সম্পর্কে 'বদ' কথা ব্যবহার করা ঠিক নয়। যাক, এ নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। প্রতিমা না-বুঝে বলেছে। তবে তার এখন প্রশ্ন করা মানে আলোচনার পথ খুলে যাওয়া। যতই রেগে থাকুক প্রশ্ন করে সে সুযোগ দিয়েছে। কেশব আরও একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'এইটাই তো এতক্ষণ ধরে তোমায় বলার চেষ্টা করছি। অমিয় সামন্ত হল ইদিককার সবথেকে বড়ো ডিরেক্টর।'

'ডিরেক্টর! কীসের ডিরেক্টর?'

আবার প্রশ্ন। আরও খুশি হল কেশব। সত্যি মেয়েটার দোষ কোথায়? কোনো দোষ নেই। তাকে আগেই খোলসা করে বিষয়টা বলা উচিত ছিল। সে তো জানেই না, তার স্বামী কীসের জন্য হা পিত্যেশ করে বসে আছে এত বছর। তার রাগ করাটা মোটেও অন্যায় কিছু নয়। অন্য কোনো মেয়ে হলে আরও বেশি রাগ করত। প্রতিমা ভালো মেয়ে বলে কম রাগ করেছে।

'নাটকের ডিরেক্টর। নবীপুর সুমতি নাট্যসংঘের নাম শুনেছ? অবশ্য শুনবেই-বা কী করে? তোমাকে তো এতদিন কিছুই বলিনি। অমিয় সামন্ত হল সেই সুমতি নাট্যসংঘের অল ইন অল। মালিকই বলতে পার। দলের খুব নামডাক। আমাদের সাবডিভিশনে এখন এক নম্বরে আছে। কলকাতা থেকে পর্যন্ত কল পায়।'

'কল কী?'

'উফ তুমি দেখছি গান বাজনা, নাটকের কিছুই জানো না প্রতিমা। কল হল নেমন্তন্ন। কলকাতায় গিয়ে নাটক করার নেমন্তন্ন। তাতে পয়সাও দেয়।'

'ও।'

'আর কী সব প্লে একেকখানা! ঐতিহাসিক, সামাজিক...আহা! আমি ওদের সব কাজ দেখিছি। এই যে রোজ বিকেলে সদরে যাই, সে তো ওদের রিহার্সাল দেখার জন্য। তোমাকেও নিয়ে যাব।'

'থাক, আমাকে নিয়ে যেতে হবে না। আমার ওসব পছন্দ নয়। তাও যাত্রা হলে কথা ছিল। তুমি ওখানে গিয়ে কী কর?'

ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসল কেশব। সেই হাসির অর্থ—এই প্রশ্নের অর্থ কী? চোখ নাচিয়ে বলল, 'এখন কিছু করি না, পরে করব।'

'কী করবে? ঝাড়ুদার?'

'কী যে বল প্রতিমা! আমি অ্যাক্টিং করব।'

'কী টিং!' প্রতিমার চোখ কপালে উঠল।

'অ্যাক্টিং, অভিনয়। অমিয়দাকে বলা আছে। অমিয়দা বলেছে, একটু অপেক্ষা কর, জুতসই পার্ট পেলেই তোকে ডেকে নেব। সেই ডাকের অপেক্ষায় বসে আছি।'

'তুমি অভিনয় জানো? প্রতিমার গলায় সন্দেহ।'

কেশব দার্শনিক ধরনের ভঙ্গি করে বলল, 'এইটা কী বললে প্রতিমা? অভিনয় জিনিসটা কি অত সহজ জিনিস? জানতে হলে একটা গোটা জীবন চলে যায়। যাওয়ার পরও জানা হয় না। আমি তো শুরুই করলাম না।'

'আগে কখনো অভিনয় করেছ?'

কেশব কিছু বলল না। মিটিমিটি হাসল। প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিল না। দেবেই-বা কী? গোলমাল তো এখানেই। অনেক চেষ্টা, অনেক কাকুতিমিনতি করেও এই সুযোগটা তার এখনো আসেনি। কাছে পিঠে যে ক-জনকে পেয়েছে ধরেছে। তাদের কাছে পরীক্ষাও দিয়েছে। কাজ হয়নি কিছু। সকলেই ঠোঁট বেঁকিয়েছে। হবে না। তবু বার বার গেছে। চুপ করে বসে থেকেছে একপাশে। রিহার্সালে চা এনে দিয়েছে। শোয়ের আগে পরে মাল বয়েছে। তারপরেও গলা ধাক্কা খায়। তা হোক, বড়ো হতে গেলে গলা ধাক্কা অপমানের কিছু নয়। মানুষ গলা ধাক্কা জানতে চায় না। নামডাক জানতে চায়।

কেশব স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বড়ো দলের জন্য বসে আছি প্রতিমা। একবার যদি সুমতি সংঘে মাথা গলাতে পারি তাহলে একেবারে পায়ে রণ পা লাগিয়ে চলে যাব।'

প্রতিমা উঠতে উঠতে বলল, 'রোজগারপাতি চালিয়ে এই অপেক্ষা করা যায় না?'

কেশব আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবুক গলায় বলল, 'যায় না এমন নয়, যায়,

অনেকেই করে। তবে সে বড়ো আধাখ্যাঁচড়া ব্যাপার হয়ে যায়। আর্টিস্ট মানুষের সব হওয়া চলে, আধাখ্যাঁচড়া হওয়া চলে না। এই ধর শিশির ভাদুড়ি—উনি যদি...'

প্রতিমা কথার মাঝখানেই উঠে যায়। কেশব কথা থামিয়ে মনে মনে হাসে। বেচারি। যেদিন সত্যি সত্যি স্টেজে উঠে কাঁপিয়ে দেবে সেদিন আর প্রতিমা এভাবে উঠে যেতে পারবে না। সেই দিন এসে গেল। আজ সকালে অমিয় সামন্তর লোক এসে খবর দিয়েছে—

'অ্যাই কেশবদা, দাদায় তোমায় ডেকেছে। বিকেলের আগে চলে যাবে। জরুরি দরকার।'

এরপরেও ডিগবাজি খেতে মন চাইবে না? কত বছরের অপেক্ষার ইতি হতে চলেছে। একি সহজ কথা? ইচ্ছে করছে এখনই ছুটে গিয়ে অমিয়দার পায়ের কাছে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে থাকতে। উনি বলবেন, 'আরে কর কী? কর কী?' তখন বলতে হবে—'কিছুই করি না। আপনেকে প্রণাম জানাই।' অমিয়দা বলবে, 'ঠিক আছে, এখন ওঠ দেখি।' তখন বলতে হবে—'উঠব না, আপনি আমায় মাড়ায়ে যান।'

এই আনন্দ সংবাদ কি এখন প্রতিমাকে দেওয়া উচিত? মনে হয় না উচিত। একেবারে ফাইনাল কথাবার্তার পর বলা যাবে। সংসারের জল অনেক গড়িয়েছে। এত বছরেও হয়নি কিছু। একটা সময় পর্যন্ত প্রতিমা বার বার তাকে মন ফেরাতে বলেছে—'অ্যাক্টর হবার পাগলামি ছাড় এবার। অনেক বছর তো হল। কেউ তো নিল না। নেবেও না। আমি শুনেছি, তুমি নাকি কিছুই পার না। একবার কারা যেন তোমায় মরা সৈনিকের পার্ট দিয়েছিল। তাও পারনি। নড়াচড়া করেছ। পাবলিক হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিয়েছে।'

কেশব মাথা নামিয়ে বলে, 'মশা কামড়ালে কী করব? আমার দোষ ছিল না।'

'মশা না মাছি জানি না। তুমি সেদিন লাথ খেয়েছিলে সেটা জানি।'

'তোমায় এ-কথা যারা বলেছে মিথ্যে বলেছে। মোটেই কেউ আমাকে মারেনি। নাটক ছিল ব্রজেশ্বরের। নাটকের নাম রণক্ষেত্র ক্লান্ত। শোয়ের পর ব্রজেশ্বরের চেলা হাবুল...।'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে যায় কেশব। কারণ তারপরটুকু আর বলা যায় না। সেটা লাথি মারার থেকেও কম অপমানের নয়। হাবুল ঘাড় ধরে হল থেকে বের করে দিয়েছিল।

ফলে চান্স পাওয়ার খবর চট করে প্রতিমা বিশ্বাস করবে না। তা ছাড়া এসব দিকে আর মন নেই প্রতিমার। মন দেওয়ার সময়ও নেই। সংসারের হাল ধরেছে। অফিসে চাকরি নিয়েছে। বড়ো কিছু নয়, ছোটো পদ। তবে নতুন কাজে ঢুকে চাপ বেড়েছে। সেই সকালে বেরোয়। ফিরতে রাত। কাজটা কী পুরোপুরি জানা নেই কেশবের। ঘরে বসে? নাকি বাইরে ঘোরার? জানার যে খুব আগ্রহ আছে এমন নয়। তবু দুম করে একদিন জিজ্ঞেস করে বসল। বেচারি খাটাখাটনি করে ঘরে পয়সা আনছে। সেই পয়সায় সব চলছে। একেবারে কিছু না-জানাটা ঠিক নয়। প্রতিমাই-বা

কী মনে করছে? হয়তো ভাবছে স্বামী তাকে আমলই দেয় না। টাকা আনলেই খুশি। খোঁজখবর রাখে না কিছু। এইসব হাবিজাবি ভেবেই জিজ্ঞেস করা। প্রতিমা সেদিন বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছিল। নতুন কাজে ঢোকার পর সে সাজগোজ বাড়িয়েছে। স্নো, পাউডার, লিপস্টিক। তা তো হবেই। এ তো ঘরে বসে থাকা নয়। পাঁচটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে হয়।

'তোমার কাজটা ঠিক কী প্রতিমা?'

চকিতে মুখ ফিরিয়ে কঠিন গলায় বলেছিল, 'কেন? তোমার কী দরকার?'

'না, এমনি।'

'যে কাজই করি, তোমার শুয়ে বসে খেতে তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।'

কেশব দমে যায়। কথাটা ভুল বলেনি প্রতিমা। যা-ই করুক তার দরকার কী?

'না, বলছিলাম, ঘোরাঘুরির কাজে তো পরিশ্রম আছে। শরীরের দিকে খানিকটা যত্ন আত্তি...।'

'ভস্মীভূত করা' ধরনের দৃষ্টি হেনে প্রতিমা বেরিয়ে যায়। কেশব অবাক হয়ে দেখে, তার বউ 'স্মার্ট' হয়ে গেছে! কই সে তো আগে খেয়াল করেনি! জীবনে বোধ হয় এটাই নিয়ম। নিজের দিকে নজর রাখতে রাখতে, চারপাশটা আর দেখাই হয় না। চারপাশ নিঃশব্দে বদলে যায়।

অমিয় সামন্তর চেলা খবর দিয়ে চলে যাওয়ার পর কেশব দীর্ঘ সময় ধরে গায়ে সাবান ঘষে স্নান করছে। তবে সাবানের মান খুবই খারাপ। বহু ঘষাঘষিতেও ফেনার কোনো বালাই নেই। প্রতিমাকে কথাটা বলতে প্রতিমা ঝাঁঝিয়ে উঠল—

'দু-পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই। উনি আবার সাবানে ফেনা চান। ফুঃ। যাও না ক্ষমতা থাকলে বাজার থেকে ফেনাওলা সাবান নিয়ে এসে গায়ে ডলো।'

প্রতিমার আজকাল এই একটা স্বভাব হয়েছে। স্বামীর সামান্য কথাতেও ধমক ধামক বেশি দিয়ে ফেলছে। এটা অবশ্য দোষের নয়। খাটাখাটনি করে রোজগার করছে। ধমকধামক তো দেবেই। কেশব গায়ে মাখে না। আজ তো একেবারেই মাখার দরকার নেই। আজ তার জীবনে সত্যিকারের শুভদিন। কেশবের মনে হচ্ছে, বেরিয়ে পড়ে খবরটা সবাইকে জানিয়ে আসা উচিত। এমনি জানিয়ে আসা নয়, ঢাক পিটিয়ে জানাতে হবে। ঢাক পেতে অসুবিধে হবে না। পঞ্চাননের ঢাক আছে। পুজোর সময় সদরে বায়না পায়।

কেশব সিদ্ধান্ত নিল। বিকেল পর্যন্ত দেরি করবে না। দুপুরেই চলে যাবে। বাস ধরে সোজা সদরে। স্টেশনের পাশে, সুমন্তি নাট্যসংঘের নিজের অফিসঘর। ঘরে যদি তালা থাকে অসুবিধে নেই, বাইরে অপেক্ষা করবে। চেষ্টা করে যে-সুযোগ সে পেতে চলেছে সেখানে ঘণ্টা দু-তিন অপেক্ষা করা কোনো বিষয় নয়। 'চেষ্টা' না-বলে 'লড়াই' বলা উচিত। নেতাদের ভাষায় 'দীর্ঘ সংগ্রাম'। 'দীর্ঘ সংগ্রাম'-এর সময় মানুষ পায় সম্মান। কেশব পেয়েছে হাসি ঠাট্টা। তাও একটা সময় পর্যন্ত। তারপর অনেকেই তাকে 'পাগলা' বলে ডাকতে শুরু করল। নাটক-পাগলা। আজ

তাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হতে চলেছে। অমিয় সামন্তর ডাক পাওয়ার ঘটনা কেশবের কখনো বিশ্বাস হচ্ছে, কখনো হচ্ছে না। মাঝামাঝি একটা অবস্থা। অদ্ভুতভাবে একটু লজ্জাও হচ্ছে। স্বপ্ন সত্যি হওয়ার সঙ্গে লজ্জার কি কোনো সম্পর্ক আছে?

অমিয় প্রতিমার রেঁধে যাওয়া ভাত ডাল দুটো মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়ল। বাসে যেতে যেতে চিন্তা হল—অমিয় সামন্ত তাকে কেমন চরিত্রে নিচ্ছে? ছোটো না বড়ো? ছোটোই হবে। সুমতি নাট্য সংঘের কাজে প্রথমবারই বড়ো সুযোগ হবে এমন ভাবার মতো বোকা সে নয়। ছোটোই হোক। শুরু ছোটো দিয়ে করাই ভালো। ছোটো থেকে বড়ো হতে হয়। এখন চিন্তা একটাই, কবে স্টেজে উঠবে। রিহার্সাল কি আজ থেকে শুরু? অমিয় সামন্তকে যতটা জানে কেশব তাতে প্রথম দিনই রিহার্সাল শুরু হওয়ার কথা নয়। উনি আগে নাটকটা পড়তে দেন। তারপর পার্ট মুখস্থ করে আসতে হবে। যাই হোক, একদিন শুরু হলেই হল। প্রথম শোতে প্রতিমাকে নিয়ে যেতে হবে। আপত্তি করলেও জোর করে নিয়ে যেতে হবে। বেচারি অনেক কষ্ট করেছে। স্বামীর অভিনয় দেখে হাততালিতে হল ফেটে পড়লে সেও কি হাততালি দেবে? নাকি লজ্জা পাবে? বাসের ঝাঁকুনিতে ঘোর কাটল কেশবের।

অমিয় সামন্তর কথায় চমকে উঠল কেশব।

'আজই স্টেজ!'

অমিয় সামন্ত গালের ভেতর জিব ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'তোর অসুবিধে কোথায়? অন্য কোনো জায়গায় অভিনয় আছে নাকি?'

রসিকতা শুনে মাথা নামাল কেশব।

'কী যে বলেন অমিয়দা। তবু...'

অমিয় সামন্ত নড়েচড়ে বসল। বলল, 'তবু কী? এতদিন তো স্টেজে উঠব, স্টেজে উঠব বলে কান্নাকাটি করছিলে, এখন কী হল? ঘাবড়ে গেলি?'

'না, না কী যে বলেন দাদা।'

'যা বলি মন দিয়ে শোন। আমাদের পটাই, মধু, হরিশকে চিনিস?'

কেশব উৎসাহে বলল, 'হ্যাঁ চিনি। খুব চিনি। ওই তো শোয়ের সময় তোমাদের মালপত্র বয়ে নিয়ে যায়। সিন চেঞ্জের সময়ে স্টেজে চেয়ার টেবিল তোলে, সরায়। একবার এক যুবকের আত্মহত্যা নাটকে আত্মহত্যার দড়ি টাঙাতে গিয়ে মধু মই থেকে পড়ে হাত ভেঙেছিল। তাই না অমিয়দা?'

'ভেরি গুড। ওই তিনজনই কাল রাত থেকে ডায়েরিয়ায় বাড়িতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। হারামজাদারা একসঙ্গে কোথায় খেতে গিয়েছিল, একসঙ্গে অসুখে পড়েছে। এদিকে আজ সন্ধেবেলা অফিস ক্লাবের শো। আমার লোক লাগবে। সব তো আর হাবিজাবি লোক নিতে পারব না। আমাদের নাটকের কিস্সু জানে না এমন কাউকে নিলে তো সে বিরাট গোলমাল পাকিয়ে ফেলবে। স্টেজে চেয়ার তোলার সময় টেবিল তুলবে। টেবিলে তোলার সময় মাদুর বিছিয়ে দিয়ে আসবে।

এমন সময় তোর কথা মনে পড়ল। তুই তো আমাদের সব কটা নাটক কম করে হলেও বিশবার দেখেছিস। দেখেছিস না?'

কেশব কথা বলার চেষ্টা করল, পারল না। শুধু মাথা নাড়ল।

অমিয় সামন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মুচকি হেসে বলল, 'ভেরি গুড। একেই বলে সঠিক নির্বাচন। রাইট সিলেকশন। তোকে কেমন বাছলাম বল একবার? একজন ডিরেক্টরের শুধু অভিনেতা বাছলেই হয় না, অভিনেতা যাদের জন্য ঠিক ভাবে পারফরম করতে পারে তাদেরও বাছতে হয়। আমি জানি, তুই সেই কাজটা করতে পারবি। শুধু করতে পারবি না, সবার থেকে ভালো করতে পারবি। কারণ একদিকে যেমন নাটক তোর চেনা, তেমন তোর স্টেজে ওঠার ইচ্ছে অনেক দিনের। তাই তো? পর্দার আড়ালে হলেও স্টেজে ওঠবার স্বপ্ন তো পূরণ হচ্ছে। হচ্ছে কি না?'

কেশব আবার মাথা নাড়ল। বিড়বিড় করে বলল, 'হচ্ছে।'

'পারফরমেন্স ভালো হলে, তোর কাজ পাকা করে দেব। তোর দুটো রোজগার হবে। পটাই, মধুদের এবার তাড়াতে হবে। শোয়ের আগে যারা দলবেঁধে বিষ খেয়ে হাগে তাদের আর যাই হোক প্রফেশনাল নাটকের দলে রাখা যায় না। আমার তো বাপু ফ্রিয়ের কারবার নয়।'

কেশব কী বলবে, কী করবে বুঝতে পারছে না। সে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অমিয় সামন্ত বলল, 'আজকে আমাদের নাটক তোর সেই এক যুবকের আত্মহত্যা। তোর চেনা। দেখ বাবা, তুমি আবার দড়ি টাঙাতে গিয়ে হাত ভেঙো না। আজ বড়ো অফিসের ফাংশন।'

শুধু চেয়ার টেবিল স্টেজে তোলা নয়, আর একটু বড়ো দায়িত্ব পেল কেশব। অমিয় সামন্তই দিল।

'তুই পর্দাও টানবি। আমি ইশারা করলেই দড়ি ধরে টান মারবি। পর্দা পড়ে যাবে। কোথায় কোথায় সিন শেষ হবে, মোটামুটি তো তোর জানাই আছে। পারবি না? নাকি হলের লোককে বলব?'

কেশব নীচু গলায় বলল, 'আমি পারব অমিয়দা।'

'না, তুই দেখছি হরিশটারও চাকরি খাবি। ঠিক আছে, যা আগে ক-বার টানাটানি করে হাত সড়োগড়ো করে নে।'

পর্দা টানাটানি করে কেশব হাত সড়োগড়ো করে নিল। যদিও তার দরকার ছিল না। সদরের এই হল বেশ বড়ো। স্টেজ, আলো, পর্দা সবই চমৎকার। নাটক শুরু হওয়ার পর কেশবের একবার মনে হল, প্রতিমাকে খবর দিলে বেশ হত। তার স্বামী অভিনয় না-করুক, স্টেজে তো উঠেছে। দেখলে নিশ্চয় খুশি হত।

আগাগোড়া দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করল কেশব। এমনকী শেষদৃশ্যে যুবকের আত্মহত্যার জন্য স্টেজের মাঝামাঝি গিয়ে দড়িও টাঙিয়ে দিল নিখুত

ভাবে। অমিয় সামন্ত পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেল অন্ধকারে। গোলমাল হল একেবারে শেষমুহূর্তে।

নাটকে আছে, যুবক গলায় ফাঁস জড়াতে থাকবে, বেজে উঠবে মর্মস্পর্শী বেহালার সুর। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসবে। হল ফেটে পড়বে হাততালিতে। সেই অনুযায়ী নায়ক গলায় ফাঁস জড়াতে লাগল। বেজে উঠল বেহালা। অমিয় সামন্ত উলটো দিকের উইংসের আড়াল থেকে হাত নেড়ে ইশারা দিল, কেশব দড়ি ধরে টান মারল।

দড়ি নড়ল না। আরও জোরে টান মারল কেশব। দড়ি যেন আরও শক্ত হয়ে উঠল। পর্দা নামা তো দূরের কথা, নড়ছে না একবিন্দুও। একমিনিট, দু-মিনিট, তিন মিনিট...যেন অনন্ত সময়। গলায় দড়ির ফাঁস জড়ানো নায়ক অধৈর্য। তার হয়েছে সব থেকে বিপদ। কী করবে সে? পর্দা না-পড়লে তাকে তো সত্যি সত্যি মরণঝাঁপ দিতে হয়!

কেশব যত নার্ভাস হয়ে উঠছে, যত টানছে তত পর্দা ভারী হয়ে উঠছে। তার মনে হচ্ছে, এই পর্দা যেন কাপড়ের নয়, যেন পাথরের! যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে সে! যেন এই যবনিকায় তার মত নেই! সে আরও দেখতে চায়, আরও দেখাতে চায়।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত কেশব পর্দা ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল অপমানে। আহা রে! এতক্ষণ পরে সে সময় পেল কাঁদবার।

অমিয় সামন্ত চিৎকার করে উঠল—'লাইটস অফ। আলো নেভাও, আলো নেভাও হারামজাদা।'

অন্ধকার হলে সবার আগে যে মহিলাকণ্ঠের হাসি ভেসে এল সেটি প্রতিমার। প্রতিমা তার অফিস নাটক দেখতে এসেছিল।

আসল কাজ



রসুইপুরে এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। শুধু রসুইপুর কেন, আশপাশের দশটা গ্রামেও এমন হয়েছে বলে কেউ শোনেনি।

চোর কখনো চুরি করা জিনিস ফেরত দিতে আসে? তাও একেবারে নিশ্চিন্তে! ধমকধামক, মারধর, পুলিশ হাজতের কোনো ভয়ডর নেই? অবাক কাণ্ড! শোনা যাচ্ছে, চোর উঠোনে চোরাই জিনিসের পুঁটলি রেখে, পা ছড়িয়ে বসে আছে। গামছা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। ভাবটা এমন যেন, জিনিসপত্র সব বুঝিয়ে লেবুর শরবত খেয়ে তবে বাড়ি যাবে। তেমন চাপাচাপি করলে দুপুরের ভাতও খেয়ে যেতে পারে।

এই ঘটনা কে বিশ্বাস করবে? রসুইপুরের মানুষ পড়েছে মহাসমস্যায়। ঘটনা বিশ্বাস করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। কারণ, ঘটনার সঙ্গে রসুইপুরের একজন অতি ভালো মানুষের নাম জড়িয়ে গিয়েছে। মানুষটির নাম সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। এখানকার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। একবছর হল অবসর নিয়েছেন। চাকরি ছাড়লেও মাস্টারি এখনো ছাড়েননি। স্কুল কমিটির বিশেষ অনুমতি নিয়ে আগের মতোই স্কুলে যান, ছাত্রদের পড়ান। পয়সাকড়ি কিছু নেন না। এতে রসুইপুরের সবাই খুশি। সবচেয়ে খুশি ছাত্ররা। সারদাপ্রসাদবাবুর মতো মাস্টারমশাই পাওয়া কঠিন। পড়া বোঝানোর ব্যাপারে তিনি হলেন এক নম্বর। পড়ানোর জন্য শহর থেকে অনেকবার ডাক পেয়েছিলেন। মোটা টাকা পাওয়ার সুযোগ ছিল। তিনি যাননি। তাঁর একমাত্র ছেলে কলকাতায় বড়ো চাকরি করে। কতবার সেও তার বাবাকে ডেকেছে। বলেছে, "ভাঙা জমিদার বাড়ি আর যেটুকু জমিজমা, জিনিসপত্র আছে বেচেবুচে চলে এসো। গ্রামের অন্ধকারে বসে মশার কামড় খেয়ে কোনো লাভ নেই। অবসর জীবন আমাদের সঙ্গে কাটাবে।"

সারদাপ্রসাদবাবু রাজি হননি। এই নিয়ে কিছুদিন আগে স্ত্রী নলিনীদেবীর সঙ্গে

তাঁর ঝগড়া হয়েছে। নলিনীদেবী বললেন, "এখানে তুমি কেন পড়ে থাকতে চাইছ?"

সারদাপ্রসাদবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "দরকার আছে। রসুইপুরের জন্য আমি কাজ করতে চাই।"

নলিনীদেবী ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, "রসুইপুরের জন্য অনেক কাজ তো করলে। আর কী দরকার?"

সারদাপ্রসাদবাবু চিন্তিত গলায় বললেন, "অনেক কাজ করেছি ঠিকই, কিন্তু আসল কাজ এখনো করতে পারিনি। আরও একটু সময় লাগবে। ততদিন এখানে থাকতে হবে। এটা তুমি বুঝবে না।"

নলিনীদেবী রেগে বললেন, "সব বুঝি। এত বছরেও যখন তোমার আসল কাজ করা হল না, আর কোনোদিন হবেও না।"

সারদাপ্রসাদবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "তুমি জান আসল কাজটা কী?"

নলিনীদেবী বললেন, "কেন জানব না? রসুইপুরের সবাই জানে। তুমি রসুইপুরের মানুষের মনের ভিতর থেকে একটা শিকড় টেনে উপড়ে ফেলতে চাইছ। সেটা পারবে না। বটগাছের মতো শিকড়টা রসুইপুরের মানুষের মনের গভীরে ঢুকে আছে। মনে রেখো, মানুষের মন থেকে সব কিছু দূর করা যায়, অপমান আর ঘৃণা দূর করা যায় না। এর জন্য তুমি অনেক টাকা খরচ করছ, আরও করবে। কিন্তু লাভ হবে না।"

সারদাপ্রসাদবাবু বিড়বিড় করে বললেন, "রসুইপুরের মানুষ আমাকে পছন্দ করে।"

নলিনীদেবী বললেন, "অবশ্যই করে। তোমাকে খুবই পছন্দ করে। ভক্তি-শ্রদ্ধাও করে। তুমি তার যোগ্য। কিন্তু তার মানে এই নয়, তুমি যা চাইছ তা পারবে।"

সারদাপ্রসাদবাবু বিড়বিড় করে বললেন, "মনে হয় খানিকটা পেরেছি। আরও চেষ্টা করতে হবে। এটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। শুধু নিজের জন্য প্রশংসা কুড়োলেই হয় না। বাপ-ঠাকুরদা, পূর্বপুরুষদের কথাও ভাবতে হয়। আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। সেই কারণেই আরও ক-টাদিন এখানে থাকব।"

এই কথা শুনে নলিনীদেবী খুব রেগে গেলেন। বললেন, "তুমি থাকো, আমি ছেলের কাছে কলকাতায় চললাম!"

গতমাসের এক শুক্রবার সত্যি-সত্যি বাক্স-টাক্স গুছিয়ে একাই কলকাতায় চলে গেলেন নলিনীদেবী। আর বাড়িতে চুরি হল শনিবার। শনিবার রাতে। রাত ন-টা নাগাদ খুব একচোট বৃষ্টি নামল। সঙ্গে ঝড়। সারদাপ্রসাদবাবু সাধারণত বেশি রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশোনা করেন। বৃষ্টি-বাদলার কারণে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। খোলা জানলা দিয়ে দেখলেন, ঝড়-বৃষ্টি কিছু নেই, ঝকঝকে নীল আকাশ। ভোরের নরম আলো। চমৎকার ঠান্ডা বাতাস

বইছে। সারদাপ্রসাদবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, আর তখনই বাড়ির একমাত্র কাজের লোক নিমাইয়ের কাছ থেকে খবর পেলেন, বাড়িতে চুরি হয়েছে। চোর গুদামঘরের জানলার শিক বেঁকিয়ে ঢুকেছে। ঘরটা বহু বছরের পুরোনো সব জিনিসে ঠাসা। চোর সেখান থেকেই কিছু জিনিস নিয়ে পালিয়েছে। কী নিয়ে পালিয়েছে সারদাপ্রসাদবাবু খুব যে বুঝতে পারলেন, এমন নয়। নলিনীদেবী থাকলে হয়তো বুঝতে পারতেন। জিনিসপত্রের প্রতি সারদাপ্রসাদবাবুর বাড়তি কোনো আকর্ষণ নেই। হিসেবও রাখেন না। অনেক ভাবনাচিন্তার পর মনে হল, চোর আদ্যিকালের পিতল-কাঁসার কিছু বাসনপত্র নিয়ে গিয়েছে। সারদাপ্রসাদবাবু বিষয়টা নিয়ে একেবারেই হইচই করলেন না। নিমাইকেও বারণ করে দিলেন।

নিমাই বলল, "কত্তাবাবু, এটা ঠিক হবে না। থানায় খবর দেওয়া দরকার। কোন চোরের এত বড়ো সাহস, এই বাড়ি থেকে চুরি করে? এটা তো যে-সে মানুষের বাড়ি নয়! এটা হল...। এ যদি আগের আমল হত, তাহলে বেটাকে ধরে এনে শূলে চড়ানো হত। নইলে হাতির পায়ের তলায়...।"

সারদাপ্রসাদবাবু হাত দেখিয়ে নিমাইকে থামালেন। বিরক্ত গলায় বললেন, "আঃ নিমাই! কতবার ওসব কথা বলতে বারণ করেছি না?"

নিমাই মাথা নামিয়ে বলল, "ভুল হয়ে গিয়েছে কত্তাবাবু!"

সারদাপ্রসাদবাবু হতাশ গলায় বললেন, "রসুইপুরের মানুষকে কবে যে এই ভুল থেকে বের করে আনতে পারব" মানুষ সামান্য দু-পাঁচ বছরের কথা ভুলে যায়, অথচ এত বছরের কথা ভুলতে পারে না? যাক, কালই মিস্ত্রি ডেকে জানলার শিকগুলো ঠিক করে নেব। এই বাড়িটা নিয়ে আমার একটা পরিকল্পনা আছে।"

সারদাপ্রসাদবাবু গা না-করলেও চুরি যাওয়া জিনিসগুলো মোটেও হেলাফেলার ছিল না। সেগুলো যথেষ্ট দামি। পিতল-কাঁসার বাসনপত্রের সঙ্গে রুপোর দু-একটা বাটি-গ্লাসও আছে। আজ সকালে চোর সবসুদ্ধ পুঁটলি বেঁধে ফিরিয়ে দিতে এসেছে!

সারদাপ্রসাদবাবু তখন বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। জরুরি কাজ আছে। শহরে যেতে হবে। নিমাই প্রথম লোকটার মুখোমুখি হয়। লোকটা বুড়োটে। বয়স প্রায় তার কর্তাবাবুর মতো। সিড়িঙে টাইপের চেহারা। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথা ভরতি পাকা চুল। হাঁটু পর্যন্ত ময়লা ধুতি। গায়ে তার চেয়েও বেশি ময়লা তাপ্পিমারা ফতুয়া। পায়ে ক্যাম্বিসের ছেঁড়া জুতো। কোমরে গামছা আর হাতে একটা পুঁটলি। চোখ দুটো বড়ো-বড়ো।

সাতসকালে বাইরের লোক দেখে নিমাই খুবই বিরক্ত হল। যদিও সারদা-প্রসাদবাবুর কড়া নির্দেশ আছে, বাড়িতে কোনো মানুষ এলে কখনোই খারাপ ব্যবহার করা চলবে না। নিমাই এই নির্দেশ সবসময় মানতে পারে না। বিশেষ করে ব্যস্ততার সময় তো নয়ই। সে চোখ-মুখ কুঁচকে যথেষ্ট বিরক্তি দেখিয়ে বলল, "কাকে চাই?"

লোকটা নির্লিপ্ত মুখে বলল, "নাম জানিনে। এ-বাড়ির মালিককে ডাকো দেকি।"

নিমাইয়ের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। বেটার সাহস তো কম নয়। সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ঢুকে বলছে, বাড়ির মালিকের নাম জানে না। এখনই কঠিন চড়ে লোকটার দুটো দাঁত ফেলে দেওয়া দরকার। ফেলার আগে লোকটাকে বলা হবে, 'কোন দাঁত দুটো ফেলা হবে নিজেই ঠিক করে দাও বাপু।' তবেই বেটার উপযুক্ত শাস্তি হবে। কিন্তু এ-বাড়িতে এসব চলবে না। চাপা গলায় একটা ধমক দেওয়ার জন্য তৈরি হল নিমাই। তার আগেই লোকটা ধমকের গলায় বলল, "কী হল? সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মালিককে ডাকতে বললাম না? কথা কানে যায়নি?"

ধমক খেয়ে নিমাই এতটাই ঘাবড়ে গেল, প্রথমটায় কিছু বলতেই পারল না। তারপর থতোমতো খেয়ে বলল, "তুমি কে?"

হাতের পুঁটলি নামিয়ে উঠোনের উপর বসতে-বসতে লোকটা খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, "আমি চোর।"

"অ্যাঁ!"

"অ্যাঁ ভ্যাঁ পরে করবে, আগে মালিককে খবর দাও। তাকে বলো, শনিবার রাতে এ-বাড়ি থকে যেসব জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো ফেরত দিতে এসেছি। এই যে পুঁটলির মধ্যে সব আছে। হিসেব বুঝিয়ে যাব। বাপ রে, কী গরম পড়েছে আজ!"

কথা শেষ করে লোকটা কোমরের গামছা খুলে হাতপাখার মতো নেড়ে নিজের মুখে হাওয়া খেতে থাকল। থতোমতো ভাব কেটে গেলে নিমাই ছুটল ভিতরে। কর্তাবাবুকে খবর দিয়ে সটান বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়বে। আর কর্তাবাবুর কথা শুনলে চলবে না। এই লোককে ধরতে হবে। লোক লাগবে। একা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। চুরি পর্যন্ত তাও সহ্য হয়েছে, কিন্তু একটা ছিঁচকে চোর এসে জমিদারের বংশধরের সঙ্গে ঠাট্টা করে যাবে, এটা সহ্য করা যায় না। চুরির জিনিস ফেরত দিতে আসা ঠাট্টা ছাড়া আর কী? নিমাইয়ের দেওয়া খবর বাতাসের চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য সত্যি জমিদার বংশের মানুষ। বহু বছর আগে তাঁর ঠাকুরদার বাবা গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য এখানকার জমিদার ছিলেন। সারদাপ্রসাদবাবু ঠান্ডা মাথার পরোপোকারী মানুষ হলে কী হবে, তাঁর পূর্বপুরুষ গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন ভয়ংকর দাপুটে জমিদার। সবাই তাঁর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপত। তাঁর অত্যাচারের নানারকম সত্যি-মিথ্যে গল্প আছে। তার মধ্যে একটা গল্প মারাত্মক। রসুইপুরের মানুষের মুখে-মুখে ঘোরে।

গল্পটা হাতির।

জমিদারদের সাধারণত হাতি থাকে না। হাতি-ঘোড়া হল রাজারাজড়াদের ব্যাপার। রসুইপুরের জমিদারের হাতি ছিল। একটা হাতি নয়, তিন-তিনটে হাতি।

হাতির পিঠে চেপে গঙ্গাপ্রসাদ জামিদারি দেখতে বেরোতেন। শোনা যায়, যে-লোক খাজনা দেওয়ার ব্যাপারে গোলমাল করত, হাতি তাকে চিনে আসত। জমিদারমশাই চিনিয়ে দিতেন। রাতে হাতি গিয়ে তার ধানখেত, মাটির বাড়ি, সবজির বাগান মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলত। বাধা দিতে গেলে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার ঘটনাও আছে। তাতে হাত-পা তো ভাঙতই, দু-একজন নাকি মারাও পড়ত। পোষা হাতি দিয়ে এভাবে অত্যাচার করার কথা কেউ কখনো শোনেনি। গরিব মানুষ খাজনা মকুবের জন্য জমিদারবাড়িতে এসে কান্নাকাটি করত। গঙ্গাপ্রসাদ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে মোটা গোঁফে পাক দিতেন। বলতেন, "আমাকে বলে কী হবে বাপু? আমি কী করব? আমি তো আর তোমাদের ঘর-বাড়ি ভাঙি না, ঘর-বাড়ি ভাঙে হাতিরা। তোমরা বরং আমার হাতিদের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করো। দেখো, ওদের মন ভেজাতে পার কিনা।"

একে ভয়ংকর অত্যাচার, তার উপর এই অপমান! রসুইপুরের মানুষ তাদের এই জমিদারকে যেমন ভয় পেত, তেমনই ঘৃণাও করত। সেই ঘৃণা আজও বংশপরম্পরায় তাদের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। সারদাপ্রসাদবাবু প্রাণপণ চেষ্টা করছেন সেইসব ভয়ংকর স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে দিতে। কিন্তু পারছেন না। অত্যাচারী জমিদারের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও রসুইপুরের মানুষ তাঁকে খুবই পছন্দ করে, ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তাঁর সামনে কেউ পুরোনো দিনের কথা তোলে না। উলটে বলে, এই সুন্দর মানুষটাকে দেখলে বিশ্বাসই হয় না, এঁর পূর্বপুরুষ অমন অত্যাচারী ছিলেন। নিজের প্রশংসা সারদাপ্রসাদবাবুকে খুশি করতে পারে না। রসুইপুরের মানুষের রাগ, অপমান তাঁর মনের ভিতর সবসময় কাঁটার মতো বেঁধে। এই কাঁটা তুলতেই তিনি রসুইপুরের জন্য নানারকম ভালো-ভালো কাজ করেছেন। জমিদারির সঞ্চয় থেকে প্রচুর টাকা দিয়েছেন। গ্রামে স্কুল হয়েছে, লাইব্রেরি হয়েছে, নতুন দিঘি কাটা হয়েছে। কাজগুলোর সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদের নাম জড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন স্কুলের নাম দিয়েছেন 'গঙ্গাপ্রসাদ শিক্ষামন্দির', লাইব্রেরির নাম 'গঙ্গাপ্রসাদ গ্রন্থাগার', দিঘির নাম 'গঙ্গাদিঘি'।

রসুইপুরের মানুষ প্রথম-প্রথম আপত্তি তুলেছিল। ভালো কাজের সঙ্গে একজন নিষ্ঠুর মানুষের নাম জড়িয়ে থাকবে? তারা সারদাপ্রসাদবাবুর কাছে গিয়ে বলল, "মাস্টারমশাই, স্কুলের নাম না হয় আপনার পিতার নামে হোক।"

সারদাপ্রসাদবাবু কানে হাত ঠেকিয়ে বললেন, "ছি ছি, তিনি তো জমিদার ছিলেন না, এই টাকা তাঁর নয়। যাঁর টাকা তাঁর নাম থাকাই উচিত। তা ছাড়া কে জানে হয়তো সেই মানুষটার মনে এ-রকম একটা স্কুল তৈরির ইচ্ছে ছিল। পূর্বপুরুষের ইচ্ছেপূরণ করাটা কর্তব্য।"

রসুইপুরের মানুষ আর কথা বাড়ায়নি। তারা মাস্টারমশাইকে পছন্দ করে। তাঁর ঠাকুরদার বাবা অত্যাচারী ছিলেন বলে তাঁর কোনো দোষ নেই। সুতরাং চুপ করে থাকাই উচিত। মনের রাগ মনেই থাক।

সারদাপ্রসাদবাবু রসুইপুরের মানুষের মনের কথা বুঝতে পারেন। সেই কারণেই একটা শেষ চেষ্টা করবেন বলে ঠিক করেছেন। এটাই হবে 'আসল কাজ'! কথাটা এখনো রসুইপুরের কাউকে বলেননি। রোজই শহরে ছোটাছুটি করছেন। তাঁর বিশ্বাস, কাজটা করতে পারলে মানুষের মন থেকে গঙ্গাপ্রসাদের অত্যাচারের স্মৃতি পুরোপুরি মুছে যাবে। বংশের গায়ে আর কালির দাগ থাকবে না। তাঁর দায়িত্বও শেষ হবে। তিনি কলকাতায় চলে যাবেন।

রসুইপুরে একটা ছোটোখাটো হাসপাতাল তৈরি করতে চলেছেন সারদা-প্রসাদবাবু। অসুখবিসুখ হলে মানুষকে আর কয়েক মাইল দূরের হাসপাতালে ছুটতে হবে না। এখানেই বিনাপয়সায় চিকিৎসা হবে। ওষুধবিষুধ পাবে। কাজটা করতে অনেক টাকা লাগবে। সে ভাবনাচিন্তাও হয়ে গিয়েছে। জমিদারিবাড়িতেই হাসপাতাল হবে। জমিদারির যেটুকু টাকা রয়েছে সবটাই দিয়ে যাবেন। হাসপাতালের নামও ঠিক হয়ে গিয়েছে, 'গঙ্গাপ্রসাদ চিকিৎসালয়'। সারদাপ্রসাদবাবু জানেন, এর পর আর রসুইপুরের মানুষ কিছুতেই মনে রাগ, ঘৃণা, অপমান পুষে রাখতে পারবে না।

এই মুহূর্তে 'গঙ্গাপ্রসাদ চিকিৎসালয়' নিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে মিটিং করতে শহরে যাচ্ছিলেন সারদাপ্রসাদবাবু। এমন সময় নিমাই এসে 'চোর'-এর খবর দিল। অবাক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সারদাপ্রসাদবাবু। চোর এসেছে! এসে তাঁকে ডাকছে! এর মানে কী?

এত বড়ো একটা মানুষকে দেখে সামান্য চোরের উচিত ছিল ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ানো। লোকটা উঠে দাঁড়াল না। গামছা দিয়ে গলা মুছতে মুছতে দাঁত বের করে হাসল। বলল, "আছেন কেমন?"

সারদাপ্রসাদবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "আপনি কে?"

"আপনার কাজের লোকটাকে তো বললাম, আমি কে। সে বলেনি? লোকটা দেখছি গাধা টাইপ আছে। আমি চোর। শনিবার রাতে আপনার ওই পিছনের গুদামঘর থেকে কিছু জিনিসপত্র হাতিয়েছিলাম। সেগুলো ফেরত দিতে এসেছি।"

সারদাপ্রসাদবাবু নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। কড়া গলায় বললেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ?"

চোর অবাক গলায় বলল, "ওমা! রসিকতা করব কেন? কত দূর থেকে এসেছি জানেন? পুঁটলিটা খুলে দেখলেই তো হয়, আপনার জিনিসপত্র সব আছে কি না। তাহলেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে ঠাট্টা না সত্যি।"

"তুমি জান আমি কে?"

চোর অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলল, 'আগে জানতাম না, চুরির পর জেনেছি।"

"কী জেনেছ?" সারদাপ্রসাদবাবুর বিস্ময় বাড়ছে।

চোর হাই তুলতে-তুলতে বলল, "উফ, কাল সারারাত অনেক ধকল গিয়েছে। চুরিচামারিতে যা পরিশ্রম! পাঁচিল টপকাও রে, জানলার শিক ভাঙো রে, দৌড় লাগাও রে...! ভাবছি এবার রিটায়ার করব। যাক, যে-কথা বলছিলাম, আপনি কে

আগে জানতাম না। এখন জানি, জানি বলেই চুরির জিনিস নিজের হাতে ফেরত দিতে এসেছি।"

সারদাপ্রসাদবাবু মনে-মনে খানিকটা খুশি হলেন। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, চোর-ডাকাতও তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। ভুল করে তাঁর বাড়িতে চুরি করে এখন লজ্জিত! জিনিস ফিরিয়ে দিতে এসেছে। তিনি বললেন, "তোমার ভয় করছে না? আমি যদি পুলিশ ডাকি?"

চোর নির্লিপ্ত গলায় বলল, "ডাকলে ডাকবেন। আমার কিছু এসে-যায় না। জিনিস আমি ফেরত দেবই।"

সারদাপ্রসাদবাবু বললেন, "ভয় নেই, পুলিশ ডাকব না। তোমার নাম কী?"

"শশধর। শশধর মুন্সি। আমার ঠাকুরদার বাবার নাম ছিল জলধর মুন্সি। তিনি একসময় এই রসুইপুরে থাকতেন। নাম শুনেছেন?"

সারদাপ্রসাদবাবু হেসে ফেললেন। নরম গলায় বললেন, "অতদিন আগের মানুষকে চিনব কী করে? শশধর, এখন বলো তো, চুরি করা জিনিস তুমি ফিরিয়ে দিতে এসেছ কেন? তোমার কি অনুশোচনা হচ্ছে?"

চোর মুখ দিয়ে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ ধরনের আওয়াজ করতে লাগল। সম্ভবত হাসতে লাগল। তারপর আওয়াজ থামিয়ে বলল, "অনুশোচনা? কী যে বলেন কত্তা? অনুশোচনা কেন হবে? রাগে আর ঘেন্নায় জিনিস ফিরিয়ে দিতে এসেছি। বলতে পারেন অপমান করতে এসেছি। দেখতে চাই চোরের অপমানে গঙ্গাপ্রসাদের বংশধরের মুখের অবস্থা কীরকম হয়।"

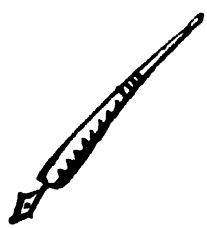
সারদাপ্রসাদবাবু হতবাক হয়ে গেলেন। লোকটা এসব কী বলছে! হাসছেই-বা কেন?

চোর বলতে লাগল, "শনিবার তো জানতাম না কার জিনিস চুরি করছি, পরে রুপোর বাসনের গায়ে দেখলাম, গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নাম খোদাই করা 'শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, জমিদার, রসুইপুর'। মাথায় গেল আগুন চড়ে। এই জমিদার বেটাই আমার ঠাকুরদার বাবা জলধর মুন্সিকে হাতি দিয়ে ছুড়ে ফেলেছিলেন না? খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, ঘটনা তাই। জলধর মুন্সির অপরাধ, ছ-মাসের খাজনা বাকি পড়েছিল। তারপর জলধর মুন্সি পরিবারসুদ্ধ রসুইপুর ছাড়া হল। হাত-পা ভেঙে বিছানায় পড়ে ছিল সাত মাস। তারপর গেল পটকে। ছি ছি, সেই জমিদারের জিনিস আমি হাত দিয়ে ছুঁয়েছি! গা ঘিনঘিন করে উঠল। চোর বলে কি মানুষ নই? নিন, নিন, জিনিসপত্র সব বুঝে নিন। আমাকে এখন অনেক পথ ফিরতে হবে। যদি চান, পুলিশ ডেকে ধরিয়েও দিতে পারেন। আমি তোয়াক্কা করি না। লোকে জানবে সামান্য চোরও গঙ্গাপ্রসাদের জিনিস ছুঁয়েও দেখে না। এত ঘেন্না!"

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সারদাপ্রসাদবাবু মাথা নামিয়ে নীচু গলায় বললেন, "শশধর, তুমি এখন যাবে না। এ-বাড়িতে ভাত খেয়ে যাবে। নইলে আমি দুঃখ পাব।"

চোর চমকে মুখ তুলল। ওমা! এত বড়ো মানুষটার চোখে জল চিকচিক করে কেন!

রসুইপুরের জমিদারবাড়িতে এখন হাসপাতাল চলছে রমরমিয়ে। ভিড় লেগেই আছে। শশধর চুরি ছেড়ে এখন এখানেই কাজ করে। খুবই ব্যস্ত মানুষ। দম ফেলার সময় নেই। তবু রোজ একবার করে হাসপাতালের নামের ফলকটা মোছার কথা সে ভোলে না। কী করে ভুলবে? ফলকে যে লেখা রয়েছে, 'জলধর মুন্সি স্মৃতি হাসপাতাল'। সামান্য মানুষটা এত বড়ো সম্মান পাবে সে ভাবতেও পারেনি। সারদাপ্রসাদবাবু স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতা থেকে মাঝেমধ্যে এসে সব দেখেশুনে যান। সেদিন গোটা রসুইপুর ভেঙে পড়ে। বড়ো ভালো লাগে সারদাপ্রসাদবাবুর। তিনি বুঝতে পারেন, রসুইপুরের মানুষ জমিদারদের অত্যাচার ভুলতে পারেনি, কিন্তু মানুষটাকে ক্ষমা করেছে। তাঁর আসল কাজ সফল হয়েছে।



মিনু ও বিনু

মেয়েটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্বস্তির ব্যাপার আছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সেটা কী? ওর চেহারায় কোনো সমস্যা? নাকি অন্য কিছু?

মৌ বলছিল, চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স। এখন দেখে মনে হচ্ছে, নয়-দশের বেশি নয়। ময়লা রং। যতটা না নিজস্ব ময়লা তার থেকে বেশি বাইরের ময়লা জমেছে। রোগাভোগা চেহারায় অপুষ্টির প্রায় সবকটা লক্ষণ রয়েছে। স্বাভাবিক মেয়েলি বাড়বাড়ন্তটুকুও থমকে গেছে। একমাথা জট পাকানো চুল। বহুদিন তেল না পড়ে লালচে। জামায় বেখাপ্পা ধরনের তাপ্পি। সেই তাপ্পিও ফাটা। দীর্ঘ ব্যবহারের কারণে জামার রং চেনার উপায় নেই। নীল হতে পারে, আবার সবুজও হতে পারে।

খানিক আগেই মৌ মেয়েটিকে 'মিনু' নামে ডেকেছে।

'ভেতরে এসো মিনু। এই তোমার দাদাবাবু। ওর কাজকর্ম করে দিতে হবে। পারবে তো?'

মিনু মুখে কিছু বলেনি। তথাগতর দিকে চকিতে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। তথাগত ভুরু কোঁচকায়। গোলমাল কি মেয়েটার চোখে? তথাগত নিশ্চিত হতে পারছে না। আরও একবার চোখদুটো দেখলে হয়তো পারত। সে সুযোগ নেই। মিনু মাথা নামিয়ে আছে। মনে হচ্ছে, এ-মেয়ে সহজে মাথা তুলবে না।

মৌ বানানো হেসে বলল, 'কী হল? কিছু বলছিস না যে? দাদাবাবুর কাজ করতে পারবি না?'

মাথা নামানো অবস্থাতেই মিনু ঘাড় কাত করল। পারবে।

তথাগত খানিকটা বিরক্ত হল। মৌ এ কাকে ধরে আনল! নীচু গলায় বলল, 'মৌ, এইটুকু মেয়ে!'

মৌ অবাক গলায় বলল, 'এইটুকু কী! চোদ্দো বছর বয়স। রোগা বলে অমন মনে হচ্ছে। গ্রামের মেয়ে এ-রকমই হয়। ম্যালনিউট্রিশনে ভোগে।'

তথাগত চিন্তিতভাবে বলল, 'সে যাই হোক, কাজ করতে পারবে তো?'

মৌ নিশ্চিন্ত গলায় বলল, 'ঠিক পারবে।'

'এর তো দেখছি হাত পা কাঠির মতো।'

মৌ খানিকটা উষ্মা দেখিয়ে বলল, 'কাজ তো করবে মোটে একটা মানুষের, তার জন্য হাত পা কি হাতির মতো লাগবে? আর কী-ই বা কাজ? জল তোলা, ঘর ঝাঁট, তোমার দুটো জামাকাপড় কেচে দেওয়া—এই তো। রান্না তো তুমি নিজেই করে নেবে। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা এ-রকমই হয়। রোগা হলেও ভারী কাজ সব পারে। নিজের বাড়িতে করে না? সেখানে তো রোজগারের কোনো ব্যাপার নেই। বেগার খাটনি। তোমার এখানে করলে তো তবু ক-টা পয়সা পাবে।'

তথাগত দ্বিধাভরা গলায় বলল, 'তবু, একটা বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে...।'

এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল মৌ। স্বামীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বল তো। আমি কলকাতা ছেড়ে এই গণ্ডগ্রামে এসে তোমার দাসীগিরি করব? দীপুর পড়াশোনা লাটে উঠবে? তাকে সাউথপয়েন্ট থেকে ছাড়িয়ে এখানে নিয়ে আসব? পাঠশালায় ভরতি হবে? কী চাও তুমি?'

তথাগত বলল, 'তুমি আমার ওপর রেগে যাচ্ছ কেন? আমি কি ইচ্ছে করে এই গণ্ডগ্রামে বদলি হয়েছি? চাকরিটাই তো এ-রকম, যেখানে যেতে বলবে সেখানে যেতে হবে। আজ এমনভাবে বলছ যেন তুমি জান না! আর আমি কখনই-বা তোমাকে এখানে এসে থাকতে বললাম! এ-রকম তো নয়, আজ আমার বদলি প্রথম হয়েছে। আসানসোল, রায়গঞ্জ ছাড়া কোথায় তুমি ছিলে? সব জায়গায় তো আমি একাই থেকেছি। এবারও থাকব।'

মৌ গজগজ করে বলল, 'না-থাকলে না-থাকবে। আমি থাকতে পারব না। এটার মতো খারাপ জায়গা আর একটাও ছিল না।'

কথাটা মিথ্যে নয়। তথাগত এবার বদলি হয়েছে যথেষ্ট 'খারাপ' জায়গায়। একেবারেই অজ গাঁ বলতে যা বোঝায়। কলকাতা থেকে ট্রেনে লম্বা জার্নি। পুরো দেড় দিন লাগে। তার ওপর লেট। জায়গাটা থাকার মধ্যে আছে শুধু ধু-ধু মাঠ, মাইলের পর মাইল ধানখেত আর থেকে থেকে বাঁশবন। সেই বাঁশবন দিনের বেলাতেও অন্ধকার। সভ্যতা বলতে একটা বন্ধ হেল্‌থ সেন্টার, একটা ছাদহীন প্রাইমারি স্কুল। শুনশান দুপুরে চাকায় বিকট ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে বাঁশ বোঝাই গোরুর গাড়ি চলে যায়। সন্ধের পর থেকে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাক। থামতেই চায় না। থামলে মনে হয়, ভয়ংকর কিছু হয়েছে। প্রলয়ের আগে থম মেরে গেছে। ইলেকট্রিকের পোস্ট আছে। কারেন্ট নেই। অফিসে জেনারেটর চলে। মোবাইলে চার্জ-টার্জ সব ওখান থেকেই সেরে আসতে হবে। একটা দিন রাত কাটালেই দুনিয়া সম্পর্কে ধারণা বদলে যায়। কলকাতা নামে কোথাও যে একটা ঝলমলে, হট্টগোলে ভরা, ব্যস্ততা আর আমোদ আহ্লাদের শহর আছে কে বলবে? মনে হয়, ওসব স্বপ্নের

কথা। ওসব সত্যি নয়। দুনিয়ার সব আলো, সব হইচই, সব রং আর ব্যস্ততা এখানে আসার আগেই ফুরিয়ে গেছে।

পাকারাস্তা মোটে একটা। পাকা মানে ইট বাঁধানো। সেই রাস্তা একদিকে ঢুকে গেছে গ্রামের মধ্যে, একদিকে চলে গেছে স্টেশন পর্যন্ত। স্টেশনে সারাদিনে মাত্র দুটো ট্রেন। একটা প্যাসেঞ্জার, অন্যটা এক্সপ্রেস। বাকি সব মালগাড়ি। কাছাকাছি শহরে যাওয়ার জন্য বাসও আছে। ধরতে যেতে হয় তিন কিলোমিটার দূরে। সাইকেল নয়তো ভ্যান রিকশ ভরসা। এই ইট বাঁধানো রাস্তার ধারে তথাগতর অফিসের কোয়ার্টার। কোয়ার্টার মানে একতলা বাড়ি একখানা। তিনজন স্টাফ। তারাও মোটামুটি স্থানীয়। বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে পারে। পিয়োন বৃন্দাবন তো অফিসেই থাকে।

কোয়ার্টারে ঢুকতে ঝামেলা আছে। সামনে দিয়ে বড়ো নালা চলে গেছে। নালা ঠিক নয়, খাল থেকে খেতে জল যায়। সেই জলপথ টপকে ঢুকতে হয়। চওড়া কাঠ পাতা। কাঠ নড়বড় করে। মৌ প্রথম দিন পার হতে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল। ছুটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরেছিল তথাগত। কোয়ার্টারের রং একসময় হলুদ ছিল। যেমন থাকে। রোদ, জলে সেই রঙ উঠে গেছে। মেরামতও হয়নি বহু বছর। বাড়ি ঘিরে খানিকটা জমি। সেখানে আগাছার জঙ্গল। চারপাশে পাঁচিল। তাও জায়গায় জায়গায় ভাঙাচোরা। এককথায় সব মিলিয়ে বসবাসের অনুপযুক্ত। এই জায়গায় বদলির অর্ডার হলে সকলেই সেই অর্ডার বাতিলের জন্য ধরাধরি করে। যার যেমন ক্ষমতা। কেউ ধরে ওপরতলায়, কেউ ইউনিয়নে। তথাগত এই কাজ কখনো করে না। বলে, 'জেনেশুনেই চাকরি নিয়েছিলাম। যেখানে বদলি হব, যাব।' মৌ বলেছিল—

'ওখানে কিছুতেই থাকতে পারবে না। তুমি কাউকে বল।'

তথাগত বলল, 'আগের অফিসার কী করে ছিলেন?'

মৌ বিরক্ত গলায় বলল, 'উনি কী করে ছিলেন জানি না, তুমি পারবে না।'

তথাগত হেসে বলল, 'পারা-না-পারার প্রশ্ন উঠছে না মৌ। আমাকে যেতেই হবে। চিন্তা কী? তুমি গিয়ে সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসবে।'

নতুন কিছু নয়। আগেও মৌ এ-কাজ করেছে। নতুন জায়গায় গিয়ে যতটা পারে সামলে সুমলে দিয়ে এসেছে। জয়েন করার দিনতিনেক আগে মৌকে নিয়ে চলে এসেছে তথাগত। যতটা সম্ভব কম মালপত্র এনেছে। দীপুকে রেখে এসেছে মামাবাড়ি। কোয়ার্টারের চেহারা খারাপ হলেও গোছানোর খুব কিছু নেই। মোটে দেড়খানা ঘর। সেখানে খাট, টেবিল, আলনা, মান্ধাতার আমলের একটা ধ্যাড়-ধ্যাড়ে আলমারি। নতুন বিছানা করে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে দিল মৌ। আলমারির কোণায় ন্যাপথলিনের প্যাকেট গুঁজে, জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখল। টেবিলে বই, খাতা। ড্রয়ারে পেন, টর্চ, মোমবাতি। পিয়োন বৃন্দাবন এসে হাত লাগাতে কাজ কিছুটা সহজ হল। সে-ই একটা হ্যাজাক, হ্যারিকেনে তেল-টেল ভরে দিয়ে গেছে।

মূল ঘরে হ্যাজাক জ্বলবে। ঘর ছেড়ে বেরোলে হ্যারিকেন। রান্নাঘর, বাথরুম দুটোই একটু বাইরে। উঠোন পেরিয়ে যেতে হয়। মৌ বলল, 'ঝড়বৃষ্টিতে মুশকিল হবে।'

তথাগতও বুঝতে পারছে মুশকিল হবে। কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না। মৌ বেচারি তাতে আরও ভেঙে পড়বে। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, 'কী আর হবে, ছাতা মাথায় যাব। সে-রকম হলে বারান্দা আছে। সেখানেই স্টোভে ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিতে কতক্ষণ?'

'আর বাথরুম?' স্বামীর হালকা ভাবে রাগ হল মৌ-এর।

তথাগত মুচকি হেসে বলল, 'তখনো বারান্দা। জেন্টসের সমস্যা কী?'

নাক সিটকে মৌ বলল, 'মাগো! কী নোংরা!'

তথাগত বলল, 'নাক সিটকোনোর কিছু নেই। তুমি যখন কলকাতা থেকে আসবে উঠোন পরিষ্কার থাকবে।'

মৌ দমকে বলল, 'খবরদার বলছি। ওইসব কাণ্ড করেছ তো আমি এদিকে পা-ই বাড়াব না।'

রান্নাঘরটা সাফসুতরো করতেই যা একটু সময় লাগল। সুবিধে একটাই তথাগত নিজে রান্না করতে পারে। পুরুষমানুষের রান্না করা মানেই শৌখিন। রোজকার ডাল ভাত বললেই ছুটে পালাবে। তথাগতর বেলায় তা নয়। সে সুক্তো, মাছের ঝোল, টমেটোর চাটনি সব পারে। খুব ভালো পারে না, কিন্তু চলে যাওয়ার মতো পারে। একসময় কলকাতার মেসে থেকে রান্না করে খেত। তার সুফল এখন পাচ্ছে। সেদিক থেকে মৌ খানিকটা নিশ্চিন্ত। আলাদা করে রান্নার লোক রাখতে হয় না। কিন্তু অন্য কাজের জন্য লোক তো একজন লাগবেই। ঘর ঝাঁড়পোচ, বাসন মাজা, জামাকাপড় কাচতে হবে। হ্যারিকেন, হ্যাজাকে তেল ভরা লাগবে। তাই আসার দিন থেকেই তারে লোক খুঁজতে শুরু করল মৌ। বৃন্দাবনই খুঁজে দিল মিনুকে।

'বউদি মেয়েটাকে রেখে দিন।'

চেহারা দেখে প্রথমটায় ভরসা পায়নি মৌও।

'কাজ-টাজ সব পারবে তো? এ-রকম রোগ পিংলে চেহারা। অসুখবিসুখ আছে নিশ্চয়।'

বৃন্দাবন হাসল। বলল, 'আমাদের দেশের গাঁ গঞ্জে কার অসুখ নেই বউদি? তা বলে কাজ পারবে না! গরিব ঘরের মেয়ে, রোজ ঠিকমতো খাওয়া জোটে না। কাজ না-করলে আরও জুটবে না।'

'খাওয়া জোটে না'-র সঙ্গে মৌ ঠিক অভ্যস্ত নয়। গলা নামিয়ে বলে, 'চুরি-টুরি করবে না তো বৃন্দাবন? তোমার স্যার কিন্তু একা থাকবেন।'

'না, না। পরিবারটা ভালো। বাবা খেতে মজুরের কাজ করে। মা কয়েক বছর হল অসুখ করে শয্যাশায়ী। আপনি কাজে নিলে, সংসারটার একটু সুরাহা হয়। চিন্তা করবেন না, মেয়ে বিশ্বাসী। কথা কম বলে।'

মৌ-এর বেশি চিন্তা করার সুযোগ নেই। এখানে কাজের লোক বাছাবাছি করবে কোথায়? হাতে সময়ও কম। চলে যেতে হবে। দীপুর স্কুল কামাই হয়ে যাচ্ছে। মিনুকে রেখেই দিল মৌ। মেয়েটার সত্যি ঝামেলা নেই। মাইনে-টাইনে নিয়ে বাহানা করল না। শর্ত শুধু একটাই। কাজ করবে একবেলা। সকালেই সব সেরে বাড়ি চলে যাবে। বিকেলের পর আসতে পারবে না। এতে অসুবিধের কিছু নেই। একটা মানুষের কাজ করতে সারাদিন লাগে না। ভালোই হবে। তথাগত তালা লাগিয়ে নিশ্চিন্তে অফিস চলে যেতে পারবে। তবু দুম করে রাজি হল না মৌ। এটা তার মায়ের শিক্ষা। 'কাজের লোক' ম্যানেজমেন্টের জন্য মহিলা নানারকম কায়দা-কানুন জানেন। তিনিই বলেছেন, 'এদের কথায় চট করে রাজি হবি না। যা বলবে তাতেই মাথা নাড়বি না। বারণ করবি। মুখের ওপর বলবি, হবে না।'

মৌ অবাক হয়ে বলেছিল, 'সেকী! আমার অসুবিধে না হলে খামোকা বারণ করব কেন?'

'তোর অসুবিধে না-হোক, ওদের সুবিধে হয়। কাজের লোককে একবার সুবিধে দিয়েছিস তো গেলি। মাথায় চেপে বসবে। কাজের লোক ম্যানেজ করার জন্য টেকনিক লাগে।'

মৌ মায়ের এই 'টেকনিক' পুরোটা না-পারলেও, খানিকটা অ্যাপ্লাই করে। এবারও করল। মিনুকে ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন: বিকেলে পারবি না কেন?'

মিনু বিড়বিড় করে বলল, 'পারব না।'

'সেকী! তাহলে কী করে হবে? বিকেলে না-এলে জল তুলবে কে? শুকোতে দেওয়া জামাকাপড় পড়ে থাকবে যে। দুপুরের এঁটো বাসন...।'

মিনু একইভাবে দু'পাশে মাথা নাড়ল।

মৌ বলল, 'কতক্ষণ লাগবে? দাদাবাবু অফিস থেকে ফিরলে ঝটপট করে ফিরে যাবি।'

মিনু এবার মাথা নাড়ানো বন্ধ রেখে বলল, 'তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি কাজ করতে পারব না।'

কথাটা বলার মধ্যে একটা জোর আছে। আর ঘাঁটাতে সাহস পেল না মৌ। মেয়েটা ফসকে গেলে মুশকিল। বৃন্দাবনকে বলায় সে চুপ করে রইল।

'কী ব্যাপার বৃন্দাবন? ওই মেয়ে বিকেলে কাজ করতে চায় না কেন?'

বৃন্দাবন খুব স্পষ্ট উত্তর দিল না। খানিকটা ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে বলল, 'মনে হয় ভয় পায়।'

'ভয়! কীসের ভয়?' মৌ-এর গলায় উদ্‌বেগ।

'না, না সে-রকম কিছু নয়, বোঝেনই তো, এই বয়েসের মেয়ে। অতটা পথ ফিরতে হবে। অন্ধকার-টন্ধকার হয়ে যায়। এখানে তো আলো নেই। মনে হয় সেই কারণে ভয় পায়। বোঝেনই তো পাড়াগাঁ ভালো নয়।'

যুক্তিটা ভুল নয়। মেয়েটার বয়সটাও ভালো নয়। মৌ মেনে নিল। তারপরই

ডেকে পাঠিয়েছে মিনুকে। তথাগত ভুরু কুঁচকেছে। মেয়েটার মধ্যে কোথাও একটা অস্বস্তির ব্যাপার আছে। কথাটা মুখে না-বললেও মৌ স্বামীর 'অস্বস্তি'টা বুঝতে পারল।

'তোমার ভেতরে একটা কিন্তু কিন্তু হচ্ছে, তাই তো? ও কিছু নয়, নোংরা বলে...তেল, সাবান, শ্যাম্পু পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে। শ্যাবি ভাবটা কেটে যাবে। আমি ব্যবস্থা করছি। তেল, সাবান দিয়ে যাচ্ছি। পরেরবার কলকাতা থেকে দুটো জামাও নিয়ে আসব।'

দু-দিন কোনোরকমে কাজ দেখিয়ে মৌ কলকাতায় ফিরে গেছে। যাবার আগে বলে গেছে—'যা করানোর করিয়ে নেবে। রোগা বলে আদিখ্যেতা কোরো না। টাকা এমনি দিচ্ছি না। রোজ উঠোনটা জল ঢেলে ধোয়াবে। বারান্দা মোছাবে। কাপড় জামা জমিয়ে রাখবে না, কাচতে দেবে। জানলা দরজাগুলো যেন দু-দিন অন্তর মোছামুছি করে। ধুলো জমবে। বিকেলেও আসতে পারব না, সকালেও কাজ করব না, তা চলবে না।'

মৌ চলে যাওয়ার পর কটাদিন কেটে গেল হুড়মুড় করে। নতুন অফিসের কাজকর্ম বুঝতে সময় লাগে। মিনুর সঙ্গে তথাগতর বাক্যালাপই কম হয়। যেটুকু না-বললেই নয়। মেয়েটা নিজের মতো কাজ সেরে চলে যায়। মৌ-এর তেল সাবানে মলিন মিনু খানিকটা সাফসুতরো হলেও তথাগতর অস্বস্তি ভাবটা যায়নি। ফলে অতিরিক্ত দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তথাগত অফিস বেরোনোর আগেই কাজ শেষ করে চলে যায়। কদিন পর তথাগত বুঝতে পারল, চুপচাপ কাজ করলেও মেয়েটার কাজে গোলমাল আছে। ফাঁকিবাজির গোলমাল নয়, অন্য গোলমাল। সে সময়মতোই আসে। তথাগত অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই কাজ সেরে চলে যায়। কিন্তু গোলমাল আছে। মেয়েটা অন্যমনস্ক। সবসময় কী যেন ভাবে! কোনোদিন জল ভরতে ভুলে যায়। কোনোদিন কাচা কাপড় মেলা হয় না। কোনোদিন ঘর ঝাঁট দেওয়ার পর ধুলো ময়লা জমা করে রাখে ঘরের কোনায়। একদিন বড়ো সমস্যা হল। হ্যারিকেনে তেল ভরতে ভুলে গেল। রাতে তথাগত পড়ল ঝামেলায়। অন্ধকারে তেলের জায়গা খুঁজে পায় না।

মোবাইলে মৌকে জানাতে সে গলা চড়াল।

'তোমার জন্যই হচ্ছে। তুমি কোনো খেয়াল রাখ না।'

তথাগত বলল, 'কী খেয়াল রাখব? কাজের লোকের পিছনে ট্যাক ট্যাক করব?'

'ট্যাক ট্যাক করবে কেন? নজর তো দেবে। তুমি তো ওই মেয়ের সঙ্গে কথাই বল না। যাবার সময় কাজগুলো ঠিকমতো করে গেল কি না জিজ্ঞেস করবে না? মনে তো করিয়ে দেবে।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তথাগত ঠিক করল, ঠিকই বলেছে মৌ। অনেক হয়েছে আর নয়। বানানো অস্বস্তি ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। মিনুর সঙ্গে একটা

হালকা কমিউনিকেশন তৈরি করা প্রয়োজন। নইলে তারই সমস্যা। দু-দিন টুকটাক কথাবার্তা চালাল তথাগত। মিনু যে উৎসাহ দেখিয়েছে এমন নয়। সব কথার উত্তর তেমন দেয়নি। তবে অবস্থার উন্নতি হল অবশ্যই। অন্তত গল্পের ছলে কাজগুলো মনে করিয়ে দিতে পারছে।

'তোর বাড়ি কোথায়?'

'ওইদিকে।'

তথাগত মিথ্যে হেসে বলল, 'ওইদিকে মানে? ওইদিক তো অনেকগুলো।'

ঘর ঝাঁট দিতে দিতে মিনু বলল, 'কালো দিঘি পেরিয়ে আরও খানিকটা।'

'কালো দিঘি! কালো দিঘি আবার কেমন নাম রে বাবা! জলের রং কালো নাকি?'

মিনু মাথা নাড়ল। সেই ঘাড় নাড়ায় কিছু বোঝা যায় না। হতেও পারে, নাও হতে পারে।

'বাড়িতে কে আছে?'

মিনু চুপ করে রইল। তথাগতই উত্তর জোগাল।

'বাবা, মা?'

মিনু চুপ করে রইল। তথাগত বলল, 'ভাই বোন কেউ নেই?'

মিনু বিড়বিড় করে বলল, 'আছে। বোন আছে।'

'বোন তোর থেকে বড়ো না ছোটো? ঝাঁট দেবার পর ধুলো ময়লাগুলো আজও আবার ঘরের কোনায় জমা করে রেখে যেয়ো না বাপু।'

কাগজ এনে ধুলো তুলতে তুলতে মিনু বলল, 'একটু বড়ো।'

'বাঃ, তাহলে তো তোর পিঠোপিঠি। নাম কী?'

মিনু চুপ করে রইল। তথাগত বলল, 'কাজ শেষ হলে স্টোভটা পরিষ্কার করবি। কাল ধরাতে গিয়ে ঝামেলায় পড়েছিলাম।'

মিনু মাথা নাড়ল। কাজ করতে তার আপত্তি নেই। শুধু মনে পড়তে হবে।

'কীরে বললি না? তোর দিদির নাম কী?'

'বিনু।'

তথাগত উঠে পড়ল। অফিসের সময় হয়েছে।

'তোর বউদি এলে একদিন দিদিকে নিয়ে আসিস। বিনুকে।'

দু-দিন পরে, মোবাইলে স্ত্রীকে ধরল তথাগত।

'*তোমার অ্যাডভাইস মতো অ্যাক্ট করে ফল পেয়েছি মৌ। মিনুকে দিয়ে সব* কাজ করিয়ে নিচ্ছি। ইনফ্যাক্ট মেয়েটা ভালো। কথা শোনে। ভুলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই।'

মৌ নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'যাক, চিন্তা দূর হল। তোমার ওই অস্বস্তি গেছে তাহলে?'

তথাগত হেসে বলল, 'তা গেছে। বড়ো কথা কী জানো মৌ, মেয়েটা খুব বিশ্বাসী। আমার মানিব্যাগ কতদিন টেবিলে পড়ে থাকে...।'

'বৃন্দাবন তো সেটাই বলেছিল। তবে আবার বেশি বিশ্বাস করতে যেয়ো না। এসব মেয়ের পেটে পেটে শয়তানি থাকে।'

'দুর, কী যে বল মৌ। জান, মিনুর আবার একটা দিদি আছে।'

'তাই নাকি! দিদিও আছে?'

'বিনু না কী যেন নাম বলল। যাক, ওসব কথা ছাড়। দীপুর ক্লাস টেস্টের খাতা বেরিয়েছে?'

প্রশ্নের জবাব না-দিয়ে মোবাইলের ওপাশে মৌ চুপ করে রইল।

'অ্যাই শোন, মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।'

'প্ল্যান! কী প্ল্যান?' তথাগত অবাক হল।

'আমাদের কলকাতার বাড়ির জন্য দুই বোনের একটাকে নিয়ে এলে কেমন হয়?'

'দুই বোনের একটাকে! মানে?'

'ওই মিনু আর বিনুর একজনকে। দীপুর সঙ্গে থাকবে। আমি খানিকটা ফ্রি হতে পারি। এই দেখ না প্লিজ। বিশ্বাসী, সবসময়ের একটা লোক পেলে খুব ভালো হয়। একটুও ছেলেটাকে রেখে বেরোতে পারি না। সারাক্ষণ ট্যাঁকে ট্যাঁকে নিয়ে ঘুরতে হয়। সেদিন ছন্দা কত করে বলল, আইনক্সে সিনেমা দেখবে চল। দীপুটা ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল। যাওয়াই হল না। অ্যাই দেখ না।'

তথাগত বিরক্ত গলায় বলল, 'এসব আমি জানি না, তুমি এসে দেখ।'

মৌ আরও উৎসাহ নিয়ে বলল, 'গ্রামের মেয়েই ভালো হবে জান। কলকাতার কাছাকাছি হলে মুশকিল। হাজারবার বাড়ি যেতে চাইবে। তারপর নানারকম হাতছানি। তুমি প্লিজ একটু কথা বল না।'

তথাগত বলল, 'বলছি তো আমি পারব না।'

মৌ বলল, 'এই ভুলো মনের মেয়েটাকেই রাজি করাও। মিনুকে। আমার কাছে থাকলে সিধে হয়ে থাকবে। দিদিটা ববং তোমার ওখানে কাজ করুক। তা ছাড়া...।'

তথাগত বলল, 'তা ছাড়া কী?'

'তা ছাড়া তোমার যখন মিনুকে নিয়ে অস্বস্তি হয়, তখন ওকে তোমার কাছে না-রাখাই ভালো। তুমি কালই কথা বল। আমার একটা সব সময়ের লোক চাই-ই। কম পয়সায় হয়ে যাবে। মেয়েটাকে রাজি করিয়ে ফেল।'

'আমি পারব না।' কড়া গলায় বলল তথাগত।

'যেটুকু পার কর। বাকিটা আমি গিয়ে বৃন্দাবনকে দিয়ে করিয়ে নেব। ওর বাড়িতে বলব। আমি নিজে যাব।'

তথাগত বিরক্ত গলায় বলল, 'আমি কী বলব? টাকার লোভ দেখাব?'

মৌ একটু ভাবল। সম্ভবত তার মায়ের কাজের লোক ম্যানেজমেন্টের কথা মনে করল। বলল, 'টাকা নয়, তুমি আগে কলকাতার লোভ দেখাও।'

'কলকাতার লোভ মানে! কী বলছ মউ আমি তো ভালো করে বুঝতেই পারছি না।'

মউ মুখ দিয়ে চুক চুক ধরনের আওয়াজ করল।

'আরে কলকাতা কত সুন্দর সেটা বল, এখানে এলে ও কত কী দেখবে—এই সব। ওইসব মেয়েদের কলকাতা শুনলে চোখ চকচক করে।'

তথাগত এবার রেগে গেল। মউয়ের মাথাটা গেছে। সে কী ভেবেছে? রাগ করে ফোনটা কেটেও দিল। কিন্তু পরদিন কথাটা মিনুকে বলেও বসল। সরাসরি বলল না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলল।

'হ্যারে মিনু, তুই কখনো কলকাতায় গেছিস?'

মিনু চমকে মুখ তুলল। ফের মাথা নামিয়ে নিজের মনে হ্যারিকেনের কাচ পরিষ্কার করতে লাগল।

'গেছিস কখনো?'

বিড়বিড় করে বলল, 'না, আমি যাই নি।'

'কলকাতা দেখতে ইচ্ছে করে না?'

মিনু চুপ করে রইল। তথাগত বলল, 'কলকাতায় কত কী আছে জানিস? কত কী! তোদের এই পচা গ্রামের মতো নয়। ঝকঝকে রাস্তা, সাঁই সাঁই করে গাড়ি ছুটছে। মেট্রো রেলের নাম শুনেছিস? মাটির তলা দিয়ে যায়। গেলে দেখতে পাবি। ওখানে কত আলো, দোকানবাজার। জামাকাপড়। বড়ো বড়ো সব বাড়ি।'

মিনু মুখ তুলল না। তথাগত হেসে বলল, 'আমরা যে-বাড়িটায় থাকি সেটা আটতলা। আটতলা বুঝিস? একেবারে আকাশ পর্যন্ত। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় না, একটা ছোট্ট লোহার খাঁচায় উঠবি। সেই খাঁচাই তোকে ওপরে নিয়ে যাবে। তাকে বলে লিফ্‌ট।'

একটু চুপ করে মিনুর মুখ দেখতে চাইল তথাগত। এক্সপ্রেশন বুঝতে হলে মুখ দেখতে হবে। দেখা গেল না।

'যাবি? তোর বউদি এলে ঘুরে আয় না। আচ্ছা আমি না হয় বলব।'

ব্যস। এইটুকু বলেই চুপ করল তথাগত। প্রথমদিন বেশি ভালো নয়। রাতে মৌকে ফোন করে বলল, 'বলেছি।'

মৌ অধীর আগ্রহে বলল, 'কী বলল? আসবে?'

'অত বলিনি, শুধু কলকাতা সম্পর্কে বলেছি। সুন্দর, আলো ঝলমলে—এইসব।'

'কী বলল?'

'কিছু বলেনি। চুপ করে শুনেছে।'

মৌ দ্রুত গলায় বলল, 'ঠিক আছে, আর কিছু বলতে হবে না। আমি রবিবার যাচ্ছি, ফাইনাল করে আসব। মাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

তথাগত বলল, 'মা! মা কী করবেন?'

'কাজের লোক-টোকের ব্যাপার মা-ই ভালো বোঝে। কাজ তো অনেক। শুধু তো মিনুকে নিয়ে এলেই হবে না। ওর দিদিটাকেও তো তোমার ওখানে ব্যবস্থা করতে হবে। কী যেন নাম দিদিটার?'

'বিনু। কিন্তু সে যদি রাজি না হয় মৌ?'

মৌ তাচ্ছিল্যের হেসে বলল, 'ঠিক হবে। মা এসব দারুণ পারে। আর দেরি করব না। রবিবারই আসছি। ও আর একটা কথা। দীপুকে এবার নিয়ে যাচ্ছি। খুব বায়না করছে। ও নাকি কখনো হ্যারিকেনের আলোয় রাত দেখেনি। ঠিক সময়ে স্টেশনে থেকো। মনে হয় বিকেল পার হয়ে যাবে। গাড়ি তো লেট করবেই।'

পরদিন কাজ সেরে চলে যাবার সময় মিনু এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। তথাগত বলল, 'কী হল?'

'দাদাবাবু, একটা কথা ছিল।'

কথা! এই মেয়ের কথা! কলকাতার গল্প শুনে বিগড়ে গেল নাকি রে বাবা! তথাগত যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক রেখে বললে, 'কী কথা মিনু?'

'দিদি আসতে চায়।'

তথাগত চমকে উঠল। বলল, 'তাই নাকি! বিনু? কার কাছে আসবে?'

'আপনার কাছে।'

ভুরু কোঁচকালো তথাগত, 'আমার কাছে! কেন রে?'

'আপনাকে বলবে।' এবার আর মাথা নামায়নি মিনু।

'নিয়ে আসিস।' কথাটা খানিকটা থতোমতো গলাতেই বলল তথাগত। মেয়েটা নিশ্চয় বাড়ি গিয়ে দিদিকে কলকাতার গল্প বলেছে। খচ খচ করা মন নিয়ে তখনই মৌকে ফোন করল তথাগত। মৌ খুশি হয়ে বলল, 'হয়ে গেছে।'

'কী হয়ে গেছে?'

মৌ হাসতে হাসতে বলল, 'টোপ গিলেছে। কলকাতার টোপ। আরে বাবা, এসব কায়দা আমি মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। আমি লিখে দিচ্ছি, কলকাতায় আসবার জন্য দুই বোনে মারামারি লেগে গেছে। তুমি বেশি কিছু বোলো না। আমি আর মা গিয়ে ব্যবস্থা করছি। বৃন্দাবনকে থাকতে বলবে। ওই মেয়ে কবে আসবে? মিনুর বোন বিনু?'

বিনু 'দেখা করতে' এল শুক্রবার সন্ধের পর। তথাগত অফিস থেকে ফেরার বেশ কিছুটা পর। সবে সন্ধে নেমেছে। তথাগত অবাক হল। মিনু সন্ধেবেলা এসেছে! ভয় পায়নি? হয়তো দুই বোন একসঙ্গে আছে বলে ভয় পায়নি। হতে পারে। হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোয় তথাগত দেখল, বিনুকে তার বোনের মতোই দেখতে।

সেই একইরকম রোগাভোগা। একমাথা জট পাকানো চুল। কে বলবে দু'বছরের বড়ো! তফাত পোশাকে। বিনু শাড়ি পরেছে।

দুজনেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের দরজায়। তথাগত শান্ত গলায় বলল, 'এসো বিনু।'

বিনু এক পা ঢুকল। না, শুধু পোশাক নয়, এই মেয়ের চোখদুটোও বোনের থেকে আলাদা। ভাসা ভাসা। তবে চোখ দেখার বেশি উপায় নেই। বোনের মতো সেও মাথা নামিয়ে থাকতে ভালোবাসে।

'বল, কী বলবে?'

মিনু হাত দিয়ে দিদির গায়ে খোঁচা দিল। ফিসফিস করে বলল, 'বল। বল না।'

বিনু কথা বলল। একটু জড়ানো গলা। ফিসফিস করে বলল, 'আমি কলকাতায় যাব।'

তথাগত খুশি হল। হেসে বলল, 'তাই?'

'কলকাতায় আমাকে একটা কাজ দেখে দেন দাদাবাবু।'

তথাগত আরও খুশি হল। মৌ ঠিকই বলেছে। সত্যি ওরা এদের চট করে বুঝতে পারে। তথাগত নিজের খুশি ভাব গোপন করে বলল, 'দেখ বিনু, আমি তো বলতে পারব না। তোমার বউদি আসছে। তার সঙ্গে তুমি কথা বল। কেমন? শুনেছি, আমাদের কলকাতায় একজন লোক দরকার। সারাক্ষণ থাকবে। একেবারে বাড়ির মতো...আমার ছেলে আছে...তার টিফিন করে দেবে...জামাকাপড় গুছিয়ে দেবে... স্কুল বাসে তুলে দেবে...একেবারে বাড়ির মতো। তোমার বউদি আসুক। অ্যাই মিনু, দিদিকে একটু চা করে খাওয়া।'

বিনু ফিসফিস করে বলল, 'চা খাই না।'

তথাগত নরম গলায় বলল, 'ঠিক আছে, চায়ের দরকার নেই। মিনু দেখ, রান্নাঘরের কৌটোতে মিষ্টি আছে। বের করে দে। কৌটো ঠিকমতো আটকাবি। বিনু, তুমি মিষ্টি খাও তো?'

বিনু চুপ করে রইল। দিদিকে মিষ্টি খাওয়াতে মিনুর খুবই উৎসাহ। সে তাকে একরকম টেনেই নিয়ে গেল। দুজনেই রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে সন্দেশ খেল। জল খেল। গুনগুন করে কথাও বলল। সে-কথা অস্পষ্ট। বোনেরা যখন নিজেরা কথা বলে সে-কথা সবসময়ই অস্পষ্ট শোনায়। হয়তো শব্দবিজ্ঞান এ-রকমই ব্যবস্থা করেছে। দুই বোনের কথা অন্যদের শুনতে দেয় না। তথাগত তাও কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। সে অবাক হয়ে লক্ষ করল, মিনুকে নিয়ে তার যে-অস্বস্তিটা ছিল সেটা একেবারে উধাও হয়ে গেছে! এটাই ভালো। যদি পারে মৌ ওর দিদিকেই বরং কলকাতায় নিয়ে যাক। মিনু মোটামুটি তার ধাত বুঝে গেছে। ওরা ফের এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াল। বিনু নীচু গলায় বলল, 'চললাম দাদাবাবু।'

'সাবধানে যা। সঙ্গে আলো-টালো কিছু আছে? টর্চ?'

মিনু হাসল। এই প্রথম মেয়েটার হাসি দেখল তথাগত। বলল, 'আলো লাগবে না। দুজনে আছি না?'

তথাগতও হাসল। বলল, 'তাহলে আর চিন্তা কী? যা ভাগ। কাল তাড়াতাড়ি আসবি।'

দুই বোন বারান্দা, উঠোন দিয়ে পায়ে চলে গেল। চলে গেল আলো ছায়া পার হয়ে। যাবার পথে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসিও করল যেন। মোবাইল তুলে মৌকে ধরল তথাগত। ফোনের কানেকশন হল না। মাঝে মাঝে এই কাণ্ড হয়। টাওয়ার চলে যায়। সারারাত আসবে না। সত্যি একটা গণ্ডগ্রাম। অফিসের কাগজপত্র দেখতে গিয়ে খানিকটা দেরিই করে ফেলল তথাগত। হ্যাজাকটা কমিয়ে, হাতে টর্চ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। রান্নাঘর থেকে খাবার এনে ঘরেই খাবে। রাতে রোজই তাই করে। গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল তথাগত। মনটা ভালো লাগছে। মৌ আসছে, দীপু আসছে। হইচই করে কাটবে। অফিস গিয়েই চলে আসবে এই কটাদিন। টর্চের আলো ফেলে বারান্দায় ক-পা এগোতেই থমকে গেল তথাগত।

ওটা কী! পায়ের ছাপ না?

এগিয়ে গেল তথাগত। হ্যাঁ, পায়ের ছাপই তো। চলে গেছে বারান্দা পার হয়ে। এবার শক্ত হাতে টর্চটা ধরল তথাগত। মেয়েলি পায়ের ছাপ। হালকা। কেউ যেন হেঁটে গেছে। নিশ্চয় দুই বোনের একজন জল মাড়িয়েছিল। নিশ্চিন্ত হতে গিয়েও অবাক হল তথাগত। ওরা গেছে তো অনেকক্ষণ, এখনো পায়ের ছাপ! কী করে সম্ভব? তথাগত ঘরে ফিরল। হ্যাজাকটা নিয়ে বেরিয়ে এল আবার। বারান্দা আলোয় ভরে গেল। আর তাতেই গোটা শরীর ঝিমঝিম করে উঠল তথাগতর! মনে হল মুহূর্তের জন্য হাত পা যেন অবশ হয়ে গেল। মনে হল হ্যাজাকটা হাত থেকে পড়ে যাবে এখনই।

পায়ের ছাপ ঠিকই, কিন্তু জলের নয়, রক্তের! আলোয় সেই ছাপ লাল টকটক করছে। মনে হচ্ছে, কেউ রক্তমাখা পায়ে হেঁটে গেছে বারান্দা, উঠোন, বাড়ি পেরিয়ে...।

মাথা ঘুরে উঠল তথাগতর। কোনোরকমে ঘরে ঢুকে দরজা আটকাল সে।

পরদিন সকালেই বৃন্দাবনের সঙ্গে যোগাযোগ করল তথাগত।

'মিনুর বাড়িতে কোনো গোলমাল আছে? কিছু লুকিয়ো না। আমার জানা দরকার।'

'কেন? কিছু হয়েছে স্যার?'

'না, কিছু হয়নি। তুমি বল।'

খানিকটা চুপ করে রইল বৃন্দাবন। তারপর বলল। ছোটো ঘটনা। নতুনত্ব কিছু নেই। পাড়াগাঁয়ে আকছার ঘটছে। দু-বছর আগে, মিনুর দিদি বিনুকে কাজের কথা বলে অচেনা একজন লোক কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়। এই ধরনের অসংখ্য

দালাল গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। মেয়ে সংগ্রহ করে। বিনু প্রথমটায় রাজি হয়নি। কিন্তু বেশিদিন লোভ সামলাতে পারে না। ঝলমলে শহরে থাকার লোভ। বাড়ি থেকে পালিয়ে একদিন ট্রেনে উঠেও পড়ে সে। দীর্ঘ তিনমাস তার খবর পাওয়া যায়নি। তিনমাস পরে পুলিশ বিনুর মৃতদেহ খুঁজে পায় খিদিরপুরের এক বস্তিতে। রক্তে ভেসে যাওয়া শরীর। ধর্ষণ এবং খুন। সব মিলিয়ে অতি সাধারণ ঘটনা।

এসবের কিছুই অবশ্য মৌকে বলেনি তথাগত। বলে কী লাভ? ভয় পেয়ে যাবে। সেদিন ট্রেন লেট করে ওদের আসতে আসতে বেলা হয়ে গেল। স্টেশনে গিয়েছিল তথাগত। সেখানেই মৌকে বলল, 'ওই বিনু মেয়েটার কথা ভুলে যাও। খবর পেলাম, মেয়েটা নাকি বিরাট চোর। ওকে রাখা যাবে না।'

ও, একটা কথা বলা হয়নি। পায়ের ছাপের ঘটনার পরদিন সকালে মিনু কাজ করতে এসেছিল একটু বেশি সকালে। আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলল তথাগত। খুলেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মিনু জল ঢেলে বারান্দা আর উঠোন ধুচ্ছে। ধুচ্ছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। যেমন রোজ ধোয়।

ঢাক



ঘর এসি। হালকা এসি নয়, কড়া এসি। কোট প্যান্ট পরে থাকলেও এই এসিতে শীত শীত করে সুশোভন রায়ের মনে হচ্ছে, তার শীত করছে না, ঘাম হচ্ছে। যদিও এই মনে হওয়া সত্য নয়। এটা বিভ্রম। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকলে মানুষের মনে নানা ধরনের বিভ্রম তৈরি হয়। তার মধ্যে একটা হল, ঠান্ডা গরমের বোধ ওলোট পালোট হয়ে যাওয়া। যার বেলায় ঘটে সে বেচারি বুঝতে পারে না। তার মনে হয়, যা ঘটছে তা সত্যি। সুশোভন রায়েরও তাই হয়েছে। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের অদৃশ্য ঘাম মুছলেন। টাইয়ের নট আলগা করলেন।

সুশোভন রায়ের কানে মোবাইল। ফোনে কথা বলার সময় তিনি সাধারণত তার দামী চেয়ারে হেলান দেন। রিভলবিং চেয়ার অল্প অল্প নাড়ান। রিল্যাক্সড ভঙ্গি। সেই ভঙ্গি বলে—'সমস্যা কিছু নেই। থাকলেও খুব দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।' বড়ো কম্পানিতে উঁচু জায়গায় যারা থাকে তাদের জন্য এই ভঙ্গি খুবই জরুরি। এই ভঙ্গি যে দেখে তার যেমন মনোবল বাড়ে, নিজেরও সাহস বাড়ে। সমস্যা যত কঠিন হবে 'রিলাক্সড ভঙ্গি' তত বেশি হবে। সুশোভন রায়ের 'জায়গা' আবার ছোটোখাটো উঁচু নয়। অতিরিক্ত উঁচু। তিনি এই কম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

যদিও এই মুহূর্তে সুশোভন রায়ের ভঙ্গি অন্যরকম। তিনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছেন। কথা বলছেন চাপা গলায়। সেই গলায় একই সঙ্গে তিন ধরনের অভিব্যক্তি। বিরক্তি, চিন্তা এবং ভয়। ফোনের ওপাশে যে যুবকটি রয়েছে তার নাম শতদ্রু। শতদ্রু খাস্তগির। সে এই কম্পানির ম্যানেজার। দক্ষ ছেলে। কেরিয়ারের সিঁড়ি টপকাচ্ছে টপাটপ। সুশোভন রায় এই ছেলেকে বিশেষ পছন্দ করেন। কাজ দেবার সময় বিশ্বাস করেন, এই ছেলে 'পারবে'। সে-ই বিশ্বাসেই তিনি শতদ্রুকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই ছেলে দায়িত্ব ফেল করার ছেলে নয়। আজ ফেল করেছে।

সুশোভন রায় চাপা গলায় বললেন, 'শিয়ালদা গিয়েছিলে? শিয়ালদা স্টেশন?'

শতদ্রু বলল, 'স্যার ওখান থেকেই শুরু করেছি। হাওড়া স্টেশনও গেছি। শিয়ালদা, বাবুঘাট কোথাও বাদ দিইনি। ইন ফ্যাক্ট, আমি এখন গঙ্গার পাশে স্যার। লঞ্চ ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকে বাস স্ট্যান্ডও দেখা যাচ্ছে। বাস, লঞ্চ, নৌকো সব কিছুর ওপর নজর রাখছি। কেউ এলেই...।'

সুশোভন রায় ভীত গলায় বললেন, 'আশ্চর্য! সারপ্রাইজিং! চিরকাল আমি শুনেছি ওসব জায়গাতেই পাওয়া যায়। এখন কী হবে শতদ্রু? এতো ভয়ংকর কাণ্ড। তোমার বউদি পুরোপুরি আমার ওপর ডিপেন্ড করে আছে। শুধু বউদি বলব কেন, আমার গোটা শ্বশুরবাড়ি ইজ ওয়েটিং ফর মি। যাকে বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। লাস্ট সেই বিয়ের দিন এইভাবে অপেক্ষা করেছিল। বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে যাবে। লস অব ফেসের থেকেও অনেক বেশি হবে। লস অব এভরিথিং। দেশের বাড়িতে আমার শ্বশুরবাড়ির পুজো...।'

শতদ্রু কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'স্যার, চিন্তা করবেন না। নিশ্চয় একটা কিছু ওয়ে আউট বেরিয়ে আসবে। একবার বড়োবাজার আর নিউমার্কেটে যাব? বড়োবাজারে স্যার সব কিছু পাওয়া যায়। আর ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি, নিউমার্কেটে বাঘের দুধও মেলে।'

চাপা ধমকে সুশোভন রায় তার তরুণ ম্যানেজারকে থামালেন। বললেন, 'বোকার মতো কথা বল না শতদ্রু। তোমাকে মানায় না। আমরা যা খুঁজছি, তা ওসব জায়গায় পাওয়া যায় না। তুমি অন্য কিছু ভাব।'

ওপাশের শতদ্রুকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার অবস্থা খারাপ মালিকের ধমক বাঘের হালুমের মতো। মনে জোর এনে সে ঢোক গিলে বলল, 'সরি স্যার।'

এপাশে সুশোভন রায় খানিকটা লজ্জা পেলেন। শতদ্রুর কী দোষ? সে কেন 'সরি' বলবে? দুর্ঘটনা তো শেষ মুহূর্তে ঘটেছে। কাল গভীর রাতে দেশের বাড়ি থেকে রমা ফোন করেছিলেন। দুর্ঘটনার সংবাদ দেবার সময় মানুষের গলা থাকে থমথমে। রমা গদগদ স্বামীকে বললেন, 'তুমি কবে আসছো?'

প্রতি বছরই শ্বশুরবাড়ির পুজোয় যোগ দিতে সুশোভন যায় সপ্তমীর দিন। বলে সকালে। যেতে যেতে বিকেল হয়ে যায়। ষষ্ঠী পর্যন্ত অফিস করেন। স্ত্রী এবং মেয়ে চলে যায় তিনদিন আগে। আত্মীয়দের সঙ্গে পুজোর আয়োজন করে। অত বড়ো নাটমন্দির সাজানো তো কম কথা নয়।

সুশোভন বললেন, 'হঠাৎ এই প্রশ্নের অর্থ কী রমা? যেমন যাই তেমন যাব। সপ্তমীতে।'

রমা আহ্লাদি গলায় বলল, 'না, এবার তা চলবে না। এবার তোমাকে আগে আসতে হবে। কারণ একটা খারাপ ঘটনা ঘটেছে।'

সুশোভন রায় ভুরু কুঁচকে বললেন, 'খারাপ ঘটনা!'

রমা সামান্য হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, খারাপ ঘটনা। মুকুন্দকে মনে আছে? আরে বাবা মুকুন্দ, আমাদের পুজোয় ঢাক বাজায়। বিশ বছর ধরে আমাদের বাড়িতে ঢাক বাজাতে আসে। মনে পড়েছে?'

সুশোভন রায় বলেন, 'না, মনে পড়েনি। কী হয়েছে তার?'

রমা বললেন, 'একটু আগে খবর পাঠিয়েছে, সে এবার আসতে পারছে না। তার খুব জ্বর। এদিকে আর কোনো ঢাকিও পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে। সবাই বুক্‌ড। পুজোর দু-দিন আগে কে আর বসে থাকবে? মেজোমামা, ছোটকা, ন-পিসি, ফুলদি সবার মাথায় হাত। বাচ্চারা তো কেঁদে ফেলেছে। ফেলবেই তো। ঢাকি ছাড়া দুর্গাপুজো হবে কী করে? তুমিই বল হয়? তখন সবাই আমাকে চেপে ধরল। বলল, 'তুই তোর বরকে বল। সে বিরাট মানুষ। অনেক কিছু পারে। দেখবি একটা ঢাকি ঠিক জোগাড় করে ফেলবে। ওকে বল, ঢাকি নিয়ে এখানে কাল সকালেই চলে আসতে।'

সুশোভন রায় শোকস্তব্ধ গলায় বললেন, 'তুমি কী বললে? রাজি হয়ে গেলে?'

রমা অবাক গলায় বললেন, 'হব না? অত করে ধরল। তাছাড়া শ্বশুরবাড়ির পুজো বলে কথা, তুমি জামাই মানুষ, একটা দায়িত্ব তো নেওয়া উচিত। শুধু এলাম আর খাওয়া দাওয়া করে পা নাড়ালাম তা কী করে হবে? যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি একজন ঢাকি নিয়ে চলে এস। নইলে বিরাট কেলেঙ্কারি। আমার প্রেস্টিজ থাকবে না। ও, সঙ্গে কাঁসর বাজানোর একজন চাই। তাকেও আনবে।'

স্ত্রীর সঙ্গে কথা শেষ করে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন সুশোভন রায়। তারপর শতদ্রুকে ফোনে ধরলেন। সেই শতদ্রু সকাল থেকে পথে পথে ঢাকি খুঁজে ব্যর্থ। শুধু কলকাতায় নয়, এমনকি মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলিতেও খবর পাঠিয়েছিল সে। ঢাকি নেই। কোথাও ঢাকি নেই। থাকার কথাও নয়। পুজোর আগেরদিন কোনো ঢাকি বেকার বসে থাকবে?

ফোন কানে চেপে সুশোভন রায় বিড়বিড় করে বললেন, 'শতদ্রু তুমি কি কোনো ব্যাক আপ সিস্টেমের কথা ভাবতে পারছো? কোনো অলটারনেটিভ?'

শতদ্রু খড়কুটো চেপে ধরার ঢঙে বলল, 'একটা হতে পারে স্যার, ঢাকের আওয়াজ যদি কম্পিউটার থেকে ডাউনলোড করে... সিডি করে... তারপর আপনার ফাদার-ইন-ল-এর বাড়িতে... মানে পুজোর জায়গায় মাইকে বাজানো হয় যদি।'

চিন্তিত সুশোভন রায় চেয়ারে হেলান দিয়ে। আর তখনই মাথার ভেতরটা চিড়িক করে উঠল। একটা পথ তো আছে। একটাই পথ। তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'শতদ্রু,আমার মাথায় হালকা ভাবে একটা প্ল্যান আসছে। ঢাকি লাগবে না, তুমি একটা ঢাক জোগাড় কর। যেভাবে হোক জোগাড় কর। অ্যাট এনি কস্ট। দরকার হলে যেখানে ঢাক বানানা হয় সেখানে চলে যাও। যত দাম লাগে।'

গ্রামের ভাঙা রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে যে গাড়িটা চলেছে তার দাম প্রায়

কোটি টাকার কাছাকাছি। গাড়ির কাঁচ তোলা। ভেতরে এসি চলছে। গাড়ি চালাচ্ছেন সুশোভন রায়। পাশে শতদ্রু।

সুশোভন রায় বললেন, 'কী পারব না?'

শতদ্রু গদগদ গলায় বলল, 'খুব পারবেন। দারুন পারবেন। কেন পারবেন না? এ আর এমন কী কঠিন কাজ স্যার? তাছাড়া আমি তো কাঁসর হাতেই পাশে থাকব স্যার।'

সুশোভন রায় বললেন, 'ঠিকই বলেছ। পারব না কেন! সেই ছোটোবেলা থেকেই তো শুনে আসছি। এখনো কানে লেগে আছে, কাই নাড়া কাই নাড়া, গিজ গিনিতা গিনিতা, গিজ গিনিতা গিনিতা... হা হা...।'

পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। দামি গাড়ির মাথায় তারা দড়ি দিয়ে ব্যাগ, সুটকেস বাঁধা দেখেছে অনেক, কিন্তু কখনো ঢাক বাঁধা দেখেনি। পালকে সাজানো সেই ঢাক বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সেও বিরাট খুশি। তাই লাফাতে লাফাতে চলেছে।

ফটিক মুন্সির সমস্যা

ফটিক মুন্সির সমস্যা হয়েছে।

প্রথমদিকে তাঁর মনে হয়েছিল, সমস্যা বড়ো। পরে মনে হল, না, সমস্যা বড়ো কিছু নয়, সমস্যা ছোটো। মনের ভুল মাত্র। তবু অনেক সময়ে ছোটো জিনিস বেশি ঝামেলা পাকায়। বড়ো কাঁটা টান মেরে ফেলা যায়। ছোটো কাঁটা বের করা যায় না। গলার ভেতর ঘাপটি মেরে বসে খচ খচ করে। ছোটো সমস্যা ফটিক মুন্সির মাথার ভেতর বসে খচ খচ করতে লাগল। তিনি ঠিক করলেন, মনকে কঠিন করে রাখবেন। কাঁটা উপড়ে ফেলা যাবে।

দীর্ঘ আঠাশ বছর সরকারি অফিসে কেরানি পদে চাকরি করছেন ফটিকবাবু। এই দপ্তর, সেই দপ্তরে বিস্তর ঘোরাঘুরির পর তিনবছর হল 'দুষ্প্রাপ্য জীবিকা ও কর্মবিনিয়োগ' দপ্তরে এসে থিতু হয়েছেন। কর্মজীবনে আরও একটা প্রোমোশন বাকি আছে। তার জন্য কাঠখড় পোড়াতে হবে। ধরাধরির পরিশ্রম লাগবে। ফটিকবাবুর প্রোমোশনের কোনো বাসনা নেই। তিনি বিশ্বাস করেন, যতটা হয়েছে তাই অনেক। এই অবস্থা থেকে অবসর নিতে পারলেই হবে। অবসরেরও আর দেরি নেই, হাতে গোনা ক-টা বছর মাত্র বাকি। আসলে ফটিকবাবুর বুদ্ধিসুদ্ধির স্তর খানিকটা নীচের দিকে। যাদের বুদ্ধি কম হয় তারা দিনকাল বদলের সঙ্গে নিজেকে বদলাতে পারে না। ফটিকবাবুও পারেননি। শুধু পারেননি নয়, তিনি পড়ে আছেন প্রাচীনকালে। প্রায় প্রস্তর যুগে। অফিসে এসে কাজ না-করলে তার অস্বস্তি হয়। টেবিলে ফাইল জমলে বিরক্ত লাগে। কাজ ফেলে গল্পগুজব পছন্দ করেন না। এত বছর চাকরি হয়ে গেল, আজও পনেরো মিনিট দেরি করে অফিসে ঢুকতে লজ্জা পান। দশ মিনিট আগে ছুটির পারমিশন নিতে গিয়ে বড়োবাবুর সামনে দশবার মাথা চুলকোন। তাঁর এই কর্তব্যকাণ্ড এবং দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে অফিসে হাসাহাসি আছে। সেটাই স্বাভাবিক। সহকর্মীরা ঠাট্টা করে। বলে, ফটিক মুন্সি মরলে গভর্মেন্ট পাথরের মূর্তি বসাবে।

মূর্তির অর্ডার হয়ে গেছে। মাথায় গাদাখানেক পাথরের ফাইল। তলায় লেখা থাকছে—'শহিদ করণিক ফটিক মুন্সি। সরকারি ফাইল বহন করিতে করিতে জীবন দিয়াছেন।'

এই মানুষটা যদি এখন কাউকে বলেন, 'বুঝলেন ভাই, একটা সমস্যা হয়েছে। মাসখানেক হল, আমি...,' সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বে। তাই বিষয়টা সম্পর্কে চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফটিকবাবু। ঠিকই করছেন। বলবেনটাই-বা কী? সমস্যাটা তাঁর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। ধাঁধার মধ্যে আছেন। শুধু স্বল্প জ্ঞান বুদ্ধিতে বুঝতে পারছেন, ঘটনা সত্যি নয়। এ জিনিস হতে পারে না। যে জিনিস হতে পারে না তা অন্যকে বলে লাভ কী? মনের ভুল তাড়াতে মনকে কঠিন করা ছাড়া অন্য ওষুধ নেই। তিনি মনকে কঠিন করলেন। ওষুধ কাজ দিল। দিনকতক কোনো ঝামেলা হল না। ফটিকবাবু ভাবলেন, বাঃ, সমস্যা কেটে গেছে। গলার কাঁটা দূর হয়েছে।

কাঁটা দূর হল না। ঝামেলা ফিরে এল সোমবার। ফিরে এল বিচ্ছিরি চেহারায়।

সেদিন দুপুরে ঘণ্টাখানেকের জন্য হাতে কাজ ছিল না। চেয়ারে বসে জিরোচ্ছিলেন ফটিক মুন্সি। গরমে সামান্য ঝিম মতো ধরেছিল। নিজের অজান্তেই মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ বুজেছিলেন। আর তখনই ঝিমের মধ্যেই দেখতে পেলেন গৌরহরিকে।

গৌরহরি রয়েছে জেলে। গায়ে কয়েদিদের সাদা কালো ডোরাকাটা পোশাক। এক গাল উশকো খুশকো দাড়ি। মাথার চুলে কদম ছাঁট। চোখদুটো বড়ো বড়ো, করমচার মতো লাল। জেলের উঠোনে বসে গৌরহরি ঘানি টানছে আর ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করে রাগের নিশ্বাস ফেলছে। গৌরহরির সঙ্গে জেলে দেখা করতে গেছেন ফটিকবাবু। হাতে টিফিন কেরিয়ার। তিনবাটির টিফিন কেরিয়ার। একটায় রয়েছে বড়ি দিয়ে সুক্তো, অন্য বাটিতে ঝিঙে পোস্তর তরকারি, আর শেষ বাটিতে সরষে মাখা পারসে মাছের ঝাল। সবই গৌরহরির প্রিয় খাবার। অনেক ধরাধরি, অনুনয় বিনয়ের পর জেলার ফটিকবাবুকে খাবার নিয়ে জেলে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন।

ফটিকবাবু গৌরহরির কাছে গিয়ে নরম গলায় বললেন, 'গৌর, আছ কেমন বাবা?'

বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকাল গৌরহরি। মুখ থেকে পিচ করে একদলা থুতু ফেলল সামনে। নাক কুঁচকে বলল, 'কেমন আছি দেখতে পাস না শুয়ার? আমার সঙ্গে ফাজলামো মারিস? থাবড়ে গাল তোবড়া করে দেব।'

ঝিমোনি ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে বসলেন ফটিক মুন্সি। তাড়াহুড়োয় পড়ে যাচ্ছিলেন চেয়ার থেকে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে শুকনো মুখে ছুটলেন চোখে জল দিতে। মুখ শুকনো করা ছাড়া উপায় কী? গৌরহরি তার জামাই। একমাত্র জামাই। একমাত্র জামাইকে জেলে বসে ঘানি টানতে দেখলে মুখ শুকনো

করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। তার ওপর জামাই যদি শ্বশুরের গালে থাবড়া দেওয়ার হুমকি দেয় তাহলে তো কথাই নেই। অথচ এই ছেলে ছিল খুবই শৌখিন। টেরি বাগানো চুল, ফিনফিনে পায়জামা পাঞ্জাবি, শ্যাম্পু সেন্টে সবসময় ফিটফাট। তার একী হাল! এক মুখ নোংরা দাড়িগোঁফ নিয়ে হাজতে! উফ! এ তিনি কী দেখলেন। বাথরুমে ঢুকে চোখে জল ছিটিয়ে, ঘাড়ে জল চাপড়ে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করলেন ফটিকবাবু।

জামাইটি অবশ্য তাঁর খুবই বদ। অতি বেয়াদপ। নানাবিধ লোক ঠকানোর কারবার আছে। আলপিন টু এলিফ্যান্ট সব বিষয়ে দালালি করে। বিস্তর গোলমাল। ফুটানি সব শ্বশুরের পয়সায়। মেয়েরও মদত আছে। স্বামী বলতে গদগদ। এখন সে স্বামীর জন্য মোটরবাইকের বায়নাক্কা ধরেছে। ফটিকবাবু অবাক হয়ে মেয়েকে বললেন, 'বলিস কী তপা! ও জিনিসের তো অনেক দাম। অত টাকা আমি পাব কোথা থেকে?'

বাবার সঙ্গে যেকোনো ঝগড়াই তপা আদুরে গলায় শুরু করে। সেদিনও করল। আধো আধো গলায় বলল, 'কী যে বল বাবা! মোটরবাইক দামি হতে যাবে কেন? আজকাল একেবারে জলের দর। তোমার জামাই বলল হাজার বারোশো দিলেই বাড়ি এসে দিয়ে যাবে। তারপর মাসে মাসে মেটালেই চলবে। তোমার গায়েও লাগবে ন।'

গায়ে লাগবে না! থতোমতো খেয়ে যান ফটিক মুন্সি। বলে, 'ছোটো চাকরি করি। ক-টা টাকা বেতন পাই? বলিস তো জামাইকে একটা সাইকেল কিনে দিই।'

তপা এবার গলা চড়ায়। বলে, 'এমনভাবে কথা বলছ যেন ভিখিরি। তাহলে ভিখিরির ঘরে বিয়ে দিলেই পারতে। জামাইয়ের সঙ্গে ট্রেনে ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষে করতাম। রবিবার করে তোমরা বেড়াতে এলে স্টেশনেই চাট্টি চাল ডাল ফুটিয়ে দিতাম। তা যখন হয়নি, তখন খরচাপাতি তো কিছু করতে হবে বাবা। তা ছাড়া তোমার জামাই বলে, সরকারি আফিসে এখন নাকি কবজি ডোবানো মাইনে। না, বাবা, এমাসেই ব্যবস্থা কর। নইলে জামাই আবার রাগ করবে। তার রাগ তো জান না। আমাকেই যা খিস্তি খেউড় করে। বাপ্ রে! দেখতে অমন সখি সখি হলে কী হবে মুখে কিছু আটকায় না। তার থেকে ভালোয় ভালোয় জিনিসটা কিনেই দাও।'

ফটিকবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কাতর গলায় বলেন, 'আমার কথা না ভাবিস, তোর মায়ের কথাটা তো ভাববি। তার ওষুধের জন্য কত খরচ হয় তা তো জানিস।'

তপা মুখ দিয়ে 'ফুঃ' ধরনের আওয়াজ করল। বলল, 'মায়ের জন্য আর ওষুধ কেনার মানে হয় না বাবা। ফালতু পয়সা নষ্ট। কোনো কাজে লাগবে না। যেখানে পয়সা ঢাললে উপকার সেখানে ঢালো। মোটরবাইকটার ব্যবস্থা কর। গাড়ির রং কিন্তু আমি চয়েস করব বাবা। তুমি আবার রং কানা।'

এই ছেলের বাইরে থাকা উচিত নয়। এই ছেলের জায়গা হাজতে। শুধু

জামাই নয়, সঙ্গে তপাকেও কয়েকদিন জেলে ভরে রাখা দরকার। যে মেয়ে মাকে...। তবে সেসব তো রাগের কথা। শ্বশুর হয়ে জামাইকে সত্যি সত্যি জেলে দেখলে কেমন যেন লাগে। কিন্তু হারামজাদা হাজতে গেল কেন? লোক ঠকিয়ে? নাকি চুরি ছিনতাই? ডাকাতিও হতে পারে। কেমন ডাকাত ডাকাত চেহারা হয়েছে। অসম্ভব কিছু না। এই জন্মে যখন জালিয়াত হয়েছে, পরের জন্মে ডাকাত হতে অসুবিধে কী?

এটাই হল ফটিক মুন্সির সমস্যা। তিনি গল্প শুনেছেন, কেউ কেউ নাকি আগের জন্ম দেখতে পায়। জানতে পারে কে ছিলাম, কেমন ছিলাম। রাজাবাদশা? নাকি পথের ভিখিরি? রাজকন্যা? নাকি হারেমের দাসীবাঁদী? এদের বলে জাতিস্মর। তার হয়েছে উলটো! মাসখানেক ধরে মনে হচ্ছে, তিনি পরের জন্ম দেখতে পাচ্ছেন! যত দিন যাচ্ছে এই ধারণা মাথার ভেতর শিকড় গেঁড়ে বসছে। একে কী বলে? ফটিকবাবু জানেন না। বাপের জন্মে এমন কথা শোনেননি। ত্রিকালদর্শীরা মুনি ঋষি পর্যায়ের মানুষ। তিনি মুনিঋষি পর্যায়ের মানুষ নন। তাঁর কেন এমন মনে হবে? আরও সমস্যা হল, পরের জন্মে তিনি যে শুধু নিজেকেই দেখছেন এমন নয়। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে এই জন্মের অনেকেরই! তাদের কারো কারো অবস্থা অতি ভয়াবহ!

ঘটনা ঘটার প্রথম দিকে মনে হয়েছিল শরীর খারাপ। হজমের গোলমাল হলে আধা ঘুম, আধা জাগায় অনেক সময় হাবিজাবি স্বপ্ন আসে। মানে হয় না এমন সব স্বপ্ন। পরে দেখা গেল, ঘুম ছাড়াও দৃশ্য দেখা দিচ্ছে। চোখের সামনে অন্য সব কিছু মুছে গিয়ে ছবির মতো সেই দৃশ্য ভেসে উঠছে। খুবই অল্প সময়ের জন্য ভাসছে, তবু ভাসছে। লেখাপড়া খুব বেশি না-করলেও ফটিক মুন্সি জানেন, মানুষের স্বপ্নে কোনো রং থাকে না। স্বপ্ন হল পুরোনো কালের সিনেমার মতো। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। কিন্তু তিনি যা দেখতে পাচ্ছেন তাতে রং আছে। তাহলে? তাহলে তো স্বপ্ন নয়! অনেক ভাবনাচিন্তা করে ফটিকবাবু সিদ্ধান্তে এলেন গোটাটাই আসলে মনের ভুল। যে জিনিস হতে পারে না, তাই যদি হয় তাহলে সেটা ভুল ছাড়া কী? সুতরাং সমস্যা বড়ো কিছু নয়। মনকে কঠিন করলে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

জামাইকে ডাকাতবেশে দেখার পর ফটিকবাবু বুঝতে পারলেন, কিছুই ঠিক হয়নি। পরজন্ম-দর্শনে এবার ঘরের লোক নিয়েও টানাটানি শুরু হয়েছে। তার ভয় করছে। মাথার গোলমাল নয় তো? মনে হচ্ছে তাই। হলে কেলেঙ্কারি। চাকরিটাই চলে যাবে। অনেক কষ্টে চাকরিটা পেয়েছিলেন। সরকারি কাজে গোলমেলে মাথার লোক রাখার নিয়ম নেই। এক্ষেত্রে যেটুকু যা ছাড় আছে তা কেবল ওপরমহলে। নীচের দিকে সরকার খুবই কড়া। পাগলামির একটু লক্ষণ ধরা পড়লেই আগে চাকরি 'নট', তারপর অন্য কথা। তখন হবে বিরাট বিপদ। বড়োমেয়ে তপার বিয়ে হয়ে গেলেও ছেলে বিশু এখনো মানুষ হয়নি। হবে বলে মনেও হয় না। দু-বার হায়ার সেকেন্ডারিতে ফেল করেছে। চাকরিবাকরি করে যে বাবাকে সাহায্য করবে সে

আশায় ছাই। নেশা ভাং ধরেছে। পাড়ায় ফক্কুড়ি করে বেড়ায়। এখন বলছে বিজনেস করবে, টাকা চাই। এদিকে স্ত্রী মাধবীর শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। হাড়ের জটিল অসুখে টানা তিন বছর শয্যাশায়ী। গতবছর পর্যন্ত নিজে উঠে বাথরুম-টাথরুমে যেতে পারত। এ বছর থেকে তাও পারছে না। হাত পা নাড়তে যন্ত্রণা। চিকিৎসায় দেদার খরচ হচ্ছে। জোগান দিতে ফটিকবাবুর নাভিশ্বাস উঠছে। গলা পর্যন্ত ধার। ছেলে-মেয়েরা আগে বাড়িতে থাকলে মায়ের কিছু কিছু দেখাশোনা করত, এখন তিনবার ডাকলেও সাড়া দেয় না। তারা শুধু হাল ছেড়ে দেয়নি, মায়ের অসুখে খুবই বিরক্ত। মেয়ের মতো ছেলেও মনে করে, চিকিৎসায় ফালতু পয়সা নষ্ট হচ্ছে। এখনই সব 'স্টপ' করা উচিত। ফটিক মুন্সি এসব কথা শোনেন না। স্ত্রীর সেবাযত্ন সবই নিজের হাতে করেন। স্নান, খাওয়া থেকে শুরু করে গরমের সময়ে রাত জেগে হাতপাখা নাড়িয়ে হাওয়া করা পর্যন্ত। মহিলা সারাক্ষণই কান্নাকাটির মধ্যে থাকে। এও এক হ্যাপা। স্বামীকে বলে, 'বিষ এনে দাও, খেয়ে মরি। বিষ না দাও, আমাকে কোনো বিনিপয়সার হাসপাতালে ফেলে এসো। সেখানেই মেঝেতে শুয়ে মরব। তুমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।' যুক্তি দিয়ে দেখলে কথা মিথ্যে নয়। ফটিক মুন্সির বুদ্ধি কম বলে যুক্তি বুঝতে পারেন না। স্ত্রীকে ধমক দেন। বলেন, 'কোনটা বাঁচা, কোনটা মরা তুমি বুঝবে কী করে? মেয়েছেলের অত বুদ্ধি থাকলে তো হয়েই যেত। মেলা বকবক না-করে নাও হাঁ কর দেখি।' ভাত মেখে মুখের সামনে ধরেন। ছেলে উঁকি মেরে এই দৃশ্য দেখে মনে মনে বাবাকে বলে 'গাধা'।

এই অবস্থায় চাকরি চলে গেলে বিপদ ছাড়া আর কী? মহাবিপদ।

তাই ঘটনা কাউকে না বলার সিদ্ধান্ত বদলালেন ফটিক মুন্সি। তিনি দেখা করলেন জগদীশের সঙ্গে। জগদীশ তাঁর অফিসেই চাকরি করে, তবে ডিপার্টমেন্ট আলাদা। বয়েসে ছোটো হলেও এই ছেলেকে পছন্দ করেন ফটিকবাবু। আর পাঁচজনের মতো তাঁকে নিয়ে কখনো হাসি ঠাট্টা করে না। কাজের মাঝে ফাঁকফোকর পেলে কখনো সখনো তার কাছে গিয়ে দুটো সুখ দুঃখের কথা বলে আসেন ফটিকবাবু। ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে জগদীশকে সব ঘটনা বললেন। জগদীশের চোখ কপালে ওঠবার জোগাড়।

'বল কী হে ফটিকদা! কবে থেকে এই কাণ্ড হচ্ছে?'

'বললাম যে মেরেকেটে মাসখানেক।' ঢোক গিলে বললেন ফটিকবাবু।

জগদীশ ভুরু কুঁচকে বলল, 'ছবি, সিন সিনারি কি কেবল ঘুমের সময় দেখতে পাও?'

'না, জেগেই দেখি। এই তো পরশুদিন অফিস থেকে ফেরার সময় দেখলাম। বাস ধরতে জিপিওর পিছনে লাইন দিয়েছি। তখন দেখলাম।'

'কাকে দেখলে?'

'হঠাৎ চোখের সামনে সিনেমার মতো ফুটে উঠল। দেখি আমার বাড়িওলা, মুকুন্দবাবু চলেছেন। সঙ্গে ফ্যামিলি।'

জগদীশের শুধু ভুরু কুঁচকে যায়নি সে খানিকটা হাঁ-ও হয়ে গেছে। সেই হাঁ অবস্থাতেই বলল, 'কী দেখলে?'

ফটিকবাবু চোখ বুজে পুরো ছবিটা যেন মনে করার চেষ্টা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'ভালো কিছু দেখলাম না। দেখলাম মানুষটা স্ত্রী পুত্র নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথা গোঁজার ব্যবস্থা নেই। টাকা পয়সার অবস্থা করুণ। বাড়ি ভাড়া নেবে তার জো নেই। আমি বললাম, আসেন, সল্টলেকে বাড়ি করেছি। আমার বাড়িতে গিয়ে উঠবেন চলুন। তিনতলা বাড়ি, পুব দক্ষিণ খোলা, অল টাইম জল। কোনো অসুবিধে হবে না। আমাকে চিনতে ভদ্রলোকের সময় লাগল। খানিকটা বুড়ো হয়ে গেছে মনে হল। চোখের চশমাটায় আবার একটা ডাঁটি গোলমাল করছিল। ঝুলে ঝুলে পড়ছিল। আমাকে চেনার পর বললে, আপনার বাড়ি গিয়ে উঠতে লজ্জা লাগছে ফটিকবাবু। আমি বললাম, কেন? উনি বললেন, একসময়ে বাড়িওলা হিসেবে কী জ্বালাতনই না করেছি। জল দিতাম না। আপনার স্ত্রীর তখন খুব অসুখ। আমার খুবই খারাপ লাগল। হাত ধরে বললাম, লজ্জার কী আছে? সে তো এই জন্মের ব্যাপার নয়, আগের জন্মের ব্যাপার। পুরোনো জিনিস মনে রেখে লাভ কী? কোনো লাভ নেই। চলেন, আমার বাড়ি চলেন।'

'ভদ্রলোক গেলেন?' ফিসফিস করে বলল জগদীশ।

'তারপরই তো আমার হুঁশ ফিরে এল। আবার বাস ধরার লাইনে ফিরে গেলাম।'

জগদীশ লোহার নড়বড়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'মানে? আপনি আবার এই জন্মে ফিরে এলেন।'

ফটিক মুন্সি বিভ্রান্ত গলায় বললে, 'কে জানে, হয়তো তাই হবে।'

ফটিকবাবু এবার জগদীশের হাত চেপে ধরলেন। চাপা গলায় বললেন, 'ভাই, পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছি না তো? এই বয়েসে পাগল হয়ে গেলে বিরাট ঝামেলায় পড়ব। চাকরি চলে যাবে। ছেলে বউ নিয়ে পথে বসব। মাধবী তো পথে বসতেও পারবে না। বিছানা ছেড়ে নড়তে পারে না।'

জগদীশ এই উৎকণ্ঠার দিকে খেয়াল করল না। মুহূর্তখানেক স্থির চোখে ফটিক মুন্সির দিকে তাকিয়ে থাকল। ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বলল, 'আর কিছু দেখনি?'

ফটিক মুন্সি বললেন, 'দেখেছি তো, বেশ কয়েকটাই দেখেছি। সব মনে নেই, কিছু কিছু আছে। এই যেমন সেদিন আমার বাড়ির পাশের হাবিলদারটাকে নিয়ে দেখলাম। বেটা বিরাট নচ্ছার। রাস্তায় লরি, ঠেলা, রিকশ দেখতে পেলেই পয়সার জন্য হাত পাতে। যাই হোক একবার ধরা পড়ে সাসপেন্ড হল। পাড়ার সবাই বলল, বেশ হয়েছে। হারামজাদার চাকরিটাই যাওয়া উচিত। ওমা! এগারো দিনের মাথায় দেখি আবার যে-কে সেই। হাই লেভেলে ম্যানেজ মুনেজ করে ফের চাকরিতে ঢুকে পড়েছে। সরকারি ব্যাপারে ম্যানেজ কত সোজা সে তো তুমি জানই জগদীশ। এখন

দেখি আরও রমরমা। বারান্দায় সিল্কের লুঙ্গি পরে বসে বিদেশি সিগারেট ফোঁকে। আমাকে দেখলে ফিকফিক করে হাসে। সেদিন দেখি হারামজাদা বড়োবাজারের কাছে ঠেলা টানছে। ঠেলা ভরতি মাল।'

জগদীশ চোখ গোল করে বলল, 'কবে? পরজন্মে?'

ফটিক মুন্সি দুঃখিত মুখে বললেন, 'আমার হিসেব মতো তো তাই। বেটার চেহারাও বদলেছে। আগের সেই নাদুসনুদুস ভুঁড়িটা আর নেই। রোদে গায়ের রঙ পুড়ে ঝামা মেরে গেছে। আমার সঙ্গে কথাও হল। বললাম, কেমন আছ? কাজকর্ম ভালো চলছে? সে গামছা দিয়ে ঘাম মুছে বলল, ভালো নেই দাদা, পুলিশে বড়ো হুজ্জুতি করে। ঠেলা নিয়ে দু-পা এগোলেই পয়সা চায়। লালবাজারে আপনার জানাশোনা থাকলে একটু বলে দেন।'

বড্ড মায়া হল, বললাম, 'ঠিক আছে বলে দেব। দু-দিন আগে কমলের বউকে জড়িয়েও বড়ো দুঃখের জিনিস দেখেছি।'

জগদীশ অবাক গলায় বলল, 'কমল! মানে আপনার সেই ছোটোবেলার বন্ধু? আপনার বই, নোটস নিয়ে পড়াশোনা করে কলেজ পাশ করেছিল না? তারপর একসঙ্গে একটা বেসরকারি ফার্মে ঢুকলেন, প্যাঁচ কষে ও আপনার চাকরি খেল। সেই কমল? আপনিই তো গল্পটা বলেছিলেন ফটিকদা।'

ফটিক মুন্সি শুকনো হেসে বললেন, 'বলেছিলাম বুঝি? সবটা নিশ্চয় বলিনি। লজ্জার ঘটনা সব বলা যায় না। আসলে কী জানো জগদীশ, মাঝেমধ্যে মনে পড়লে যত না দুঃখ হয় তার থেকে বেশি অবাক লাগে। কমল কখনো এ কাজ করতে পারে ভাবতেও পারিনি। তখন চাকরিটার খুব দরকার ছিল আমার। কাজও খারাপ করছিলাম না। বুড়ো মালিক আমাকে পছন্দ করত। কমলের থেকে বেশিই করত। কী থেকে যে কী হয়ে গেল! একদিন দেখি ফর্সা রোগা একটা মেয়েকে নিয়ে কমল অফিসে এসেছে। মালিককে গদগদ গলায় বলল, স্যার, এ আপনার ভাবী বউমা। আপনার কাছে মাঝেমধ্যে আশীর্বাদ নিতে আসবে। আপনি না বলতে পারবেন না। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। কমলকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললাম, তুই বিয়ে করলি কবে? কমল চোখ টিপে বলল, করিনি, করব। দাঁড়া আগে কেরিয়ারটা গুছিয়ে নিই। সেই ফর্সা মেয়ে মাঝেমধ্যেই দুপুরে মালিকের কাছে আশীর্বাদ নিতে আসত। মালিক দরজা বন্ধ করে দিত। একদিন অফিসে গিয়ে দেখলাম, সেই মেয়ে আমার চেয়ারে বসে পা নাড়াতে নাড়াতে কাকে যেন ফোন করছে। আমাকে বলল, আপনি একটু বাইরে অপেক্ষা করুন। কাজটা সেরে নিই। আমি মালিকের কাছে গেলাম। মালিক বলল, আহা, কাজটা তো ওকে সারতে হবে। তুমি না হয় ততক্ষণ বাইরে একটু অপেক্ষাই করলে। যাও না এক কাপ চা খেয়ে এসো। কোনো প্রতিবাদ না করে আমি চা খেতে গেলাম। তবু ক-দিন পরে আমার চাকরিটা চলে গেল। বহু বছর আগে এক বিয়েবাড়িতে দেখা হয়েছিল ওদের সঙ্গে। কমল আর কমলের বউ। সেও প্রায় বছর বারো পনেরো আগের কথা। মেয়েটিকে চেনা যাচ্ছে না। বাড়াবাড়ি

রকম সেজেছে। চোখে-মুখে গাদাখানেক রং। কাঁধ থেকে আঁচল পড়ে যাচ্ছে ঘন ঘন। কমল বলল, এখন নাকি সেই কোম্পানির অনেকটা শেয়ার তার বউয়ের হাতে। বউ ব্যাবসা দেখছে।'

চুপ করে থেকে একটু বিরতি নিলেন ফটিক মুন্সি। বিড়বিড় করে বললেন, 'মেয়েটিকে সেদিন পরজন্মে দেখতে পেলাম। খুবই খারাপ অবস্থা বেচারির। বয়স হয়ে গেছে। মাথার চুল সাদা। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর যে দিকটায় খারাপ পাড়া শুরু হয়েছে তার কাছাকাছি ফুটপাথের ওপর বেলফুলের মালা আর পান সাজিয়ে বসেছে। আমাকে বলল, দাদা, একটা পান খান। বিক্রিবাটা ভালো নয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেল ফুলের মালা তো আমার লাগবে না, আমি পান নিতে হাত বাড়ালাম...।'

জগদীশ ফিসফিস করে বলল, 'ভালো কিছু? পরজন্মে কারো ভালো হয়েছে এমন কিছু দেখনি কখনো?'

ফটিকবাবু খানিকটা ভাবলেন। চায়ের খালি কাপটা তুলে তলানির পড়ে থাকা চা-টুকু পাক খাওয়ালেন বার কয়েক। তারপর অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'খুবই কম, এক-আধটা, তবে দেখেছি। মনাকে দেখেছি। এই জন্মে কষ্ট পেলেও পরজন্মে তার ভালো হয়েছে।'

'মনা! মনাটা আবার কে?' জগদীশ জ্বলজ্বলে চোখে বলল।

ফটিক মুন্সি আবার মুহূর্তখানেক চুপ করে রইলেন। সম্ভবত ভাবলেন, কথাটা বলা ঠিক হবে কি না। তারপর ফিসফিস করে বলতে শুরু করলেন।

'মনা আমাদের গ্রামের মেয়ে...একেবারে গরিব গুব্বো। তার ওপর আবার বাপ মরা। কাকা জ্যাঠার ঘরে মানুষ। খেটে খেটে মরত বেচারি। কলকাতা থেকে কলেজের ছুটিছাটায় যখন গ্রামের বাড়িতে যেতাম একবার না একবার ঠিক চলে আসত আমার কাছে...কালোর ওপর বড়ো বড়ো দুটো চোখ...বলত, ফটকেদা আমাকে একবার কলকাতা দেখাতে নিয়ে যেয়ো দিকি...। আমি বলতাম, হবে হবে। বুঝলে জগদীশ, আজ তোমাকে কিছুই লুকোব না। মনাকে না-দেখলে ছুটিটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগত আমার। একবার গ্রামে গিয়ে শুনি, মনার বিয়ে হয়ে গেছে। ভালো পাত্র পেয়ে কাকারা আর দেরি করেনি। পরে খবর পেলাম, মনার বিয়ে ভালো হয়নি। বেচারি গায়ে আগুন দিয়ে মরেছে। গ্রামে এ-রকম কত হয়। গায়ে আগুন, গলায় দড়ি রোজ হচ্ছে। মানুষ ভুলে যায়। আমিও মনাকে ভুলে গেলাম।'

ফটিকবাবু চুপ করলেন। জগদীশ নড়েচড়ে বসল। এই লোকের অবস্থা বিশেষ ভালো মনে হচ্ছে না। সাদাসিধা মানুষ, অফিসে যদি এই গল্প রটে তাহলে সত্যি সত্যি চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।

ফটিক মুন্সি বলতে লাগলেন—

'সপ্তাহ দুই আগে বাজার করতে গিয়ে সেই মনার সঙ্গে দেখা। ইয়া বড়ো একটা লাল রঙের গাড়ি, ঘ্যাচাং করে গায়ের কাছে এসে থামল। চমকে তাকিয়ে

দেখি, জানলা দিয়ে মনা মুখ বাড়িয়ে আছে। সেই কালো মুখে, সেই বড়ো বড়ো দুটো চোখ! মনা আনন্দে হাসছে। কী বলব জগদীশ, কী যে সুন্দর তাকে লাগছে! হাত বাড়িয়ে সে আমাকে ডাকল—অ্যাই ফটিকদা, ফটিকদা... দেখি গা ভরতি গয়না। আমি এগিয়ে এলাম। ব্যাস। তারপরই সবটা মিলিয়ে গেল... চোখের সামনে আবার এ জন্মের বাজার দোকান, এ জন্মের গাদা গাদা মানুষ। এসব কথা কাকে বলি বল দেখি? যে শুনবে সেই তো হাসবে। তোমায় জানি, তুমি ওদের মতো নয়। একটা কিছু উপায় বের করে দাও ভাই। মাথার গোলমাল হলে তো চাকরি যাবে।'

জগদীশ সোজা হয়ে বসল। বলল, 'মামার বাড়ি। চাকরি গেলেই হল? মাথার গোলমালই যে হয়েছে কে বলল তোমায়? আর যদি হয়েই থাকে, তুমি তো ইচ্ছে করে করনি। তুমি বরং এক কাজ কর ফটিকদা, কাল ফার্স্ট আওয়ারে চলে এসো। একজনের কাছে নিয়ে যাই, শুনি কী বলে।'

'ডাক্তার?'

জগদীশ চিন্তিত মুখে বলল, 'না ডাক্তার নয়। ইউনিয়নের লিডার। পোড় খাওয়া, দুঁদে লোক। সমস্যায় পড়লে যাই। কী করতে হবে পথ বাতলে দেয়।'

ফটিক মুন্সি অবাক হয়ে বললেন, 'লিডার দিয়ে কী হবে! এ তো তোমার পেনশন, প্রোমোশনের ব্যাপার নয় জগদীশ। পরজন্মের ব্যাপার, ইউনিয়ন কী করবে?'

জগদীশ কষ্ট করে হেসে বলল, 'উফ এইজন্যই তোমাকে সবাই বোকা বলে। ইউনিয়ন যেমন তোমার এ জন্ম কন্ট্রোল করছে, চেষ্টা করলে পরের জন্মেও কিছু ভুজুং ভাজুং করে দেবে। আরে বাবা, পাগল-টাগল বলে তোমার চাকরি নিয়ে যাতে টানাটানি না হয় তার জন্য আগে থেকে একটা গার্ড নিয়ে রাখা ভালো। লিডারদের ওপরমহলে খুব হাত। দেখব কোন শালা তোমার চাকরি খায়।'

সরকারি অফিসে দীর্ঘদিন চাকরি করলে মনের ওপর প্রভাব পড়ে। মন হয়ে যায় দোলাচলে ভরা। চট করে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। আবার অবিশ্বাসও করা যায় না। তবে সবার যে এমন হয় তা নয়। যেমন হয়নি ইউনিয়নের নেতা পল্লব গুঁইয়ের। দীর্ঘ চাকরি জীবন তার মনের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। শুধু প্রভাব ফেলেছে চেহারায়। তার যৌবনের বড়ো বড়ো দুটো চোখ ছোটো হতে হতে কুতকুতে টাইপ হয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় সবসময় আধবোজা হয়ে আছে। পল্লববাবু ঘোষণা করেছেন, রিটায়ারমেন্টের আগে তার দুটো চোখ পুরোপুরি বুঁজে যাবে। চোখ বোজা অবস্থাতেই তিনি অফিসে আসবেন। ফাইলও দেখবেন চোখ বুজে।

সেই পল্লব গুঁই আজ বহু বছর পর বড়ো বড়ো চোখে সামনের চেয়ারে বসে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছেন। লোকটার চেহারা চিমসে ধরনের। গাল চোয়াড়ে। জামা প্যান্ট, ক্যাম্বিসের জুতোয় বোঝা যায় এই লোক শুধু অভাবী নয়,

বোকাও। কিন্তু এই মুহূর্তে বোকা চালাক নিয়ে ভাবার সময় নেই পল্লব গুঁইয়ের। এর সম্পর্কে জগদীশের কাছ থেকে তিনি যা শুনেছেন, তার যদি এক শতাংশ সত্যি হয় তাহলে ব্যাপার মারাত্মক। মনে হয় না সত্যি। এ জিনিস সত্যি হওয়ার নয়। আশপাশ থেকে সবাইকে হটিয়ে দিয়েছেন পল্লব গুঁই। ফটিক মুন্সি নামের এই লোক তার কাছে আসেনি একবারও? বদলি, প্রোমোশন কিচ্ছু দরকার হয়নি? আশ্চর্য! গলা নামিয়ে দ্রুত প্রশ্ন শুরু করলেন পল্লব গুঁই।

'এসব যে পরজন্মের ঘটনা আপনি বুঝলেন কী করে?'

'যুক্তি কিছু নাই। মনে হয়।' বললেন ফটিক মুন্সি।

'যা দেখছেন তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

'না, করি না। সেইজন্যই তো ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে মাথার গোলমাল হয়েছে।'

জগদীশও নীচু গলায় বলল, 'দাদা, কী করা যায় বল তো? ঘটনা জানাজানি হলে তো মুশকিল। চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে। ফটিকদা বেঘোরে মরবে। কাঁধে বিরাট বোঝা। স্ত্রী অসুস্থ।'

পল্লব গুঁই ফটিকবাবুর ওপর থেকে চোখ না-সরিয়ে, নিজের গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'ওকে তুমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও জগদীশ। আমার চেনা ডাক্তারের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। ফোনও করে দেব। উনি লম্বা ছুটি দরকার বলে প্রেসক্রিপশন লিখে দেবেন। মনে হয়, এনার ক-টাদিন বাড়িতে থাকা ভালো।'

ফটিকবাবু নার্ভাস গলায় বললেন, 'কী জন্য লম্বা ছুটি লিখবে?'

পল্লব গুঁই মুচকি হেসে বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, ডাক্তার মাথার গোলমাল লিখবে না। অন্য একটা কিছু বানিয়ে লিখে দেবে। সেইজন্যই তো চেনা লোকের কাছে পাঠাচ্ছি। আর এদিকটা আমি ম্যানেজ করব। আপনার ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার তো দেবনাথ সেন। আমি পার্সোনালি কথা বলে রাখছি। লোক ভালো। আমাকে দাদা ডাকে। বড়ো কিছু ডিসিশন নেওয়ার আগে কথা বলে নেয়। আপনি কালই ছুটির দরখাস্ত নিয়ে দেবুর সঙ্গে দেখা করবেন। মিনিস্টারের রেকমেন্ডেশন থাকলে কেউ প্রশ্ন তুলবে না।'

ফটিক মুন্সি কৃতজ্ঞতা ভরা গলায় বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ।'

সত্যি কথা বলতে কী ফটিকবাবুর একটা লম্বা ছুটির দরকারও হয়ে পড়েছে। নিজের জন্য নয়, মাধবীর জন্য। মাধবীর শরীরটা আরও খারাপ হয়েছে। বাড়িতে একা থাকে। তপা আসা যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। বিশুও কোনো কোনো সময় দিন তিন-চারের জন্য উধাও হয়। জিজ্ঞেস করলে বলে, দীঘার কাছে হোটেল খোলার তোড়জোড় করছে। গত সপ্তাহে সে তার মাকে শাসিয়ে গেছে। বলেছে, টাকা লাগবে। বাবা যেন জোগাড় করে রাখে। নইলে ঘরের মালপত্র বেচবে। ছেলের হাবভাবে মাধবী দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে। একা থাকতে ভয় পায়। ওর পাশে কটাদিন থাকতে পারলে ভালো হত। সেই সুযোগ এসে গেল।

পল্লব গুঁইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে জগদীশ এক গাল হাসল। বলল, 'দেখলেন তো ফটিকদা, ঝট করে কেমন সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বলেছিলাম না পল্লব গুঁই হল ওস্তাদ লোক? শুধু দাদা কেন, কোন্ এক প্রতিমন্ত্রী শুনেছি ওকে মামা ডাকে। ভাগ্নে হয় না তবু ডাকে। তোমার গায়ে কে আঁচড় কাটবে? হা হা...।'

সন্ধেবেলা চেম্বারে বসে ডাক্তার মুখার্জি বললেন, 'কিস্স্যু হয়নি, সব ঠিক হয়ে যাবে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে এ-রকম হয়। দশ পনেরো দিন লম্বা ঘুম দিন, দেখবেন পরজন্ম, ইহজন্ম সব পালিয়েছে। আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। দরকার হলে পরে ডোজ বাড়াব। মনে হয় না বাড়াতে হবে।'

পরদিন ছুটির দরখাস্ত নিয়ে ঘরে ঢুকতেই মন্ত্রী অদ্ভুত চোখে তাকালেন। সেই চোখে বিস্ময়, অবিশ্বাস, ভয় সবই আছে! ফটিকবাবু আমতা আমতা গলায় বললেন, 'পল্লববাবু পাঠিয়েছে...।'

মন্ত্রী হাত বাড়িয়ে দরখাস্ত নিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি। আপনি আমার ডিপার্টমেন্টের স্টাফ আমি জানতাম না। আমার এখানে ক-দিন আছেন?'

ফটিক মুন্সি হাত কচলে বললেন, 'বেশি দিন নয়, তিন বছর। খুব সামান্য পদে আছি স্যার। আপনার চেনবার কথা নয়।'

মাথা নামিয়ে দরখাস্তে সই করতে করতে মন্ত্রী বললেন, 'আপনি তো জানেন এসব ছুটিছাটা আমার দেখার কথা নয়, কিন্তু পল্লবদা বলেছে...। আমি সেক্রেটারিকে স্পেশাল লিভের জন্য লিখে দিচ্ছি। আপনার কেসটাও স্পেশাল।' মন্ত্রী মুখ তুলে একটু যেন হাসলেন। সই করা দরখাস্তটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'চিন্তা করবেন না, এসব কেউ জানবে না। ডাক্তারবাবু তো লিখেছেন এক্সেসিভ পরিশ্রমে নার্ভে চাপ পড়ছে। রেস্ট নিতে হবে। আমি আপনার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি, অফিসেও আপনার রেকর্ড ভালো। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

ফটিক মুন্সি খুবই লজ্জা পেলেন। মন্ত্রী তার কাছ থেকে অনুমতি নিচ্ছে!

মন্ত্রী গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনি কি ইচ্ছেমতো কারো পরজন্ম দেখতে পারেন?'

ফটিকবাবু চমকে উঠলেন। তার মানে পল্লব গুঁই মন্ত্রীকে সব বলেছে। এখন আর লুকিয়ে লাভ নেই। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, 'ইচ্ছেমতো দেখা যায় কি না জানি না স্যার, কখনো চেষ্টা করিনি।'

'ইচ্ছে হয় না?'

ফটিক মুন্সি চুপ করে রইলেন। এ কেমন প্রশ্ন। যে সমস্যা থেকে তিনি বেরোতে চাইছেন সেখানে নিজেই আবার ঢুকতে যাবেন কেন! মাথা নামিয়ে বললেন, 'না, হয় না।'

মন্ত্রী সাদা তোয়ালে ঢাকা চেয়ারে হেলান দিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আপনাকে যে এবার একটু ইচ্ছে করতে হবে মুন্সিবাবু। জানেন তো এই ধরনের অসুখে ফিট সার্টিফিকেট ছাড়া অফিসে জয়েন

করতে দেওয়া হয় না। তাও আবার সরকারি ডাক্তার দেখবে। কঠিন নিয়মকানুন। নিয়ম তো হবেই, সরকারি কাজ তো আর পাগল ছাগলের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। রোগীর পাওনা টাকাপয়সাও আটকে যায়। ওয়ারিশন নিয়ে হাজার ঝামেলা। আপাতত আমি সেই ঝামেলা থেকে আপনাকে মুক্তি দিলাম। আপনার ভবিষ্যৎ দেখলাম। এবার ভাই আমার ভবিষ্যৎটা একটু দেখে দিন। গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি। ঘরে কেউ নেই। বলুন তো, আমার পরজন্মটা কেমন দেখছেন?'

নিজের তেলতেলে মুখটা তুলে মন্ত্রী ঝুঁকে বসলেন। ফটিকবাবু বুঝলেন মন্ত্রী তাকে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু এখন ভয় পেলে চলবে না। এখন সাহস ধরে রাখবার সময়। তিনি গলা নামিয়ে বললেন, 'এখনই পারব না, সময় লাগবে স্যার।' মন্ত্রী ফের হেলান দিলেন চেয়ারে। তীক্ষ্ণ চোখে ফটিক মুন্সির দিকে তাকিয়ে রইলেন অল্প সময়। তারপর হাতের দুই তালু ঘষতে ঘষতে বললেন, 'নিন, সময় নিন। দশ-পনেরো-কুড়ি দিন সময় নিন। আমি চাপ দিচ্ছি না। সিরিয়াস জিনিস সময় নিয়ে বলাই ভালো। তবে ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার আগে আমাকে বলতে হবে। অন্য কেউ জানবে না, শুধু আমি আর আপনি জানব। এইটা কিন্তু মনে রাখবেন মুন্সিবাবু।'

দশপনেরো দিন লাগল না। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে ভিড় বাসে ঘামতে ঘামতেই দুষ্প্রাপ্য জীবিকা ও কর্মবিনিয়োগ মন্ত্রীর পরজন্মের দৃশ্য দেখতে পেলেন ফটিক মুন্সি। মাত্র কয়েক মুহূর্তের দৃশ্য। কিন্তু ওটুকুই যথেষ্ট। মনে মনে খুব একচোট হাসলেন। না-হেসে উপায় কী? এ-জন্মের অমন বড়ো একটা মানুষকে যদি পরের জন্মে গিয়ে...।

না থাক, উনি কাউকে বলতে বারণ করেছেন। বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবেন না ফটিকবাবু।

বাড়ি পৌঁছে নিজের সমস্যার কথা চেপে গিয়ে মাধবীকে লম্বা ছুটির খবর জানালেন ফটিকবাবু। মাধবী খুব খুশি হল। বলল, 'বেশ হবে, ক-দিন তোমাকে সারাক্ষণ কাছে পাব।'

ফটিকবাবু উৎসাহী গলায় বললেন, 'কাছে পেলে তো শুধু হবে না, দেখ না, এই ক-দিন কেমন নার্সিং করি। তোমাকে আবার দাঁড় করিয়ে তবে ছাড়ব। ছুটিটাকে কাজে লাগাতে হবে।'

রুগ্ন মাধবী সুন্দর করে হেসে বলল, 'কচু পারবে। অ্যাই, একবার শোন এদিকে।'

অফিসের ব্যাগ ছাতা রেখে চিন্তিত মুখে খাটের পাশে সরে এলেন ফটিকবাবু। বললেন, 'কী হল আবার?'

মাধবী লাজুক মুখে বললেন, 'আমার একটা সমস্যা হয়েছে।'

খাটের ওপর বসে পড়লেন ফটিক মুন্সি। বললেন, 'সমস্যা!'

মাধবী ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। বলল, 'টেনশন করতে হবে না, বড়ো কিছু নয়, ছোটো সমস্যা। জান, আমি না পরের জন্ম দেখতে পেয়েছি!'

ফটিকবাবুর নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না। তিনি স্ত্রীর শীর্ণ হাতটা ধরলেন। বললেন, 'মাধবী এসব কী বলছ হাবিজাবি!'

'হ্যাঁ গো, সত্যি বলছি, একেবারে ছবির মতো দেখলাম। দেখলাম, পরের জন্মেও আমি আবার তোমার বউ হয়ে জন্মেছি। একইরকম অসুস্থ। শুয়ে আছি বিছানায়; আর তুমি ঠিক এইভাবে আমার হাত ধরে আছ। শরীরে খুব ব্যথা, কষ্ট, তবু কী যে ভালো লাগছিল!'

ফটিক মুন্সি দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। তার খুব ইচ্ছে করল বলেন—'এ তোমার মনের ভুল মাধবী। মনকে কঠিন কর, সব সমস্যা কেটে যাবে।' নিজেকে সামলালেন। থাক, কিছু কিছু মনের ভুল বড়ো সুন্দর। তাকে যত্ন করে রেখে দিতে হয়।

রাতে পড়া যাবে না



বিরাজ দত্তর ব্যাবসার বিরাট রমরমা অবস্থা। বীরভূমে দু-দুটো কোল্ড স্টোরেজ, বর্ধমান-বড়বাজার লাইনে তিনটে ট্রাক, মেচেদায় আলুর গোডাউন, ওল্ড দীঘায় হোটেল। এর ওপর পুরুলিয়া-বাঁকুড়া বর্ডারে খানিকটা জঙ্গল ইজারা নেওয়ার কথা প্রায় ফাইনাল। কেন্দু পাতার ব্যাবসা হবে। এই ব্যাবসায় বিরাট লাভ। সব মিলিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড। লোকে বলে, বিরাজ দত্তর বুদ্ধি খুব। বুদ্ধি খুব না-হলে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটানো যায় না।

কথাটা ঠিক, তবে পুরো ঠিক নয়। বুদ্ধি অনেকেরই থাকে। কিন্তু তারা সবাই বিরাজ দত্তর মতো হতে পারে না। আসলে বুদ্ধির সঙ্গে মানুষটার অতিরিক্ত একটা গুণ আছে। এই গুণ সবার থাকে না। গুণটা হল, উনি মানুষ চিনতে পারেন।

চিনতে পারেন বলেই এই গোপন কাজটা করার জন্য তিনি গঙ্গাকে বেছেছেন।

বিরাজ দত্তর হেড অফিস বর্ধমানে। গঙ্গা সেই অফিসের একজন নীচুতলার কর্মী। ঠান্ডা ধরণের ছেলে। বুদ্ধিসুদ্ধি বেশি কিছু নয়। বরং কমের দিকে। অফিসে তার নির্দিষ্ট কোনো পোস্ট নেই। পিয়োন নয়, আবার অনেকটা পিয়োনের মতো। এখানে ওখানে ফাইল-টাইল, চিঠিপত্র দেওয়া নেওয়া করে, ফাইফরমাশ খাটে। মালিক কোথাও ব্যাবসার কাজ দেখতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যায়। সেখানে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত দেখে। তাকে কখনোই বড়ো বা জটিল কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় না। ঝুঁকি কে নেবে? আসলে প্রতিটা কাজের জায়গাতেই এলেবেলে গোছের দু-একজন থাকে। যাকে বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করে না। গঙ্গা অনেকটা সে-রকম। কেউ কেউ বলে—এই ছেলে একটা বোঝা। ওর বদলে চালাকচতুর চটপটে কাউকে রাখলে অফিসের সুবিধে হত।

অন্যরা পছন্দ না-করলেও গঙ্গাকে পছন্দ করেন খোদ বিরাজ দত্ত। মুখে বলেন না, তবে মনে মনে জানেন। মানুষ চেনার ক্ষমতায় তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর

এই সামান্য কর্মচারীটি বোকাসোকা হতে পারে কিন্তু গুণ আছে। ছেলেটার লোভ নেই। সেইসঙ্গে খুবই অনুগত। দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যা বলবেন এই ছেলে তাই করবে। অন্য কর্মচারীরাও করবে। কিন্তু তারা করবে চাকরি বাঁচানোর জন্য। অথবা আরও যদি উন্নতি হয় সেই লোভে। গঙ্গা করবে নিঃস্বার্থভাবে।

এক শনিবার বিকেলে বিরাজ দত্ত গঙ্গাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন।

'তোমায় একটা কাজ করতে হবে গঙ্গা।'

'বলুন স্যার।'

'উত্তর দিঘিতে আমার দূর সম্পর্কের এক দিদি থাকে। একটা সময় আমার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তখন স্কুলে পড়ি। বাবা-মা দুজনেই দুম করে মারা গেলেন। থাকা-খাওয়ার কোনো জায়গা নেই। এই দিদি তখন আমাকে কিছুদিন তার কাছে রেখেছিল। পরে যোগাযোগ ছিঁড়ে যায়। খবর পেয়েছি, সেই দিদির মেয়ের বিয়ে। টাকাপয়সার খুব টানাটানি। আমি তাকে কিছু টাকা পাঠাতে চাই। পঞ্চাশ হাজার টাকা। আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু সে সময় আমার নেই। দিদিকে টাকা নেবার জন্য এখানে ডেকে পাঠানো মানে অপমান করা। আমি অন্য কারো হাত দিয়ে টাকাটা পাঠাতে পারতাম, কিন্তু সেটা চাইছি না। তাহলে পাঁচ কান হবে। একবার যদি জানাজানি হয়ে যায় যে আমি টাকা দিয়ে সাহায্য করছি, তাহলে সবাই এসে টাকা চাইবে। অফিসের সামনে লাইন পড়ে যাবে। আমি চাই বিষয়টা গোপন থাকুক। আমার কোনো কর্মচারী, আত্মীয়স্বজন কেউ জানবে না। কাজটা তুমি পারবে?'

গঙ্গা মাথা নামিয়ে বলল, 'আপনি হুকুম করলে অবশ্যই পারব।'

বিরাজ দত্ত উঠে গিয়ে আলমারি থেকে কাগজে মোড়া টাকার বাণ্ডিল বের করে গঙ্গার হাতে দিলেন।

'এটা একটা ব্যাগে ভরে রাখো। সাবধানে রাখবে।'

গঙ্গা টাকা নিয়ে বলল, 'তাহলে স্যার কাল সকালের বাসে রওনা হয়ে যাই?'

বিরাজ দত্ত বললেন, 'হ্যাঁ, কালই রওনা হবে। তবে বাসে নয়, গাড়িতে যাবে। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বে। সন্ধের মধ্যে পৌঁছে যাবে। একটা রাত দিদির ওখানে থেকে পরশু ফিরে আসবে। যদি মনে কর নাও থাকতে পার। রাতেই আবার ফেরার জন্য রওনা দিয়ো।'

গঙ্গা অবাক হয়ে বলল, 'গাড়ি! স্যার, আমি বাসেই চলে যেতে পারব।'

বিরাজ দত্ত চাপা গলায় ধমক দিলেন।

'আঃ, আমি যা বলছি সেটাই করবে। অতগুলো টাকা নিয়ে বাসে যাওয়া ঠিক হবে না। তবে চেনাজানা কোনো গাড়ি নেবে না। বাইরে থেকে ভাড়া করে নেবে। তাহলে এখানে কেউ জানতে পারবে না।'

গঙ্গা পরদিন ভোরে স্ট্যান্ড থেকে গাড়ি ভাড়া করল। ইচ্ছে করলে, চেনাজানা কোনো গাড়ি নিতে পারত। এখানকার কিছু ভাড়া খাটা গাড়ির মালিক, ড্রাইভারকে

সে চেনে। কিন্তু সে তা করল না। ঘটনা গোপন রাখার হুকুম আছে। চেনাদের সঙ্গে কোনো কারবার চলবে না। অচেনা একজন ড্রাইভারের সঙ্গে দরদাম ঠিক করে তার গাড়িতে উঠে বসল গঙ্গা। গাড়ি খুবই ফিটফাট। সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডার। মনে হচ্ছে মাত্র বছরখানেক হল কেনা হয়েছে। গঙ্গার মনে উত্তেজনা। উত্তেজনা দুটো কারণে। এক বহু বছর পর সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ পেয়েছে। এই কাজ ঠিকমতো করে তাকে প্রমাণ করতে হবে সে মোটেও এলেবেলে ছেলে নয়। সে-রকম দায়িত্ব পেলে পালন করতে জানে। আর দু-নম্বর হল, খোদ মালিক তাকে বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস না-করলে এতগুলো টাকা তার হাতে তুলে দিত না। বিরাজ দত্তর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল। চলন্ত গাড়ির পিছনে বসেই বিরাজ দত্তর উদ্দেশে সে কপালে হাত ঠেকাল।

হাইওয়ে দিয়ে ঘণ্টাখানেক ছোটার পরপরই 'ফিটফাট' গাড়ি গোলমাল করল। ড্রাইভার ছোকরা গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন পরীক্ষা করে বলল, 'কারবুরেটরে সমস্যা হয়েছে। কোনো চিন্তা নেই। এখনই ঠিক হয়ে যাবে।'

সত্যি সত্যি খুব তাড়াতাড়ি গাড়ি ঠিক হয়ে গেল এবং আবার ছুটতে শুরু করল। গঙ্গা বলল, 'আর একটু জোরে চালাও ভাই।' তার চিন্তা টাকা নিয়ে। দিনের আলো থাকতে থাকতে টাকাগুলো হাতে তুলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। ড্রাইভার স্পিড বাড়াল। না, অচেনা হলেও ড্রাইভার ছেলের হাত পাকা। দুটো বাস, একটা ট্রাককে নিখুঁত ভাবে ওভারটেক করল হর্ন না-বাজিয়েই। গঙ্গা সিটে মাথা এলিয়ে চোখ বুজল। এবার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

না, ঘুমিয়ে নেওয়া গেল না। একটু পরে গাড়ি আবার গোলমাল করল। এবার গোলমাল বড়ো। ব্রেকফেল।

২

'না, দেব না।'

মানুষটা মুখ না-তুলেই কথা বলল। তারপর যেমন কাজ করছিল, করতে লাগল নিজের মনে। গঙ্গা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পিছনে।

কাজ বলতে হ্যারিকেন পরিষ্কার। পিছনে দাঁড়িয়ে থেকেই গঙ্গা দেখতে পেল, হ্যারিকেন জং ধরা। মাথার কাছে সামান্য কাত হয়ে আছে। মনে হয় তুবড়ে গেছে। কাজ অতি সামান্য, কিন্তু আয়োজন বিরাট। হ্যারিকেনের বিভিন্ন অংশ খুলে ফেলা হয়েছে। চিমনি, হাতল, তেল ভরার মুখ, সলতে সব। সামনে ছড়ানো নানা ধরনের কাপড়ের টুকরো। সেগুলো দিয়ে অতি যত্নে ঘষামাজা চলছে। এত যত্ন দেখে গঙ্গার অবাক লাগল।

জিনিসটা যেন সামান্য হ্যারিকেন নয়, তার থেকে দামি কিছু!

গঙ্গা গলা খাঁকারি দিল। একবার, দু-বার। আবার বলল, 'দেখুন না, মাত্র একটা রাতের ব্যাপার।'

লোকটা এবার কোনো জবাব দিল না। সম্ভবত শুনতে পেল না। অথবা শুনতে পেলেও তাচ্ছিল্য করল। হাতের কাপড় হ্যারিকেনের গায়ে বোলাতে লাগল আগের মতো।

লোকটার বয়স বেশি নয়। মাঝারিই হবে। চল্লিশ বিয়াল্লিশ। কয়েক বছর কম বেশি হতে পারে। সাজপোশাকটা অন্যরকম। ঠিক এই জঙ্গুলে জায়গার সঙ্গে মানানসই নয়। পাড়াগাঁয়ের মানুষ সাধারণত পায়জামা পরে না। লুঙ্গি পরে। এই লোক পায়জামা পরেছে। পায়ের কাছে নীল বর্ডার দেওয়া সাদা পায়জামা। গায়ে কুর্তার মতো জামা। দুটোই কাচা, ধোপদুরস্ত। পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে, লোকটা এ বাড়ির হাবিজাবি কেউ নয়। সম্ভবত বাড়ির মালিক। মালিক না-হলে মালিকের খুব কাছের কেউ তো বটেই। কথাবার্তার ঢংও সে-রকম। ধমক দেওয়ার ভঙ্গি।

গঙ্গা গলায় কাকুতি-মিনতির ভাব এনে বলল, 'কাল সকাল হতে-না-হতেই চলে যাব। শুনলাম, ফার্স্ট বাস ছ-টার সময়। ছ-টা হোক, পাঁচটা হোক আমাকে ধরতেই হবে।'

এবারও কোনো উত্তর নেই। আচ্ছা সমস্যা তো! গঙ্গা কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

লোকটার চেহারা ভারীর দিকে। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। সেই চুলে পাক ধরেনি। ধরলেও চট করে চোখে পড়ছে না। শুধু উবু হয়ে বসার মধ্যে একটা বুড়োটে বুড়োটে ভাব। মাথা দুটো হাঁটুর মধ্যে খানিকটা ঝোঁকানো। একটু দুলছেও। মাথা দোলা বেশি বয়েসের লক্ষণ। মানুষটার বয়স বেশি নয়, তবু মাথা দুলছে কেন!

গঙ্গা বলল, 'সত্যি বলছি, ঠিক একটা রাতের ব্যাপার। আজকের রাতটুকু।'

লোকটা এবার একটু নড়ল। তারপর একইভাবে মুখ না তুলে কাটা কাটা গলায় বলল, 'আমি কী বললাম আপনি মনে হয় শুনতে পাননি। বললাম তো আমি ঘর ভাড়া দিই না। একটা রাত কেন এক ঘণ্টার জন্যও ভাড়া দিই না।'

'কেন দেন না জানতে পারি কি?'

'না, জানতে পারেন না।'

লোকটা বিরক্ত হচ্ছে। হোক বিরক্ত। গঙ্গার এখন খুশি, বিরক্তি কোনোটাই গায়ে মাখার অবস্থা নেই। একটু পরেই সন্ধে নামবে। তার আগে কোনো একটা ব্যবস্থা না-হলে বিরাট ঝামেলা। এই অচেনা অজানা শুনশান, জঙ্গুলে জায়গায় কোথায় রাত কাটাবে তা নিয়ে সে মোটেও চিন্তিত নয়। সে যেখানে খুশি থাকতে পারবে। গাছের তলাতে শুতে সমস্যা নেই, মাঠের ওপর থাকতে সমস্যা নেই। বাস যেখানে নামিয়ে দিল, সেই বড়ো রাস্তার ধারে একটাই মাত্র ঝুপড়ি। চায়ের দোকানের মতো। চাইলে সেখানেও থাকা যায়। কিন্তু সঙ্গে যে টাকা আছে। টাকা নিয়ে গাছের তলায়, মাঠে বা রাস্তার ধারে থাকা যাবে না। একটা ঘর লাগবে। তাতে দরজা লাগবে। সেই দরজায় যেন ছিটকিনি, খিল থাকে। বিরাজ দত্ত বলে

দিয়েছে সাবধানে থাকতে হবে। কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগটা সামনে এনে পেটের কাছে চেপে ধরল গঙ্গা। ঘরের জন্য চেষ্টা চালাতেই হবে। অন্য কোথাও যে যাবে সে-উপায় নেই।

'আপনি ঘর না-দিলে বিরাট সমস্যায় পড়ে যাব দাদা। ঘর লাগার কথা ছিল না। বর্ধমান থেকে সরাসরি গাড়িতেই আসছিলাম। মাঝপথে যে এ-রকম বিপদে পড়ব বুঝতে পারিনি। বর্ধমান পেরোতে-না-পেরোতে গাড়ি গেল বিগড়ে।'

হ্যারিকেন থেকে চোখ না-সরিয়ে রাগী গলায় লোকটা বলল, 'আমাকে এতসব কথা বলছেন কেন? আমি কি শুনতে চেয়েছি?'

লোকটার গলা কি একটু নাকি? না সর্দি-টর্দি কিছু হয়েছে? খোনা শোনাচ্ছে কেন?

গঙ্গা বোকা বোকা হেসে হাত কচলে বলল, 'না, শুনতে চাননি, তবু বলছি। যদি আমার সমস্যাটা বুঝতে পারেন। আমার মনে হচ্ছে, বুঝতে পারবেন। গাড়ি থেমে যাওয়ার পর ড্রাইভার পরীক্ষা-টরীক্ষা করে বলল, কারবুরেটরে সমস্যা হয়েছে। ড্রাইভার ছোকরা কাজের। সেই সমস্যা সারিয়ে গাড়ি চালু করল খুব তাড়াতাড়ি। তারপর জোরে ছুটছিলাম। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আবার সমস্যা। এবার বড়ো ঘটনা। একেবারে ব্রেকফেল। আমি দেরি করিনি। ওখান থেকেই বাস ধরলাম। কনডাক্টর বলল বাস উত্তর দিঘি যাবে না। আমি বললাম, যত দূর যায় ততটা যাব। সেখান থেকে না হয় উত্তর দিঘির বাস ধরা যাবে। সেই বাসও গোলমাল করল। বাসে নয়, গোলমাল করল পথে। কোথায় যেন অবরোধ-টবরোধ ছিল। সব মিলিয়ে তিন-সাড়ে তিন ঘণ্টার লেট হয়ে গেলাম। সেই বাস এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল ঘুরে। বলল, এখান থেকেই উত্তর দিঘির বাস পাওয়া যাবে।'

হ্যরিকেনের চিমনির ভেতর কাপড় ঢুকিয়ে আলগোছে হাত ঘোরাতে লাগল লোকটা। থমথমে গলায় বলল, 'উত্তর দিঘির বাস ধরে চলে গেলেই পারতেন। আমি তো আপনাকে সমস্যায় ফেলিনি।'

গঙ্গা স্বস্তি বোধ করল। এতক্ষণে মনে হচ্ছে, ম্যানেজ করা গেলেও যেতে পারে। তবে লোকটা মুখ ঘোরালে আরও সুবিধে হত। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যেত। চোখের দিকে তাকালে মানুষের মনকে প্রভাবিত করতে সুবিধে হয়। লোকটাও হয়তো তার মুখ দেখে ঘর দেওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পারত। গঙ্গা নতুন উদ্যমে শুরু করল।

'ছি ছি, আপনি কেন সমস্যায় ফেলবেন? গাড়িটা ব্রেকফেল না-করলে...।'

শেষ বিকেলের হলদেটে মরা আলো এসে পড়েছে উঠোনে। সেই আলোর মধ্যে একটা থম ভরা ভাব। উঠোনের একদিকে লম্বা ছায়া। টিনের চালার ছায়া। চারপাশে জঙ্গলের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাছপালাগুলো চুপচাপ। ওরা কি একটু বেশি চুপচাপ? নাকি এসব জায়গায় এমনটাই হয়? ভাঙা লোহার গেট খুলে ঝোপঝাড় টপকে ঢুকতে ঢুকতেই গঙ্গা বুঝেছিল, বাড়িটা অন্যরকম। লম্বাটে টিনের

চাল সামনের দিকটা ঢালু হয়ে এসেছে। খান চারেক ঘর। অনেকটা স্কুলবাড়ির মতো। একটা ছাড়া সব ঘরে তালা ঝুলছে।

যদিও এটা কোনো স্কুলবাড়ি নয়। এটা একটা বাতিল হয়ে যাওয়া হেল্‌থ সেন্টার। বাংলায় যাকে বলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বহু বছরের পুরোনো। মিশনারিরা বানিয়েছিল। এই দুর্গম জায়গায় চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। তখন এখানে কিছু লোকজন থাকত। একসময় এখান থেকে বসতি উঠে গেল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রও বন্ধ হল। পরে বাড়িটার অনেকগুলো হাত বদল হয়েছে। বছরের পর বছর থেকেছে তালাবন্ধ অবস্থায়। মাস দু-তিন হল আবার একজনকে এই বাড়িতে দেখা যাচ্ছে।

গঙ্গাকে এত খবর দিয়েছে বাস রাস্তার ধারে যে একমাত্র চায়ের দোকানটা আছে তার মালিক। দোকান না-বলে ঝুপড়ি বলা উচিত। তাঁকে নামিয়ে চলে যাওয়ার সময় বাসের কনডাক্টর বলল, উত্তর দিঘির বাস এখান থেকেই পাবে। এটা হল ইটাকান্ডির মোড়। যাও ওই চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাক। বাস এলে উঠবে।'

ঝুপড়ি চায়ের দোকানে ঢুকে চা চাইতে দোকানদার বলল, চা হবে না। এখানে আর লোকজন নেই। সে দোকান বন্ধ করে চলে যাবে। গঙ্গা আঁতকে উঠল। তাহলে উত্তর দিঘির বাস? তাও চলে গেছে। কাল সকালের আগে কিছু নেই। মাথায় বাজ পড়ল গঙ্গার। এখন উপায়! এতগুলো টাকা সঙ্গে? দোকানদার ঠান্ডা গলায় জানাল, এই ইটাকাণ্ডি জায়গাটা মোটেও ভালো নয়। আশেপাশে তিন কিলোমিটারের মধ্যে কোনো ঘরবাড়ি নেই। খানিকটা জঙ্গল, খানিকটা রুক্ষ জমি। পুরোনো দিনের ভেঙে পড়া দু-একটা বাড়ি-টাড়ি পাওয়া যেতে পারে। সেখানে দরজা-জানলা কিছু নেই। সাপ বাদুড়ের আস্তানা। এলাকাটাও খারাপ। ডাকাতের উপদ্রব। কেউ ভুল করে চলে এলে সব খুইয়ে যেতে হয়। গঙ্গা পড়ল ভীষণ চিন্তায়। সে একা থাকতে পারে, কিন্তু এতগুলো টাকা নিয়ে ভাঙা বাড়িতে থাকা যাবে না। দোকানদারকে সে অনুরোধ করল তার বাড়িতে যাওয়া যাবে কি না। দোকানদার বলে সে আজ নিজের বাড়ি যাবে না। মুকুন্দপুরে শ্বশুরবাড়ি যাবে। গঙ্গা যদি চায় তার সঙ্গে যেতে পারে। তবে মুকুন্দপুর হল উত্তর দিঘির উলটো পথ। বাসও এখান থেকে পাওয়া যাবে না। দু-কিলোমিটার সাইকেলে যেতে হবে। সাইকেল জমা রেখে বাস ধরতে হবে। গঙ্গা রাজি হয়নি। রাজি হলে চলবে কী করে? উত্তর দিঘি থেকে আরও দূরে সরে যাবে যে। তখন দোকানদারই এই বাড়ির সন্ধান দিল।

'মাইলখানেক হাঁটলে একটা বাড়ি পাবে। ঠিক বাড়ি নয়, পুরোনো হাসপাতাল। তোমরা যাকে বল হেল্‌থ সেন্টার। সেসব অনেকদিন উঠে গেছে। বাড়িটা বহু বছর ফাঁকা পড়ে আছে। শুনেছি, কে নাকি ওখানে এসে উঠেছে। বাড়িটা কিনেছে না নিজে থেকে দখল নিয়েছে কে জানে। তোমার যখন বাড়িতে থাকার এত দরকার একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো। একটা রাতের তো মামলা। তবে...।'

গঙ্গা বলল, 'তবে কী?'

'শুনেছি, সেই লোকের নাকি গোলমাল আছে। সহজে কেউ ওদিকে যায় না। বাড়িটা এড়িয়ে চলে। পুরোনো হাসপাতাল তো। কত লোক ওখানে মরেছে...। লোকে বলে তারা নাকি এখনো ওই বাড়িতে আছে। ঘুর ঘুর করে। যে-লোকটা বাড়িটা দখল নিয়েছে তাকে নিয়েও সন্দেহ।'

গঙ্গা হেসে বলল, 'ভূতের কথা বলছ নাকি ভাই? না, ওসবে আমার ভয় নেই। আগে ছিল, এখন নেই। যে-কাজে বেরিয়েছি তাতে ভূতের থেকে চোর ডাকাতে ভয় বেশি।'

দোকানদার ভুরু কুঁচকে বলল, 'সেটাই তো সমস্যা। শুনেছি ডাকাতরাও ওই বাড়ির দিকে পা বাড়ায় না। কারণ বলতে পারব না। মনে হয় তারাও ভয় পায়।'

গঙ্গা তখনই মনে মনে ঠিক করল, সে এই পোড়ো হেলথ সেন্টারেই রাতটা কাটাবে। যে-লোক আছে তাকে ম্যানেজ করবে। প্রথমে কাকুতিমিনতি করবে, কাজ না হলে টাকার লোভ দেখাবে। মাঠ, জংলি, পথ, ইট পাথরে ঢাকা রেললাইন পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়িটায় হাজির হল।

গঙ্গা এবার গলা তুলে বলল, 'ভাড়ার যে টাকা বলবেন তাই দেব। একশো? দুশো? আড়াই শো...।'

পিছন ফিরে বসা লোকটা হিসহিসে গলায় বলল, 'টাকার লোভ দেখাচ্ছ? তোমার তো সাহস কম নয় ছোকরা।'

'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধনে নেমে গেছে লোকটা! নিশ্চয় খুব রেগেছে। রাগুক। গঙ্গাও মরিয়া হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। এবার এসপার-ওসপার একটা কিছু হওয়া দরকার। একেই পথে এত ঝামেলা, তার ওপর টাকাটাও যদি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া না-যায় তাহলে সব যাবে। বিরাজ দত্তর কাছে মুখ দেখানো যাবে না। অফিসে জানাজানি হবে। সবাই বলবে, একে কাজটা দেওয়াই ভুল হয়েছে। দেখ বেটা নিজেই টাকাগুলো হাতিয়ে বসে আছে।

গঙ্গা গলা খাঁকারি দিল আবার। তারপর বলল, 'তা দাদা, সাহস একটু বেশিই আমার। আগে ছিল না, এখন হয়েছে। বড়ো একটা কাজের দায়িত্ব পেয়েছি কিনা। ভয় পেলে চলবে কেন?'

কথা শেষ করে সহজভাবে হাসার চেষ্টা করল গঙ্গা।

লোকটা এবার হ্যারিকেন মোছা বন্ধ করল। পিছন ফেরা অবস্থাতেই বলল, 'বাঃ, কথাটা তো নতুন শুনছি। ভয় পায় না এমন কাউকে তো আজকাল চোখেও পড়ে না। সত্যি তুমি ভয় পাও না!'

কথাটা বলার মধ্যে মৃদু ঠাট্টার সুর রয়েছে।

গঙ্গা দাঁত কামড়ে বলল, 'বললাম যে আগে পেতাম। এখন পাই না।'

'শুনি আমাকেই তো সবাই ভয় পায়। এমনকী চোর ডাকাতও নাকি পায়। হা হা।'

লোকটা হাসল।

'কেন?' গঙ্গা গল্প জমানোর চেষ্টা করে। সে নিশ্চিন্ত লোকটাকে ম্যানেজ করা হয়ে গেছে। নইলে রাগ বিরক্তি থেকে সরে গিয়ে এভাবে হাসত না। এবার ঘর খুলে দেবে। হালকা অন্ধকার ঝুঁকে পড়েছে বাড়ির ওপরে। সব কিছু ছায়া ছায়া লাগছে। উবু হয়ে বসা লোকটাকেও।

'কেন আমাকে ভয় পায়? আমি ঠিক জানি না, তবে শুনেছি ওরা বলে আমি নাকি মরা মানুষদের সঙ্গে থাকি।'

গঙ্গা আওয়াজ করে হেসে উঠল।

লোকটা হ্যারিকেনে চিমনি লাগাতে লাগাতে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'হেসো না ছোকরা। কথাটা পুরো মিথ্যে নয়। ওই বাড়িতে অনেক মানুষ যেমন চিকিচ্ছে পেয়ে বেঁচেছে, তেমন মরেছেও অনেকে। অসুখবিসুখে তো মরতেই হয়। সব আত্মা যেতে পারেনি। তারা এখানেই থাকে। আমার সঙ্গে থাকে। হা হা...। আমি নাকি বাড়িটা কিনেইছি ওদের সঙ্গে থাকব বলে।'

গঙ্গা হাসল। বলল, 'আমিও থাকব।'

হাসি থামিয়ে লোকটা খানিকটা আপনমনে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। খানিকটা দেরি হল এই যা।'

গঙ্গা বলল, 'আপনি কি আমাকে একটা ঘর খুলে দেবেন? অন্ধকার হতে চলল।'

'হ্যাঁ, দেব। দাঁড়াও আর একটু অন্ধকার হোক।'

আরও কিছুটা সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল গঙ্গা। অন্য কেউ হলে গা ছম ছম করত। গঙ্গার করছে না। দু-হাত দিয়ে বুকের ওপর সে ব্যাগটা চেপে ধরে আছে। গা ছমছম করার সুযোগ কোথায় তার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘরে ঢুকে ঘরে খিল দিতে হবে।

অন্ধকার ঘন হচ্ছে। কোথায় যেন প্যাঁচার মতো কী-একটা ডেকে উঠল তীক্ষ্ণ গলায়। পাশের ঝাপসা গাছটা থেকে ঝটপট আওয়াজ করে উঠে গেল কোন রাতপাখি। কটা বাদুড় গোত্তা মেরে চলে গেল বারান্দায়। চাপ চাপ অন্ধকার ফেলে গেল। লোকটা হ্যারিকেনের সব কিছুই লাগিয়ে ফেলেছে। এবার নিশ্চয় জ্বালাবে না। না, জ্বালাল না। হাতলটা ঝুলিয়ে ধরল শুধু। হঠাৎ দেখলে মনে হচ্ছে, খানিকটা অন্ধকার হাতে নিয়েছে।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাল। মুখে আলাদা কিছু নেই। আর পাঁচজনের মতোই। অন্ধকারেই দেখা যাচ্ছে, দিন কয়েকের না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোয়াড়ে গাল, লম্বা নাক। শুধু চোখ দুটো মারাত্মক। ভয়ংকর। গর্তে ঢোকা। জ্বলজ্বলে। মণিদুটো নড়ে না, পাথরের মতো। গা শিরশির করে ওঠে। মনে হয়, এই চোখ মানুষের নয়! এই চোখ অন্য কিছু, অন্য কারোর!

লোকটার ঠোঁটের কোনায় একটু হাসি। গঙ্গাও হাসল।

'এসো, তোমার জন্য ঘর খুলে দিই।'

লোকটার গলায় আতিথেয়তার সুর! যে খানিকক্ষণ আগেও রেগে, বিরক্ত হয়ে গঙ্গাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছিল, তার গলাই এখন নরম! এত যত্ন করে কথা বলছে!

একেবারে কোনার ঘরটার তালা খুলতে খুলতে লোকটা নীচু গলায় বলল, 'চিনতে দেরি হয়ে গেল। অন্ধকার না হলে চিনতে পারি না। কিছু মনে করো না।'

কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনালেও গঙ্গা বিড়বিড় করে বলল, 'ও কিছু না।'

বিরাজ দত্তর কাছে খবরটা পৌঁছোতে ঠিক একটা দিন দেরি হল।

হাইওয়েতে ব্রেকফেল করা সাদা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি ট্রাকে ধাক্কা মেরেছে মুখোমুখি। ড্রাইভার এবং যাত্রী দুজনেই ঘটনাস্থলে মারা গেছে। ড্রাইভারের মুখ বোঝা গেলেও, যাত্রীকে চেনা যায়নি। বর্ধমান পুলিশ মর্গে গিয়ে বিরাজ দত্ত তাকে শনাক্ত করলেন। ঘুড়ি, মানি ব্যাগ, পেন সব পাওয়া গেল। শুধু পঞ্চাশ হাজার টাকা ভরতি ব্যাগটা পাওয়া গেল না।

অফিসে ফিরে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে উত্তর দিঘি থেকে বিরাজ দত্তর কাছে ফোন এল। ফোন করছে তার দূর সম্পর্কের দিদি।

'এই মাত্র তোর পাঠানো টাকা পেলাম বিজু। বড়ো উপকার করলি। টাকার অভাবে মেয়েটার বিয়েই আটকে যাচ্ছিল।'

বিরাজ দত্ত থমথমে গলায় বলল, 'গঙ্গা? গঙ্গা কোথায়?'

'এই তো মিনিট কুড়ি আগে রওনা দিল। কত বললাম, খেয়ে যাও। শুনল না। বলল, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বর্ধমান ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। চিন্তা করিস না রাতের মধ্যে পৌঁছে যাবে বলেছে।'

বাণপ্রস্থ



'চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।/ সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর, নির্জনসজন সঙ্গে রহো...।'

জগন্নাথ কয়াল ভুরু কুঁচকোলেন। গান কোথায় বাজাচ্ছে? মন্দিরা কি অন্যদিনের মতো আজও টিভি খুলেছে?

না টিভি খোলেনি, ড্রয়িংরুমে সিডি প্লেয়ার চলছে। শুধু চলছে না, চড়া ভল্যুমে চলছে। জগন্নাথ কয়াল ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন। সেই নিশ্বাসে রাগ এবং হতাশা দুটোই আছে। উফ, আজকের দিনটাও এরা গান-বাজনা বাদ দিতে পারল না? আশ্চর্য! শুধু ভুরু নয়, জগন্নাথবাবুর চোখ, নাক সব কুঁচকে গেল। সকাল হতে-না-হতে এত ঘটা করে রবীন্দ্রসংগীত বাজানোর কী হয়েছে? রোজ এই কাণ্ড শুরু হয়েছে। সকাল হতে-না-হতে গাঁক গাঁক করে রবীন্দ্রসংগীত শুরু হবে। কেন? এই বাড়ি কি রবীন্দ্রসংগীতের আখড়া? শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ? যতসব ফাজলামি। বয়স যত বাড়ছে মন্দিরার ফাজলামি বাড়ছে। ইদানীং ছোটো মেয়ে রুনা মায়ের সঙ্গে ফাজলামিতে যোগ দিয়েছে। বড়োমেয়ে ঝুমার বিয়ে হয়ে গেছে, নইলে সেও এই হুল্লোড়ে মা বোনের সঙ্গে হাত মেলাত। হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেলাতো। জগন্নাথবাবু লক্ষ করে দেখছেন, এদের টাইপটাই এ-রকম। নিজেদের মধ্যে নানাধরনের ঠোকাঠুকি আছে। ঝগড়া, কথা বন্ধ, মান অভিমান কিচ্ছু বাদ যায় না। কিন্তু যেকোনো ধরনের হুল্লোড়ে এককাট্টা।

জগন্নাথবাবু কাউকে বিশ্বাস করেন না। আগে করতেন। গভীরভাবে করতেন। অবসরের একবছরের মাথায় অনুভব করেছেন, তিনি ভুল করতেন। সংসার বিশ্বাসের জিনিস নয়, সংসার অবিশ্বাসের জিনিস। তার কোনো মায়া নেই। সে নিষ্ঠুর। কঠিন ধরনের নিষ্ঠুর। নইলে আজকের মতো একটা শোকের দিনে মা-মেয়ে বাড়িতে নৃত্যগীতের আসর বসাতে পারে! অবশ্য ওরা আদৌ দিনটা শোকের বলে

মনে করছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। মনে হয় না করছে। কথাটা ভেবে জগন্নাথবাবুর রাগ আরও বাড়ল। হাতে যদি ক্ষমতা থাকত আজ থেকে তিনি সকালবেলা রবীন্দ্রসংগীত বাজানো নিষিদ্ধ করে দিতেন। এর জন্য আলাদা পুলিশবাহিনী থাকত। জঙ্গি প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড আছে, তেমন এটা হত অ্যান্টি টেগোর সং স্কোয়াড। রবীন্দ্রসংগীত শুনলেই হেভি ফাইন। হেভি ফাইন ছাড়া এধরনের ফুর্তি বন্ধ করার অন্য কোনো পথ নেই।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এ-রকম কোনো ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই। কোনোদিন হবেও না। জগন্নাথ কয়াল গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। না, তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঠিকই নিয়েছেন। বেটার লেট দ্যান নেভার।

বাড়ির ছোটো মেয়ে হলেও রুনা বালিকা নয়। আজ বাদে কাল সে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। সকাল থেকে গান-বাজনায় মেতে থাকার মতো সময় তার থাকার কথা নয়। জগন্নাথবাবুর ইচ্ছে করছে মেয়েকে ঘরে ডেকে পাঠান। তারপর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করেন—'মা রুনা, যতদূর জানতাম তোমার ফাইনাল পরীক্ষার সাবজেক্ট রবীন্দ্রসংগীত নয়, হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স সঙ্গে ইলেকটিভ ইংলিশ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি ভুল জানি। তোমার কী মনে হয় সত্যি কি আমি ভুল জানি?'

গানের ভল্যুম আরও বাড়ছে।

'অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, অবলের বল...।'

জগন্নাথবাবু মুখ দিয়ে চাপা 'হুঁ' ধরনের আওয়াজ করলেন। একটা বয়স পর্যন্ত মানুষ রাগ হলে হাত পা ছোড়ে। আর একটু বড়ো হলে লাফাঝাঁপি চলতে পারে। তার বেশি হলে জলের গ্লাস, চায়ের কাপ ভাঙলেও নরম্যাল। কিন্তু একষট্টি বছর বয়স হয়ে গেলে এ ধরনের কোনো কাজই পারা যায় না। তখন সামান্য নড়াচড়া করেই নিজের রাগ প্রকাশ করতে হয়। যতটা না রাগ তার থেকে বেশি অভিমান। অভিমান অতি বিষম বস্তু। বেশিরভাগ সময়েই যার উদ্দেশে করা হয় সে বুঝতে পারে না। ছেলেমানুষ হলে তাও একটা চান্স থাকে। ঠিকমতো মুখ ভেটকে ঠোঁট ফোলাতে পারলে 'চুনু মুনু' বলে বড়োরা ছুটে আসে। গাল টিপে দেয়। একষট্টি বছরের একজন বৃদ্ধ ঠোঁট ফোলাতে পারেন না। পারলেও কে তাকে 'চুনু মুনু' বলে গাল টিপে দেবে? তখন নিজের অভিমান নিজেকে নিয়ে বসে থাকতে হয়।

জগন্নাথবাবু চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। অভিমানের কথা মাথায় আসতে মনে মনে নিজেকে ধমক দিলেন। ফুঃ, কীসের অভিমান? কার কাছে অভিমান? যারা জানে আর মাত্র কয়েকঘণ্টা পরই মানুষটা...জানার পরও খোশ মেজাজে 'অধন', 'অনাথ', 'অবল' শুনতে পারে, তাদের কাছে অভিমান? বয়ে গেছে। দুর, দুর। হাতে খুলে ধরা খবরের কাগজে মন দিতে চেষ্টা করলেন জগন্নাথবাবু। আর তো মাত্র কয়েকঘণ্টার মামলা। তারপর কোথায় চিরসখা? কোথায় অনাথের নাথ? মাধবী, রুনা, ঝুমা, ভবানীপুরে এই বাড়ি—সব মায়ার খেলা হয়ে যাবে। যত খুশি গান

বাজাক। মাইক এনে একটার পর একটা সিডি চালাক এরা। কোনো অসুবিধে নেই। পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি—...একটার পর একটা পর্যায় বাজাতে থাকুক। পুরো গীতবিতান শেষ করে ফেলুক। কী এসে যায়? কিচ্ছু এসে যায় না।

রাগ, অভিমান, হতাশা মিলে শরীরের ভেতরে বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছে জগন্নাথ কয়ালের। সুড়সুড়ি ধরনের অনুভূতি। সেখান থেকে মুক্তি পেতে লম্বা করে নাক টানলেন। মুক্তি হল না। সুড়সুড়ি যেন বাড়ল। হাতে খবরের কাগজ নিয়ে চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগলেন। অন্যদিন হলে তিনি এই সময়টায় ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসেন। দ্বিতীয় কাপ চা খান। আজ বসেননি। মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে সটান নিজের ঘরেই ঢুকেছেন। জানলার পাশে রাখা শক্ত কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। এই চেয়ার মন্দিরাদেবীর। রুনা, ঝুমা এই চেয়ারের নাম দিয়েছে 'ব্যথা চেয়ার'। মন্দিরাদেবীর মাঝেমধ্যে স্পন্ডেলিসিসের ব্যথা ওঠে। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছেন, শক্ত কাঠের চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসে থাকবেন। মন্দিরাদেবী তাই ব্যথা উঠলে এই চেয়ারে টান টান হয়ে বসে থাকেন। সেই কারণে 'ব্যথা চেয়ার'। মন্দিরাদেবী চুপ করে বসে থাকেন না। ব্যথা চেয়ারে বসেই সংসার পরিচালনা করেন। চেঁচিয়ে রান্নার রেসিপি বলেন। রতনের মা রান্নাঘর থেকে সেই রেসিপি শুনে কড়াইতে ঝাল, মশলা, ফোড়ন দেয়। অনিবার্যভাবে রেসিপিতে বিপর্যয় ঘটে। কোনো উপায় থাকে না। ব্যথার কারণে চেয়ার নাড়াচাড়া করা যায় না। মন্দিরাদেবীও সংসার পরিচালনা বন্ধ রাখতে পারেন না। জগন্নাথবাবু সেই ব্যথা চেয়ারে বসে আছেন। প্রায় আধঘণ্টা হল বসে আছেন। ভেবেছিলেন মন্দিরা ঘরে আসবে এবং এই বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইবে। মা না-আসুক মেয়ে রুনা অন্তত আসবে।

'বাবা, তোমার কি শরীর খারাপ?'

জগন্নাথবাবু চুপ করে থাকবেন। রুনা আবার জিজ্ঞেস করবে, 'কী হল বাবা? উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমার কি মায়ের মতো স্পন্ডেলিসিসের ব্যথা উঠেছে।'

'কেন? ব্যথা উঠতে যাবে কেন?'

'না, ব্যথা চেয়ারে বসে আছ তো সেই কারণে জিজ্ঞেস করছি।' কথা বলে রুনা ফিক করে হাসবে। এই মেয়ের ছোট্ট দুটো গজ দাঁত আছে। হাসলে ভারি সুন্দর লাগে। জগন্নাথবাবুর ইচ্ছে করবে মেয়ের হাসির দিকে তাকিয়ে থাকতে। কিন্তু তা করবেন না। তাকিয়ে থাকলে মেয়ে ধরে ফেলবে, বাবা তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। সে আশকারা পেয়ে যাবে। সুতরাং তা করা যাবে না। তাকে থমথমে মুখে বলতে হবে, 'রসিকতা না-করে এখন এখান থেকে যাও।'

রুনা এগিয়ে এসে তার বাবার পিছনে দাঁড়াবে। গলা জড়িয়ে ধরে ঝুঁকে পড়ে বলবে, 'বাবা, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

মেয়ের আহ্লাদিতে জগন্নাথবাবু খুশি হবেন, কিন্তু খুশির ভাব দেখাবেন না। তিনি গম্ভীর হয়ে বলবেন, 'এতে পাগল হওয়ার কী দেখলে?'

রুনা খিলখিল করে হেসে বলবে, 'পাগল না হলে, কেউ এ-রকম প্ল্যান করে?'

'কী প্ল্যান?'

'এই যে তুমি যা করেছ।'

জগন্নাথবাবুর মন নরম হতে থাকবে। তিনি নিজেকে কঠিন করবেন। বলবেন, 'প্ল্যান না-করলেই বরং পাগল হয়ে যেতে হত। রিটায়ারমেন্টের পর দেখতে পাচ্ছি এ বাড়িতে আমার কোনো দাম নেই। আমার থেকে তোমাদের কাছে রবীন্দ্র-সংগীতেরও অনেক বেশি দাম। সকাল হতে-না-হতে হইচই শুরু করছ, আমি যে আরও এক কাপ চা খাব সেদিকে কারো খেয়াল আছে?'

কথা শেষ করে জগন্নাথবাবু খবরের কাগজ মুখের ওপর তুলে মন দিয়ে পড়ার ভান করবেন। রুনা জোর করে কাগজ সরিয়ে দিয়ে বলবে, 'উফ বাবা, রিটায়ার করার পর তুমি বড্ড ছেলেমানুষ হয়ে গেছ। তুমি চাইছ, মা সারাক্ষণ তোমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকুক। তাই তো?'

'শুধু মা কেন? তুই দিনের মধ্যে কতক্ষণ আমার কাছে আসিস? এসে বসিস দশ মিনিট? তোর দিদি তো দেখছি বিয়ের পর প্রাইম মিনিস্টারের থেকেও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একটা ফোন পর্যন্ত করতে পারে না।'

রুনা হাসতে হাসতে বলবে, 'তোমাকে কে বলেছে ব্যস্ত হলে ফোন করা যায় না? প্রাইম মিনিস্টার দিনে ক-টা ফোন করেন তুমি জান? আমি জানি। ছ-শো তিপ্পান্নটা। যাই হোক তুমি তোমার প্ল্যান বাতিল কর। আমরা কথা দিচ্ছি, এবার সবাই মিলে তোমাকে আরও বেশি সময় দেব। গল্পে, যত্নে, আদরে তোমার অবসর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলব। মা সকালবেলা তোমার সঙ্গে নিয়মিত মর্নিংওয়াকে যাবে। ফুল, পাখি, গাছ চেনাবে। আমি বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে আগে তোমার সঙ্গে গল্প করব। কলেজের কোন টিচারকে আমরা ঘ্যাঁগো স্যার, কাকে গন্ধগোকুল, কাকে হুতুমরানি বলে ডাকি সব বলব। দিদি রোজ রাতে ফোন করে তোমার সঙ্গে পিএনপিসি করবে। শাশুড়ি কী বলল, ননদ কী করল, এইসব।'

জগন্নাথবাবু আর নিজেকে সামলাতে পারবেন না। তিনি হেসে ফেলবেন। চড় তুলে মেয়েকে মারতে যাবেন। বাবার হাসি দেখে ছোটো মেয়ে আশ্বস্ত হবে।

'তাহলে বাবা, তুমি পরিকল্পনা বাতিল করছ?'

জগন্নাথবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বলবেন, 'বাতিল করছি না, আপাতত স্থগিত রাখছি। তুই তোর মাকে বল, রতনের মাকে দিয়ে যেন এখনই এক কাপ চা পাঠায়।'

'বলতে হবে না। অলরেডি তোমার চা রেডি। রতনের মা নয়, আমার মা নিজেই চা বানিয়ে নিয়ে আসছে। আমি চললাম, মায়ের মনে হয় তোমার সঙ্গে কোনো প্রাইভেট টক আছে।'

জগন্নাথবাবু এবার হাত বাড়িয়ে মেয়ের চুলের ঝুঁটি ধরবেন। রুনা চুল ছাড়িয়ে হাসতে হাসতে পালাবে।

মন্দিরাদেবী ঢুকবেন একটু পরে। হাতে চায়ের কাপ। চোখে জল।

'তুমি কি সত্যি চলে যাচ্ছ?'

জগন্নাথবাবু কিছু বলবেন না। কাপে লম্বা চুমুক দেবেন। মন্দিরাদেবী আবার হাত দিয়ে চোখের জল মুছে বলেন, 'তুমি যাবে না।'

জগন্নাথবাবুর খুব ইচ্ছে করবে হাসতে হাসতে বলবেন, 'খেপেছ? তোমাদের ছেড়ে গেলেও যেতে পারি কিন্তু সকালবেলায় এই দু-কাপ চা ছেড়ে কোথায় যাব?' কিন্তু উনি তা বলবেন না। বানানো রাগী রাগী মুখে বলবেন, 'আগে খানিকক্ষণ আমার কাছে বোসো। তারপর ভেবে দেখব যাব কি যাব না।'

মন্দিরাদেবীর চোখে আবার জল চলে আসবে।

জগন্নাথবাবু এবার কড়া গলায় বললেন, 'অত ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না তো। ঠিক আছে দেখা যাবে। এখনো তো হাতে সময় আছে।'

এগুলির কিছুই হবে না। কারণ রুনা বা তার মা কেউই ঘরে আসেনি। আসবে বলে মনেও হয় না।

জগন্নাথ কয়াল নিজের হাত উলটে ঘড়ি দেখলেন। আজ ঘন ঘন ঘড়ি দেখবেন বলে ঘুম থেকে উঠে ঘড়ি পরে নিয়েছেন। পরার দরকার ছিল না। ঘরের দেয়ালে ঘড়ি টাঙানো আছে। মুখ তুললেই সেই ঘড়ি দেখা যায়। ঘড়িটা নতুন। সবে গত সপ্তাহে লাগানো হয়েছে। রিটায়ারমেন্টের সময় অফিস কলিগরা ছাতা, ধুতি, মিষ্টির সঙ্গে ঘড়ি দিয়েছিল। ঘড়ি এতদিন বাক্সবন্দি করে আলমারিতে তোলা ছিল। সেদিন জগন্নাথবাবু স্ত্রীকে বললেন, 'মন্দিরা, একটা ঘড়ি ছিল না? আমার ফেয়ারওয়েলের সময় দিয়েছিল।'

মন্দিরাদেবী বিরক্ত মুখে বললেন, 'আছে তো, বাক্সসুদ্ধু তোলা আছে। ঘড়ি দিয়ে কী হবে?'

'বেডরুমে টাঙাব।'

মন্দিরাদেবী অবাক চোখে হাসি গোপন করা মুখে বললেন, 'ওমা! ঘড়ি দিয়ে কী হবে?'

জগন্নাথবাবুর মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। গত একবছর ধরে এটা হচ্ছে। স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথার পর পর মাথা ঝিমঝিম করে উঠছে। 'ঝিমঝিম'টা ঠিক কীসের বোঝা যাচ্ছে না। কখনো মনে হচ্ছে রাগের, কখনো মনে হচ্ছে বিরক্তির, কখনো আবার মনে হচ্ছে হতাশার। নাকি সংসার যখন 'অসহ্য' হয়ে যায় তখন এ-রকম ঝিমঝিম করে? তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'ঘড়ি দিয়ে সময় দেখা ছাড়া আর কিছু করা যায় বলে তো আমার জানা নেই মন্দিরা, তোমার আছে?'

মন্দিরাদেবী শান্ত গলায় বলেন, 'সময় কে দেখবে?'

'কেন? আমি দেখব।'

মন্দিরাদেবী এবার মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে হেসে ফেললেন।

'এখন সময় দিয়ে তোমার কী হবে! সকাল ন-টাও যা, দশটাও তাই। বিকেল পাঁচটা আর ছ-টার মধ্যে পার্থক্য কী? ওষুধ খাওয়া আর টিভি সিরিয়াল, ব্যস আর কোন কম্মে তোমার সময় লাগে?'

জগন্নাথ স্ত্রীর কথা শুনলেন না। তিনি বাক্স থেকে ঘড়ি বের করলেন। নতুন ব্যাটারি লাগানো হল। দেখা গেল ঘড়ি ঠিক আছে কিন্তু পেন্ডুলাম খুলে একপাশে কেতরে গেছে। মন্দিরাদেবী এই ঘড়ি বেডরুমের দেয়ালে টাঙাতে অস্বীকার করেছিলেন। জগন্নাথবাবু জোরজবরদস্তি করলেন। তিনি বললেন, 'ঘড়িতে পেন্ডুলাম কোনো জরুরি জিনিস নয়। কাঁটাদুটোই আসল।'

মন্দিরাদেবী বললেন, 'তা বলে ঘরে ডিফেক্টিভ জিনিস রাখব?'

জগন্নাথবাবু গম্ভীর গলায় জবাব দেন, 'ঘরে যদি ডিফেক্টিভ মানুষ থাকতে পারে জিনিসে অসুবিধে কী?'

মন্দিরা অবাক হয়ে বলেন, 'তুমি কাকে ডিফেক্টিভ বলছ? আমাকে?'

জগন্নাথবাবু একটু চুপ করে থেকে, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি কাউকেই বলিনি। কথায় কথায় ঝগড়া করা মানুষের একটা ডিফেক্ট। বড়ো ডিফেক্ট।'

মন্দিরাদেবী গলা ঝাঁঝিয়ে বলেন, 'তুমি আমাকে ঝগড়ুটে বললে? রিটায়ারমেন্টের পর এই একটাই তোমার কাজ হয়েছে। ঘরে বসে বউয়ের খুঁত ধরা।'

'আমি কোথায় খুঁত ধরলাম!'

'একশোবার ধরেছ। এখন ভাঙা ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করছ, ক-দিন পরে ভাঙা ছাতা, ভাঙা থালা বাসনের সঙ্গে তুলনা করবে।'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, ঘড়ি লাগাতে হবে না। দয়া করে তুমি চুপ কর।'

মন্দিরাদেবী আরও রেগে গিয়ে বলেন, 'অবশ্যই লাগাব। একশোবার লাগাব। তোমার চোখের সামনে ভাঙা ঘড়িটা ঝুলুক। তুমিও ভাঙা, তোমার ঘড়িও ভাঙা।'

'আমি ভাঙা!' জগন্নাথবাবু অবাক গলায় বলেন।

'অবশ্যই ভাঙা। রিটায়ার করলে মানুষ আস্ত থাকে না, ভাঙা হয়ে যায়।'

ট্রেন সেই বিকেলে। অনেক সময় বাকি। উফ, এত সময় না-থাকলেই যেন ভালো হত। এ-বাড়িতে প্রতিটা মুহূর্ত অসহ্য লাগছে। সব থেকে ভালো হত যদি ট্রেন সকালেই ছাড়ত। ঘুম থেকে উঠেই ট্যাক্সি ডেকে রওনা হওয়া যেত। গান-বাজনার অত্যাচার সহ্য করতে হত না। এ তো শুধু গান নয়, এ তো অপমান। 'হেড অব দ্য ফ্যামিলি' সংসার ছেড়ে বিদায় নিচ্ছে আর বাড়ির লোক ফুর্তি করছে!

জগন্নাথ কয়াল যে-গতিতে পা নাড়াচ্ছিলেন, সেই গতি দ্বিগুণ করে দিলেন।

এবার সত্যি সত্যি মন্দিরাদেবী ঘরে ঢুকলেন। স্বামীর দিকে তাকালেন আড়চোখে। তিনিও গুন গুন করে গান গাইছেন। জগন্নাথবাবুর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তিনি কাগজে মুখ ঢাকলেন।

'আর এক কাপ চা খাবে?' গান থামিয়ে প্রশ্ন করলেন মন্দিরাদেবী।

জগন্নাথবাবু চুপ করে রইলেন। মন্দিরাদেবী খাটের সামনে গিয়ে বললেন, 'ভালোই হয়েছে। চা খাওয়া কমাও। এরপর তো আর অর্ডার করার জন্য বউয়ের

মতো দাসীবাঁদী পাবে না। শুধু চা কেন, খাওয়াদাওয়াও টেনে করার প্র্যাকটিস দরকার। চারের বদলে দু-বেলা খাবে। দুটো মেন ফুড। ব্যস। লাঞ্চ করবে বেলার দিকে। রাত পর্যন্ত যেন পেটে গজগজ করে। এরপর তোমাকে তোয়াজ করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় এটা সেটা টিফিন কে দেবে বল?'

জগন্নাথবাবু অবাক হয়ে গেলেন। মন্দিরা এসব কী বলছে! কোথায় তিনি ভেবেছিলেন, বাড়ি ছেড়ে না-যাওয়ার জন্য স্ত্রী কান্নাকাটি করবে, তার বদলে বলছে খাওয়াদাওয়া কমাতে! ঠিক শুনছেন তো? অনেক সময় রাগের মাথায় মানুষ মিথ্যে শোনে। এও সে-রকম কিছু নয় তো? মনে যতই গোপন ইচ্ছে থাকুক, তিনি যে পাকাপাকি ভাবে ঘর সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এমন সিদ্ধান্ত তো ঘোষণা করেননি এখনো। মাস কয়েক দিয়ে শুরু করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু এরা ধরেই নিয়েছে, এখনই পাকাপাকি বিদায় হচ্ছে! ধরে নিয়ে বিরাট খুশিও!

মন্দিরাদেবী ঝাড়ু দিয়ে বিছানার চাদর ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'তুমি বেরোচ্ছ কখন?'

জগন্নাথবাবু বিস্ময়াহত গলায় বললেন, 'কেন?'

'না, কিছু নয়, দুপুরের আগে বেরোলে সুবিধে ছিল। ঝামেলা চুকিয়ে খেয়ে দেয়ে একটু শুতে পারতাম।'

জগন্নাথবাবু খবরের কাগজ আবার মুখের সামনে তুললেন। ইচ্ছে করছে এখনই গুছিয়ে রাখা ব্যাগ সুটকেস নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে। এর থেকে ফুটপাতে বসে থাকা ভালো। স্বামী বাণপ্রস্থে চলল, আর স্ত্রী দিবানিদ্রা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে! ভয়ংকর। নিজের বাড়ি থেকে নিজে বিদায় নিচ্ছেন তাও এই অবস্থা! জগন্নাথ কয়াল দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। একটা চেষ্টা করলে কেমন হয়? লাস্ট ট্রাই?

'আমি কোথায় যাচ্ছি তুমি কি জানতে চাও মন্দিরা?'

দ্রুত হাতে বালিশের ওয়াড় বদলাতে বদলাতে মন্দিরাদেবী বললেন, 'না, জানতে চাই না। তিরিশ বছর ধরে শুধু তোমার যাওয়া আসার খবর রেখে রেখে ক্লান্ত। কখন অফিসে যাবে, কখন ভাত বসাব, কখন বাড়ি ফিরবে, কখন তার টিফিন হবে। রিটায়ারমেন্টের পর হিসেব আরও বেড়েছে। আগে শুধু বাড়ির বাইরে যাতায়াতের খবর জানলেই হত। এখন তোমার বাথরুম, বেডরুম, ড্রয়িংরুম সব যাতায়াতের খবরই জানতে হচ্ছে। বাপ রে! আর রাখতে চাই না।'

জগন্নাথবাবু নীচু গলায় বললেন, 'ও।'

'ওষুধবিষুধ সব গুছিয়ে নিয়েছ? অবশ্য না-নিলে কোনো ক্ষতি নেই। এখন বাণপ্রস্থ তো আর কেউ পাহাড়ে জঙ্গলে করে না। বাড়ি ঘর, বউ ছেলে-মেয়ে ছাড়ার আগে হোটেলে ঘর বুক করে নেয়।' কথাটা বলতে আড়চোখে তাকালেন মন্দিরাদেবী। আবার শুরু করলেন, 'দেখে নেয় ঘরের টিভিতে চ্যানেলগুলো সব আসছে কি না। সন্ধেবেলা, সিরিয়াল দেখতে হবে না। সুতরাং যেখানে যাচ্ছ

সেখানে ওষুধবিষুধও পাবে। আর না-পেলে তুমি বুঝবে। জিনিস আমি গোছাইনি। আর আমার ওপর রাগ দেখাতে পারবে না।'

জগন্নাথবাবু কিছু বলতে পারলেন না। কথাটা মিথ্যে নয়। দুটো ব্যাগ, সুটকেস তিনি নিজের হাতে গুছিয়েছেন। সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাগ সুটকেস সংসারে থাকা মানুষদের দিয়ে গোছানো যায় না।

'মন্দিরা তোমাদের এই গান-বাজনাটা কি একটু বন্ধ করা যায় না?'

মন্দিরাদেবী চকিতে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কেন তোমার কী সমস্যা হচ্ছে? বাড়ি তো আমরা ছাড়ছি না, তুমি ছাড়ছ। গান শুনতে আমাদের তো কোনো অসুবিধে নেই। নাকি গান বন্ধ করে রুনাকে বেহালার সিডি চালাতে বলব? একটা দুঃখ দুঃখ ভাব হবে।'

'তুমি ঠাট্টা করছ কেন? আমি তো ঠাট্টার কথা বলিনি।'

'ঠাট্টার কথা বলনি, ঠাট্টার কাজ করছ।'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'মেয়েটার পরীক্ষা তাই বলছিলাম। সকাল থেকে বাড়িতে নাচগানের ফাংশন না শুরু করলে হত না?'

মন্দিরাদেবী মুখ দিয়ে জোরে ফুঃ ধরনের আওয়াজ করলেন। অবজ্ঞার আওয়াজ।

'মেয়ের পরীক্ষা নিয়ে বিরাট চিন্তা যেন। পরীক্ষার আগেই তো পালাচ্ছ।'

কথা বলতে বলতে ঘর ছাড়লেন মন্দিরাদেবী। অপমানিত জগন্নাথ কয়াল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ভেবেছিলেন, শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন হবে যে গোছানো ব্যাগ খুলে ফেলতে হবে। বাণপ্রস্থে যাওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, সে-চান্স আর নেই। এখন হাতি বাঁধার চেন দিয়ে তাকে বেঁধে রাখলেও তিনি আর এ-বাড়িতে থাকবেন না। আগে বেরোবেন। তারপর একমাস পরে চিঠি পাঠাবেন—'তোমরা যা চেয়েছিলে, শেষ পর্যন্ত তাই হল। আমি আর ফিরছি না। আমার জমানো টাকা কোথায় কী আছে তার একটা লিস্ট খাতায় লেখা আছে। খাতা আছে আমার টেবিলের ডান দিকের ড্রয়ারে। শেষ মুহূর্তে ড্রয়ারের চাবি ভুল করে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছি। মিস্ত্রি ডেকে ড্রয়ার ভাঙিয়ে নাও। আমার টাকা পয়সা নিয়ে ভাবতে হবে না। আমার খোঁজ কোরো না।'

স্যুটকেসটা একবার চেক করে নেওয়া দরকার। যদিও মন্দিরাদেবী ভুল বলেননি। বাণপ্রস্থর প্রথম পর্যায়ে বড়ো ধরনের ঝুঁকি নেননি জগন্নাথবাবু। পরিচিত জায়গাতেই হোটেল বুক করেছেন। ঘরে টিভি, বাথরুমে গিজার—সবই আছে।

সুটকেস পরীক্ষা করে দেখার আগে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল রুনা।

'বাবা, তোমার সঙ্গে একটা আর্জেন্ট কথা আছে।'

জগন্নাথবাবু মুখ না-ফিরিয়ে কঠিন গলায় বললেন, 'আমি তোমার আর্জেন্ট কথা জানি।'

'তাই নাকি! কী বল তো?' রুনা অবাক হয়ে বলল।

জগন্নাথবাবু চাপা গলায় বললেন, 'তুমি চাও, আমি তোমার ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। সরি, দিজ ইজ নট পসিবল।'

রুনা চোখ কপালে তুলে বলল, 'সে কী এমন কথা তোমাকে কে বলল! আমি মোটেই চাই না। বরং আমি চাই বাড়িটা একটু ফাঁকা হোক। ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ হোক। আমি শান্তিতে পড়াশোনা করতে পারব। তা ছাড়া ফাইনালের এখনো দেরি আছে।'

মনে মনে ভেঙে পড়লেন জগন্নাথ কয়াল। মেয়েও এইরকম! মায়ের মতো তাঁকে তাড়াতে পারলে বাঁচে! তিনি ঢোক গিলে বললেন, 'ও, আমি তাহলে ভুল বুঝেছিলাম। তোমার আর্জেন্ট কথাটা কী শুনি। ছোটো করে বলবে। আমার গোছগাছ বাকি আছে।'

রুনা খাটের ওপর বসে গদগদ মুখে বলল, 'আমার কাছে খবর আছে তোমার ট্রেন বিকেলে, পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিটে। ঠিক তো?'

জগন্নাথবাবু মুখ ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। বললেন, 'তুমি কোথা থেকে জানলে? তুমি কি লুকিয়ে আমার টিকিট দেখেছ?'

রুনা হেসে বলল, 'সোর্স বলব না বাবা। খবর ঠিক কি না বল।'

'হ্যাঁ ঠিক। তাতে কী হয়েছে?'

'আমি চাইছিলাম তুমি একটু দেরি করে বাড়ি থেকে বের হও। এই ধর সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ।'

জগন্নাথবাবু এবার সোজাসুজি মেয়ের দিকে তাকালেন। এটা কী ধরনের রসিকতা!

'কেন সাতটা হলে তোমার কী সুবিধে?'

রুনা তার সুন্দর গজদাঁত বের করে হাসল। বলল, 'বাবা, আজ ফুল মুন। চাঁদ উঠবে। চাঁদের আলোয় বাড়ি ঘর ছাড়ার একটা অন্যরকম ভ্যালু আছে। গৌতম বুদ্ধ, সম্রাট অশোক, হিউয়েন সাঙ্ সবাই চাঁদের আলোয় ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। আমরা সবাইকে গর্ব করে বলতে পারব। বাবা কোথায় গেছে জানি না, কিন্তু উনি যে মুন লাইটে ঘর ছেড়েছিলেন সেটা জানি। উই ফিল প্রাউড ফর হিম।'

জগন্নাথবাবুর ইচ্ছে করল, মেয়ের গালে একটা চড় লাগান। কিন্তু সেটা তিনি পারবেন না। তিনি কখনো সন্তানদের গায়ে হাত তোলেননি। আজ তো প্রশ্নই নেই। সম্ভবত আজই মেয়ের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা।

বড়ো মেয়ে ঝুমা এল বিকেল চারটের মিনিট দশেক পরে। সে এসেছে হন্তদন্ত হয়ে। ঢাউস একটা সুটকেস নিয়ে বাড়ির গেট খুলে ঢুকল। নিজের ঘরে ধুতি পাঞ্জাবি পরে তৈরি হচ্ছিলেন জগন্নাথবাবু। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর মন্দিরা বা রুনা দুজনের কেউ এই ঘর মাড়ায়নি। ভালোই করছে। আরও দুটো অপমানের কথা শুনতে হত। জগন্নাথবাবুর জানলা দিয়ে বড়ো মেয়েকে দেখতে এলেন। সুটকেস এনেছে কেন? নিশ্চয় ক-দিন কাটিয়ে যাবে। সমস্যা নেই। বাপের বাড়িতে লোক কমছে। খোদ বাপই বেরিয়ে যাচ্ছে। সে হাত-পা ছড়িয়ে থাকার সুযোগ ছাড়বে

কেন? উফ! সন্তানরা এত বড়ো স্বার্থপর হতে পারে? বাবার খাটে শুয়ে দুই বোনে রাত জেগে ফুসুর ফুসুর করবে।

ঝুমা ঘরে ঢুকল বড়ো একটা কৌটো হাতে।

'বাবা, এটা তোমার ব্যাগে ঢোকাও তো।'

'কী আছে?'

'কুচো নিমকি। তুমি নিমকি ভালোবাস। বানাতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।'

চোখ ফেটে জল এল জগন্নাথ কয়ালের। যে-মেয়েকে তিনি প্রাণের থেকে একটু বেশি ভালোবাসতেন সে কিনা সেজেগুজে নিমকি হাতে বাবাকে বাড়ি থেকে বিদায় করতে এসেছে! এও দেখে যেতে হচ্ছে? হায় রে! নিজেকে সামলে তিনি হাত বাড়িয়ে কৌটো নিলেন। না, কোনোরকম দুর্বলতা দেখানো চলবে না। যে সংসার ভালোবাসা বোঝে না তার কাছে কীসের দুর্বলতা?

ঝুমা বলল, 'যাই, মায়ের কাছে যাই। রুনা ফোন করে করে পাগল করে দিচ্ছে।'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'এখানে একটু বোসো ঝুমা। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আর মনে হয় না সময় পাব।'

ঝুমা কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'সরি বাবা, যতই জরুরি কথা থাকুক, এখন তোমার কাছে বসতে পারছি না। লেট করে ফেলেছি। রুনা বকেছে, এবার মা বকবে। তোমার জামাই ট্যাক্সি ডাকতে গেছে।'

জগন্নাথবাবু ধাক্কার মতো খেলেন। বড়ো মেয়ে আর অপেক্ষাও করেনি। পাছে বাবার যাওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা হয়, তার জন্য স্বামীকে ট্যাক্সি পর্যন্ত ডাকতে পাঠিয়ে দিয়েছে। তিনি ব্যথিত গলায় বললেন. 'অলক ট্যাক্সি ডাকতে গেল কেন? আমি নিজেই তো পারতাম।'

ঝুমা হেসে বলল, 'আমরা পারতাম না বাবা।'

'মানে!'

বাবার কথার উত্তর না-দিয়ে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঝুমা।

মানে বোঝা গেল অলক ট্যাক্সি ডেকে আনার পর। ট্যাক্সি একটা নয়, ডাকা হয়েছে দুটো। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ কয়াল বললেন, 'দুটো কেন!'

মন্দিরাদেবী এসে দাঁড়িয়েছেন স্বামীর পিছনে। দুই মেয়ের মতো তিনিও সাজগোজ করেছেন। স্বামীর কথায় ধাতিয়ে উঠলেন।

'এত মালপত্র, এতগুলো লোক একটা ট্যাক্সিতে হবে কী করে? তুমি কি ট্যাক্সির মাথায় চেপে যাবে?'

জগন্নাথবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। চোখ কপালে তুলে বললেন, 'তোমরা কোথায় যাবে?'

রুনা বলল, 'আমরাও তোমার সঙ্গে বাণপ্রস্থে যাচ্ছি বাবা।'

জগন্নাথবাবুর মনে হল তিনি বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর বসে পড়বেন।

‘কী বলছিস? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!’

ঝুমা বলল, ‘সব বুঝে দরকার কী? শুধু জেনে রাখ আমরাও আজ তোমার সঙ্গে বেনারসের ট্রেন ধরছি। তোমার জামাই একই ট্রেনে টিকিট কেটেছে।’

‘কী করে জানলি আমি বেনারস যাচ্ছি?’ জগন্নাথবাবু হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারছেন না।

মন্দিরাদেবী ধমক দিয়ে বললেন, ‘বোকার মতো কথা বোলো না। ট্রেনের টিকিট রাখবে আলমারিতে আর আমি জানতে পারব না? তুমি আমি আলাদা হয়ে যেতে পারি কিন্তু আমাদের আলমারি তো এখনো আলাদা হয়নি। মেয়েদের সামনে মুখ খুলিয়ো না তো। নাও নাও হাঁ করে দাঁড়িয়ে না-থেকে মাল্ তোল দেখি।’

জগন্নাথবাবু বিড়বিড় করে বললেন, ‘রুনার তো পরীক্ষা।’

রুনা খাবারের টুকরি ট্যাক্সিতে তুলতে তুলতে বলল, ‘বাবা, আমি বই নিয়ে যাচ্ছি। উইথ রবীন্দ্রসংগীতের সিডি। চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না...। হি হি।’

সবাই হেসে উঠল। জগন্নাথ কয়ালও।

সেলেনোফোবিয়া



ঘটনা প্রথম ঘটল বুধবার রাতে। ক-দিন পরেই পূর্ণিমা। আকাশের মাঝখানে ভেসে আছে চাঁদ। বাঁশির মনে হল, এই চাঁদ আর পাঁচটা দিনের মতো নরম-সরম চাঁদ নয়, অন্যরকম। এই চাঁদ কঠিন, দগদগে! শরীরে রুপোলি আগুন নিয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। একনাগাড়ে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখ সরিয়ে নিতে হয়। বাঁশি অবাক হল। আজ এ-রকম হচ্ছে কেন? সে চোখ সরিয়ে নিল।

তখনও রাত খুব বেশি হয়নি, আবার একেবারে কমও নয়। এগারোটা বাইশের ট্রেন আসেনি। এ-বাড়ি থেকে ট্রেন দেখা যায় না, ট্রেনের হুইস্‌ল শোনা যায়। পুব দিকের মাঠ, মাঠের ঝোপজঙ্গল, এঁদো পুকুর পেরিয়ে সেই আওয়াজ ভেসে আসে। দিনে হালকা, রাতে খানিকটা স্পষ্ট। মজার কথা হল, রাত যত বাড়তে থাকে হুইসলে তীক্ষ্ণ ভাব কমে আসে, আওয়াজ হয়ে যায় ভোঁতা। স্টেশনে ঢোকার আগে ট্রেনটা যেন চাপা গলায় ডেকে ওঠে। সেই ডাকে ক্লান্তির ছাপ।

বুধবার তখনও ডাক শোনা যায়নি। হঠাৎ বাঁশি অনুভব করল, কেউ তাকে ছুঁয়েছে! কাঁধের ওপর আলতোভাবে হাত রেখেছে। হাত খানিকটা পড়েছে ব্লাউজের ওপর, খানিকটা খোলা পিঠে। খরখরে, কড়া স্পর্শ। যেন পুরুষমানুষের আঙুল! ভালো করে বুঝে ওঠবার আগে হাতটা দ্রুত সরেও গেল। সব মিলিয়ে মুহূর্ত-খানেকের ব্যাপার।

মাদুরে চিত হয়ে শুয়ে ছিল বাঁশি। আকাশের দিকে তাকিয়ে। শাড়ির আঁচলটা আড়াআড়িভাবে ফেলা ছিল বুকের ওপর। সেই আঁচল কোনোরকমে চেপে ধরে ধড়ফড় করে উঠে বসল বাঁশি। এই অন্ধকার, নির্জন ছাদে কে গায়ে হাত দেবে! শাড়ি দ্রুত গায়ে জড়াতে জড়াতে বাঁশি বুঝতে পারল, ভুল হয়েছে। মনের ভুল। সারাদিন পর শরীর ক্লান্ত। ভুল হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। আজকাল কোনো কোনো দিন বেশি খাটাখাটনি হলে রাতের দিকে মাথাও ঘোরে। গা পাক দেয়। মাথা

ঘোরাটা বাড়তে কথাটা কান্তিকে বলেওছিল। কান্তি প্রথমে উড়িয়ে দেয়, তারপর রাগ দেখায়।

'ক-দিন হল শরীরটা কেমন যেন করছে।'

কান্তি মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকাল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী করছে?'

'সন্ধের পর মাথা ঘোরে। পরশুদিন রান্নাঘরে চক্কর দিল। রুটি করছিলাম। মনে হল, চাটুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ব।'

স্ত্রী গরম চাটুর ওপর পড়ে যাচ্ছিল শুনেও কান্তি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'ও কিছু নয়, অ্যানিমিয়া। সব মেয়েদের থাকে। মাথা ঘোরে, আঙুলের ডগা ঝিমঝিম করে।'

বাঁশি বিছানার চাদর ঝাড়ছে। কান্তি বসেছিল ঘরের কোনায়, প্লাস্টিকের চেয়ারে। কোলের ওপর হলুদ রঙের টিনের অ্যাশট্রে। অ্যাশট্রের মুখ খুলে ছাই ঘেঁটে আধপোড়া সিগারেট খুঁজছে কান্তি। এই নোংরা অভ্যেস তার বহু দিনের। সিগারেট ফুরিয়ে গেলে অ্যাশট্রে ঘাঁটে। সারাদিনের ফেলে যাওয়া টুকরোটাকরা পেলে মুখে নিয়ে আগুন লাগায়। বিয়ের পর একদিন বাঁশি অ্যাশট্রে পরিষ্কার করে রাখে। রাতে চিৎকার করতে থাকে কান্তি। বাঁশি ভয় পেয়ে বলে, 'ছাই ঘেঁটে আধপোড়া সিগারেট খাও, আমার ভালো লাগে না।'

কান্তি দাঁত ঘষার হিসহিস ধরনের আওয়াজ করে বলেছিল, 'আমি ছাই-ই ঘাঁটব। আমি ছাই ঘাঁটতে ভালোবাসি। কথাটা মনে থাকবে? আর কোনোদিন অ্যাশট্রেতে হাত দেবে না।'

সেদিন স্বামীর আচরণের কারণ বুঝতে পারেনি বাঁশি। একটা মানুষ ছাই ঘাঁটতে ভালোবাসবে কেন! চুপ করে যায় বাঁশি। চুপ করে থাকারই মেয়ে সে। শান্ত স্বভাব। কলকাতা থেকে দূরে মফস্বল শহরে বড়ো হয়েছে বাবা-মায়ের কাছে। বাবার ছোটো চাকরি ছিল। সংসারে অভাব ছিল, কিন্তু গোলমাল ছিল না। না বাইরের গোলমাল, না ঘরের। তিন মানুষের সংসার। বাবা-মায়ের ঝগড়া হত নীচু গলায়। খুব বেশি রাগারাগি হলে কথা বন্ধ থাকত। তাও বড়োজোর এক-দু-দিন। স্কুলে নীচু ক্লাসের পর কোনোদিন বকুনি খেয়েছে বলে মনে পড়ে না বাঁশির। খাওয়ার মতো কাজও করেনি। বড়ো হয়েও করেনি। কোনো কথায় 'না' বলেনি। কোনো কিছু পছন্দ না হলেও মেনে নিয়েছে। এক ধরনের মানুষ থাকে যারা আসলে চরিত্রগতভাবে ভিতু। ভয়কে 'মানিয়ে নেওয়া' বলে ঢাকা দিতে চায়। ছোটোবেলা থেকেই বাঁশি সে-রকম। সে ভিতু প্রকৃতির। বাবা একদিন দুম করে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। তার একটা বছর পার হতেই বড়োমাসি বিয়ের সম্বন্ধ আনলেন। বাঁশির তখন কলেজে ফাইনাল ইয়ার চলছে। পড়াশোনা চালাতে অনেক সমস্যা। আত্মীয়দের সাহায্য ছাড়া সংসারই চলে না তো পড়াশোনা! তবু চালাচ্ছিল বাঁশি। একটা চাকরি পেতে হবে। এই আশায় লড়ছিল। বড়োমাসির প্রস্তাবে 'না' বলল সে।

'না মাসি।'

বোনঝির মুখে 'না' শুনতে হবে ভাবতেও পারেননি মহিলা। তাও আবার এ-রকম সরাসরি। তিনি চোখ তুললেন। সেই চোখে একইসঙ্গে বিস্ময় এবং রাগ।

'তুই কি বিয়ে-থা করবি না ঠিক করেছিস?'

বাঁশি নিজেকে সামলায়। বুঝতে পারে এভাবে প্রস্তাব বাতিল করাটা ঠিক হয়নি। এই সংসার চালানোর পিছনে বড়োমাসির ভূমিকা সব থেকে বেশি। মাকে টাকাপয়সা দেয়। টাকা না-দিলে চাল-ডাল তো আছেই। বাঁশি মাথা নামিয়ে বলে, 'তা বলিনি। সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষাটা আগে দিয়ে নিই। তারপরে হয় না?'

বড়োমাসি ঠান্ডা গলায় বললেন, 'হয় না কেন? অবশ্যই হয়। আজকাল বিয়ে বেশি বয়েসেও হয়। তবে চট করে ভালো ছেলে পাওয়া যায় না। ভালো ছেলে হাতছাড়া হলে মেয়েদের সারাজীবন পস্তাতে হয়। এই ফ্যামিলি তোর মেসোর চেনাজানার মধ্যে। ছেলে একসময়ে কারখানায় কাজ করত। লেবার নয়, সুপারভাইজার। বাড়ির কাছেই কারখানা। সেই কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এটা-সেটা করে, রোজগারপাতি মন্দ নয়। আজকাল পাকা চাকরি থেকে এটা-সেটায় বেশি ইনকাম। বুড়ো বাবার পেনশন আছে। সরকারি চাকরি ছিল। কোনো দাবিদাওয়া নেই। খাট-বিছানাও চাইছে না। এ-রকম সুযোগ আর ক-টা পাব? ওরা শুধু লক্ষ্মীপানা একটা বউ চায়। একটাই কন্ডিশন মেয়েকে শান্তশিষ্ট হতে হবে। খ্যাড়খ্যাড়ি মেয়ে ওরা নেবে না। বছর তিন আগে এক খ্যাড়খ্যাড়ি মেয়ের সঙ্গে এই ছেলের বিয়ে দিয়ে মহা বিপদে পড়েছিল। অনেক কষ্টে তাকে পার করেছে।'

বাঁশি চমকে উঠেও নিজেকে সামলাল। বলল, 'ডিভোর্স?'

বড়োমাসি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'তাই হবে। ছেলে তো আর বিয়ে করতে রাজিই হচ্ছিল না। বন্ধুরা বুঝিয়েছে, বুড়ো বাপ-মা একা থাকে। সেবাযত্ন, পাহারার জন্যও তো একটা নিজের লোক চাই। তা ছাড়া বয়স যখন কিছুই হয়নি, বিয়ে না-করে বসে থাকবে কেন? ছেলে নিমরাজি হয়েছে। বলছে, তাহলে শান্ত ভদ্র মেয়ে চাই। তোর মেসো সেই খবর পেয়ে আমাকে বলল, বাঁশির মতো শান্ত মেয়ে আর কে আছে? একবার কথাটা বলব? আমি বললাম, বলবে না মানে? একশোবার বলবে। আজকালকার দিনে ডিভোর্স আবার কোনো ঘটনা হল? কী রে বল?'

বাঁশি বিড়বিড় করে বলল, 'সে-কথা বলছি না, বলছি এতটা এগিয়ে লেখা-পড়া ছেড়ে দেব?'

মাসি বড়ো করে হাসলেন। বললেন, 'ওমা, ছেড়ে দিবি কেন? বালাই ষাট। বিয়ের পর পড়বি। অসুবিধে কোথায়? বিয়ের পর মেয়েরা পড়াশোনা করে না? শোন বাঁশি, এই ছেলে বাড়ির একমাত্র সন্তান। নিজের একতলা বাড়ি। শ্বশুর-শাশুড়ি বেঁচে আছে। বুড়ো অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে কাতরায়। বুড়ি সারাদিন পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকে। সাতপাঁচ ঝামেলায় নেই। ছেলে কাজে বেরিয়ে গেলে তুই সারাদিন পড় না কত পড়বি।'

বাঁশি বিড়বিড় করে বলে, 'আগে পাশ করে একটা চাকরিবাকরি পেলে ভালো হত...।'

মাঝখানেই থামিয়ে দেন বড়োমাসি। এবার আর বিরক্তি লুকোতে পারেন না। এই মেয়ে এত কথা শিখল কোথা থেকে? অসন্তুষ্ট গলায় কেটে কেটে বললেন, 'আর একটা দিকও তো ভাবতে হবে বাঁশি। তুমি বড়ো হয়েছ, তুমি তো জান সংসারে দুটো মানুষের খাইখরচা কত লাগে, কতদিন আর পরের কাছে হাত পেতে চলবে? সে মাসি হোক পিসি হোক। পর পরই। তুমি কবে লেখাপড়া শেষ করবে, কবে তুমি চাকরি পাবে সেই আশায় কে বছরের পর বছর টাকা ঢেলে যাবে? নাকি সেটা সম্ভব? আজকাল লেখাপড়া করলে কাজ পাওয়া যায় না। অমন বি.এ. পাশ গণ্ডায় গণ্ডায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে।'

বড়োমাসির কথার মধ্যে সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার স্পষ্ট হুমকি। বাঁশি চুপ করে থাকে। বড়োমাসি উঠতে উঠতে বলেন, 'দেখছি, নিজের ভালো এখন নিজেই বুঝতে শিখছ। ভালো কথা। তবে নিজের সংসারের ভালোটাও বুঝতে হয়। ভাবতে হবে মায়ের মাথা থেকে যেন মেয়ে পার করার দুশ্চিন্তা দূর হয়। এবার ভাব কী করবে। আমার বলার কথা বলে গেলাম।'

শুধু বাঁশিকে নয়, মহিলা তার বোনকেও সেদিন বলে গেলেন।

'ধীরা, তোর মেয়ে দেখছি মুখের ওপর না বলতে শিখেছে। এই শিক্ষা খারাপ নয়, ভালো শিক্ষা। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য তো বটেই। আমরা না বলতে শিখিনি বলে সারাজীবন মার খেয়েছি। তবে সমস্যা কী জানিস ধীরা, এই শিক্ষা কাজে লাগানোর জন্য জোর লাগে। হয় বাপের অনেক টাকা, নয় চোখধাঁধানো রূপ। অথবা লেখাপড়ায় দারুণ রেজাল্ট। অন্যের দান-দয়ায় চলা গরিব ঘরে ময়লা গায়ের রং নিয়ে ফরফরানি চলে না। তাই না? তুই কী বলিস?'

ফাইনাল পরীক্ষার আগেই বিয়ে হয়ে গেল বাঁশির। ম্লান আয়োজন। চলে যাওয়ার সময় বাঁশি ভেবেছিল খুব কষ্ট হবে। মাকে জড়িয়ে জোরে জোরে কাঁদবে। কাঁদেনি। সম্ভবত জোরে কাঁদার জন্যও সাহস লাগে। শ্বশুরবাড়িতে যেতে দুটো ট্রেন পালটাতে হল। মাঝখানে ট্রেকারে মিনিট কুড়ি। পৌঁছোতে সন্ধে। মাঠ টপকে কাঁচা রাস্তার পাশে ছোটো একতলা বাড়ি। একটা মাত্র বাল্‌ব জ্বলছে সদরে। দুজন মহিলা ঘোমটা দিয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে। কে বলবে নতুন বউ এসেছে। বাঁশি মনকে বোঝাল, এটাই স্বাভাবিক। দু-বার বিয়েতে আর কত হইচই হবে? প্লাস্টারবিহীন, বিবর্ণ, ইট বের করা সেই বাড়ির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে ফুঁপিয়ে উঠল তরুণী বাঁশি। স্বামী বিরক্ত ভঙ্গিতে নীচু গলায় বলল, 'আঃ, কেঁদো না তো। মা ফ্যাঁচফ্যাচানি একদম পছন্দ করে না।'

না ফ্যাঁচফ্যাচানি নয়, ছেলের বউদের শাশুড়ি কেন পছন্দ করেন না জানতে কিছুদিন সময় লেগেছিল বাঁশির। তবে তার আগে আরও এক ভয়ংকর জিনিস জেনেছিল সে।

প্রায় ফুলহীন ফুলশয্যার রাতেই সেই জিনিস আঁচ করল খানিকটা। তবু সন্দেহ হল। ভাবল, প্রথম দিকে পুরুষমানুষের এ-রকমই হয়। যতই দু-নম্বর হোক, নতুন বউ তো! আড়ষ্টতা কাটতে সময় লাগবে। আরও কিছুদিন পর সেই সন্দেহ দূর হল। বাঁশি বুঝতে পারল, এই আড়ষ্টতা কাটবে না। তার স্বামী অসুস্থ। স্ত্রীর নগ্ন শরীর নিয়ে নানাভাবে চেষ্টা করে সে। উলটে-পালটে, নেড়ে-ঘেঁটে শরীরে যত শক্তি আছে, সব দিয়ে চেষ্টা করে। পারে না। কিছুতেই পারে না। তখন বাঁশিকে কামড়ায়, খামচায়, আঁকড়ে ধরে। একসময় হাঁপিয়ে পড়ে। গোঙানির মতো আওয়াজ বের হয় মুখ থেকে। ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে কুঁকড়ে পড়ে থাকে বিছানার কোণে।

বাঁশির মায়া হয়। সে কাপড় পরে পাশ ফিরে শোয়।

বিয়ের দিন দশ পরেই শাশুড়ি বাঁশিকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, 'দেখো বউমা, আমার মনে হয়, মেয়েমানুষের ছেলেপুলে যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। তোমার শ্বশুরমশাই কতদিন বাঁচবেন ঠিক নেই। তিনি নাতির মুখ দেখে যান এটাই আমি চাই। এ-যুগের মেয়েদের তাড়াতাড়ি বাচ্চা না-নেওয়ার ঢং আছে। এই ঢং আমার পছন্দ নয়। খোকার আগের বউটাও ছিল ও-রকম ঢঙি। বাচ্চাকাচ্চার কথা বলতে গেলে রেগে যেত। পরে খোকার নামেই মিথ্যে বলতে শুরু করল। বলত, ওরই কীসব সমস্যা আছে। আসলে হারামজাদির অন্য পুরুষের সঙ্গে নষ্টামি ছিল। কলকাতায় বাপের বাড়ি যাওয়ার নাম করে ন্যাংটা হয়ে এর তার বিছানায় গিয়ে উঠত। গায়ের রং ফর্সা হলে বেটাছেলেদের মন ভোলাতে অসুবিধে হয় না।'

কান গরম হয়ে ওঠে বাঁশির। সে অস্ফুটে বলল, 'এসব কথা থাকুক না মা।'

'থাকবে কেন? তুমি তো ঝি-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সাতকথা শুনবে। মিথ্যে শোনার আগে সত্যিটা জেনে নেওয়া ভালো। আমি খোকাকে বললাম, লাথি মেরে তাড়িয়ে দে। বাপের বাড়ির টাকা আছে বলে দেমাক দেখায়। এত বড়ো আমার ছেলের নামে দোষ নেয়। খোকা বলল, চটামটি কোরো না আমি ব্যবস্থা করছি। ওকে অবশ্য ব্যবস্থা করতে হয়নি। সেই মেয়েই কোর্টে গিয়ে নিজে থেকে ছাড়াছাড়ি চাইল। গাদাখানেক টাকাও নিয়েছে। যাক আপদ গেছে। তারপর থেকেই আমি ঠিক করেছিলাম, আবার বউ আনব। বদলা নেব। ঢংঅলা বড়োলোকের মেয়ে চাই না। গরিব ঘরের সাধারণ শান্ত ভদ্র মেয়ে চাই। সেই মেয়ের তাড়াতাড়ি বাচ্চা হবে। আমরা নাতিনাতনির মুখ দেখে মরব।' কথাটা বলে একটু থামলেন মহিলা। মুচকি হেসে চোখ নাচিয়ে বললেন, 'মনে রেখো বউমা, ভগবান মেয়েমানুষকে অমন সুন্দর দুটো বুক দিয়েছেন সাজিয়ে গুছিয়ে আলমারিতে তুলে রাখার জন্য নয়। স্বামী আর বাচ্চার জন্য।'

বাঁশি মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ ফেটে জল আসছে তার। একজন বয়স্ক মানুষের মুখ থেকে এমন অশ্লীল, কদর্য কথা সে জীবনে শোনেনি। মানসিকভাবে অসুস্থ না হলে কেউ এ-রকম বলতে পারে?

সেদিনও অ্যাশট্রের ছাই ঘাঁটছিল কান্তি। মাথা ঘোরার খবর জানিয়ে বাঁশি নীচু গলায় বলল, 'একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাব ভাবছি।'

কান্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়। বিরক্ত গলায় বলে, 'বাড়াবাড়ি কোরো না। সামান্য মাথা ঘোরার জন্য ডাক্তারের কাছে যাবে মানে? ডাক্তার কী করবে?'

বাঁশি বুঝতে পারল ডাক্তারের কথা বলাটা ঠিক হয়নি। কান্তি রেগে গেছে। মানুষটা আজকাল হুট করে রেগে যায়। আগেও রাগত তবে এতটা ছিল না। বছরখানেক হল এই জিনিস শুরু হয়েছে। মুখ খারাপও করছে। কান্তি নীচু গলায় গজগজ করতে থাকে, 'ডাক্তার আসল কম্ম কিছু পারল না...উনি ডাক্তার দেখিয়ে মাথা ঘোরা ঠেকাবেন...একটার পর একটা অপোগণ্ড জুটেছে আমার কপালে....।'

দু-বছরেও ছেলেপুলে হওয়ার কোনো লক্ষণ না-দেখে থমথমে মুখে বাঁশিকে ডাক্তার দেখিয়ে এনেছেন শাশুড়ি। ডাক্তার গাদাগুচ্ছের পরীক্ষা দিল। সেদিন ছিল গরমের রাত। ইলেকট্রিক ছিল না। এখানে প্রায়ই এ-রকম হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইলেকট্রিক থাকে না। শোয়ার পর হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বাঁশি কান্তিকে বলল, 'মাকে বারণ করো। পরীক্ষা করে লাভ কী হবে?'

কান্তি পাশ ফিরল। বিড়বিড় করে বলল, 'মা শুনবে না। যা বলছে করো।'

বাঁশি বলল, 'শুধু শুধু টাকা খরচ।'

কান্তি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তোমার কী? টাকা তো তোমার নয়।'

বাঁশি থমকে গেল। পাখা নাড়ানো বন্ধ করে বলল, 'টাকা কার সেটা বড়ো কথা নয়। তুমি তো আসল ব্যাপারটা জান। জান সমস্যাটা কোথায়?'

কান্তি হাই তুলল। বলল, 'বাজে কথা বোলো না। আসল-নকল কোনো ব্যাপারই আমি জানি না। আমি শুধু জানি আমার কোনো দোষ নেই। দোষ যদি কিছু থাকে তা আছে তোমার, তোমাদের। মনে হচ্ছে, এবারও আমি ভুল করেছি। নাও, সরো আমাকে ঘুমোতে দাও।'

সেদিন সারারাত জেগে ছিল বাঁশি। চেয়ার টেনে বসে ছিল বারান্দায়। বারান্দা থেকে পাশের বন্ধ কারখানার পাঁচিল দেখা যায়। রাতের আবছা আলোয় মনে হচ্ছে ধ্বংসস্তূপ। নিজে মরে চারপাশটাকে মেরে রেখেছে। তারপর আরও একটা বছর কেটে গেছে। শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব আরও বেড়েছে। নিজের মায়ের কাছে প্রথম দিকে বছরে দু-বার করে যেত। এখন একবারের বেশি যাওয়া হয় না। এ-বছর তাও হয়নি। বাঁশি ভেবেছিল, পড়াটা নতুন করে শুরু করবে। যতটা পড়ার জন্য তার থেকে বেশি একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য। কান্তিকে বলেওছিল। কান্তি হুঁ-হাঁ বলে চুপ করে গেছে। দমবন্ধ এই পরিবেশে এখন বাঁশির মুক্তি বলতে এই ছাদটুকু। ঝড় বৃষ্টি বা খুব শীত না-থাকলে রাতের কাজকর্ম গুছিয়ে ছাদে চলে আসে বাঁশি। শুয়ে শুয়ে তারাভরা আকাশ দেখে। কোনোদিন চাঁদ ওঠে পালতোলা নৌকোর মতো। জ্যোৎস্নায় টলমল করে। কান্তি অনেক রাত করে ফেরে। কখনো লাস্ট ট্রেন চলে যায়, ফেরে না। তার নাকি বাইরে কাজ থাকে। আগে চিন্তা হত

বাঁশির। মোবাইলে ফোন করত। এখন হয় না। শেষরাতে ছাদ থেকে নেমে ঘরে একাই শুতে যায়। ছাদটা বাঁশির খুব প্রিয়। আশপাশে কোনো বাড়ি নেই যে কেউ তাকে দেখতে পাবে। এই বাড়িটা পাড়া থেকে দলছুট। একদিকে গাছপালা, অন্য দিকে বন্ধ কারখানার আব্রু। বাঁশির মনে হয়, তার কথা ভেবেই যেন ছাদটা রয়েছে। এই ছাদ জানত, একদিন অনেক দূর থেকে একটা মেয়ে তার কাছে আসবে। বসে থাকবে চুপ করে। কখনো আকাশ দেখে মুগ্ধ হবে। কখনো কাঁদবে চুপিচুপি। সেই সুখ-দুঃখের কথা সে ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না।

আজও বাঁশি এসেছিল। আজ গরম বেশি। মাদুর পেতে শুয়েছিল চিত হয়ে। আর তখনই মনে হল কে যেন...।

বাঁশি ছাদের চারপাশে তাকাল। না, কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। ছাদের এক কোনায় কয়েকটা ফুলগাছের টব। প্রায় সবকটাই মরা। রসহীন শুকনো মাটি ভরতি, অগোছালো, নোংরা ফুল বলতে একটা গাছে কেবল জবা হয়। বিয়ের প্রথম প্রথম গাছের যত্ন করত বাঁশি নিজে। নতুন টব কিনত, গাছ লাগাত। সেসব এখন অতীত। টবের পাশ থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। সিঁড়িও ন্যাড়া। ছাদের দু-কোনায় আধখেঁচড়া দুটো পিলার। ফুটখানেক করে উঁচু। তাতে বাঁশ বাঁধা। বাঁশের মাথায় কাপড় শুকোতে দেওয়ার তার চলে গেছে এপাশ থেকে ওপাশে। বিয়ের প্রথম প্রথম ন্যাড়া সিঁড়ি, ন্যাড়া ছাদে অস্বস্তি হত। অসম্পূর্ণ মনে হত। ভয় হত পড়ে যাবে। এখন হয় না।

বাঁশি সিঁড়ির দিকে তাকাল। তাকে ছুঁয়ে কেউ কি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচে? গা ছমছম করে উঠল বাঁশির। তা কী করে হবে? কে আসবে ছাদে? নীচে দুটো বুড়োবুড়ি শুয়ে আছে। সদরে কোলাপসেবল টানা, বাঁশি উঠে দাঁড়াল। নেমে যাবে আজ। কেমন একটা লাগছে। ভয় ভয় করছে। সেদিন কান্তি বাড়ি ছিল না। রাতে যতবার ঘুম ভেঙেছে, ততবার কাঁধের সেই ছোঁয়াটা ফিরে ফিরে এসেছে! বাঁশি উঠে জল খেল। গরম খুব, তবু জানলা বন্ধ করে দিল।

দ্বিতীয় দিনের ঘটনা ঘটে ঠিক তিন দিন পর। সন্ধের সময়। সন্ধে না-বলে রাতের শুরু বলাই উচিত। আটটার একটু পরে।

দুপুর থেকেই শ্বশুরমশাইয়ের শরীরটা খারাপ। বেশি কিছু নয়, সামান্য অম্বলের মতো হয়েছে। শাশুড়ি নিজের মনে গজগজ করছে। সেই গজগজের একটুও স্বামীর শরীর বিষয়ক নয়। মহিলার এই এক স্বভাব। স্বামীর অসুস্থতা বাড়লে তিনি গজগজ করেন। বিকেল থেকেই গজগজানির পরিমাণ বেড়েছে। তাতে নোংরা কথা।

'আমার কপালটাই খারাপ...নইলে দু-দুটো বউ এনে ঠকব কেন? সবাই আমার ভালোমানুষ ছেলেটার সুযোগ নেয়। আরে পুরুষমানুষ কি এমনি এমনি জাগে? তাকে রং-ঢঙ দিয়ে জাগাতে হয়। আমরা জাগাইনি?...তোরা রং-ঢঙ সব পরের ঘরে ফুরিয়ে আসবি, হবে কী করে?...আসলে সম্পত্তির লোভ। আমি বুঝি না

ভেবেছে, সব বুঝি...জানে বাপ-মা মরলেই বাড়িটা পাবে...। সবকটাকে কাপড় তুলে ঝ্যাটাপেটা করতে পারলে শান্তি পেতাম...।'

আটটার পরে ইলেকট্রিক চলে গেল। রান্নাঘর ছেড়ে বেরোতেই বাঁশি বুঝল, শুধু পূর্ণিমা নয়, তার থেকেও বেশি কিছু। ঘরের একমাত্র জানলা দিয়ে আলো এসে ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছে। যেন রোদ পড়েছে। চাঁদের রোদ! হালকা একটা অস্বস্তি শুরু হল বাঁশির। জানলার কাছে এসে চমকে উঠল। কারখানার মাথায় যে-চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সে চেনে না! এই চাঁদ কর্কশ, দগদগে। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাসছে মিটিমিটি। সে-হাসিতে মায়াভরা আলো নেই, আছে পুরুষের উগ্র কামনা। এতক্ষণ যেন বাঁশির জন্যই অপেক্ষা করছিল। ভাবছিল মেয়েটা কখন এসে দাঁড়াবে জানলার কাছে। শিউরে উঠল বাঁশি। জানলা থেকে সরে যেতে গেল দ্রুত। আর তখনই জ্যোৎস্না এসে পড়ল তার শরীরে। বাঁশির মনে হল, কে যেন তাকে জাপটে ধরেছে। প্রবেশ করতে চাইছে তার কোমল শরীরে। গা গুলিয়ে উঠল বাঁশির। তীব্র আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে...।'

শাশুড়ি ঘরে ঢুকল হুড়মুড়িয়ে। পুত্রবধূকে চেপে ধরল দু-হাতে। বাঁশি তখনও চোখ বোজা, তখনও ছটফট করছে। রাতে তাড়স দিয়ে জ্বরও এল বাঁশির। তবে সেই জ্বর নেমে গেল এক রাতে। সকালে খুব লজ্জা পেল বাঁশি। শাশুড়িকে বলল, 'হঠাৎ ভয় পেয়েছিলাম। ছি ছি আপনাকে খুব ঝামেলায় ফেললাম মা।'

কান্তিকে ডেকে তার মা বলল, 'একবার ডাক্তার দেখা খোকা। আমার কেমন জানি লাগছে। ওই মেয়ে তো আর কচি খুকি নয় যে বলা নেই কওয়া নেই ভর সন্ধেতে ভয় পাবে।'

কান্তি বিরক্ত হয়ে বলল, 'পেলেই-বা কী? উফ এর জন্য ডাক্তার লাগবে?'

বাঁশির শাশুড়ি গলা নামিয়ে বললেন, 'গাধার মতো কথা বলিস না। একটা সোমত্ত মেয়ে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বলে চিল্লোচ্ছে, আর তুই বলছিস ডাক্তার লাগবে না? আমি বলে দিলাম, হয় এই মেয়ের বাইরে লটঘট আছে নয় মাথার গোলমাল হয়েছে। দুটোর একটা হলেই আমার কেল্লাফতে। আমি আরও একবার চেষ্টা করব।' কথা শেষ করে চোখ বুজে দু-হাত জড়ো করে কপালে ঠেকালেন মহিলা।

'কী চেষ্টা?' কান্তি অবাক হয়ে বলল।

'পাগল বা নষ্ট বউকে তাড়াতে কোনো সমস্যা হয় না। আদালতে গেলেই হবে। আবার একটা বউকে আনব। আবার চেষ্টা করব। অসুবিধে কোথায়? মরা মাছের মতো তাকিয়ে থাকিস না, যা বললাম কর।'

ডাক্তার বৃদ্ধ। আগে কারখানার লেবারদের দেখতেন। তখন রমরমা অবস্থা ছিল। কারখানা বন্ধের পর থেকে চেম্বার ফাঁকাই থাকে। ডাক্তারবাবু বাঁশিকে দেখলেন অনেকটা সময় ধরে। চোখ, নাড়ি, জিভ। বুকে পিঠে স্টেথো বসিয়ে বললেন, 'জোরে জোরে নিশ্বাস নাও মা। আরও জোরে।' তারপর বললেন, 'তেমন

কিছু হয়নি। তবে অ্যাকিউট অ্যানিমিয়া। হিমোগ্লোবিন কম। সেখান থেকেই দুর্বলতা। সেই দুর্বলতা মনেও ছড়িয়েছে। তাই ভয় পেয়ে চিৎকার করে ফেলেছে। ক-টা দিন টানা ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাবে। শরীরে জোর ফিরবে, মনেও। আগে একটা ব্লাড কাউন্ট করতে হবে।'

সব শুনে শাশুড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিক আছে ওষুধ খাক। কবে মাথা ঘুরে উনুনের ওপর ফিট হয়ে পড়বে। লোকে বলবে, শাশুড়ি বউ মেরেছে। এই বয়েসে জেলে গিয়ে দরকার নেই বাপু।'

ওষুধ যবে শেষ হওয়ার কথা তার থেকেও সময় দু-দিন বেশি লাগল। মাঝখানে দু-দিন ওষুধ খেতে ভুলে গিয়েছিল বাঁশি। আর তৃতীয়বারে ঘটনা ঘটল, সেই ওষুধ শেষ হওয়ার ঠিক সাত দিনের মাথায়।

বহুদিন পরে সেদিন রাতে ছাদে গেল বাঁশি। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে বলেই গেল। সন্ধে থেকেই আকাশে মেঘ। সেইসঙ্গে ঠান্ডা হাওয়া। কিন্তু বৃষ্টি নেই। অথবা বৃষ্টি হয়েছে দূরে কোথাও। সব মিলিয়ে ভারি চমৎকার। মেঘের কারণে চাঁদ-তারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না আজ। হাওয়ায় মেঘেরা ছোটাছুটি করছে। যেন খেলছে। বাঁশি শুয়ে শুয়ে সেই খেলা দেখছে। তবে মন থেকে এখনও সেদিনের লজ্জা যায়নি। ছি ছি, কী কাণ্ডটাই না করেছিল! বাড়ির বউ ভয়ে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলছে! ইস মাগো। শরীর দুর্বল হলে মানুষ ভয় পায় নাকি? তাও আবার কী দেখে ভয়? না, চাঁদ দেখে! চাঁদের মতো সুন্দর আর কী আছে? তাকে দেখে কেউ কখনো ভয় পেতে পারে? ভাগ্যিস চাঁদের কথাটা কেউ জানে না। জানলে নিশ্চয় পাগল ভাবত। বাঁশি চোখ বুজল। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। আরামের ঘুম পাচ্ছে বাঁশির। শুয়ে শুয়েই গায়ের কাপড়-জামা আলগা করল বাঁশি। নিশ্চয় সেদিন কোনো ভুল হয়েছে। হয়তো চাঁদের অত আলোয় বিভ্রম হয়েছিল কোনো। কোনো ছায়া দেখেছে। তার ওপর শরীরটাও তো অনেকদিন ধরেই খারাপ যাচ্ছিল। খারাপ শরীরে মানুষ অনেক ভুল দেখে...ভাবে...নিজের সঙ্গে হাবিজাবি কথা বলতে বলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল বাঁশি।

সেই ঘুম ভাঙল হ্যাঁচকা টানে। চমকে উঠে চোখ খুলল বাঁশি। কে যেন তার শাড়ি ধরে টানছে। ইতিমধ্যে ওপরের অংশটা খুলে ফেলেছে। এখন চেষ্টা করছে কোমর থেকে বাকিটা সরিয়ে নিতে। বুকের মাঝখানে হাত চাপা দিয়ে দ্রুত উঠে বসল বাঁশি। হঠাৎ ঘুম ভাঙায় চারপাশটা কেমন ঘোর আর বেশি অন্ধকার। জড়িয়ে যাচ্ছে সব। দিক ভুল হচ্ছে। শাড়ির আঁচল খুঁজতে বাঁশি হাতড়াতে লাগল মাদুরের চারপাশ। কোথায় আঁচল? কোথায়? টান বাড়ছে। কেঁপে উঠল বাঁশি। ঝড়ে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কাপড়? কিন্তু হাওয়া তো থেমে গেছে। থম মেরে আছে চারপাশ। তাহলে? তখনই বাঁশি মুখ নামিয়ে দেখতে পেল দু-পায়ের হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন হয়ে পড়েছে সে। শিউরে উঠল। এবার দু-হাতে কাপড় ধরে জোরে টান দিল। ছাদে পড়ে থাকা পাথরের টুকরো বা কোনো পেরেকে যদি আটকে থাকে। যদি কেন?

নিশ্চয় তাই হয়েছে। আর তখনই বাঁশির মনে হল, তার বুকের ওপর কেউ হাত রেখেছে। খসখসে সেই হাত ব্লাউজের হুক খুঁজছে! গলায় আঁচড় কাটছে। বাঁশি বুঝতে পারল, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। সত্যি সে পাগল হয়ে গেছে।

জ্ঞান হারানোর ঠিক আগের মুহূর্তে বাঁশি দেখতে পেল, মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারছে চাঁদের একটা ফালি। চাঁদ নয়, ঝকঝকে ক-টা দাঁত! ধারালো, রুপোলি, সেই দাঁত ঠিকরে দিচ্ছে আলো। পুরুষালি বিক্রমে তারা নেমে আসছে বাঁশির মুখের ওপর, স্তনের ওপর, দুই উরুর মাঝখানে।

ডাক্তার সেনগুপ্তর বয়স বেশি নয়। চেহারায় অতিরিক্ত ঝকঝকে একটা ভাব। মানসিক রোগের চিকিৎসকদের সম্ভবত এই ভাবটা রাখতে হয়। রোগী ভরসা পায়। অবশ্য এই মুহূর্তে ডাক্তার সেনগুপ্তর সামনে রোগী নেই। আছে রোগীর স্বামী। রোগী এখন অনেক দূরে, তার মায়ের কাছে। সেখানে যেতে হলে বর্ধমানে নেমে ট্রেন বদলাতে হয়। কান্তি এসেছে কলকাতায় ডাক্তারের কাছে। কান্তির মা-ই কলকাতার ডাক্তারের কথা বলেছিলেন। নামকরা পাগলের ডাক্তার রোগীকে দেখছে শুনলে কোর্টে সুবিধে হবে। এসব কাজে কিপটেমি করা বোকামি। কান্তি সে-কথা শুনেছে। স্ত্রীকে দেখিয়ে নিয়ে গেছে। এখন এসেছে দু-লাইন লিখিয়ে নিতে। তার স্ত্রী যে মানসিক অসুখে ভুগছে সে-সম্পর্কে দু-লাইন। উকিলের সঙ্গে কথাও হয়ে গেছে। উকিল বলেছে, আজকাল শুধু প্রেসক্রিপশনে হয় না। নির্দিষ্ট ডায়াগ্নোসিস এবং কেস হিস্ট্রি জমা দিতে পারলে মামলা সহজ হয়। উকিলের কথা চেপে কান্তি সেই লেখা নিতে এসেছে।

ডাক্তার সেনগুপ্ত বললেন. 'আপনার স্ত্রীকে দেখার পর, এই ক-টা দিন আমি বিস্তর বইপত্র ঘেঁটেছি, সাইট দেখেছি। অসুখটাকে লোকেট করেছি শেষপর্যন্ত। আপনি কি নামটা শুনতে চান?'

কান্তি উৎসাহী গলায় বলল, 'অবশ্যই চাই স্যার। আপনি স্যার দয়া করে একটা কাগজে যদি লিখে দেন, সত্যি কথা বলতে কী, সেই কারণেই আজ আমার আসা।' একটু থেমে কান্তি বলল, 'স্যার অসুখটা কঠিন ধরনের পাগলামি তো?'

ডাক্তার সেনগুপ্ত খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'কঠিন না নরম কীরকম পাগলামি বলতে পারব না, তবে এটা একটা আতঙ্ক। ফোবিয়া। আপনাব স্ত্রীর সঙ্গে সেদিন যখন আমি একা কথা বলছিলাম, তিনি আমাকে বার বার চাঁদের কথা বলেন। তিন দিনের ঘটনার সঙ্গেই চাঁদের একটা যোগাযোগ ছিল। প্রথমে কনফিউজড হলেও পরে আমি ওই লাইনেই খুঁজতে শুরু করি। খুঁজতে খুঁজতে জানতে পারি একে বলে সেলেনোফোবিয়া। চাঁদ থেকে এক ধরনের ভয় তৈরি হয়।'

কান্তি ঢোক গিলে বলল, 'কী বললেন স্যার? ঠিক বুঝতে পারলাম না...।'

ডাক্তার সেনগুপ্ত চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'সেলেনোফোবিয়া। বাংলায় কী হবে? চন্দ্রাতঙ্ক? আমিও ঠিক জানতাম না। বিষয়টা ইন্টারেস্টিং। প্রকৃতির সুন্দর

সৃষ্টিগুলোর একটা হল চাঁদ। কত গান কবিতা ছবি তাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে। আরও হবে। অথচ তার থেকেই মানুষের আতঙ্ক। সত্যি মানুষের মন বড়ো আশ্চর্যের!'

কান্তি ঠোঁট চেটে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার। এক গ্লাস জল হবে?'

'আমাদের চেনা আতঙ্ক অনেক রকম আছে। যেমন কারো পোকা দেখলে ভয়, কেউ ভয় পায় অঙ্কে, কারো ভয় করে বেশি উঁচুতে উঠলে। তেমন আবার নানা ধরনের অচেনা আতঙ্কও আছে। এগুলো খুব কম মানুষের হয়। সেলেনোফোবিয়া সে-রকমই একটা। এই অসুখে চাঁদ দেখলে মনের ভেতর এক ধরনের অ্যাংজাইটি তৈরি হয়। বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সেই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে শরীরে। কখনো উত্তেজনা, কখনো ঝিমিয়ে পড়া ভাব আসে। তার সঙ্গে বমি, নিশ্বাসের গোলমাল সহ অন্য ঝামেলা।'

কান্তি বেশ খানিকটা চুপ করে রইল। কী যেন ভাবল। তারপর যেন আপনমনে বলল, 'স্যার, এই অসুখের কি কোনো চিকিৎসা আছে?'

ডাক্তার সেনগুপ্ত মৃদু হেসে বললেন, 'অসুখ যখন ধরতে পেরেছি, চিকিৎসাও পারব। আমি ওষুধ বদলে দিচ্ছি।'

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখছেন। পাথরের মতো বসে আছে কান্তি। তার খারাপ লাগছে। চাঁদ-টাদ নিয়ে সে কোনোদিনও ভাবেনি। শেষ কবে চাঁদ দেখেছে মনে পড়ে না। সে মাটির দিকে তাকিয়ে মুখ গুঁজে চলা মানুষ। আকাশের চাঁদ দেখবে কী করে? তবু কেন জানি তার খারাপ লাগছে এখন। কেন লাগছে? মানুষের মন আশ্চর্যের বলে কি? চাঁদের মতো সুন্দর জিনিসের জন্য মেয়েটার এত কষ্ট কেন হবে? তার কি কিছুই করার নেই? কিছু করতে না-পারুক, পাশে তো থাকতে পারে। বাঁশি তার আগের বউয়ের মতো নয়। তাকে ছেড়ে চলে যায়নি। আচ্ছা, আজ যদি কাউকে না-জানিয়ে সে ওষুধ নিয়ে সোজা বর্ধমানের ট্রেন ধরে কেমন হয়? সেখান থেকে বাঁশির মায়ের ওখানে পৌঁছোতে কত রাত হবে? তখন কি চাঁদ উঠবে?

প্রসাদবাবুর ভয়

একটাই ঘর। দোতলায় ছাদের ওপর। ঘর খুব বড়ো। একজন কেন, পাঁচজন হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারে। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ছাদটাও বড়ো। শহরের এ-পাড়াটা বেশ নিরিবিলি। গাছপালা অনেক। এই বাড়ির চারপাশেও গাছ। ভেতরে একটা ছোটোমতো বাগান রয়েছে। তবে সে-বাগানে ফুল ফলের গাছ কিছু নেই, শুধুই আগাছা। থাকার মধ্যে রয়েছে শুধু ঝাঁকড়া একটা নারকোল গাছ। গাছটা বাড়ির গা ঘেঁষে একেবারে ছাদ পর্যন্ত উঠে এসেছে। ছাদের ছোট্ট পাঁচিল টপকে ডালপালা নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে ছাদের ওপর। বাড়ি দেখে প্রসাদবাবুর মনটা ভালো হয়ে গেল। ভগ্নীপতি কিঙ্কর আর বোন ছন্দাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালেন। এ-বাড়িটায় না-এলে মস্ত বোকামি হয়ে যেত। এমন চমৎকার ঘর, এমন চমৎকার ছাদ কোথাও পাওয়া যাবে না। এর পরেও প্রসাদবাবুর মন হালকা খচখচ করে উঠল। কারণ কী?

কারণ চুয়ান্ন বছরের প্রসাদবাবু একজন ভীতু মানুষ। অন্ধকার ঘর, খাটের তলার খুটখাট দরজার ক্যাঁচকোঁচে তিনি চমকে ওঠেন। তাই ছাদ দেখেও একটু ঘাবড়ে গেছেন। ছোটোদের ভূতের ভয় মানায়। কিন্তু বড়োরা ভূতে ভয় পেলে সেটা বিরাট একটা হাসিঠাট্টার ব্যাপার হয়। আমাদের এই প্রসাদবাবুর বেলাতেও তাই হয়েছে। সবাই তাঁর ভূতের ভয় নিয়ে মজা করে। হয়তো কোনো একদিন অফিসে ফাইল নিয়ে ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে গেছেন। সেখানে কাজ করেন শিশিরবাবু। তিনি ফাইল সরিয়ে নীচু গলায় বলেন, "হিসেব-টিসেব পরে হবে দাদা, আগে বলুন, কাল রাতে ওরা কেউ এসেছিল নাকি?"

প্রসাদবাবু অবাক হয়ে বলেন, "কারা? রাতে কারা আসবে?"

শিশিরবাবু ঝুঁকে পড়বেন, আরও গলা নামিয়ে বলবেন, "আরে বাবা, রাতবিরেতে আপনার কাছে যারা আসে তাদের কথা বলছি। ওই যে লম্বা লম্বা হাত, উলটো দিকে গোড়ালি...কেউ এসেছিল নাকি?"

প্রসাদবাবু শুকনো হেসে বলেন, "ঠাট্টা করছেন?"

শিশিরবাবু হেসে ফেলেন। বলেন, "না না ঠাট্টা করব কেন? ভূত খুব সিরিয়াস একটা বিষয়। সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কখনো ঠাট্টা করা যায়? আমার ছোটো ছেলেটা ক্লাস ফাইভে পড়ছে। সেও ঠিক আপনার মতো। ভূত নিয়ে হাসিঠাট্টা একেবারে সহ্য করতে পারে না। হা হা।"

অফিসের বাইরেও একই কাণ্ড। পাড়াতেও অনেকে তার ভয়ের কথা জানে। সেদিন সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরছিলেন প্রসাদবাবু। গলির মোড়ে জটলা করে দাঁড়িয়ে ছিল পাড়ার ছেলেরা। প্রসাদবাবুকে দেখে চুপ করে গেল। পল্টু গম্ভীর গলায় বলল, "প্রসাদকাকু নাকি?"

প্রসাদবাবু থমকে গেলেন। বললেন, "কিছু বলবে পল্টু?"

পল্টু সিরিয়াস গলায় বলল, "না তেমন কিছু নয়, আপনাকে একটু সাবধান করে দিচ্ছিলাম।"

"সাবধান! কীসের জন্য? গোলমাল-টোলমাল কিছু হয়েছে নাকি?"

পল্টু গলা গম্ভীর করে বলল, "না এখনও হয়নি, তবে হতে পারে। আজ অমাবস্যা কিনা। ভূতেদের ফেভারিট তিথি। এইজন্য আপনাকে বলছিলাম সাবধানে থাকবেন কাকু।"

ছেলেরা সবাই হেসে উঠল। প্রসাদবাবু মাথা নামিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

শুধু বাইরের লোক নয়, নিজের লোকেরাও প্রসাদবাবুকে ছাড়ে না। আসানসোল থেকে বিচ্ছু ভাগনে ফোন করে বলে, "মামা, নেট সার্চ করে দেখলাম, জাপানে একটা দারুণ জিনিস বেরিয়েছে। ঘোস্ট লক। ভূত ঠেকাতে তালা! জানলা দরজায় লাগালে ঘরে ভূত ঢুকতে পারবে না। যদি বল তো একটা অর্ডার দিই।"

প্রসাদবাবুর রাগ হয়। ইচ্ছে করে ভাগনেকে একটা ধমক দিই। কিন্তু পারেন না। কারণ দোষ তো আর অন্য কারো নয়, দোষ তার নিজের। বুড়ো বয়েসে ভূতের ভয় পেলে সকলেই রসিকতা করবে। ব্যাপারটাও বিচ্ছিরি। বয়সকালের নানা অসুখ আছে। বাত, দাঁত ব্যথা, কান কটকট। সেসবের ওষুধ আছে। ভূতের ভয় কাটানোর কোনো ওষুধ নেই। প্রসাদবাবু রোজই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, আর নয়, এবার মনে জোর এনে ভয়ের অসুখ সারাবেন। কিন্তু পারছেন না। কী লজ্জার কথা!

প্রসাদবাবুর পুরো নাম প্রসাদরঞ্জন প্রামাণিক। সহজ সরল ছাপোষা মানুষ। কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরের এই শহরে ছোটোখাটো একটা চাকরি করেন। ঠিক সময়ে অফিসে আসেন। টিফিনের সময় অফিসের নীচে নেমে ফুটপাতের দোকান থেকে টোস্ট আর কলা কিনে টিফিন সারেন। সহকর্মীরা বলেন, "ও প্রসাদদা, পাঁউরুটি কলা ছেড়ে একদিন অন্য কিছু হবে নাকি? একটা ফিশফ্রাই বলি?"

প্রসাদবাবু অল্প হেসে দু-পাশে মাথা নাড়েন। বলেন, "না ভাই, আমার এই পাঁউরুটিই ভালো।"

প্রসাদবাবু সাধারণ খাবার পছন্দ করেন, সাধারণভাবে থাকেন। যাকে বলে সিম্পল লিভিং। বিয়ে থা করেননি। নিজের লোক বলতে, বোন-ভগ্নীপতি। তারা থাকে আসানসোলে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রসাদবাবু 'সুখে আছি' নামের একটা মেসবাড়িতে ছিলেন। স্টেশনের ঠিক পাশেই। বাড়িটা অতি পুরোনো। মেসের মালিক 'সারাচ্ছি, সারাব' করেছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু করেননি। একদিন সকালে 'সুখে আছি'তে একটা কাণ্ড ঘটল। খাওয়ার ঘরে সবাই খেতে বসেছে। অফিস যাওয়ার তাড়া। হঠাৎ ছাদ থেকে ঝিরঝির করে বালি সুরকি ডাল, মাছের ঝোলের ওপর ঝরে পড়তে লাগল। মেসের মালিক চিৎকার করে উঠলেন, "ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!" খাওয়া-টাওয়া ফেলে সবাই ছুটল বাড়ির বাইরে। দু-একজন ভাতের থালাও হাতে নিয়ে ছুটল। একটু পরেই বোঝা গেল, 'ভূমিকম্প-টুমিকম্প বাজে কথা। পুরোনো মেসবাড়ি এবার ভেতর থেকেও ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। চুন, সুরকি ফেলে ওয়ার্নিং দিচ্ছে। এরপর মাথায় ইট পাথর, লোহালক্কড় ফেলবে। এরপরই 'সুখে আছি' মেস খালি করে মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। কাজ শেষ হতে সময় লাগবে। বছরখানেকও লাগতে পারে। যাঁরা মেসে ছিলেন তাঁরা নিজেদের মতো ব্যবস্থা করে নিলেন। এই ছোটো শহরে আর দ্বিতীয় মেস নেই। কেউ গেলেন আশপাশের আত্মীয়র বাড়িতে। কেউ দলবেঁধে বাড়ি ভাড়া করলেন। কেউ আবার হোটেলে ঘর নিলেন। প্রসাদবাবুও তাই করলেন। অফিসের কাছাকাছি একটা হোটেলে উঠলেন। কিন্তু খরচে পোষাতে পারলেন না। তারওপর হোটেলের খাওয়াও তাঁর একেবারে সহ্য হল না। সারাদিন ঢেকুর ওঠে।

এ-রকম সময় আসানসোলে বসে এই বাড়িটার ব্যবস্থা করে দিল কিঙ্কর আর ছন্দা। বাড়ির মালিক আসানসোলে চাকরি করেন। পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকেন। এক বছর হল বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। অনেকদিন ধরে নিজের একজন পছন্দসই ভাড়াটে খুঁজছিলেন। ছাদের ঘরে থাকবেন। বয়স্ক মানুষ, যিনি ভাড়া থাকবেন, অথচ পুরোপুরি ভাড়াটে হবেন না। বাড়িটা একটু দেখভালও করবেন। ছেলেপিলেরা পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকলে ধমক দেবেন, ভবঘুরেরা বারান্দায় উঠে আস্তানা গাড়তে চাইলে তেড়ে যাবেন, রোববার করে লোক ডেকে বাগানের আগাছা কাটাবেন। প্রস্তাবটা লুফে নিল কিঙ্কর। কারণ ভাড়া অতি যৎসামান্য। কিঙ্কর প্রসাদবাবুকে টেলিফোনে সব বলল। প্রসাদবাবু বললেন, "বাড়ি দেখভাল করতে হবে মানে? এটা আমার পছন্দ নয় কিঙ্কর। উটকো ঝামেলা।"

কিঙ্কর বিরক্ত গলায় বলল, "চুপ করুন। বাড়ি দেখভাল মানে কী আর লাঠি হাতে রাত জেগে পাহারা? একটু আধটু হাঁকডাক দিলেই হবে। বাড়ির মালিক ভয় পাচ্ছে, খালি বাড়ি দেখে এরপর চোর ডাকাত দরজা, জানলা খুলে নিয়ে না-যায়। এইজন্যই একজনকে চাইছে। বছরখানেক আগে ওই বাড়িতে কী যেন একটা গোলমাল হয়েছিল। তারপর থেকে বাড়ি বন্ধ।"

প্রসাদবাবু ঢোক গিলে বললেন, "কী গোলমাল?"

ভগ্নীপতি আরও বিরক্ত হয়ে বলল, ''আমি জানি না। আপনি বোনের সঙ্গে কথা বলুন।''

ছন্দা টেলিফোন ধরে দাদার ওপর রাগ দেখাল। বলল, ''কী গোলমাল জেনে তোমার কী হবে দাদা?''

প্রসাদবাবু মিনমিন করে বললেন, 'চুরি-টুরি নয় তো?''

''চুরি, ডাকাতি, খুন যাই হোক তোমার কী? কিচ্ছু না। তোমার সস্তায় বাড়ি চাই। ব্যস সব গোলমাল মিটে গেল। এই সপ্তাহেই মালপত্র নিয়ে ওখানে চলে যাবে। ওই ঘর কিন্তু মোটেও ফাঁকা থাকবে না এই বলে দিচ্ছি। দেখবে, তোমার পুরোনো মেসেরই কেউ ডবল ভাড়া দিয়ে নিয়ে নিয়েছে। তখন মাথা চাপড়াতে হবে। আজই তোমার ভগ্নীপতি বাড়ির মালিককে একমাসের অ্যাডভান্স ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে। পরশুর মধ্যেই লোক মারফত তোমার কাছে চাবি চলে যাচ্ছে। শুনেছি নিরিবিলি জায়গা। ছাদের ওপর ঘর বলে রোদ হাওয়া ফ্রি। কোনো ঝামেলা নেই। তুমি মেসবাড়ির অন্ধকার ছোটো ছোটো ঘরে থাকতে বলেই তোমার ওইসব ভূত-টুতের ভয়। খোলামেলা জায়গায় থাকবে, আজেবাজে ভয় পালাবে। তা ছাড়া খাওয়া নিয়ে চিন্তা নেই। ওই বাড়িতে একসময় কাজ করত বীণার মা, সে তোমার রান্নাবান্না করে দেবে। আমি বলে রাখব।''

প্রসাদবাবু বললেন, ''বাড়িতে গেলাম না, তার আগেই রান্নার লোক ঠিক করে ফেললি!''

ছন্দা কিছু একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। বলল, ''তুমি অত ভেব না। আমি নিজে গিয়ে তোমার নতুন বাড়ি গুছিয়ে দিয়ে আসব। ওকে ছুটি নিতে বলেছি।''

প্রসাদবাবু বুঝলেন আর কোনো উপায় নেই। বোন ভগ্নীপতির ঠিক করে দেওয়া বাড়িতে উঠতেই হবে। বেচারিরা অতদূর থেকে বাড়ি খুঁজে দিয়েছে এটাও একটা কথা। দিনতিনেক পর এক ভোরবেলা মালপত্র নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে এলেন প্রসাদবাবু। এসে দেখলেন, সত্যি অসুবিধে কিছু নেই। একতলা বাড়ি। নীচটা বড়ো বড়ো তালা দিয়ে বন্ধ। পাশ দিয়ে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে লোহার সিঁড়ি। উঠে গেলে ছাদ, একপাশে ঘর। ঘর দেখে প্রসাদবাবু চমকে উঠলেন। ঘর তো বিরাট! হেসেখেলে গড়াগড়ি দিয়ে থাকতে পারবেন। ঘরের কোনায় খাট। খাটের মাথার কাছে জানলা। জানলা খুলতেই ছাদ। সেটাও বড়ো। ভোরের নরম রোদ পড়েছে। নারকোল গাছটা ঝুঁকে আছে শান্ত ভঙ্গিতে। একটু একটু দুলছে। বাঃ! অল্পক্ষণের মধ্যেই মনের খচখচানি দূর হয়ে গেল প্রসাদবাবুর। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, এবার বদলে যাবেন। ভূত-টুতের ছেলেমানুষি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবেন একদম। সবাই চমকে যাবে। হাসিঠাট্টা বন্ধ হয়ে যাবে। আজ সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে মাদুর পেতে ছাদটায় খানিকক্ষণ বসে থাকলে কেমন হয়?

বেলা একটু বাড়তেই এগারো-বারো বছরের একটা মেয়ে এসে হাজির হল।

মিষ্টি দেখতে। গায়ে একটা ফুলকাটা ফ্রক। ঘাড়ের দু-পাশে দুটো বিনুনি ঝুলছে। তাতে লাল রঙের সস্তার ফিতে। কপালে ছোট্ট একটা কালো টিপ। প্রসাদবাবু বললেন, "তুই কে?"

মেয়েটা হাসি হাসি মুখে বলল, "আমি বীণা।"

প্রসাদবাবু বললেন, "বীণা কে?"

মেয়েটা ফিক করে হেসে বলল, "বীণার মায়ের মেয়ে।"

প্রসাদবাবুর এবার মনে পড়ে গেল। 'বীণার মা' মানে যে-মহিলা তাঁর রান্না করবে। প্রসাদবাবু বললেন, "তোর মা কোথায়?"

বীণা বলল, "মায়ের জ্বর হয়েছে। আমায় বললে, তুই গিয়ে রান্না করে দিয়ে আয়, নইলে নতুন মানুষ বিপদে পড়বে।"

প্রসাদবাবু অবাক হয়ে বললেন, "তুই কী রান্না করবি? এইটুকু মেয়ে।"

বীণা হেসে বলল, "এইটুকু মেয়ে বলে এইটুকু এইটুকু রান্না পারব। ভাত, ডাল, আলুভাজা। চলবে?"

প্রসাদবাবু মেয়েটার কথা শুনে মজা পেলেন। বললেন, "ডাল ভাতে খুব হবে। তুই বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারিস তো বীণা?"

"গুছিয়ে রান্নাও করতে পারি। হি হি।"

প্রসাদবাবুও হাসলেন। বললেন, "তুই কথায় কথায় হাসিস কেন?"

বীণা এক মুখ হেসে বলল, "মনে হয় হাসির রোগ আছে।"

প্রসাদবাবু চোখ পাকিয়ে তাকালেন। বীণা রান্নাঘরে ছুটে পালাল। রান্নাঘর পাশেই। বীণা ছুটে যাওয়ার সময় একটা ঝম ঝম আওয়াজ পেলেন প্রসাদবাবু। মেয়েটা ঘুঙুর পরেছে নাকি? কই চোখে পড়ল না তো! কে জানে ছোটো মেয়েরা ছোটাছুটি করলে বোধ হয় এ-রকম ঘুঙুরের আওয়াজ হয়। প্রসাদবাবু হেসে ফেললেন। অফিস যেতে হবে। খানিক পরে খবরের কাগজ রেখে স্নানে গেলেন। এ-বাড়িতে জলের সমস্যা নেই। সময় নিয়ে স্নান করা গেল। 'সুখে আছি' মেসে জলের টানাটানি ছিল। মাথাপিছু এক বালতি পাওয়া যেত। খেতে বসলেন প্রসাদবাবু। বীণা রান্না খারাপ করেছে। সবেতেই গাদাখানেক চিনি। ছোটোমেয়ে কতটা আর পারবে। খাওয়া শেষে প্রসাদবাবুকে মুখ ধোওয়ার জল এগিয়ে দিল বীণা। বলল, "রান্না ঠিক হয়েছে?"

প্রসাদবাবু বললেন, "ঠিক আছে। রাতের রুটি করতে কখন আসবি?"

বীণা বলল, "আমি আর আসব না। রাতের রুটি তরকারি করে গেলাম। কাল থেকে মা আসবে। বীণার মা। হি হি।"

বীণার হাসি শুনে প্রসাদবাবুর ভালো লাগল। তবু বললেন, "ফাজিল মেয়ে আবার হাসে? চড় খাবি এবার। ঠিক আছে, তুইও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে মাঝেমধ্যে চলে আসিস।"

"কী জানি মা আমাকে আসতে দেবে কি না। মনে হয় না দেবে।"

প্রসাদবাবু বললেন, "আমি বলে দেব।"

প্রসাদবাবু অফিস যাওয়ার জন্য বেরিয়ে ঘরে তালা দিলেন। বীণা দাঁড়িয়ে ছিল ছাদের এক কোনায়। প্রসাদবাবু বললেন, "কীরে বাড়ি যাবি না?"

"আমি একটু থাকব এখানে? এই বেশি না, খানিকক্ষণ।" দু-আঙুল ফাঁক করে 'খানিকক্ষণ' সময়টা দেখাল বীণা।

প্রসাদবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "থাকবি! কী করবি?"

বীণা আবদারের ঢঙে বলল, "ছাদে খেলব।"

"বাড়ি গিয়ে খেল।"

বিনুনি ঝাঁকিয়ে বীণা বলল, "মা খেলতে দেবে না, আবার কাজে পাঠিয়ে দেবে।"

এমনিতেই মেয়েটাকে খুব পছন্দ হয়েছে প্রসাদবাবুর, এখন মনটা আরও নরম হয়ে গেল। আহা রে, ছোটো মেয়ে। কাজকর্ম করে খেলতে চাইছে। হেসে বললেন, "সে না হয় থাকবি। কিন্তু খেলবি কার সঙ্গে? একা?"

বীণা উৎসাহ নিয়ে বলল, "একাই খেলব। ছক কেটে এক্কাদোক্কা খেলব। আর ওই যে গাছটা আছে, নারকোল গাছটা ওর সঙ্গেও খেলব। দেখ না, আমার সঙ্গে খেলবে বলে একেবারে ছাদে উঠে এসেছে? হি হি। আমরা হাত ধরাধরি করে নাচব, লাফাব। দুজনে আগেও খেলেছি।"

এগিয়ে গিয়ে গাছের পাতাগুলো ধরে নাড়া দিল বীণা। ডালপালা দুলে উঠল। সাড়া দিল। প্রসাদবাবু মনে মনে বললেন, "পাগল মেয়ে!" মুখে বললেন, "ঠিক আছে খেল। আমি চললাম। তুমি যখন যাবে সিঁড়ির মুখের গ্রিলের দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে যাবে, আর তোমার মা কাল যেন তাড়াতাড়ি আসে। দেরি হলে অফিসে লেট হয়ে যাবে।"

লোহার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামার সময় প্রসাদবাবু গুনগুন করে গান করতে লাগলেন। কত বছর পর যে তিনি নিজের মনে গান করলেন!

অফিসের কাউকে নতুন বাড়ির কথা ভাঙলেন না প্রসাদবাবু। তিনি ঠিক করেছেন, রবিবার সন্ধেবেলা অফিস আর 'সুখে আছি' মেসের কয়েকজনকে ডাকবেন। ছাদে বসে গল্পগুজব হবে। সঙ্গে চা আর একটা করে ফিশফ্রাই? একটু খরচ হয়ে যাবে ঠিকই। তা হোক। চমৎকার বাড়ি দেখাতে একটু খরচ করতে হয়। বীণার মাকে বলতে হবে, মেয়েটাকে যেন সেদিন সঙ্গে নিয়ে আসে। সবাইকে চা দেবে। অফিস থেকে বেরোনোর সময় ভগ্নীপতিকে একটা ফোন করতে গেলেন প্রসাদবাবু। বাড়িটার জন্য একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ফোন পাওয়া গেল না। ঠিক আছে কালই হবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। বরং একটা রাত কাটুক।

বাড়ি ফিরে প্রসাদবাবুর মন আরও ভালো হয়ে গেল। ছাদটা একেবারে ঝকঝক করছে। বোঝাই যাচ্ছে, বীণার কাজ। খেলা শেষে ঝাঁট দিয়ে গেছে। একপাশে ইট দিয়ে আঁকা এক্কাদোক্কা খেলার অস্পষ্ট ছক। প্রসাদবাবু মুচকি হাসলেন।

নিজের হাতে চা বানিয়ে এনে ছাদে মাদুর পেতে বসলেন। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। ঘরে ফেরা পাখির কিচিরমিচির ডাক। ধীরে ধীরে সন্ধে নামল। আকাশ ভরা তারা। মস্ত বড়ো চাঁদ। নারকোল গাছের পাতায় হাওয়া লেগে ফিস ফিস আওয়াজ হচ্ছে। বেশ লাগছে। এভাবে আকাশ, গাছপালা, পাখি অনেকদিন দেখা হয়নি! না, কিঙ্কর আর ছন্দা কাজটা ভালো করেছে। প্রসাদবাবু হাত বাড়িয়ে নারকোল গাছের পাতা ছুঁলেন। পাতার দল হাওয়ায় সর সর করে সরে গেল, ফিরে এল আবার। যেন প্রসাদবাবুর সঙ্গে খেলতে চাইছে!

অনেকরাত পর্যন্ত ছাদেই বসে রইলেন প্রসাদবাবু। নিজেই অবাক হয়ে গেলেন, কই ভয়-টয় কিছু করছে না তো! ভয় সব পালিয়েছে নাকি? নিশ্চয় পালিয়েছে। ছন্দা ঠিকই বলেছে, এতদিন অন্ধকার ঘুপচি ঘরে থাকতে থাকতে মনের ভেতরেও অন্ধকার বাসা বেঁধেছিল। এই খোলামেলা পরিবেশ তাকে মুক্ত করেছে। প্রসাদবাবু মনে মনে হেসে উঠলেন।

না, ভয় পালায়নি। ভয় ফিরে এল অনেক রাতে। তবে সেটা প্রসাদবাবুর পরিচিত ভয় নয়। অপরিচিত ভয়। অনেক তীব্র। হাড় হিম হয়ে যায়। রাত তখন ক-টা? একটা? নাকি দুটো?

নতুন বাড়িতে সাধারণত প্রথমদিন ঘুম আসতে দেরি হয়, এই বাড়িতে প্রসাদবাবু কিন্তু বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙল এক ধরনের অস্বস্তিতে। প্রসাদবাবু বুঝতে পারলেন, অস্বস্তি নয়, আওয়াজ। হালকা একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙেছে। ঝম ঝম...। আওয়াজটা আসছে থেমে থেমে। কে যেন ঘুঙুর পায়ে হাঁটছে। হাঁটছে না লাফাচ্ছে। কে লাফাচ্ছে? কোথায় লাফাচ্ছে? গলা শুকিয়ে গেল প্রসাদবাবুর। তিনি চোখ খুললেন। ঘর অন্ধকার। অন্ধকার কেন! ঘর অন্ধকার থাকার কথা নয়! রাতে আলো জ্বেলে শুয়েছিলেন। নতুন জায়গায় তিনি ঝুঁকি নেননি। চোর ডাকাত থাকতে পারে। আলো দেখলে ভয় পাবে। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলেন প্রসাদবাবু। আলো কে নেভাল? লোডশেডিং? হতে পারে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে না। প্রসাদবাবু বুঝতে পারলেন, ঝমঝম আওয়াজটা আসছে ছাদ থেকে। কখনো জোরে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে। শরীরের অস্বস্তিটা এবার ভয়ের চেহারা নিল। অন্য কোনো সময় এর ছিটেফোঁটা ভয় পেলেও প্রসাদবাবু চাদর মুড়ি দিয়েছেন, আজ কিন্তু উঠে বসলেন। একবার ছাদে গিয়ে দেখলে কেমন হয়? কথাটা ভাবতেই প্রসাদবাবুর মন একসঙ্গে দুটো উত্তর দিল। একবার বলল, 'কিচ্ছু হয়নি, সব মনের ভুল। নিজে গিয়ে দেখে এস। ভয় পেলে চলবে না। ভয়ের দিন তোমাকে শেষ করতে হবে'। তারপরেই বলল, 'যেয়ো না, যেয়ো না, বাইরে বিপদ আছে।' দোনামোনার মধ্যেই খাট থেকে নামলেন প্রসাদবাবু। অন্ধকারে টলতে টলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পা দুটোকে মনে হচ্ছে পাথর। কাঁপা হাতে দরজার ছিটকিনি খুলতে অনেকটা সময় গেল। খোলা দরজা দিয়ে কয়েক পা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। নির্জন, অন্ধকার ছাদ। আকাশে চাঁদ

নেই, অসংখ্য তারা। ছাদ জুড়ে নরম আলো পড়েছে কুয়াশার মতো। সেই আলো সাদা আর নীলে মেশা। বেশ লাগছে দেখতে। মনে সাহস এনে চারপাশে ভালো করে তাকালেন প্রসাদবাবু। না, কেউ নেই। ঘুঙুরের আওয়াজটাও আর শোনা যাচ্ছে না। দূরে বড়ো রাস্তা দিয়ে ট্রাক চলে যাওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। নিশ্চিন্ত হলেন প্রসাদবাবু। নিজের মনেই পিঠ চাপড়ালেন। ভাগ্যিস চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেননি। তাহলে ভয়টা বেড়ে যেত।

কাল সকালেই এই চমৎকার বাড়ি ছেড়ে পালাতেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের ঘরে ঢুকতে গেলেন প্রসাদবাবু, আর তখনই চোখ পড়ল নারকোল গাছটার দিকে। নিমেষে ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শরীরে। ওটা কী! গাছ তো নয়, অন্য কিছু! একটা মানুষ যেন! ঝাপসা চুল। হাসছে! অন্ধকারের চোখ মুখ। অন্ধকারের হাসি। ডালপাতাগুলো লম্বা হাতের মতো বাড়িয়ে রেখেছে। পেতে রেখেছে ছাদের ওপর! হাওয়ায় দুলছে তারা। আওয়াজ হচ্ছে খস খস, খস খস...। খামচে ধরার আগে বাঁধানো ছাদে যেন নখ শানাচ্ছে! চোখের পাতা ফেলতে পারছেন না প্রসাদবাবু। তাকে কে যেন মাথার ভেতরে বলছে—"চলে যাও, পালিয়ে যাও। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ফেল এখনই!" কণ্ঠস্বরটা বাচ্চা মেয়ের মতো। চেনা, কিন্তু চিনতে পারছেন না প্রসাদবাবু। তিনি বুঝতে পারছেন, এখনই ঘরে ঢুকে যাওয়া দরকার। খুব দরকার। কিন্তু পারছেন না! নারকোল গাছের ডালপাতা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে! তারপর হাত ধরে টান দিল! তিনি সম্পূর্ণ নিজের অনিচ্ছায় এগিয়ে যেতে লাগলেন ছাদের কিনারার দিকে। আর কয়েক পা গেলেই ছাদের ছোট্ট পাঁচিল। পাঁচিল টপকালেই...।

জ্ঞান হারানোর আগে প্রসাদবাবু স্পষ্ট শুনতে পেলেন, গাছটা বাচ্চা একটা মেয়ের গলায় হেসে উঠল। গলাটা এবার চিনতে পারলেন প্রসাদবাবু। ছোট্ট মেয়ে বীণা।

পরদিন সকালে ছাদের ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেল প্রসাদবাবুকে। পেল আসানসোল থেকে আসা প্রসাদবাবুর বোন ছন্দা আর ভগ্নীপতি কিঙ্কর। তারা প্রসাদবাবুকে না-জানিয়ে কাল রাতে ট্রেনে উঠেছিল। পরিকল্পনাটা কিঙ্করের। একেবারে বাড়িতে হাজির হয়ে শ্যালককে চমকে দেবে। এই কারণে দু-দিন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে। ছন্দার কাজও আছে। দাদার জন্য বাড়িটা একটু গুছিয়ে দিয়ে যাবে। রান্নার একজন লোক চাই। খুঁজতে হবে। বীণার মা থাকলে কোনো চিন্তা ছিল না। কিন্তু এই শহরের পাট গুটিয়ে সে চলে গেছে। একবছর আগে পর্যন্ত এই বাড়িতে বন্ধ দরজা খুলে ঝাড়পোঁছ করতে আসত। সঙ্গে তার বারো বছরের মেয়েটাও থাকত। ছাদে খেলত। একদিন খেলতে খেলতে এই বাড়িরই ছাদ থেকে পড়ে মারা যায় বেচারি। তার মা তখন একতলায় ছিল। বাড়ির মালিকের কাছে ছন্দা শুনেছে বীণা মেয়েটা ছিল ভারি সুন্দর। কথায় কথায় হাসত। বায়না করায়

একজোড়া ঘুঙুর কিনে দিয়েছিল তার মা। মেয়েটা সেই ঘুঙুর পরে লাফিয়ে বেড়াত। আওয়াজ হত ঝম ঝম। বীণা যে কী করে ছাদ থেকে পাঁচিল টপকে পড়ল তাই নিয়ে রহস্য হয়ে গেছে। কেউ যেন হাত ধরে টান দিয়েছিল। নইলে পাঁচিল টপকাবে কেন? যদিও এসব কথা প্রসাদবাবুকে বলেনি তাঁর বোন। একেই তিনি ভীতু মানুষ...।

কিঙ্কর ডাক্তার ডাকতে ছুটল।

হে বৈশাখ

হরিপদ খটখটির গা হাত পায়ে খুব ব্যথা। এত ব্যথা যে সব প্রোগ্রাম ক্যানসেল করতে হয়েছে। ডাক্তারবাবু এসেছেন। ব্যথার কারণ জিজ্ঞেস করেছেন। হরিপদ খটখটি বলতে পারছেন না। শুধু ককিয়ে উঠছেন। আরও একটা সমস্যা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'র' শুনলে ভয়ংকর রেগে যাচ্ছেন। তার ঘরে সদ্য কেনা একসেট রবীন্দ্র-রচনাবলি আছে। তিনি ঠিক করেছেন, ওই বই তিনি প্রথম সুযোগেই বিলিয়ে দেবেন। টিভি বা রেডিয়ো থেকে রবীন্দ্রসংগীত কানে ভেসে এলে 'রে রে' করে উঠছেন।

ঘটনা এ-রকম—

হরিপদ খটখটি রাত জাগছিলেন। নেতা মানুষ রাত জাগবেন এ আর আশ্চর্য কী? পলিটিকসে সব কাজ দিনে হয় না। পলিটিকসের দেবতা কাজ ভাগ করে রেখেছেন। রাতের কাজ, দিনের কাজ। দিনেরবেলাটা রাখতে হয় গদগদ মুখ আর জোড় হাতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য। রাত হল প্ল্যানিং-এর সময়। নিজেরটুকু গোছানো, অপনেন্টকে টাইট মারা, ইলেকশনে ছক্কা পাঞ্জার প্ল্যানিং। কোনো কোনোদিন সকালবেলা দেরি করে ঘুম থেকে উঠতে হবে। অপেক্ষায় থাকা ভিজিটরদের বলতে হবে—'ভাই রে, দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য খুবই দুঃখিত। এইভাবে চলতে থাকলে বেশিদিন তো আর মানুষ থাকব না। গোরু-ছাগলে পরিণত হব। কাউ অ্যান্ড গোট। তখন আর আপনারা আমাকে পার্টি অফিসে পাবেন না। পাবেন মাঠে ঘাটে। ঘুরে বেড়াচ্ছি, ল্যাজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছি। ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আপনাদের প্রবলেমের কথা শুনছি, সার্টিফিকেটে সই করছি। হা হা...। সেই কারণেই লেখাপড়া।'

গত দশদিন ধরে হরিপদ খটখটির রাত জাগা চলছিল। গভীর রাতে যদি কেউ তার বাড়ির দিকে নজর করত, দেখতে পেত দোতলার পিছনে, কোনের ঘরে আলো

জ্বলছে। কাচের জানলা বন্ধ। কাচের গায়ে মাঝেমধ্যে একটি ছায়ামূর্তি স্পষ্ট হচ্ছে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেন কেউ পায়চারি করছে! এত রাতে নেতার ঘরে কে পায়চারি করে? পায়চারি করছেন হরিপদ খটখটি নিজে। শুধু পায়চারি করছেন না, বই হাতে পায়চারি করছেন। ঘন ঘন বইও বদলাচ্ছেন। পায়চারি করতে কষ্ট হচ্ছে। কারণ বইগুলো সবই ওজনে ভারি। হাতে না-নিয়ে টেবিল বা খাটের ওপর রেখে পড়তে পারতেন। কয়েকদিন সেই চেষ্টা করেছিলেন হরিপদ। লাভ হয়নি। স্কুল জীবনের অভ্যেস পায়চারি করে পড়া মুখস্থ করা। হাতে সময় কম। মুখস্থ করতে হবে অনেক। তাই পুরোনো অভ্যেস। হরিপদ চেয়েছিলেন কাজটা সহজ করে নিতে, একটা বইতে সবটা সারতে। তাহলে এত বই নিয়ে নাস্তানাবুদ হতে হত না। 'একশো বাছাই কোটেশন' ধরনের কিছু পেলে সবথেকে ভালো হত। গদাই গাধাটাই গোলমাল করেছে। তাকে বই আনবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, পুরো সেট তুলে এনেছে। হনুমানও এক ভুল করেছিল। গোটা গন্ধমাদন পাহাড় নিয়ে এসেছিল। অবশ্য এই সাবজেক্ট সম্পর্কে গদাইয়ের কোনো ধারণা নেই। সে ওয়ানশটার বিশেষজ্ঞ। গুলি, বন্দুক, স্প্রিন্টার চেনে। বই কীভাবে চিনবে? হরিপদ খটখটি পড়েছিলেন বিরাট বিপদে। এই পর্বত নিয়ে তিনি কী করবেন? সব পড়া অসম্ভব। যে দু-চার পাতা পড়া যাবে বেশিরভাগই মাথায় ঢুকবে না। প্রথমদিন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করেছিল। মনে হচ্ছিল, গদাইকে দিয়ে এক টিন কেরোসিন আনাই। তারপর বইগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিই। গদাই বাসে ট্রামে বহুবার আগুন ধরিয়েছে। বইতে আগুন লাগানো তার পক্ষে কোনো সমস্যা হবে না। শেষ পর্যন্ত হরিপদ নিজেকে শান্ত করেছেন। মাথা গরম করলে চলবে না। বই পড়ে বোঝার দরকার নেই। লাইন মুখস্থ করতে হবে। তারপর ঝোপ বুঝে কোপের মতো, স্কোপ বুঝে কোটেশন। হাল ছাড়া যাবে না। খবর আছে, অপনেন্টের কেউ কেউ কোটেশন মুখস্থ করা শুরু করে দিয়েছে। কেদার গড়গড়ি নাকি বাড়িতে টিউটর পর্যন্ত রেখেছে। খবর মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। সময় নেই। বৈশাখ মাস এসে গেছে। একমাত্র বাংলা মাস যাকে নিয়ে বাঙালির হইচই। মাস জুড়ে নানারকম হুড়ুমতাল। পয়লা বৈশাখে উৎসব, পঁচিশে বৈশাখের ফাংশন। ফুরফুরে পায়জামা পাঞ্জাবি। হারমোনিয়াম, বেলফুলের মালা, রজনীগন্ধার স্টিক। আগে পরে একটু ভাষণ, সঙ্গে হালখাতা, ডাবের জল, আইসক্রিম সন্দেশ। তার ওপর আবার এবছর বৈশাখ ফুরোলেই মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন। এই সময় লিডারের পকেটে খান কুড়ি রবীন্দ্রনাথের লাইন না-থাকলে প্রেস্টিজ পাংচার। গাদাখানেক নতুন বছরের অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রজন্মোৎসব তো আছেই। কোনোটায় সভাপতি, কোনোটায় প্রধান অতিথি। ইলেকশন মিটিঙেও ওই 'জিনিস' কাজে লাগবে। আজকাল পলিটিক্যাল লেকচারে রবীন্দ্রনাথ খুব যাচ্ছে। যে সময় যে ফ্যাশন। তাই লাইন চাই, লাইন। তবে বই খুলে বা কাগজের টুকরো দেখে তো আর বলা যাবে না। পাবলিক সিটি মেরে নামিয়ে দেবে। অপনেন্ট বলবে—বেটা গণ্ড মূর্খ। বলতে হবে মন থেকে। অতএব মুখস্থ ছাড়া কোনো শর্টকাট নেই।

তাই হরিপদ খটখটি রাত জেগে পরিশ্রম করেছেন। পরিশ্রমের ফলও পেয়েছেন। 'অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি', 'ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি' থেকে শুরু করে 'একদিন ফুল দিয়েছিলে হায়', 'বাছা রে তোর চক্ষে কেন জল' পর্যন্ত বেশ কিছু লাইন মোটামুটি সড়গড় হয়েছে। যেখানে খুশি লাগিয়ে দেওয়া যাবে। নববর্ষ টু ইলেকশন ভায়া পঁচিশে বৈশাখ। তবে একটা সমস্যা হচ্ছিল। ছোটো সমস্যা। লাইনগুলো মাঝেমধ্যে একটু আধটু গুলিয়ে যাচ্ছিল। 'মাঝি'র জায়গায় 'জল', 'জল'-এর জায়গায় 'ফুল', 'অর্থ'র জায়গায় 'চক্ষু', 'চক্ষু'র জায়গায় 'বাছা'। বয়স হয়েছে, স্মৃতি কিছু গোলমাল তো পাকাবেই। সব শুনে ওয়ানশটার গদাই দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'আপনি টেনশন করবেন না দাদা। এসব ছোটোখাটো ভুল কে ধরবে?'

হরিপদ খটখটি চিন্তিত মুখে বললেন, 'ওভাবে উড়িয়ে দিস নে গদাই। পাবলিক আজকাল ভারি সেয়ানা হয়ে গেছে। হারামজাদারা লিডারের ভুল ধরার জন্য সবসময় ছোঁক ছোঁক করছে।'

গদাই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিক করে খানিকটা থুতু ফেলল। বলল, 'ধরলে পেটে মেশিন ঠেকিয়ে দেব। পাবলিক কীভাবে টাইট করতে হয় আমার জানা আছে। আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন দাদা।'

নিশ্চিন্তেই শুয়ে পড়েছিলেন হরিপদ খটখটি। ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। এত রাতে কে কড়া নাড়ে? নিশ্চয় কোনো ঝামেলা। অ্যাক্সিডেন্ট? হসপিটাল? পুলিশে তুলেছে? শালা ঝামেলায় পড়বার আর সময় পেল না? জোর ধমক দেওয়ার জন্য তৈরি হলেন হরিপদ। আধো ঘুমে টলতে টলতে উঠে দরজা খুললেন। খুলেই চমকে উঠলেন।

ইনি! একী স্বপ্ন! তাই হবে। ইনি কী করে আসবেন!

লম্বা জোব্বা পরা বৃদ্ধ মানুষটা হরিপদ খটখটিকে ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর ডান হাতে নিজের সাদা দাড়ি মুচড়ে কড়া গলায় বললেন, 'নে এবার মুখস্থ বল। একটা শব্দ ভুল করবি তো কান ধরে দশবার ওঠবোস। আধখানা শব্দ ভুল হলে পাঁচবার। নে চটপট শুরু কর।'

হরিপদ খটখটি ক্ষীণ গলায় ডাকলেন, 'গদাই গদাই...।' সেই ডাক গলা দিয়ে বের হল না।

এই কারণেই হরিপদ খটখটির গা হাত পায়ে ব্যথা। রবীন্দ্রনাথ শুনলেই খেপে উঠছেন। স্বাভাবিক। চারশো পঁয়ষট্টি বার ওঠবোস এই বয়েসে সহ্য হয়?

সারপ্রাইজ



প্রতিবছর সপ্তমীর দিন গৌরহরির মামারবাড়িতে একটা দারুণ ঘটনা ঘটে। মামারা সকলকে ডেকে...।

ছোটোবেলার পুজো মানে এলাহি ব্যাপার। বিস্তর পরিকল্পনা। প্রচুর ব্যস্ততা। ক-টাদিন কী কী হবে তার লম্বা লিস্ট হয়। তার মধ্যে একটা দিন ধরা থাকে 'মামাবাড়ি'র জন্য। পুজোর সময় মামারবাড়ির মজার সঙ্গে অন্য মজার তুলনা হয় না। নরমাল সময়ে মামা মামিরা আদর যত্ন করে ঠিকই, কিন্তু পুজোর সময় সেটাই বেড়ে তিনগুণ হয়ে যায়। অতি শান্তশিষ্ট হাঁদা টাইপের ছেলে-মেয়েরাও এই সুযোগ কাজে লাগায়। যতটা 'বাঁদরামি' করা উচিত, সেটা তিনগুণ বাড়িয়ে ফেলে। এর একটা ফর্মুলা আছে। ফর্মুলার নাম 'আদর যতটা বাঁদর ততটা'। মামাতো, মাসতুতো ভাই বোন দাদারা সবাই আসে। ফর্মুলা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দেয়। সারাদিন তুলকালাম কাণ্ড চলে। হইহট্টগোলের চূড়ান্ত।

গৌরহরির মামাবাড়ি আমহার্স্ট স্ট্রিটে। তিন মামা থাকেন তিনতলা জুড়ে। বিরাট ব্যাপার। বড়ো বড়ো ঘর। মার্বেল বাঁধানো টানা বারান্দা। উঁচু উঁচু থাম। থামের মাথায় পায়রা বকবকম করছে। দু-খানা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। সার্ভিস করতে বউবাজার থেকে লোক আসছে প্রতি সপ্তাহে। বড়োমামার গ্যারেজে গাড়ি। সেই গাড়ির বেজায় যত্ন। তবে পথে বেরোয় বছরে মাত্র একদিন। ভিন্টেজ কার র‍্যালিতে। গৌরহরি প্রতি পুজোয় সপ্তমীর দিন মায়ের হাত ধরে ওখানে যায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থাকার প্রোগ্রাম। তিন মামার ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে সাতজন। এর ওপর দুই পিসির চার ছেলে-মেয়ে। তারাও আসে। আসে টুকু, ঘেঁটু, কাজল, মিলন। এরা নন্ আত্মীয়, প্রতিবেশী। এমনভাবে মিশে যায় বোঝা যায় না। সব মিলিয়ে বিশাল বাহিনী। বাহিনীর একটা নাম আছে। 'যা খুশি তাই বাহিনী'। এই বাহিনীর 'যা খুশি তাই' করার পারমিশন আছে। মায়েরা চোখ রাঙায়, কিন্তু

বকতে পারে না। মামাদের কড়া নির্দেশ—পুজোর দিনে বকাঝকা চলবে না। যদি বকতেই হয়, তাহলে বাড়িতে গিয়ে বকো। ট্যাক্সি ডেকে নাও। ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দেওয়া হবে।

আর এর সঙ্গে আছে সেই দারুণ ব্যাপার। যা কোথাও নেই।

ব্যাপারটা কী?

এদিন গৌরহরির মামারা সবাইকে 'সারপ্রাইজ গিফট' দেন। পুজোয় চমকে দেওয়া উপহার। তিনতলার ঘরে সবাইকে ডেকে বাষট্টি বছরের বড়োমামা হাসিহাসি মুখে জিনিস হাতে তুলে দেবেন। জিনিস যে বিরাট কিছু হয় এমন নয়। চমকে যাওয়ার মতোও নয়। কাউকে ছোটোখাটো জামাকাপড়, কাউকে সেন্ট পাউডার, কাউকে গল্পের বই, কাউকে ফাউনটেন পেন। এসব জিনিসে চমকে যাওয়ার কিছু নেই। তবে আনন্দ আছে। দু-তরফের আনন্দ। যে দেয় আর যে নেয়। ছোটো হলেও গৌরহরিরা বিষয়টা বোঝে। তারা ভান করে, উপহার পেয়ে সত্যিই খুব চমকে গেছে। চোখ বড়ো বড়ো করে।

বড়োমামা বলেন, 'উপহার পছন্দ হল না?'

গৌরহরিরা বলে, 'সে কী বড়োমামা! পছন্দ হবে না কেন? খুব হয়েছে।'

বড়োমামা বলেন, 'আমি জানি হয়নি।'

গৌরহরিরা বয়েসে ছোটো হলেও লজ্জায় পড়ে যায়। বলে, 'বিশ্বাস কর বড়োমামা, আমাদের ভালো লেগেছে। আমরা খুব খুশি হয়েছি। এবার কি আমরা খেলতে যাব?'

বড়োমামা খুশি হয়ে বলেন, 'ঠিক আছে যাও। পরের বছর আরও চমকে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।'

গৌরহরিরা জানত, পরের বছরও উপহার পাওয়া যাবে। তবে চমকে দেওয়ার মতো কিছু থাকবে না।

সময় যেতে লাগল। গৌরহরি বড়ো হল। স্কুল পার হল, কলেজ পার হল। জীবনের বহু চমকের মতো পুজোর তালিকা থেকে 'মামারবাড়ি'ও হয়ে এল ফিকে। প্রথমদিকে পুজোর মধ্যে কোনো একদিন ঘুরে আসত। এরপর দু-বছরে একবার। শেষে তাও বন্ধ হল। মামাবাড়িও ছোটো হয়ে গেছে। শুধু লোকজনই কমেনি, তিন ভাইতে বাড়ি ভাগাভাগি হয়েছে। বড়োমামা, বড়োমামি মারা গেছেন। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের অংশ বেচে দিয়েছে। মেজোমামা, মামিমা মেয়ে জামাইয়ের কাছে আমেরিকায়। দোতলা তাঁদের। সেখানে ঝুলছে তালা। তালায় পড়েছে ঝুল। থাকার মধ্যে আছেন শুধু ছোটোমামা। প্রবল অর্থকষ্টে বাড়ির পুরোটা নিজের দখলে রাখতে পারেননি। সামনেটা ভাড়া দিয়ে, সরে গেছেন পিছনে। ভিন্টেজ কারের গ্যারেজ এখন ছাঁট কাপড়ের গোডাউন। গৌরহরিদের পুজোর সেই 'যা খুশি তাই বাহিনী' কবে ছত্রখান হয়ে গেছে কেউ খবর রাখে না। মামাতো, পিসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে যোগাযোগ রোজই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। পথে দেখলে চিনতে পারে না। সেদিন

ডালহৌসিতে রত্নার সঙ্গে দেখা হল গৌরহরির। মামাতো বোনকে চিনতে সময় লাগল পাক্কা দশ মিনিট। রত্না বলল, 'লজ্জা পাস না। সময় তোর কমই লেগেছে। পরশু যতুদাকে মেট্রোয় দেখলাম। চিনতে পারলাম না। মনে হল, কে একটা হুমদো লোক অসভ্যের মতো তাকিয়ে আছে। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মনে পড়ল পরদিন বিকেলে। পিসতুতো দাদাকে চিনতে পুরো একদিন সময় লাগা কম? মনে হয়, যতুদা ঠিক চিনেছিল। অভিমানে ডাকেনি। ভালোই করেছে। কী হবে চিনে?'

গৌরহরি হিসেব রাখে না। যদি রাখত তাহলে দেখত, তিরিশ বছর কেটে গেছে। চোদ্দো বছরে সে যখন শেষবারের মতো পুজোয় মামারবাড়ি এসেছিল তার থেকে তিরিশ বছর চলে গেছে হু হু করে। সে আজ চুয়াল্লিশ। ছত্রিশের টগবগে ছোটোমামা ছেষট্টির বৃদ্ধ।

সেই ছোটোমামা সপ্তমী সকালে কাঁপা কাঁপা গলায় টেলিফোন করলেন।

'আজ একবার আসতে হবে যে গৌর।'

বহু বহু বছর পর ছোটোমামার গলা শুনে চমকে উঠল গৌরহরি।

'শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি ছোটোমামা?'

'না, শরীর খারাপ নয়। আজ সপ্তমী।'

গৌরহরি থমকে যায়। সপ্তমী তো ছোটোমামার কী? মানুষটার বয়স হয়েছে। বয়স হলে মানুষ কতকরকম উলটো পালটা বলে। ছোটোমামার গলা আরও কেঁপে উঠল। বললেন, 'সপ্তমীর দিনগুলো বড্ড মন কেমন করে রে বেটা। একে ওকে ফোন করি। করে ডাকি। কেউ আসে না। সময় থাকে তবু মিথ্যে করে বলে, সময় নেই। অথবা কে জানে হয়তো সময় থাকে না।

ছোটোমামার গলায় বিষাদ। ছোটোমামা বিভ্রান্ত।

গৌরহরি ঢোক গিলে বলে, 'কাকে ডাক?'

'ওই যে তোদের বাহিনী ছিল না? ওই যে যা খুশি তাই বাহিনী? হা হা...। ওদের ডাকি। হা হা...।'

ছোটোমামার হাসিতেও ব্যথা। হাসি থামিয়ে বললেন, 'এই নিয়ে এগারো-জনকে ফোন করলাম। সকলেই বলল, 'পারব না। সময় নেই।'

গৌরহরি নিজেকে সামান্য কঠিন করল। তবু নরম গলায় বলল, 'এখন সবার কত কাজ। কী করে যাবে বল? তা ছাড়া সেদিন তো আর নেই। পাস্ট ইজ পাস্ট ছোটোমামা। পাস্ট নিয়ে পড়ে থাকার সময় আছে?'

ছোটোমামা এ-কথায় উত্তর না-দিয়ে বললেন, 'এবার তোকে ধরেছি। তুইও কি না বলবি? ইচ্ছে করলে বলতে পারিস। তোরা হল যা খুশি তাই বাহিনীর মেম্বার। তোরা খুশিমতো কথা বলবি না তো কে বলবে?'

গৌরহরি একটু চুপ করে রইল। এক মুহূর্ত বলল, 'আসলে কী জানো ছোটোমামা...আজ সপ্তমী তো, বিপাশা আর ছেলে-মেয়ে দুটোকে নিয়ে বেরোতে হবে...বরং পরে না হয় একদিন যাব...।'

বৃদ্ধ ওপাশে যেন একটু হাসলেন। বললেন, 'না এলি তো বয়েই গেল। নিজেই ঠকলি। তোর জন্য সারপ্রাইজ গিফটের ব্যবস্থা করেছিলাম। মনে আছে? সেই যে চমকে দেওয়া উপহার? নাকি সেটাও ভুলে মেরেছিস? আর চান্স পাবি বলে মনে হয় না। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আর কতদিন থাকব। যাক, ভালো থাকিস।'

গৌরহরি আর কথা বাড়াল না। বুড়ো মানুষের সঙ্গে কথা বাড়ালেই সমস্যা। একবার কাঁদুনি শুরু করলে থামবে না। কথার মধ্যে অসংলগ্ন ভাব আছে। মাথাও অল্প বিগড়েছে। ফোন নামিয়ে রেখে গৌরহরি মনে মনে বলল, 'পাগল। বুড়ো বয়েসে সারপ্রাইজ! এতে কেউ জড়ায়?'

সারাদিনে সময় হল না। সন্ধের পর শহরের আলোকমালা আর মানুষের ভিড় ঠেলে আমহার্স্ট স্ট্রিটের অন্ধকার, প্রায় ভেঙে পড়া মামারবাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে গৌরহরি বুঝল, কাজটা ঠিক হল না। বুড়ো মানুষের পাগলামিতে জড়িয়ে পড়াটা ভুল হয়েছে। বিরাট ভুল হয়েছে। একটা বুড়ো মানুষকে চমকে দেওয়ার জন্য এত বড়ো ভুল করা ঠিক হয়নি। বাড়িতে বউ, ছেলে-মেয়ে অপেক্ষা করে আছে। তবে ছোটোমামা আজ বুঝবে পুজোয় চমকে দেওয়া উপহার কাকে বলে? মিথ্যে চমকে দেওয়া নয়, সত্যি চমকে দেওয়া। তৃপ্তিতে হাসল গৌরহরি।

* মূল গল্পের নাম ছিল 'সপ্তমীর উপহার'।

লোডশেডিং

আলো দু-ভাবে নেভে। কখনো একবার দপ করেই নিভে যায়, কখনো নেভে বেশ কয়েকবার দপ দপ করবার পর।

এখন আলো নিভেছে দপ করে। লোডশেডিং-এর ভগবান কে? কাজল জানে না। ভগবানের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। সংখ্যা বাড়লেও বাড়তে পারে। দুনিয়া এগোচ্ছে, ভগবান এগোবেন না এ হতে পারে না। সে যাই হোক, এত ভগবানের নাম জানা সম্ভব নয়। দরকারও নেই। ভক্তি থাকলেই হল। চোখ বুঁজে লোডশেডিং-এর ভগবানের উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকাল কাজল। দপ্ করে আলো চলে যাওয়া একটা শুভলক্ষণ। তার মানে লোডশেডিং হয়েছে। লোডশেডিং হলে কারেন্ট চলে আসবে। একঘণ্টা, দু-ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা যতই দেরি হোক একটা-না-একটা সময় চলে আসবে। কিন্তু আলো যদি দপ দপ করে চলে যেত তাহলে হত কেলেঙ্কারি। বোঝা যেত বড়ো কোনো ঝামেলা হয়েছে। জটিল গোলযোগ। হয় ফেজ চলে গেছে, নয় পাড়ার মোড়ের ট্রান্সমিটার ফেটেছে। আরও মারাত্মক কিছু হতে পারে। বছরখানেক আগে এ-রকম হয়েছিল। মিনিট খানেক দপদপিয়ে কারেন্ট চলে গিয়েছিল। সারারাত অন্ধকারে কাটানোর পর সকালে খবর পাওয়া গেল, গোলমাল পাড়ায় হয়নি। গোলমাল হয়েছে সুদূর কোলাঘাট না সাঁওতালডিহির পাওয়ার স্টেশনে। খোদ বিদ্যুৎ তৈরির কারখানায়। সেই গোলমালও ছিল যথেষ্ট দুর্বোধ্য। চার নম্বর ইউনিট বসে গিয়েছিল না শুয়ে পড়েছিল! পাওয়ার স্টেশনের ইউনিট কাকে বলে? সেই ইউনিট শুয়ে বসে যাওয়ারই-বা অর্থ কী—গরমে ঘামতে ঘামতে কেউ আর সে-কথা জানতে আগ্রহ দেখায়নি।

যাই হোক, সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো থাকে। এই যে এখন কারেন্ট চলে গেল এর মধ্যেও আছে। ভালোটা হল, একটু আগেই কাজলদের রাতের

খাওয়া হয়ে গেছে। শুধু খাওয়া হয়নি, রান্নাঘরে থালা বাসন নামানোও হয়ে গেছে কাজলের। অন্যদিন খেতে আরও দেরি হয়। শ্যামল দেরি করে ফেরে। অফিসের পর ক্লাবে টুঁ মারে। সেখানে আড্ডা না দিলে তার রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না। হলেও দুঃস্বপ্ন দেখে। আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছে। ফিরেই তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে। গেল স্নান করতে। যেতে যেতে বলল, 'তাড়াতাড়ি খেতে দাও। পেট চুঁই চুঁই করছে।'

কাজলের বিয়ে হয়েছে এগারো বছর। এগারো বছর কম সময় নয়। আধুনিক পৃথিবীতে এগারো বছর বিয়ে টিকে থাকাই একটা ঘটনা। সেদিনই এ-বিষয়ে কোন কাগজে যেন খবর বেরিয়েছে। জাপানের হোক্কাইডো না হনসুতে বারো বছর স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে থাকলে সরকার থেকে বিশেষ সুবিধে দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচির নাম 'কিয়াগো গতাচে' ধরনের কিছু একটা। 'কিয়াগো গতাচে' শব্দের অর্থ কী? সুখে আছি? প্রথমে ছোটোখাটো সুবিধে দিয়ে কর্মসূচি শুরু। বাসভাড়ায় কনসেশন, রেশনে কুপন। পরে সুবিধে বাড়বে। এই খবর পড়ে কাজল মনে মনে খুব হেসেছিল। কী কাণ্ড! ওইসব দেশে একসঙ্গে থাকাটাই আশ্চর্যের, অথচ স্বামী কোনোদিন আগে বাড়ি ফিরলে আজও কাজলের একটা খুশি খুশি ভাব হয়! সেই খুশি ভাবের মধ্যে একটু লজ্জাও থাকে। লজ্জার কারণ কাজল বেশ কয়েকবার লক্ষ করে দেখেছে, শ্যামল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে সেইসব দিন যখন বিল্টু মামাবাড়িতে বেড়াতে যায়। খাওয়া সেরে চটপট শুয়ে পড়ে তারপর আলো নেভানোর পর 'ঝামেলা' পাকায়। আজ বিল্টু নেই। সে গেছে বড়োমাসির কাছে। নিশ্চয় শ্যামলের রাতে 'ঝামেলা' পাকানোর প্ল্যান আছে।

কাজলের শরীরের ভেতরে চাপা ঝিমঝিমানি হল। খুব অল্প, কিন্তু হল। রাতের 'ঝামেলা'র কথা ভেবে বিয়ের বারো বছর পরেও শরীর ঝিমঝিম করা একটা আনন্দের ঘটনা।

শ্যামল বাথরুমে গান গাইতে গাইতে স্নান করছে। একেকজন গায়কের একেকরকম গানে দক্ষতা। কারো 'ফোক সং', কারও 'টেগোর সং'। শ্যামলের 'বাথরুম সং'-এ গলা ভালো। তিনচারটে গান মিলিয়ে মিশিয়ে একসঙ্গে গায়। ফিউশনের মতো। আজ করছে রবীন্দ্রসংগীতের ফিউশন। সেখানে মোট তিনটি গান রয়েছে। তোমারেই ঝরনাতলায় নির্জনে, সহসা ডালপালা তোর উতলা যে আর আমি চিনি গো চিনি তোমারে। বাইরের কেউ শুনলে ঘাবড়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। একটাই বাঁচোয়া বাথরুম সং বাইরের কেউ শোনে না।

স্নান শেষ করে মাথা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল শ্যামল। উঁকি দিল রান্নাঘরে। কাজল সাবধান হল। আবার খুশিও হল। সন্ধের পর পুরুষমানুষ রান্নাঘরে উঁকি মারলেই বুঝতে হবে রাতে 'ঘটনা' আছে।

শ্যামল বলল, 'কী হল? খাবার রেডি?'

কাজল চোখ পাকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, আজ এত তাড়া দিচ্ছ যে!'

শ্যামল চলে যেতে যেতে বলল, 'খিদে পেয়েছে।'

মনে মনে খুশি হলেও কথায় সেই খুশি ভাব বুঝতে দিল না কাজল। উলটে খানিকটা অভিমানের ঢঙে বলল, 'তাও ভালো খিদে পেলে বাড়ির কথা মনে পড়ে। অন্যসময় রাত জেগে বসে থাকতে হয়।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মুচকি হেসে শ্যামল বলল, 'শুধু বাড়ির কথা কেন বলছ? বউয়ের কথাও বল। খিদে পেলে বউয়ের কথাও মনে পড়ে।'

কাজলের ইচ্ছে করল জিজ্ঞেস করে, 'কোন খিদে?' করতে পারল না। লজ্জা করল। যদিও এই লজ্জার কোনো যুক্তিসম্মত কারণ নেই। এতদিনে স্বামী-স্ত্রীর শরীরের সম্পর্ক সহজ হয়ে যাওয়ার কথা। হয়েও গেছে। তবু কেন জানি এখনো লজ্জা করে কাজলের। এ ব্যাপারে সে কি খানিকটা অপরিণত? হলে কোনো সমস্যা নেই। বরং লজ্জাটুকু ভালো লাগে।

কাজল চট করে ক-টা আলু পটল ভেজে নিল। শ্যামল ডালের সঙ্গে পটল ভাজা খেতে পছন্দ করে। কাজলের একটু দুঃখও হচ্ছে। ইস আগে যদি জানত মানুষটা তাড়াতাড়ি ফিরবে তাহলে রতনের মাকে ঝোলের বদলে মাছের কালিয়া করতে বলা যেত। একটু বেশি করে ঝাল দিয়ে কালিয়া হলে শ্যামল খুশি হত। অবশ্য এ-কথা ভাবার কোনো মানে হয় না। রতনের মা সেই বিকেলেই রান্না করে চলে যায়। তখন কে জানত বাবু আগে ফিরবেন?

শ্যামল প্রতিদিন রাতের খাওয়ার পর জানলার সামনে চেয়ার টেনে বসে একটা সিগারেট খায়। আজও খাচ্ছে। তিনতলার ওপর এই দু-কামরার ফ্ল্যাট যখন পছন্দ করেছিল কাজল, তখন মূল আকর্ষণ ছিল বেডরুমের এই জানলা। দক্ষিণের জানলা। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ছাড়া জানলার সামনে কোনো বাধা বিপত্তি নেই। উঁকি দিলে পিছনের পার্কের কিছুটা দেখা যায়। কোনো কোনোদিন হাওয়া দেয়। খুব হাওয়া। ওলটপালট টাইপ। শ্যামল সামনে বসে সিগারেট ধরাতে পারে না।

আজ অবশ্য হাওয়া নেই। একটা গুমোট ভাব। শ্যামল সিগারেট শেষ করে সবে ফেলেছে, ঠিক তখনই একবার দপ করে কারেন্ট চলে গেল।

শ্যামল বলল, 'এই যাঃ।'

কাজল বিছানা করছিল। হাত তুলে কপালে ঠেকাল। লোডশেডিং দেবতাকে প্রণাম। তারপর অন্ধকারেই বেডকভার সরিয়ে, বালিশ সাজাতে সাজাতে বলল, 'লোডশেডিং। একটু পরেই চলে আসবে। আজকাল লোডশেডিং খুব বেশিক্ষণ থাকে না।'

শ্যামল বিরক্ত গলায় বলল, 'লোডশেডিং কী করে বুঝলে? সেদিনকার মতো হয় যদি? সেই যে পাওয়ার স্টেশনে কী হল না? তাহলে সারারাত জ্বালাবে।'

'ওসব কিছু না। আমি জানি লোডশেডিং!' শ্যামল ঠাট্টা করে বলল, 'কী করে জানলে? ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?'

বিছানার ওপর বসে গায়ের আঁচল আলগা করল কাজল। পা দোলাতে লাগল। অন্ধকারে পা দোলাতে অন্যরকম একটা মজা লাগে। পা দুটো ঠিক মতো দেখা যায় না। মনে হয় অন্যর পা। তবে কারেন্ট চলে যাওয়া প্রথম ধাক্কার নিকষ কালো ভাবটা সরে গেছে। কাজল বলল, 'ও তুমি যতই ঠাট্টা কর, আমি জানি বড়ো কিছু হয়নি। নিত্যদিন ঘরে বসে দেখছি, আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমরা বুঝতে পারি।'

'তুমি দেখছি বিরাট কারেন্ট বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছ। উফ একদিন একটু আরাম করে শোব ভাবলাম।'

কাজল মুখ টিপে হাসল। মানুষটা রেগে গেছে। শোয়ার জন্য নয়, অন্য কারণে রেগেছে। মতলব ভেস্তে গেল বেচারির। ভেবেছিল মাথার ওপর বনবনিয়ে ফ্যান চালিয়ে...।

'কেন? অন্যদিন আরাম করে শোও না? কষ্ট হয়?'

শ্যামল তেতো খাওয়া গলায় বলল, 'হ্যাঁ হয়।'

'কীরকম কষ্ট? মনে হয় বিছানায় কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছি?'

শ্যামল এবার মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারেই স্ত্রীর দিকে তাকাল। আধো রাগ, আধো প্রশ্রয় মেশানো গলায় বলল, 'উফ, তুমি থামবে? দেখছ না আজ কেমন গরম? একটু হাওয়া পর্যন্ত নেই। এর মধ্যে বকবকানি শুরু হল।'

আবার একটা সিগারেট ধরাল শ্যামল। মেজাজ খারাপের সিগারেট।

কথাটা সত্যি। আজ বেশ গরম। হাওয়াও না-থাকার কারণে ফ্ল্যাটের মূল আকর্ষণ জানলাটি ফেল মেরেছে। সিনেমার হিরোর ফ্লপ করার মতো। সবে মিনিট পাঁচ হল ফ্যান বন্ধ হয়েছে। এতেই একটু একটু ঘাম হতে শুরু করেছে। খারাপ কাজলেরও লাগছে। কিন্তু এই খারাপ সে কিছুতেই মাথায় উঠতে দেবে না। একটা-না-একটা সময় তো কারেন্ট আসবেই। আলো জ্বলবে, ফ্যান চলবে। বলা যায় না বাইরে হাওয়াও শুরু হয়ে যেতে পারে। অনেক সময়ে বেশিরাতের দিকে একটা হাওয়া ছাড়ে। মেজাজ খারাপ করলে সব মাটি। মেজাজ খারাপ নিয়ে শ্যামলের 'ঝামেলা' উপভোগ করা যাবে না। কালই বিল্টু চলে আসবে। ব্যাস। বিল্টু আর ছোটো নেই যে ঘুম পাড়িয়ে পাশের ঘরে চলে যাবে। এখন সে ক্লাস ফাইভে পড়ছে। রাতে ঘুম ভেঙে পাশে মাকে না-দেখলে বিরাট হইচই বাধিয়ে দেবে। ছেলে-মেয়ে বড়ো হয়ে গেলে যেমন অনেক সুবিধে আছে তেমন অসুবিধেও আছে। সুতরাং আজকের দিনটা নষ্ট করা যাবে না। নিজের মেজাজ ঠিক রাখতে হবে। শ্যামলকে ঠান্ডা রাখতে হবে। কীভাবে?

এই গরমে ঠান্ডা রাখার একমাত্র উপায় হাওয়া। হাতপাখাটা কোথায়? মনে পড়েছে, আলমারির মাথায়। খাট থেকে নামল কাজল। অন্ধকারে হাতড়ে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে টর্চ বের করল। টর্চ জ্বলল না। ব্যাটারি ফুরিয়েছে মনে হয়।

‘অ্যাই, দেশলাইটা জ্বালো।’

‘কেন?’

‘মোম জ্বালব।’

‘এই রাতে মোম জ্বেলে কী করবে?’

‘হাতপাখা খুঁজব।’

‘হাতপাখা! হাতপাখা দিয়ে কী হবে?’

কাজল চাপা গলায় বলল, ‘হাতপাখা দিয়ে কী হয় জান না?’

শ্যামল উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, ‘না, জানি না।’

‘আমিও জানি না, মনে হয় লোডশেডিং হলে তোমাকে হাওয়া করা হয়।’

শ্যামল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, ‘হাতপাখা নেড়ে আর হাত ব্যথা করার দরকার নেই।’

স্বামীর কথায় কাজল খুশি হল। মুখে বলল, ‘থাক, আর দরদ দেখাতে হবে না।’

অন্ধকারেই হাতপাখা পাওয়া গেল। পাওয়া গেল আলমারির মাথায় নয়, আলমারির পিছনে, খাঁজে। কাজল সেই পাখা নিয়ে এসে দাঁড়াল স্বামীর পিছনে। ফিসফিস করে বলল, ‘অ্যাই বিছানায় এসে বসবে?’

চেয়ারে হেলান দিয়ে, সামনের জানলার গ্রিলে পা তুলে দিল শ্যামল। বলল, ‘খেপেছ? এই গরমে?’

‘এসো না। প্লিজ...।’

‘উফ, বিরক্ত কোরো না কাজল। তুমি বরং একটা চেয়ার-টেয়ার কিছু নিয়ে এখানে এসো। একটা মোড়া ছিল না?’

কাজল মোড়া খুঁজল না, ড্রেসিং টেবিলের সামনে যে সাজগোজের টুলটা আছে সেটাই নিয়ে এসে শ্যামলের পাশে বসল। জানলার বাইরে চাপা একটা আলো। চাঁদ উঠেছে? নাকি অন্ধকারের আলো? ঝাপসা কৃষ্ণচূড়া গাছটা দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মতো।

‘ক-টা বাজল?’

কাজল বলল, ‘কী হবে জেনে?’

শ্যামল বলল, ‘না, কতক্ষণ জ্বালাবে তাই ভাবছি।’

কাজল নীচু গলায় বলল, ‘জ্বালাবে কেন? অন্ধকারে বেশ দুজনে পাশাপাশি বসে আছি। কতদিন এ-রকম বসিনি বল তো।’

শ্যামল বলল, ‘আমরা কি ভূত, যে অন্ধকারে বসতে হবে?’

কাজল বলল, ‘তা কেন হবে? অন্ধকার আলো কখনোই তো পাশাপাশি বসা হয় না। সেইদিক থেকে লোডশেডিং হয়ে ভালোই হয়েছে। বেশ দুজনে বসেছি। বিয়ের প্রথম প্রথম যেমন বসতাম।’

শ্যামল মাথা ঘুরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

'কী বললে! লোডশেডিং হয়ে ভালো হয়েছে! তোমার কি মাথাটা পুরোপুরি গেছে কাজল?'

কাজল হেসে স্বামীর গায়ে হাত রাখল, 'গেছে তো গেছে। অ্যাই শোন এখন আমরা একদম ঝগড়া করব না।'

'তুমি লোডশেডিং-এর গুণকীর্তন করবে আর আমি চুপ করে, মুগ্ধ হয়ে শুনব?'

কাজল স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'হ্যাঁ শুনবে। যা বলব তাই শুনবে মুগ্ধ হয়ে। আবার তুমি যা বলবে আমিও মুগ্ধ হয়ে শুনব।'

শ্যামল বড়ো করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'প্রেম?'

কাজল মাথা তুলে বলল, 'হ্যাঁ, প্রেম। অসুবিধে আছে?'

'কতক্ষণ এই প্রেমপর্ব চলবে।'

কাজল হেসে ফেলল। বলল, 'যতক্ষণ না আলো আসে।'

শ্যামলও হেসে ফেলল। বলল, 'কী ব্যাপার বল তো বয়স-টয়স কমে গেল নাকি তোমার!'

কাজল স্বামীর ডান হাতটা দু-হাতে তুলে নিজের গালে ছোঁয়াল।

'বাঃ তোমারই কেবল বয়স কমবে? আমার কমতে পারে না?'

শ্যামল অবাক হয়ে বলল, 'আমার বয়স কমল! আমার আবার বয়স কমল কোথায়!'

শ্যামলের হাতটা ছেড়ে দিয়ে কাজল চোখ পাকিয়ে বলল, 'কমেনি?'

শ্যামল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'যা, বাবা আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

কাজল গাঢ় স্বরে বলল, 'তাহলে তাড়াতাড়ি চলে এলে কেন?'

শ্যামল একটু চুপ করে থেকে আমতা আমতা করে বলল, 'খিদে পেয়েছিল বলে...।'

ঠোঁট চিপে হাসল কাজল। বলল, 'বিল্টু বাড়ি না-থাকলে তোমার আজকাল তাড়াতাড়ি খিদে পায় বুঝি?'

শ্যামল বলল, 'যাঃ, কী সব বল না...যত আলতু ফালতু...।'

স্বামীর লজ্জা পাওয়া দেখে কাজলের মজা লাগল। ধেড়ে একটা লোকও যদি বিয়ের এত বছর পর লজ্জা পেতে পারে তাহলে তার আর দোষ কী?

কাজল ফিসফিস করে বলল, 'লজ্জা পাচ্ছ কেন?'

শ্যামল নার্ভাস হয়ে পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে গেল। প্যাকেট খুঁজে পেল না, প্যাকেটটা খানিক আগেই রেখে দিয়েছে খাটের ওপর। বলল, 'দুর, ঠাট্টা কোরো না তো। বিল্টুকে ফোন করেছিলে? দিদিকে জ্বালাতন করছে না তো?'

বিল্টুর ব্যাপারে উত্তর না-দিয়ে কাজল বলল, 'আচ্ছা, আমি সিরিয়াস। হল তো? কারেন্ট চলে আসুক তারপর আমি আরও সিরিয়াস হয়ে যাব।'

কথাটা বলে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া করতে শুরু করল কাজল। শ্যামল বারণ করল না। কাজল বানিয়ে বানিয়ে একটা হাই তুলল। বলল, 'ঘুম পাচ্ছে।'

শ্যামল বলল, 'শুয়ে পড়।'

কাজল আদুরে গলায় বলল, 'একা একা শুতে ইচ্ছে করছে না। ভয় করছে।'

শ্যামল কিছু বলল না। সামান্য নড়েচড়ে বসল। কাজল মুচকি হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে, তুমি খুব শিগ্‌গিরই কিয়াগো গতাচে কর্মসূচির মধ্যে ঢুকবে।'

শ্যামল মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী বললে? কী গতাচে!'

কাজল আওয়াজ করে হেসে বলল, 'কিয়াগো। সুখী দাম্পত্য জীবনের পুরস্কার।'

শ্যামল কিছু বলতে গেল। তার আগেই টেবিলের ওপর রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল। বিরক্তিতে মুখ কোঁচকাল শ্যামল।

'উফ এত রাতে আবার কে?'

কাজল খানিকটা চিন্তিত গলায় বলল, 'বড়দি নয় তো। বিল্টুটা...'

একবার এ-রকম হয়েছিল। বছর দুই আগে। মামাবাড়ি বেড়াতে দিয়ে বিল্টু মাঝরাতে মায়ের কাছে যাব বলে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিল। আজও কি সে-রকম কিছু হল?

না, সে-রকম কিছু নয়। ফোন করেছে শ্যামলের পাড়ার বন্ধু অভিষেক। ফোন করে ভয়ংকর খবর দিল। খবর পাকা কি না বলা যাচ্ছে না, তবে মনে হচ্ছে পাকা। ভালো খবর ভুল হয়, খারাপ খবর কখনো ভুল হয় না। সেই অর্থে এই খবরও ভুল হবে না।

খবর হল—লোডশেডিং নয়, মেইন রোডে মাটির তলায় কেবল ফেটেছে। কোথায় ফেটেছে জানা যাচ্ছে না। সুতরাং আজ রাতে কারেন্ট আসার কোনো প্রশ্নই নেই। কালও আসবে না। পরশু বিকেলের দিকে একটা চেষ্টা হলেও হতে পারে। খবর জানিয়ে অভিষেক দ্রুত ফোন ছেড়ে দিল। ফোন ছেড়ে খাটের ওপর ধপাস করে বসে পড়ল শ্যামল। কাজল শুনে বলল, 'সর্বনাশ!'

শ্যামল বলল, 'আমার মনে হচ্ছিল নিশ্চয় মেজর কিছু একটা ঘটেছে...। তুমিই বললে...।'

কাজল উঠে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু আলো যে দপ করে গেল!'

শ্যামল ঝাঁঝিয়ে উঠল। বলল, 'রাখ তোমার দপ করে গেল, ঝপ করে গেল। তোমরা সব পণ্ডিত হয়ে গেছ। সব ব্যাপারে পণ্ডিতি ফলাবে।'

স্বামীর ধমকে থতোমতো খেয়ে কাজল বলল, 'লোডশেডিং হলে তো ওভাবে আলো যায়।'

শ্যামল জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বিরক্ত এবং হতাশ গলায় বলল, 'চুপ কর, চুপ কর তো, এখন যে কী হবে?'

কাজল বলল, 'আমাকে বলছ কেন? কেবল তো আমি ফাটাইনি।'

'এই গরমে ঘুমোব কী করে...।'

কাজল উঠল মোমবাতি খুঁজতে। রাতে বাথরুম-টাথরুমে যেতে লাগবে। বলল, 'এবার একটা ইনভার্টার কেনো। আমি কবে থেকে বলছি। ছোড়দিরা নিয়েছে। দুটো পাখা, দুটো লাইট জ্বলে।'

শ্যামল রাগী গলায় বলল, 'তোমার ছোড়দি বড়দিরা তো নেবেই। তাদের বরেদের অনেক টাকা। হুটপাট জিনিস কেনার মতো আমার যে অত টাকা নেই সেটা কি তুমি জান না? নাকি জেনেও বলছ? আমাকে তো ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে।'

কাজলও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এতে বরেদের টাকার কী প্রশ্ন ওঠে। আজকাল সবাই নিচ্ছে। এসব জিনিস ইনস্টলমেন্টে পাওয়া যায়। অনেক টাকা লাগে না।'

শ্যামলও ঘুরে দাঁড়াল।

'ইনস্টলমেন্টে পাওয়া গেলেই হবে না। টাকা শোধ দিতে হবে। তার জন্য সংসারের আলতু ফালতু খরচ কমাতে হবে। সে কি তোমরা পারবে?'

'আমরা মানে?'

শ্যামল গলা তুলে বলল, 'তোমরা মানে, তোমরা। তুমি, তোমার কাজের লোক, যারা সংসার চালায়।'

কাজলও গলা তুলল, 'এমনভাবে বলছ যেন দশটা দাসী বাঁদী রেখে দিয়েছ।'

'একটা বাঁদীতেই তো নাভিশ্বাস। অপচয়ের চূড়ান্ত। মাসের খরচের বহর দেখলে পিলে চমকে যায়।'

কাজলও গলা তুলে বলল, 'কী চাইছ? সারাদিন ধরে হেঁশেল ঠেলব?'

'না, পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবে।'

'কী! আমি সারাদিন পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকি! এতবড়ো কথাটা বলতে পারলে? তোমার ছেলেকে দেখাশোনা করে কে? কে পড়ায়?'

'রাখ তোমার পড়ানো। হাফ ইয়ারলিতে তো ওই নম্বর জুটেছে। অঙ্কে চুয়াল্লিশ।'

'তুমি পড়ালেই পারতে। ছেলে অঙ্কে এক-শো পেত।'

শ্যামল ফস করে একটা সিগারেট ধরাল। ঘড়ি বারোটা ছাড়িয়ে গেছে। গরম বাড়ছে। মাথার গরমও বাড়ছে দুই 'সুখী দম্পতি'র। খানিক আগে পর্যন্ত ঘরের মধ্যে যে পরিবেশ ছিল, একটা ফোনে তা পুরো পালটে গেছে। প্রেম ভাসে চাঁদের আলোয়, সমুদ্রের ঢেউয়ে। এখানে মনে হচ্ছে প্রেম ভেসে পালিয়েছে অন্ধকারে। একেবারে ছুট দিয়েছে।

শ্যামল পায়চারি করতে করতে বলল, 'ছেলেকে আমিই না হয় বাড়িতে বসে পড়াব, কাল থেকে তুমি একটা চাকরিবাকরি জুটিয়ে ফেল।'

কাজল ভেবেছিল মোমবাতি পাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। টুকরো সাইজের মোমবাতি। রান্নাঘর থেকে দেশলাই আনতে গিয়ে চৌকাঠে সামান্য ঠোক্কর খেল।

'একটা চাকরিঅলা বউ জুটিয়ে নাও না। অসুবিধে তো কিছু নেই।'

শ্যামলের গলা রাগে ঘস্‌ঘসে হয়ে গেছে। কথা বলার সময় সে মাঝে মাঝেই মাথার ওপর স্থির হয়ে থাকা ফ্যানের দিকে তাকাচ্ছে। অন্ধকার চোখ সওয়া হয়ে গেছে। শ্যামলের মনে হচ্ছে, অন্ধকারে দেখতে আর কখনোই সমস্যা হবে না! বাদুড় পেঁচার মতো হয়ে যাবে! সে বলল, 'তাই নেওয়া উচিত।'

মোমবাতির টুকরো জ্বেলে জানলার পাশে রাখল কাজল। ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'কালই উকিল ডাক।'

এই কথা শেষ হওয়ার মুহূর্তে ঘরের আলোগুলো জ্বলে উঠল! যেভাবে চলে গিয়েছিল ফিরে এল তার থেকেও নিঃশব্দে!

নিতি কেন বৃষ্টি ভালোবাসে না

১

সম্প্রতি আমেরিকার মেডিভিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমীক্ষা করেছে। সমীক্ষার বিষয়—বৃষ্টি।

হিসেব মতো বৃষ্টি নিয়ে সমীক্ষা করা উচিত কৃষি বিভাগের। কিন্তু এই সমীক্ষাটি করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের গবেষকরা। গোড়ায় এই নিয়ে প্রচুর জল ঘোলা হয়। সমীক্ষার অনুমতি এবং বাজেটের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব জমা পড়লে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে তীব্র আপত্তি ওঠে। তাদের বক্তব্য ছিল, মনস্তত্ত্ব বিভাগ এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করতে চাইছে। বৃষ্টি, জলসেচ, ফসল তাদের বিষয়। এই বিষয়গুলি নিয়ে সমীক্ষা যদি করতেই হয়, তারাই করবে। মনস্তত্ত্ব বিভাগ বলে, এই কাজ আমরাই করব। এর সঙ্গে কৃষির কোনো সম্পর্ক নেই। দুই বিভাগের মনোমালিন্য চরমে উঠলে কৃষি বিভাগের ডিন প্রফেসর সুজান পদত্যাগের হুমকি দিলেন। প্রফেসর সুজান কোনো 'রাম শ্যাম যদু মধু' নন। তিনি যেকোনো সময় নোবেল প্রাইজ পেয়ে বসতে পারেন। তার পদত্যাগের হুমকিতে কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসল। দু-পক্ষকে নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক হয়। শেষ পর্যন্ত মনস্তত্ত্ব বিভাগের যুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মেনে নিতে বাধ্য হল। ঘোষণা করল, কাজটা ওরাই করবে। এতে যদি সুজানের মতো প্রফেসরকে বিশ্ববিদ্যালয় হারায় কিছু করার নেই। যুক্তির কাছে ব্যক্তি বড়ো নয়। নোবেল প্রাইজ পেলেও নয়।

সমীক্ষার স্যাম্পেল সাইজ যথেষ্ট বড়ো ছিল। শুধু সংখ্যায় নয়, ভৌগোলিক ভাবেও বড়ো। বিভিন্ন দেশের বহু মানুষ সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। ফিল্ডওয়ার্ক যেমন হয়েছে, মেলেও ডেটা সংগ্রহ কম হয়নি। প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বিশ্বময়। মানুষ প্রবল উৎসাহে উত্তর পাঠিয়েছেন। কাজ এত বড়ো যে গবেষকরা ফাইনাল রিপোর্ট এখনো তৈরি করে উঠতে পারেননি। আপাতত দু-শো আশি

পাতার একটি ইন্টারিম রিপোর্ট জমা পড়েছে। সেখানে আছে বাহান্নটি পরিচ্ছেদ। বিয়াল্লিশ নম্বর পরিচ্ছেদে 'ফাইন্ডিংস নাম্বার থ্রি বি'-র অংশটি আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। আমরা শুধু সেটাই দেখব। সেখানে যা বলা হয়েছে সেটা এ-রকম—

ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ নামের যে ছোটো অঞ্চলটি আছে সেখানকার মেয়েদের ওপর বৃষ্টির প্রভাব অতি চমকপ্রদ। সেই সঙ্গে চিন্তারও। সাধারণভাবে সেখানকার মেয়েরা 'বাঙালি মেয়ে' নামে পরিচিত। ছোটো বড়ো নির্বিশেষে বৃষ্টির সময় বাঙালি মেয়েরা এমন সব আচরণ করে যাকে পুরো স্বাভাবিক বলা যায় না। বর্ষা ঋতুতে তারা মানসিকভাবে খানিকটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাই সমীক্ষার এই অংশটি আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা 'হু'-এর কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদি ইচ্ছে হয়, তারা সেখানকার মেয়েদের চিকিৎসার জন্য ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। 'ইউ এন ও'-র মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে এধরনের কাজ ইতিমধ্যে কিছু হয়েছে। অবশ্যই এটা আমাদের পরামর্শ মাত্র। নিশ্চয় সকলে মিলে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটা পথ বের করা সম্ভব হবে। আমাদের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা বৃষ্টিকে বাড়াবাড়ি ধরনের পছন্দ করে। বেশিরভাগ সময়েই সেই পছন্দ তাদের স্বামী বা পুরুষ বন্ধুকে পছন্দের থেকেও বেশি! সমস্যার বিষয় হল, বৃষ্টির প্রতি মানসিক ভাবে তারা এতটাই তাড়িত হয়ে পড়ে যে এই উচ্ছ্বাস তারা গোপন করতে পারে না। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, প্রায় আটানব্বই শতাংশ বাঙালি মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে চায়। বিরাশি শতাংশ মেয়ে বৃষ্টি শুরু হলে যেকোনো ধরনের জরুরি কাজ বন্ধ করে খানিকক্ষণের জন্য বাইরে তাকিয়ে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। আটষট্টি শতাংশ মেয়ে এই সময় গলা ছেড়ে গান করার পক্ষে। ছিয়াত্তর শতাংশ চায় গুনগুন করতে। আশ্চর্যের বিষয় হল, কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু বৃষ্টিকে উপলক্ষ করে এক-শোর ওপর গান লিখে রেখেছেন! সম্ভবত বাঙালি মেয়েদের এই বৃষ্টি পাগলামির কথা তিনি জানতেন। সমীক্ষার ফল বলছে, এই অঞ্চলের মেয়েরা বৃষ্টির সময় বিশেষ ধরনের খাবার তৈরি করে পরিবারের সদস্যদের খাওয়াতে চায়। এর মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় খাবারটির নাম হল 'খিচুড়ি'। সমীক্ষার ফাইনাল রিপোর্টে আমরা সেই খাবারের রেসিপি জানাতে পারব বলে আশা করছি। এর সঙ্গে মুড়ি তেলেভাজা বলেও একটা টিফিন আইটেম আছে। বৃষ্টি ও যৌনতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সেখানকার বাঙালি মেয়েরা আমাদের যা যা জানিয়েছে সেগুলিও খুব স্বাভাবিক নয়। তাদের মতে পুরুষের সঙ্গে শারীরিক মিলনের জন্য বর্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। সেই পুরুষ স্বামী বা 'পুরুষ বন্ধু' যাই হোক। বাইরের মেঘগর্জন মৈথুনকে নাকি চরম তৃপ্তি দেয়। বাঙালি মেয়েরা প্রায় সকলেই টিপ টিপ ধরনের বৃষ্টিকে প্রেম করার জন্য 'ফিটেস্ট টাইম' বলে মনে করেছে। অবৈধ অভিসারের জন্য তারা বৃষ্টির সময়কে রেখেছে পছন্দের এক নম্বরে। তেত্রিশ শতাংশ মেয়ে জানিয়েছে ছাতা বা রেনকোট গায়ে প্রেমিককে দেখলে তারা উত্তেজনা অনুভব

করে। আমরা বিষয়টি ফিজিয়োলজি বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বৃষ্টির সঙ্গে ওই অঞ্চলের মেয়েদের হরমোনগত কোনো সম্পর্ক আছে কি না জানা প্রয়োজন।

খানিক আগে গড়পারের সুনীল নেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎই মেডিভিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃষ্টি বিষয়ক এই সমীক্ষা রিপোর্টটি দেখতে পায়। প্রথমে অবজ্ঞা করে। আমেরিকার ইউনিভার্সিটিগুলোর একটাই কাজ। হুদো হুদো গবেষণা কর আর গবেষণার রিপোর্টগুলি বিশ্বময় ছড়িয়ে দাও। অধিকাংশ গবেষণার বিষয়ই অর্থহীন। কোনো মাথামুণ্ডু নেই। দুনিয়ার মাথাওলা ছেলে-মেয়েদের নিজেদের দেশে আটকে রাখার কল। 'আমার ছেলে আমেরিকায় রিসার্চ করছে'—বলতে পারলে বাপ-মায়েরা কৃতার্থ। ছাতি ফুলে ইয়া বড়ো। কিন্তু গবেষণার বিষয় নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। বেশিরভাগই এই প্রসঙ্গে ছেলের ফ্ল্যাট নিয়ে গল্প পাড়ে। দু-একজন চালবাজ অবশ্য কয়েক পা এগোয়।

'তুমি বোধ হয় বাপীর কাজ সম্পর্কে জানতে ইন্টারেস্টেড। ওর রিসার্চের বিষয় হল বাজেট ক্রাইসিস অব আন্ডার ডেভেলপ্‌ড্‌ রিজিয়ন। জানই তো এখন আবার ইকনমিক্সের ভাষায় কান্ট্রির ডেফিনেশন গেছে বদলে। হা হা। সবাইকে আর দেশ বলা যায় না। বিশেষ করে গরিবদেশকে তো একেবারেই নয়। তাদের বলা হয় রিজিয়ন, অঞ্চল। হা হা। বোঝ কাণ্ড! তো বাপী তোমার ওদের নিয়েই কাজ করবে বলে ঠিক করেছে। ভালোই করেছে। দরিদ্র দেশের সন্তান দরিদ্র মানুষের প্রতি একটা দায়িত্ব না-থাকলে লোকে বলবে কী? হা হা। যাই হোক, ওর রিসার্চ সিনপসিস পড়ে নরম্যান হিউজ নাকি লাফালাফি জুড়ে দিয়েছিলেন। নরম্যান হিউজকে চেন তো? সেভেনটি থ্রিতে নোবেল পেতে গিয়েও খুব অল্পের জন্য মিস করেছিলেন।'

এই কারণেই সুনীল যেকোনো গবেষণা দেখলেই এড়িয়ে চলে। এটা এড়াতে পারল না। বাহান্ন নম্বর পরিচ্ছেদের মাথায় বড়ো করে লেখা—'বেঙ্গলি গার্লস'। আমেরিকার ইউনিভার্সিটি বাঙালি মেয়ে নিয়ে পড়েছে। কৌতূহলে অংশটুকু দ্রুত পড়েও নিল সুনীল। বাঙালি মেয়ে নয়, গবেষণার বিষয় বাঙালি মেয়েদের ওপর বৃষ্টির প্রভাব। সমীক্ষা, ফলাফল বিশ্লেষণ—সবই পড়ল। তারপর ফোঁস আওয়াজে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হায় রে! মেডিভিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সঙ্গে নিতির কি একবার দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না? দেখা হলে তারা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারত, বাঙালি মেয়ে এবং বৃষ্টি কাকে বলে?

এখন সকাল আটটা। বাইরে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। একটু আগে সামান্য ধরেছিল, আবার ঝেঁপে এসেছে। নিতির মুখ বেজার। শুধু বেজার নয়, সে ক্রমাগত খিটখিট করে চলেছে। এই খিটখিটানি চলছে তিনঘণ্টাব্যাপী। শুরু হয়েছে সকাল ছ-টা থেকে। খিটখিটানির সব কথা বোঝা যাচ্ছে না। বেশিরভাগটাই অস্পষ্ট। তাতে কিছু এসে যায় না। সুনীল জানে, খিটখিটানির সবই রাগের কথা। গত তিন বছরে তার অভ্যেস হয়ে গেছে। তিন বছর মানে, তিনটে বর্ষা। না না, তিন নয়,

আড়াইখানা। নিতি আর তার বিয়ে হয়েছিল, শ্রাবণ মাসে। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি। সেদিক থেকে হিসেব করলে বর্ষার আদ্দেকটা বলাই ভালো।

নিতির রাগ শুরু হয়েছে ভোর থেকে। ঘুম ভেঙে উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে যখনই দেখেছে আকাশের মুখ ভার তখন থেকে তারও মুখ ভার। এটাই তার স্বভাব। বৃষ্টি দেখলেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে। বিরক্তিতে চোখ-মুখ যায় কুঁচকে। মনে হয়, বৃষ্টি পড়ছে না, আকাশ থেকে কাদা ঝরে ঝরে পড়ছে। মুখ-চোখের এই অবস্থার মধ্যেই সে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছে। শাড়ি পরা হয়ে গেছে। এবার দ্রুত হাতে চুল বাঁধছে।

'সকাল থেকে কম্পিউটার নিয়ে বসে আছ কেন?' স্বামীর উদ্দেশে বলল নিতি। গলায় ঝাঁঝ।

সুনীল খানিকটা দমে গিয়ে বলল, 'কী করব?'

'কী আবার করবে? সকাল ন-টার সময় রাজ্যের মানুষ যা করে তাই করবে। অফিস যাবে।'

এবার আর শুধু ঝাঁঝ নয়, গলায় হুকুমও আছে। সুনীল অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল।

'হাঁ করে দেখছ কী? আমাকে দেখনি কখনো? তিন বছর তো ঘর করা হয়ে গেল। যাও, অফিসের জন্য তৈরি হও।'

সুনীল অবাক গলায় বলল, 'কী বলছ নিতি। এই বৃষ্টির মধ্যে বেরোব কী করে? ছাতাতেও কিছু হবে না। তারওপর রাস্তায় জল জমছে। জুতো-টুতো ভিজে ঢোল হয়ে যাবে। ভেজা জুতো পরে অফিস যাব?'

নিতি ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর হাসল। চোখ নাচিয়ে বলল, 'ভেজা জুতো পরে যাবে কেন? প্যান্ট গুটিয়ে, হাতে জুতো নিয়ে গলি পেরোবে, তারপর মেইন রোডে গিয়ে ট্রামে উঠে অফিস যাবে।'

সুনীল ঢোক গিলে বলল, 'দুর, অত ঝামেলা করে কে অফিস যাবে? আজ সি.এল. মেরে দেব।'

'সে কী গো! বৃষ্টি তোমার এত প্রিয়, এত ভালো লাগার জিনিস, বৃষ্টি দেখলে তোমার মন উড়ু উড়ু করে সেই বৃষ্টি দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছ?'

সুনীল বলল, 'ঘাবড়ে যাচ্ছি না, জলে ভিজে সর্দিজ্বর বাধাতে চাইছি না।'

নিতি চোখ পাকিয়ে বলল, 'তা বললে কী করে হবে বাপু? শুধু ভালোটুকু নেব, খারাপটুকুর সময় মুখ লুকিয়ে থাকব তা কী করে হবে? আমিও তো এই হতচ্ছাড়া বৃষ্টির মধ্যে বেরোচ্ছি। চাকরি করতেই যাচ্ছি। আমি যদি পারি তুমি পারবে না কেন? তা ছাড়া তুমি হলে একজন বৃষ্টিপ্রেমিক মানুষ। কাল রাতে খেতে বসে লেকচার দিচ্ছিলে না? ভুলে গেলে? এখন মুখ লুকিয়ে থাকলে চলবে?'

নিতির চোখ খুব সুন্দর। টানা টানা। ভালো করে দেখলে কোনো কোনো সময় মধুবালার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। কিন্তু চোখ পাকালে বড়োমাসির কথা মনে পড়ে

যায়। সুনীলের বড়োমাসি ছোটোদের ধমক দিতেন না। শুধু চোখ পাকাতেন। ব্যস, তাতেই কাজ হয়ে যেত।

সুনীল হাসির ভান করল। বলল, 'মুখ লুকিয়ে কোথায় আছি নিতি? এই তো আমার সামনে জানলা খোলা। দিব্যি বৃষ্টি দেখছি। ঝরঝর মুখর বাদরদিনে।'

'চুপ কর। একদম চুপ। ইস, বাবু ঘরে বসে কাব্য করছেন!'

নিতির কথা বলবার কায়দা বলে দিচ্ছে, সে ঝগড়ায় যেতে চাইছে। কেন যে বৃষ্টির সময় মেয়েটা এমন করে! ওকে মেডিভিল্ট ইউনিভার্সিটির সমীক্ষা রিপোর্টটা পড়ালে কেমন হয়? বাঙালি মেয়েদের বৃষ্টি প্রীতি যেখানে পাগলামি বলে মনে করা হয়েছে, সেখানে ও কেন এ-রকম! থাক, ওসব দেখাতে গিয়ে কম্পিউটারটাই না ভেঙে ফেলে। রিস্কে না-যাওয়াই ভালো।

নিতির এই বৃষ্টি বিরোধী চরিত্রের খবর সুনীল প্রথম জানতে পারে ফুলশয্যার রাতে। জেনে বিরাট অবাক হয়। এমন সুন্দর একটা মেয়ে বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না! বৃষ্টি পড়লেই বিরক্ত হয়। মেজাজ বিগড়োয়! বৃষ্টি অপছন্দ করে, আদৌ এমন কোনো মেয়ে সংসারে আছে সেটাই সুনীলের জানা ছিল না। সেদিন বিষয়টা নিয়ে হাসি ঠাট্টাই করেছিল সুনীল। নিতি প্রতিবাদ করেনি। নতুন বউ বলে কথা। শোধ নিয়েছে পরে। নিয়েছে বলা ঠিক নয়, বলা উচিত এখনো নিয়ে চলেছে।

ফুলশয্যার রাতে ঘটনাটা ছিল এ-রকম—

সারাদিন গুমোট থাকার পর বৃষ্টি নেমেছিল। নতুন বউকে নিয়ে সবে ঘরে ছিটকিনি দিয়েছে সুনীল, অমনি বাইরে বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে। সুনীল বুঝল, সে বিরাট ভাগ্যবান। ফুলশয্যার রাতে বৃষ্টি পাওয়া আর ঘড়া ভরতি মোহর পাওয়া একই ঘটনা। সুনীলের মনে হল, বৃষ্টি তার মনে যতটা পুলক জাগাচ্ছে, শরীরে তার থেকে ডবল শিহরন এনেছে। এই দিনে শরীরের ব্যাপারটা ছোটো ব্যাপার নয়, বরং বলা উচিত আসল ব্যাপার।

আর পাঁচটা নতুন বউয়ের মতো ফুল সাজানো খাটের পাশে খানিকটা জড়োসড়ো হয়েই বসেছিল নিতি। সিগারেট ধরিয়ে সুনীল জানলার কাছে গেল।

'আহা, কী চমৎকার! কেমন সুন্দর বৃষ্টি নেমেছে দেখ।'

নিতি কথার কোনো সাড়াশব্দ না করে চুপ করে বসে রইল। সুনীল এবার গলা তুলে বলল, 'নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে,/ ওগো প্রবাসিনী, স্বপনে তব/ তাহার বারতা কি পেলে?' তারপর বউয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'কার লেখা বুঝতে পারছ নিতি?' বলার ভঙ্গির মধ্যে একটা পণ্ডিতি কায়দা। 'বিরাট রবীন্দ্রনাথ পড়েছি', গোছের ভাব। তারপর সুনীল দু-পা এগিয়ে এল খাটের দিকে। রজনীগন্ধার পর্দা সরিয়ে খাটে বসল।

'আচ্ছা, আরও দু-লাইন বলছি। লাইনটা একটু কঠিন।'

নিতি একবার চোখ তুলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিল। সুনীল গলা তুলে বলল, 'আজি তরঙ্গ কলকল্লোলে দক্ষিণসিন্ধুর ক্রন্দনধ্বনি/ আনে

বহিয়া কাহার বিরহ।' সুনীল থামল। নিতির থুতনিতে হাত দিয়ে, নামানো মুখ তুলে পুরোনো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিনেমার নায়কদের স্টাইলে বলল, 'নাও বল। বল দেখি কে লিখেছিলেন এমন চমৎকার কথা? আজ অবশ্য বিরহ নয়, আমাদের মিলনের দিন। হা হা...।'

ঝটকা মেরে মুখ সরিয়ে নিল নিতি। বিরক্ত গলায় বলল, 'সবাই জানে রবীন্দ্রনাথের লেখা। আমার ক্লাস সেভেনের পড়া ভাইঝিও জানে। তার গানের স্কুলে শিখিয়েছে।'

ক্লাস সেভেনের ভাইঝি জানে বলার মধ্যে একটা হালকা অপমান ছিল। অপমান গায়ে মাখল না সুনীল। বরং আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে নিতির দিকে সরে এল। তার ফর্সা গালে হাত দিয়ে গাঢ় গলায় বলল, 'কী সুন্দর না?'

এই শিক্ষা সুনীলের বিবাহিত বন্ধুদের। তারা বলেছে, ফুলশয্যার রাতে হঠাৎ করে বউয়ের গায়ে হাত দিলে প্রেস্টিজ থাকবে না। হাত দিতে হবে ছল চাতুরির মধ্যে দিয়ে। ভাবটা যেন এমন হবে, 'গায়ে হাত দেব' বলে হাত দেওয়া হয়নি। শুরুর ছলচাতুরিটা ঠিক কী হবে তা নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা। শুরু ঠিক হলে সব ঠিক। বৃষ্টি পেয়ে সেই দুশ্চিন্তা অনেকটা কেটেছিল সুনীলের। রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে তার পুরোটাই কাটল। রবীন্দ্রনাথের লেখা আওড়াতে আওড়াতে বুকের আঁচল সরালে সদ্য বিবাহিতা বউ নিশ্চয় কিছু মনে করবে না। ভান করতে হবে শরীরে সে হাত দেয়নি, হাত দিয়েছে কবিতা। তাকে আদর সোহাগ করেছে গান। স্বামী তো নিমিত্ত মাত্র। ভালোবাসা এসেছে কবিতা, গানের পথ বেয়ে। এইটা বোঝাতে পারলেই কেল্লাফতে। বউ ঘন হয়ে আসবে। মনে মনে ভাববে, আহা! এ তো দস্যু নয়, এ তো কবি! এ তো মহাজ্ঞানী!

সেদিন অবশ্য এই 'মহাজ্ঞনী থিয়োরি' কাজ করল না। গাল থেকে স্বামীর হাত সরিয়ে নিতি বেশ খানিকটা সরে গেল।

'না, আমার ভালো লাগে না। বৃষ্টির কোনো কিছুই আমার ভালো লাগে না।'

হাত সরিয়ে নেওয়ায় সুনীল একটু ঘাবড়াল। গালের পরেই তার টার্গেট ছিল বুক। আলতো করে হাত রাখার টার্গেট। বুকের জন্যও সে মনে মনে 'রবীন্দ্রনাথ' ঠিক করে ফেলেছিল। সেটা অবশ্য বর্ষার নয়, প্রেমের।

'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি।/ কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি।/ এসেছিল নীরব রাতে, বীণাখানি ছিল হাতে—/স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিণী।'

'স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিণী'র—কোনো একটা ফাঁক ফোকরে নিতির ব্লাউজের বোতামে হাত দেবার প্ল্যান ছিল। বৃষ্টির কথায় থমকে গেল সুনীল।

'সে কী! কেন: বৃষ্টি ভালো লাগে না তোমার?'

প্রত্যাখ্যাত হয়ে খাট থেকে উঠে পড়ল সুনীল। সিগারেট ধরাল।

নিতি ঘোরানো মুখেই বলল, 'না, জঘন্য লাগে। সব থেকে খারাপ সময় হচ্ছে বর্ষাকাল। স্যাঁৎসেতে ওয়েদার, প্যাচপ্যাচে কাদা।'

সুনীল অবাক হল। সেই সঙ্গে হতাশও।

'আমি তো অন্যরকম বুঝেছিলাম। তোমার বাড়ি থেকে যখন শ্রাবণ মাসেই বিয়ের জন্য চাপাচাপি করল, আমি আপত্তি করেছিলাম। জল কাদায় বিয়েবাড়ি পণ্ড না হয়ে যায়। তারপর শুনলাম, তুমি নাকি বলেছ, শ্রাবণেই বিয়ে করতে হবে। শুনে আমার কী যে ভালো লেগেছিল নিতি তোমাকে বোঝাতে পারব না। ভাবলাম, আমি বৃষ্টি এত ভালোবাসি, আমার জীবনসঙ্গীও তাই।'

নিতি গম্ভীর হয়ে বলল, 'ভুল ভেবেছিলেন। আমার দিদা খুব অসুস্থ। যেকোনো সময় একটা কিছু...উনি যাতে আমার বিয়েটা দেখে যেতে পারেন সেই কারণেই আমি...সেটা শ্রাবণ না হয়ে অন্য কোনো মাসও হতে পারত। হাতের কাছে শ্রাবণ ছিল, তাই শ্রাবণ। নইলে বর্ষাকালে বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে?'

সেদিন রাতে বৃষ্টি দেখে সেই যে মুড অফ করেছিল নিতি তা ঠিক হতে দু-দিন লেগেছিল। তখন অবশ্য রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ কিছুই লাগেনি। নিতি নিজেই...।

বিষয়টা নিয়ে চিন্তায় পড়ল সুনীল। ঘটনা এমন যে কাউকে বলার উপায় নেই। কে বুঝবে? বউ ঝাল ভালোবাসে না, বউ নোনতা ভালোবাসে না, বউ বরের বেশিক্ষণ বাইরে সময় কাটানো পছন্দ করে না, বউ বরের গোঁফ পছন্দ করে না—এসবের একটা মানে আছে। খানিকটা বোঝা যায়। বউ বৃষ্টি ভালোবাসে না—তার কী মানে! চুপ করেই রইল সুনীল। একদিন না-পেরে অফিসের দিব্যেন্দুকে বলে বসল।

দিব্যেন্দু সব শুনে গম্ভীর গলায় বলল, 'দেখ, হতে পারে বর্ষার সময় তোমার স্ত্রীর জীবনে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল। হয়তো প্রিয় কেউ মারা গিয়েছিলেন। আবার অন্য কিছুও হতে পারে। ইয়ে ধরনের কিছু।'

'ইয়ে! সেটা কী?'

দিব্যেন্দু 'বলব না বলব না' গলা নামিয়ে বলল, 'অনেকসময় ইয়ে ধরনের কোনো স্মৃতি রিপালশন তৈরি করে।'

সুনীল ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কী সেটা?'

'হয়নি যদিও, তবু ধর কোনো ঝড়ু বাদলার রাতে তোমার স্ত্রী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে পথের ধারে কোনো ভাঙা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সে। এদিকে সেই সময় সেখানে বসে কতগুলো খারাপ লোক নেশাভাং করছিল। তারা তোমার স্ত্রীকে দেখতে পেল। তখন পা টিপে টিপে পিছন থেকে...। এ-রকম তো খবরের কাগজে আকছার পড়ি। পড়ি না?'

এরপর আর কথা বাড়ায়নি সুনীল। তবে আড়াই বছরে ঠারে ঠোরে অনেকবারই নিতিকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছে সে। জানতে চেয়েছে বৃষ্টির ওপর

তার এত রাগ কীসের? শুধু জানতে চায়নি, বার বার চেষ্টা করেছে যদি স্ত্রীকে খানিকটা নরম করে আনা যায়। মানুষ মানুষের ওপর রাগ, বিরক্ত হলেও অনেক সময় নরম হয়ে যায়। রোদ, বৃষ্টির ওপর নরম হওয়া যাবে না কেন?

এই তো গতকাল রাতেও খেতে বসে বউকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল সুনীল।

'বৃষ্টিতে তোমার সমস্যা কীসের নিতি?'

'তোমার এত ভালোবাসারই বা কী আছে? সেটা আগে বল শুনি।'

সুনীল একটু থতোমতো খেয়েছিল। সত্যি তো, কেন বৃষ্টি ভালোবাসে দুম করে বলা মুশকিল।

'বাঃ, ভালোবাসা হবে না? বর্ষায় মাঠঘাট, খাল বিল সব জলে টইটম্বুর হয়ে যায়।'

নিতি ধাঁতিয়ে ওঠে, 'তোমার কী? তুমি কি ব্যাং? নাকি পুঁটি মাছ যে তোমার খালবিলে টইটুম্বুর জল লাগবে?'

সুনীল এই যুক্তিজালে আবার থতোমতো খায়। বোঝে খালবিলের কথাটা দুম করে বলা ঠিক হয়নি। সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ঢোক গিলে বলল, 'চাষিরা মাঠে চাষ করে...।'

'তুমি চাষ কর? তোমার মাথা ব্যথা কীসের? তুমি তো বাড়ির বাজারও করতে চাও না।'

সুনীল স্মার্ট হতে চেষ্টা করে। চোখ বড়ো করে বলে, 'সে কী! বৃষ্টি না হলে ফসল ফলবে কী করে? আমরা খাব কী নিতি?'

'উরিবাবা, দেশের কৃষিমন্ত্রী এলেন রে। ফসল নিয়ে রাতের ঘুম নেই।'

ব্যঙ্গ শুনে সুনীল মুচকি হাসার চেষ্টা করে। বলে, 'চিন্তা সবার। যাই বল নিতি, বৃষ্টি খুব দরকার। সে তুমি তার ওপর রেগেই থাক আর নাই থাক।'

নিতি ভূগোলের টিচার। শেওড়াফুলিতে মেয়েদের স্কুলে পড়ায়। ক্লাস এইটের ক্লাস টিচার। সুনীলের কথায় টেবিলে হালকা চাপড় মেরে বলল, 'এইবার পথে এস। তাহলে সুন্দর না বলে বল বৃষ্টি আমাদের দরকার। সহজ কথা সহজ ভাবে বল। আহা বৃষ্টি, ওহ বৃষ্টি বলে ন্যাকামি কর কেন? সেদিক থেকে বলতে গেলে আমাদের সব সিজনই দরকার। রোদ না উঠে বছরের পর বছর যদি আকাশ মেঘলা হয়ে থাকত? চলত?'

সুনীল চোখ ঢুলু ঢুলু করে বলল, 'শুধু প্রয়োজন বলছ কেন নিতি? বর্ষা ঋতুটার একটা এসথেটিক ভ্যালু আছে। নান্দনিক মূল্য, সৌন্দর্য। আকাশ মেঘে মেঘে কালো। গাছপালা জল পেয়ে সবুজে সবুজ। কখনো মেঘের ছায়া, কখনো বৃষ্টির আলো। কান পাতলে শুধু ঝিমঝিম ঝমঝম। শ্বাস টানলে বেল, জুঁইয়ের উদাস করা গন্ধ। মন উন্মনা হয়ে ওঠে। সবাই এসব বোঝে না নিতি। সৌন্দর্য একটা কঠিন সাবজেক্ট। সর্বক্ষণ গ্লোব আর ম্যাপ দেখলে সৌন্দর্য বোঝা যায় না। এসব থেকে মাঝেমধ্যে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রকৃতির সামনে দু-হাত তুলে দাঁড়াতে হবে। এইভাবে...'

বলতে বলতে সুনীল দু-হাত ছড়িয়ে দেয় দু'পাশে। নিতি ভুরু কুঁচকে স্বামীর দিকে তাকায়। সুনীলও থমকে যায়। বুঝতে পারে আবার একটা মিসটেক হল। গ্লোব, ম্যাপ বলে খোঁচা দেওয়াটা ঠিক হল না। কাল রাতে নিতি উত্তর না দিয়ে উঠে গিয়েছিল। রাতে বেডরুমে আরও একপ্রস্থ প্রকৃতি ও সৌন্দর্য নিয়ে কথা শুরু করেছিল সুনীল। নিতি বলল, 'লেকচার থামাও, লাইট নিভিয়ে মশারির ভেতর এস।'

'ভালোবাসা-বাসি' শেষ হলে সুনীল ক্লান্ত হাতে নিতিকে আদর করতে করতে বলল, 'কই বললে না তো?'

ঝিম ধরা গলায় নিতি বলল, 'কী বলব সোনা?'

নাক দিয়ে হুলো বেড়ালের মতো ঘর্ ঘর্ আওয়াজ করল সুনীল।

'উ উ উ, ওই যে নেচার, বিউটি অব মনসুন...তোমাকে একটু আগে অত করে বোঝালাম, কিছু তো বললে না ডার্লিং...'

শরীর ভরা তৃপ্তি নিয়ে ফিসফিসিয়ে নিতি বলল, 'বলব, বলব সোনা। সময় হলেই বলব। চিন্তা কোরো না।'

নিতির ঘাড়ের কাছে মুখ গুঁজে সুনীল বলল 'নিতি, অ্যাই নিতি, আমার মধ্যে একটি কবি কবি ব্যাপার আছে না? জান তো ইচ্ছে করলে আমিও কবিতা লিখতে পারতাম, সরকারি অফিসে কেরানির চাকরি করতে গিয়ে সব গোল্লায় গেল...। নইলে বৃষ্টি নিয়ে একটার পর একটা কবিতা লিখে হইহই ফেলে দিতাম। উ উ উ...' কথা বলতে বলতে নিতির পেটে হাত রাখল সুনীল।

নিতি যত্ন করে সেই হাত সরিয়ে বলল, 'সময় মতো সব উত্তর পাবে কবি সোনা। এখন ঘুমোতে দাও।'

'লাস্ট কোয়েশ্চেন। নিতি তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ মুনুমুনু?'

'কেন গো আমার ব্যাং সোনা? তুমি বৃষ্টি ভালোবাস বলে রাগ করব কেন?'

'না, তখন খেতে বসে তোমাকে ম্যাপ আর গ্লোবের কথা বললাম তো তাই বলছি।'

নিতি পাশ ফিরতে ফিরতে হাসল। বোজা চোখে অস্ফুটে বলল, 'ওমা রাগ করব কেন? খুশি হয়েছি। কত খুশি হয়েছি সময় পেলে বুঝতে পারবে।'

সুনীল আহ্লাদে আটখানা। স্ত্রীর আদুল পিঠে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, 'আমি জানতাম, তুমি আমার ওপর কখনো রাগ কর না। তুমি আমার সুন্টুমুন্টু ঘুন্টু ফুন্টু না? বল বল।'

জড়ানো গলায় নিতি বলল, 'হ্যাঁ। আমি তোমার সুন্টুমুন্টু ঘুন্টু ফুন্টু। নাও এবার ঘুমিয়ে পড়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ, কাতলা মাছ হয়ে টইটম্বুর পুকুরে ডিগবাজি খাচ্ছ।'

আজ সকাল থেকে সেই 'সুন্টুমুন্টু ঘুন্টুফুন্টু'র মেজাজ বিগড়ে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। যথারীতি সে স্বামীর ওপর চোটপাট শুরু করেছে। যেন বৃষ্টির কারণ মেঘ

নয়। বৃষ্টির কারণ সুনীল। তাকে চাপ দিচ্ছে এই বৃষ্টিতে অফিসে যাওয়ার জন্য। সুনীল বিস্মিত। তবু সে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। শান্ত গলায় বলল, 'বৃষ্টি ভালো লাগলেই যে ভিজতে হবে এমন কোনো কারণ নেই নিতি। বৃষ্টি ঘরে বসে দেখতেও ভালো লাগে।'

নিতি গলা তুলে বলল, 'আমার লাগে না। আমি তো আর ঘরে বসে মেঘদূত আওড়াতে পারব না। আমাকে স্কুলে যেতে হবে।'

'যেয়ো না।'

নিতি কোমরে হাত দিয়ে প্রায় হুংকার দিয়ে উঠল, 'যেয়ো না মানে? আজ আমাদের পরীক্ষা শুরু। তোমার মতো না-গেলে চলবে না। ইস এই জল কাদায় হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে কী করে যে ট্রেন ধরব, আমার কান্না পাচ্ছে।'

পরিস্থিতি শান্ত করবার চেষ্টা করল সুনীল।

'হেডমিস্ট্রেসকে ফোন করে দাও, জ্বর হয়েছে। তারপর খিচুড়ি কর, দুপুরে খাব।'

ঝাঁঝিয়ে উঠল নিতি। বলল, 'বাজে কথা বোলো না। পরীক্ষার সময় আমাদের কামাই চলে না। আর খিচুড়ি খাওয়া বের করছি তোমার, আজ বাড়িতে রান্না হবে না। আমি স্কুলে যা-খুশি খাব, তুমি হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ করলে করবে না-করলে পেটে গামছা বেঁধে বসে থাক। তবে গামছা ভিজে এটা মনে রেখো।'

'রান্না হবে না! কেন? রান্না হবে না কেন?' সুনীল ভয়ে ভয়ে বলল।

চুল বাঁধা বন্ধ করে 'ভস্ম করে দেওয়া' ভঙ্গিতে তাকাল নিতি। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'কেন হবে না তুমি জান না? শুনে রাখ তবে, তোমার আদিখ্যেতার বৃষ্টির জন্য কাজের লোক আসেনি। এঁটো বাসন ধোয়া হয়নি। রান্না কীসে করব? এবেলা কেন, ওবেলাতেও রান্না হবে না।'

সুনীলের খুব ইচ্ছে করল বলে, 'বাসনগুলো একটু ধুয়ে নিলে হত না?'

খুব কষ্টে নিজেকে সামলাল সুনীল। বললে কেলেঙ্কারি হত। কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে যেত। মিনমিন করে বলল, 'বৃষ্টি তো বাড়ছে নিতি। তুমি যাবে কী করে?'

চুল ছেড়ে দ্রুত ব্যাগ গোছাতে গোছাতে নিতি বলল, 'তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি বৃষ্টি দেখ, আর কবিতা ভাব।'

'আহা, আমার ওপর চটে যাচ্ছ কেন নিতি। আমি তো আর বৃষ্টি আনিনি। তা ছাড়া...তা ছাড়া...বর্ষাকালে বৃষ্টি তো পড়বেই।'

উঠে দাঁড়াল নিতি। দাঁত খিঁচোনো ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকে জ্ঞান দিয়ো না। আমি জানি। ছোটো ছেলে-মেয়েরা দুষ্টুমি তো করবেই, তা বলে তাদের নিয়ে আদিখ্যেতা করতে নেই। তাদের কান মুলে দিতে হয়। বৃষ্টি বাদলার তো আর কান মুলতে পারব না। তাকে নিয়ে যে আদিখ্যেতা করে কান মুলব তার।'

সুনীল অজান্তেই নিজের ডান কানে হাত দিল। নিতি নাক সিঁটকে রবারের জুতো পরে পায়চারি করে নিল। বাড়ি থেকে নামলেই তো জল। ইস বর্ষাকালটা

যদি স্কুলে টানা ছুটি থাকত। তাও বাপেরবাড়ি ছিল স্কুলের খুব কাছে। জল কাদার ঝামেলা অতটা বোঝা যেত না। একেবারে দোরগোড়ায় রিকশ। কলকাতায় বিয়ে করে হাঁড়ির হাল।

'অ্যাই, হাঁদার মতো বসে না থেকে জানলা দিয়ে দেখে এস কতটা কাপড় তুলতে হবে?'

চমকে উঠল সুনীল। কাপড় তুলতে হবে মানে!

নিতি ধমক দিল, 'আরে, বসে রইলে কেন? গলিতে কত জল দেখে আসবে তো; শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত তুললে হবে কিনা বুঝতে পারছি না।' সুনীল উঠে পড়ল। এটা তো ভালো কথা নয়, বাড়ির বউ হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি তুলে যাবে! ছি ছি। নিতি বলল, 'আর দেখবে তো সামনের বাড়ির বুড়োটা দোতলার বারান্দায় বসে আছে কি না। ওটা বিরাট লম্পট। জল জমলেই বারান্দায় ওঁত পাতে। কোন্ মেয়ে শাড়ি তুলল, কোন মেয়ে ভিজেছে—সব দেখে। বদের ধাড়ি একটা।'

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল সুনীলের। এ কেমন কথা! বুড়ো কি নিতিকেও দেখে?

'আমি বরং রিকশ ডাকি নিতি।'

'জলের সময় গলির ভেতর ঢুকতে রিকশ কত চাইবে জান না? তা ছাড়া এখন বাবুরা আসবেনও না। এক একটা লাটসাহেব। উফ আজ ট্রেনে যা ভিড় হবে। আর যদি বৃষ্টিতে সকালের ট্রেন ক্যানসেল হয় তাহলে আর দেখতে হবে না। গাদাগাদি গোটা পথ যেতে হবে। লেডিসে জায়গা পেলে তাও রক্ষে, নইলে বুক পেট সামলাতে সামলাতে মরতে হবে। বৃষ্টিতে বদমাইশগুলোর পোয়াবারো। মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়ার লাইসেন্স পেয়ে যায়।'

এবার বেশ খারাপ লাগছে সুনীলের। সে নীচু গলায় বলল, 'আজ কি না-গেলেই নয়?'

নিতি এ কথার উত্তর দিল না। জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। হতচ্ছাড়া বৃষ্টি কি কমেছে? মনে হচ্ছে কমেছে।

সুনীল ভয়ে ভয়ে বলল, 'আচ্ছা, পল্লবীকে একটা ফোন করে নিলে পারতে না? দুজনে মিলে না হয় যেতে।'

নিতি মুখ না ঘুরিয়ে বলল, 'দুজনে মিলে গেলে কী হত? বৃষ্টি থেমে যেত? নাকি রাস্তার জল শুকিয়ে যেত? বাজে কথা বল কেন? তা ছাড়া মোবাইলের নেট ওয়ার্ক ঠিকমতো কাজ করছে না। বেশি বৃষ্টি হলে নেটওয়ার্ক কাজ করে না, তুমি জান না?'

সুনীলের খারাপ লাগাটা বাড়ছে। সে বাড়িতে বসে বসে 'আজি ঝর ঝর মুখর বাদরদিনে' করবে আর নিতি ভিজতে ভিজতে...না, এটা ঠিক নয়। একই বৃষ্টি দুজন দুরকম ভাবে কাটাবে কেন?

মিনিট তিন পরেই নিতি বলল, 'বৃষ্টি ধরেছে আমি বেরোচ্ছি। বিকেলে যদি

তোমার এই প্রাণের বৃষ্টি বাড়ে তাহলে আমি আর ফিরছি না। বাবার ওখানে থাকব।'

সুনীল আমতা আমতা করে বলল, 'আমি আমি...।'

নিতি গনগনে গলায় বলল, 'আমি আমি করছ কেন? আমি আবার কী?'

'না মানে বৃষ্টি বাদলায় আমি একা একা কী করব তাই ভাবছিলাম।'

নিতি আবার রাগের ফোঁস আওয়াজ করে বলল, 'কী আর করবে? তুমি গলির জমা জলে গিয়ে কাগজের নৌকো ছাড়। কাগজের তো অভাব নেই।'

নিতি দরজা খুলল। সুনীল বলল, 'একমিনিট নিতি।'

ভুরু কুঁচকে নিতি মুখ ফেরাল। সুনীল বোকা হেসে আবার বলল, 'প্লিজ একমিনিট।'

২

শেওড়াফুলি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে সুনীল এবং নিতি। স্টেশন চত্বর ফাঁকা। স্টেশনে নেমে খবর পাওয়া গেছে, নিতির স্কুল ছুটি। রেনি ডে। নিতিকে আগেই খবর পাঠানোর চেষ্টা হয়েছিল, মোবাইলে ধরা যায়নি। সুনীলের হাতে নিতির ছাতা। বেগুনি এবং ফুল কাটা। মেয়েদের ছাতা ধরে থাকায় সে একটু লজ্জা লজ্জা পাচ্ছে। কী করা যাবে? তাড়াহুড়োয় নিজের ছাতা আনতে ভুলে গেছে যে। তার তখন কিছুই মাথায় ছিল না। প্রথমে গলির মোড় পর্যন্ত নিতির সঙ্গে যাবে ঠিক করেছিল। সেটা বাড়িয়ে হাওড়া স্টেশন করে। শেষ পর্যন্ত একেবারে শেওড়াফুলি পর্যন্ত চলে এসেছে। নিতি বারণ করেছিল। তবে সেই বারণে জোর ছিল না। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে।

'নিতি, বাড়ি ফিরবে?'

'কেন? সেখানে তোমার জন্য কে অপেক্ষা করে আছে?'

সুনীল ঘাবড়ে বলল, 'না, বৃষ্টি পড়ছে তো তাই ভাবলাম, তোমার অসুবিধে হচ্ছে।'

নিতি কঠিন গলায় বলল, 'কে বলল? আমি তোমাকে বলেছি?'

সুনীল তাড়াতাড়ি বলল, 'অ্যাই চা খাবে?'

'খাব।'

'তাহলে চল একটা দোকান-টোকানে গিয়ে ঢুকি।'

নিতি উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'না, দোকানে খাব না। গঙ্গার ধারে গিয়ে খাব। ওখানে চমৎকার চা পাওয়া যায়।'

সুনীল আঁতকে উঠল। নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। বিড়বিড় করে বলল, 'গঙ্গার ধারে! এই বৃষ্টিতে?'

নিতি চোখ পাকিয়ে বলল, 'তোমার অসুবিধে কী?'

সুনীল তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, আমার কোনো অসুবিধে নেই।'

গঙ্গার ধারে কী হল? না, থাক। ওখানে আমরা যাব না। এর মধ্যে আমাদের নাক গলানো উচিত হবে না। বোকামিও হবে। এমনও তো হতে পারে, আমরা ভাবছি একরকম কিন্তু ঘটছে অন্য। হয়তো ফেরিঘাটের কোনো বেঞ্চে সুনীল আর নিতি ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। তাদের মাথায় একটা লেডিজ ছাতা। হয়তো সেই ছোটো ছাতায় বৃষ্টি আটকাচ্ছে না। ফলে দুজনেই ভিজছে। হয়তো সুনীল সুদূর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা নিয়ে গল্প বলছে। বাঙালি মেয়ের বৃষ্টি পাগলামির গল্প। তাই শুনে নিতি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে গায়ে। হয়তো অতটা গড়িয়ে পড়ার দরকার নেই, তবু পড়ছে।

হোল্ডঅল

আমরা বিরাট বিপদের মধ্যে পড়েছি।

বেড়াতে যাওয়ার আগে ছোটোখাটো বিপদে সবাই পড়ে। জিনিস গোছগাছের সময় সেফটিপিন নিতে ভুলে যায়। জলের জায়গা পড়ে থাকে। স্টেশনে যাওয়ার সময় তাড়াহুড়োয় ট্যাক্সির দরজায় খোঁচা লেগে কনুই ছড়ে। কিন্তু আমাদের এই বিপদ কোনো ছোটোখাটো বিপদ নয়। ছোটোখাটো হবে কী করে? যে জিনিস আমাদের বিপদে ফেলেছে সে নিজেই তো ছোটো নয়। পেল্লাই সাইজের একটা হোল্ডঅল। তাই বিপদের চেহারাও পেল্লাই।

হ্যাঁ, আমাদের বিপদ হয়েছে হোল্ডঅল নিয়ে।

হোল্ডঅলের বেল্ট ছিঁড়ে গেছে। অথচ রওনা দেওয়ার আর মাত্র অল্প বাকি আছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই বাবা ট্যাক্সি ডাকতে যাবে। আমাদের পাড়ায় চট করে ট্যাক্সি পাওয়া ঝামেলার। তার ওপর হাওড়া স্টেশন শুনে 'এক্সট্রা' হাঁকবে। বাবা রাজি হবে না। কম করে তিনজন ড্রাইভারের সঙ্গে বাবা ঝগড়া করবে। আমরাও রেডি। বিনু কায়দা মার্কা ফ্রক পরেছে। তাই নিয়ে মায়ের ধমকও খেয়েছে। মায়ের মতে রাতের ট্রেনে সাজগোজের তো কিছু নেই। আমরা তো আর প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি না। গাড়িতে উঠে শুয়ে পড়তে হবে। মা-ও প্রায় তৈরি। পিসি, কাকি, মামিমার সঙ্গে ফোনে দীর্ঘ সাতদিন ধরে আলোচনা করে ট্রেনে পরবার শাড়ি বাছাই হয়েছে।

এই বিপদের পর মনে হয় না আমাদের যাওয়া হবে। এই সন্ধেবেলা হোল্ডঅলের বেল্ট সারানো কোনো চাট্টিখানি কথা নয়। এটা জুতো বা ছাতা নয়। জুতো বা ছাতা হলেও লাভ হত না। এইসময় জুতো বা ছাতা সারাইওলাই রাস্তায় থাকে না। কেন থাকে না কে জানে। সন্ধের পর কি কারো জুতো ছিঁড়তে পারে না? হোল্ডঅলের সব মালপত্র বের করে যে অন্য কোথাও ঢোকানো হবে সে-প্রশ্ন ওঠে

না। হোল্ডঅল এমন একটা জিনিস যার জিনিস ট্রাঙ্ক, সুটকেস নিতে পারে না। তাকেই নিতে হয়।

বাবা-মায়ের মাথায় আগুন। বিনু ইতিমধ্যে ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। মা তাকে একটা চড় লাগিয়েছে। তাতে তার কান্না বেড়েছে। বাবা ছেঁড়া বেল্ট হাতে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে পড়েছে। বেরিয়ে পড়ার আগে মাকে বলে গেছে, 'তুমি সবাইকে টেলিফোন করে বলে দাও, আমরা যাচ্ছি না। ট্রেনের টিকিট পৌঁছে দিতে আমি হাওড়া স্টেশনে বড়ো ঘড়ির তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।'

আমি কাঁচুমাচু মুখ করে বললাম, 'অন্য কোনো ব্যবস্থা করা যায় না মা? এই ধর সেফটিপিন বা বিনুর মাথার ক্লিপ দিয়ে একটা চেষ্টা করা যায় যদি।'

মা কটমট করে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'আর যদি একটা কথা বলিস বিপদ আছে। তোকে বলেছি না, ক্লাস সেভেনের ছেলের মুখে পাকা পাকা কথা পছন্দ করি না।'

আমি মাথা চুলকে বললাম, 'মা, একটা কাজ করলে হয় না? আমরা খোলা অবস্থাতেই ধরাধরি করে হোল্ডঅলটা স্টেশনে নিয়ে যেতে পারি না?'

মা এরপরেই আমাকে কান মুলে দিয়েছে। বিনু ফোঁপাতে ফোঁপাতেও আমার হেনস্থা দেখে হাসছে। আমার অবশ্য কিছু এসে যাচ্ছে। বেড়ানো বাতিল হওয়ার দুঃখের কাছে কানমোলার অপমান কিছুই নয়।

আমরা যাচ্ছি দেওঘর। থাকব মাত্র উনিশ দিন। দলও বেশি বড়ো নয়, মোটে একুশজনের। আমাদের দলের সবথেকে বয়স্ক মানুষটি হলেন আমাদের ঠাকুরদা। তাঁর বয়স তিয়াত্তর। তিনি প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় স্নান করেন। তারপর ঘণ্টাখানেক লেকে মর্নিংওয়াক করতে বেরিয়ে যান। সর্বকনিষ্ঠজন আমার মাসতুতো দাদার মেয়ে মিনি। সবে তিনে পা দিয়েছে। আধো আধো গলায় ভারি মিষ্টি করে কথা বলতে শিখছে। সে এখন সারাক্ষণই বলছে—'আমরা দেওদর যাচ্চি।'

ঠাকুরদা খুবই বিরক্ত। তার মতে হাওয়া বদলের ভ্রমণের পক্ষে উনিশ দিন খুবই কম। এই ভ্রমণের কোনো মানে হয় না। দেওঘর, গিরিডি, মধুপুরের জন্য মাসখানেক মিনিমাম দরকার। দেড় মাস হলে সবথেকে ভালো। নইলে যাতায়াতের গায়ের ব্যথা মরে না। মা তাঁকে আমাদের কথা বললেন।

'বাবা, সাগর, বিনুর স্কুল খুলে যাবে যে। তারপর ফাইনাল পরীক্ষা। অতদিন বাইরে থাকলে ওদের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে।'

ঠাকুরদা ধমক দিলেন, 'রাখ তোমার পরীক্ষা। শরীর ঠিক না-থাকলে কীসের পরীক্ষা? যতক্ষণ মোটা হয়ে জামা কাপড় ছোটো না-হচ্ছে ততক্ষণ ওসব জায়গা থেকে ফেরার কোনো অর্থই হয় না।'

আমার বোন বিনু পড়ছে ক্লাস ফাইভে। তার থেকে দু-বছর বড়ো হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি তার কোনোরকম ভক্তি শ্রদ্ধা নেই। ঠাকুরদার কথায় সে

খানিকটা ঘাবড়ে গেল। তার খান পাঁচেক ফেভারিট ড্রেস আছে। আমাকে ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ রে দাদা, ওগুলো ছোটো হয়ে যাবে না তো?'

আমি নির্লিপ্ত মুখে বললাম, 'অবশ্যই যাবে। বেড়াতে গিয়ে তুই মোটা হবি, তোর ড্রেস ছোটো হবে না গাধা কোথাকারে? তবে সবকটা হবে বলে মনে হয় না। মোটে উনিশ দিন তো, খানদুয়েকে গোলমাল হতে পারে। উনত্রিশ দিন হলে সবকটা ফেলে দিতে হত।'

এই কথা শুনে বিনু আমার ওপর ভয়ানক চটে গেছে।

গত একসপ্তাহ ধরে প্রতি সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে জরুরি মিটিং বসছে। আমরা তো আছিই, ন-পিসি, ছোটোকাকা, মেজোমামা, বড়োজেঠুরাও খেপে খেপে এখানে আসছেন। মিটিঙে বাবা একটা চার নম্বর খাতা সঙ্গে রাখছেন। খাতার ওপর ইংরেজি বাংলা দুটোতেই লেখা—'প্রিপারেশন ফর দেওঘর ট্যুর। দেওঘর ভ্রমণের প্রস্তুতি।' সেই খাতায় গোছগাছের লিস্ট হচ্ছে। লেপ, কম্বল, চাদর, হাওয়া-বালিশ থেকে শুরু করে ট্রেনের লুচি আলুরদম, মিষ্টি, মোমবাতি, টর্চ, সূঁচ, সুতো বাতের মলম পর্যন্ত সব। ঠিক হয়েছে লিস্ট ফাইনাল হয়ে গেছে, আমার দিদিকে কপি করতে দেওয়া হবে। তার হাতের লেখা ভালো। কপির পর ফ্যামিলি পিছু একটা করে কপি বিলি করা হবে। সেইমতো সবাই মালপত্র গোছাবে। কিন্তু সমস্যা হল লিস্ট ফাইনাল করা যাচ্ছে না। সবসময় বদলাচ্ছে। প্রথম দিকে মশারি ছিল না। এখন মশারি ঢুকেছে। খাবারের মধ্যে কুচো নিমকি আর কড়া পাকের সন্দেশ ঠাঁই পেয়েছে। সন্দেশ নেওয়া হবে নকুড় থেকে। ঠাকুরদার জন্য মাটির একটা কুঁজো নেওয়া হচ্ছে। এতে প্রবল আপত্তি উঠেছিল। ট্রেনে তো বোতল, ট্যাপ লাগানো ওয়াটার কুলার উঠছেই। সে-রকম হলে দেওঘরে পৌঁছে কুঁজো নেওয়া যাবে। শুধু ট্রেনটুকু ম্যানেজ করতে হবে।

ঠাকুরদা গম্ভীর গলায় বলেছেন, 'কুঁজোর জল ছাড়া আমি ট্রেনে জলস্পর্শ করব না। আমার চল্লিশ বছরের অভ্যেস। দেওঘর এমন কোনো রাজভোগ রসগোল্লা নয়, যে তার জন্য আমাকে সেই অভ্যেস ছাড়তে হবে। তোমরা বরং এক কাজ কর। আমার টিকিট ফেরত দিয়ে দাও।'

কুঁজোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ন-পিসিকে।

লিস্ট ছাড়া যে যার মতো জামাকাপড়, সোয়েটার, চাদর, শাল, কোট তো নেবেই। এর মধ্যে একদিন ঘর বিলিবন্টনের আলোচনা হয়েছে। ছোটোকাকার অফিসের যে হলিডে হোম আমরা ভাড়া নিয়েছি, সেখানে ঘরের সংখ্যা মোটে পাঁচ। হিসেব মতো ঘরপিছু প্রায় চারজন করে থাকতে হবে। কে কার সঙ্গে থাকবে—আলোচনা তাই নিয়ে।

ছোটোকাকা বাবাকে বলেছিল, 'দাদা, এই ব্যাপারটা ওখানে গিয়ে দেখলে হত না?'

বাবা বলল, 'খেপেছিস! এখান থেকে মোটামুটি একটা প্ল্যানিং না-করলে

বিরাট ঝামেলায় পড়তে হবে। আঁকার সময় আগে যেমন হালকা স্কেচ করতে হয়, এটাও সেই-রকম। ফাইনাল টাচ না হয় স্পটে গিয়ে দেওয়া যাবে।'

দু-দিন আগে ফাইনাল লিস্ট তৈরি হয়ে গেল এবং সকলের হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর লিস্ট দেখে গোছানো শুরু। বাবা গোড়া থেকেই মাকে হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন, মালপত্র যেন বেশি না হয়। বেশি লটবহর মানেই বেশি ঝামেলা।

মা-ও সেইমতো ব্যবস্থা করেছে। আমাদের চারজনের জন্য মালের সংখ্যা খুবই কম। দুটো ট্রাঙ্ক। তিনটে সুটকেস। তার মধ্যে একটা জাম্বো সাইজ। দুটো মাঝারি। সেগুলোতে শুধু গরম পোশাক থাকছে। দু-খানা খাবারের ঝুড়ি। একটা রাতের ট্রেনে খাবার, একটা পরদিনের ব্রেকফাস্ট। তিনটে ওয়াটার বটল আর দুটো হোল্ডঅল। একটা হোল্ডঅল ডবল, একটা সিঙ্গল।

নিয়ম হল লম্বা ট্যুরের জন্য মালপত্র গোছানো শেষ হবে তিনদিন আগে। সেই গোছানা ভেঙে ফেলা হবে পুরো একদিন ধরে। কারণ দেখা যাবে, অনেক জিনিসই নেওয়া হয়নি। শুধু হোল্ডঅল বাঁধা বাকি থাকে। ওটা বেরোনোর অল্প সময় আগে করতে হয়। কারণ শেষ মুহূর্তে ভুলে যাওয়া জিনিস সবই হোল্ডঅলের ফাঁকফোকরে গোঁজা যায়। এমনকী বাড়িতে পরবার হাওয়াই চটি জোড়া পর্যন্ত।

আমরাও তাই করেছি। আমি আর বিনু হোল্ডঅলের ওপর উঠে বসেছি। হোল্ডঅলের ওপর না-বসলে হোল্ডঅল বাঁধা যায় না। বাবা বেল্ট বেঁধেছে, ক্লিপ লাগিয়েছে।

খানিক পরে ফরফর আওয়াজ। মা চিৎকার করে উঠল—'সর্বনাশ হয়েছে।'

মায়ের 'সর্বনাশ' শুনে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, 'কী হয়েছে মা? ট্রেনের টিকিট হারিয়ে গেছে?'

ট্রেনের টিকিট কথাটা মনে আসার কারণ বাবা। একুশজনের ট্রেনের টিকিট বাবার জিম্মায়। এটা একটা ভয়ানক দায়িত্ব। কেউ এই ভয়ানক দায়িত্ব নিতে রাজি হয়নি। নেবেই-বা কেন? টিকিট তো একটা দুটো নয়। হাফ এবং ফুল মিলিয়ে যাতায়াতের জন্য মোট আশিটা টিকিট। হলুদ রঙের ছোটো ছোটো শক্ত পিচবোর্ডের টিকিট। কুড়িটা করে এমনি টিকিট, কুড়িটা করে বার্থ রিজার্ভেশন। এতগুলো টিকিট কে রাখবে? সেই কারণেই বাবাকে দেওয়া। বাবা বড়ো একটা কাগজে মুড়ে আলমারিতে তুলে রেখেছে। রোজ সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে এসে একবার করে নামিয়ে গোনাগুনতি করে। আমি আর বিনু গভীর আগ্রহ নিয়ে পাশে বসে থাকি। টিকিটগুলো চোখে দেখে আমাদের দারুণ রোমাঞ্চ হয়। ওগুলো থেকেই আমরা কু-ঝিক ঝিক আওয়াজ শুনতে পাই। আমরা হাত দিতে চাইলে বাবা ধমক দেয়।

'ফাজলামি হচ্ছে? একটা হারালে কী কাণ্ড হবে জানিস? যাওয়াই ক্যানসেল।'

বিনু গাধার মতো বলে, 'কেন? আবার কিনে নিলেই তো হবে।'

বাবা চোখ পাকিয়ে বলে, 'ট্রেনের টিকিট কি তোমার ডল পুতুল? দোকানে গেলাম আর কিনলাম?'

আমি বললাম, 'বাবা, এগুলো কোন্ ট্রেনের টিকিট?'

বাবা বিরক্ত বিরক্ত মুখ করে বলল, 'তুফান মেল। আর একটা কথাও নয়। দিলি তো সব গুলিয়ে।'

বাবা আবার গার্টার খুলে গোছা গোছা টিকিট গুনতে বসে। আমার মাথার মধ্যে বাজতে থাকে—তুফান মেল, তুফান মেল, তুফান মেল...।

টিকিটের দায়িত্ব নিয়ে বাবা যে খুবই টেনশনের মধ্যে আছে আমরা বুঝতে পারি। রওনা হওয়ার দিন যত এগিয়ে আসছে সেই টেনশন বাড়ছে। একদিন নাকি মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে আলমারি খুলেছিল। টিকিটের প্যাকেট হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে আবার ঢুকিয়ে রেখেছে।

এই কারণেই মাকে টিকিটের কথা বললাম।

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'না, হোল্ডঅলের একটা বেল্ট ছিঁড়ে গেছে।'

আমাদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। হোল্ডঅলের বেল্ট ছেঁড়া মানে ভয়ংকর কাণ্ড। এদিকে তেরচা হয়ে পেল্লাই হোল্ডঅল খুলে গেছে। এ জিনিস তো আর বাঁধাই যাবে না! আর হোল্ডঅল বাঁধা না-হলে যাওয়া হবে কী করে? বেড়াতে যাওয়ার সময় হোল্ডঅল হল সবথেকে ইমপর্টান্ট জিনিস। পৃথিবীর বেশিরভাগ ইমপর্টান্ট জিনিসের মতো এই জিনিসটির আবিষ্কারকের নাম জানা যায় না। জানা থাকলে ঘরে ঘরে তার ফটো টাঙিয়ে রাখা হত। হোল্ডঅলে কী না ঢোকানো যায়! লেপ তোশক, চাদর বালিশ তো আছেই, তার সঙ্গে ছাতা, জুতো লাঠি এমনকী হাঁড়ি, খুন্তি প্রেশার কুকারও হাসতে হাসতে সে গিলে নিতে পারে। তিমি মাছের মতো তার পেট।

এখন কী হবে?

বাবা রাগারাগি শুরু করল। অতিরিক্ত জিনিস ঢোকানোর কারণেই নাকি এই বিপদ। মা-ও ছাড়ল না। তার যুক্তি—শীতের সময় যাওয়া, মালপত্র তো বেশি লাগবেই। লেপ কম্বলই তো নিতে হয়ে গাদাখানেক।

বাবা বলল, 'ভালোই হয়েছে। লেপ কম্বল নিয়ে তুমি কলকাতায় থাক।'

মা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'তাই থাকব।'

বাবা ছেঁড়া বেল্ট হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে মা সত্যি সত্যি টেলিফোন নিয়ে বসল—'ন-দি, আমাদের যাওয়া হচ্ছে না। আমাদের হোল্ডঅলের...। মেজদা, আমরা যাচ্ছি না...। জামাইবাবু আমরা বাদ...।'

বিনু তো কাঁদছেই। আমার চোখে জল এসে যাওয়ার জোগাড়। আমি মনে মনে বেড়ানোর ভগবানকে ডাকছি—হে ভ্রমণ দেবতা, একটা উপায় বের করো। তোমার পায়ে শতকোটি প্রণাম ঠুকব।

ভ্রমণ দেবতা মুখ তুলে চাইলেন।

বাবা ফিরে এল পনেরো মিনিটের মধ্যে। বেল্ট সারানো যায়নি। তার বদলে হাতে এক গোছা নারকোল দড়ি।

মা আঁতকে উঠে বলল, 'দড়ি! দড়ি দিয়ে হোল্ডঅল বাঁধা হবে!'

বাবা থমথমে গলায় বললেন, 'তা ছাড়া উপায় কী? ট্যাক্সি এনেছি, আর দেরি করলে ট্রেন মিস হবে।'

আমি আর বিনু আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম।

ট্রাঙ্ক, সুটকেস, লুচি, আলুরদমের ঝুড়ি, দড়ি বাঁধা হোল্ডঅল নিয়ে কীভাবে আমরা প্রায় ছুটতে ছুটতে ট্রেনে উঠলাম সে আর এক রোমহর্ষক গল্প। থ্রি-টায়ার কামরায় তখনো আলো দেওয়া হয়নি। মেজোমামা টর্চ জ্বেলে সিটের নম্বর খুঁজছে। ট্রেন ছাড়তেই আমি চিৎকার করে উঠলাম—থ্রি চিয়ার্স ফর হোল্ডঅল। একুশ জন সমস্বরে বলে উঠল—হিপ হিপ হুররে। মিনি হুররে বলতে পারে না। কী করে পারবে? তার তো মোটে তিন বছর বয়স। সে তাই বলল—হুল্‌লে।

এসব অনেক বছর আগের কথা। আজ আর বেড়াতে যাওয়ার সময় এই ধরনের বিপদে কাউকে পড়তে হয় না। কেন পড়বে? এখন দেওঘর, পুরী, দার্জিলিং, নৈনিতাল, কাশ্মীর, সিঙ্গাপুর, হংকং সবই আছে, কিন্তু হোল্ডঅল নেই।

তাই বেড়াতে যাওয়ার সময় বিপদে পড়বার মজাও নেই।

কিশোরীমোহনপুরের রয়েল বেঙ্গল

আমি দম বন্ধ করে বললাম, ''তারপর?''

সায়নের ছোটোমামা একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, ''তারপরই হল আসল গোলমাল। বাঘ গেল উধাও হয়ে। ভ্যানিশ হয়ে গেল বলতে পার। গোটা গ্রাম তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। সবার মাথায় হাত। কোথায় গেল! বাঘ তো পাখি নয় যে উড়ে যাবে।''

সায়নের মা আমাদের জন্য আলুর চপ আর বেগুনি বানিয়ে দিয়েছেন। সপ্তর্ষি ইতিমধ্যে তিনটে বেগুনি খেয়ে ফেলেছে। চার নম্বরটা হাতে তুলে বলল, ''ভ্যানিশ হয়ে গেল। ভ্যানিশ হয়ে গেল মানে? অত বড়ো একটা বাঘ ভ্যানিশ হয়ে যাবে কী করে?''

সায়নের ছোটোমামাকে আমরাও 'ছোটোমামা' ডাকি। মাঝেমধ্যে রবিবার করে উনি সায়নদের বাড়িতে আসেন। খবর পেয়ে আমরাও চলে যাই। এখন গল্প বলার লোক একদম কমে গেছে। এই মানুষটা দারুণ গল্প বলতে পারেন। বদলির চাকরি করেছেন বলে অভিজ্ঞতাও প্রচুর। সবথেকে বড়ো কথা, ওনার গল্প বলার কায়দাটা ভারি ইন্টারেস্টিং। এমন এক একটা বাঁক তৈরি করেন যে চমকে উঠতে হয়। এখন যেমন বাঘের গল্প বলতে গিয়ে আস্ত একটা বাঘকে দিয়েছেন ভ্যানিশ করে!

সপ্তর্ষির কথা শুনে ছোটোমামা অল্প হেসে বললেন, ''কী করে ভ্যানিশ হল আমি জানব কী করে? আমি তো তাকে ভ্যানিশ করিনি।''

অঙ্কুর সোফায় হেলান দিয়ে বসে ছিল। সোজা হয়ে বসল। চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, ''নিশ্চয় পালিয়ে গেছে।''

ছোটোমামা মাথা নাড়লেন। বললেন, ''পালানো কঠিন। ধানখেতের খানিকটা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে রাস্তা। সেদিকে ফরেস্ট গার্ডরা বন্দুকে ঘুমপাড়ানি গুলি পুরে বসে আছে।''

কিংশুকের হাতে আলুর চপ। সবেমাত্র একটা কামড় বসিয়েছিল। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ভ্যানিশ হওয়ার কথা শুনে সে মুখে পোরা চপ গিলতে পারল না। ওই অবস্থায় জড়িয়ে-মড়িয়ে বলল, "ছোটোমামা, বাঘটা ভূত-টুত নয় তো?"

সায়ন ধমক দিয়ে বলল, "তুই চুপ কর তো। বাঘ কখনো ভূত হয়?"

আমি মোড়ার ওপর বসে মুড়ি খাচ্ছিলাম। আমরা পকৌড়া খেতে চেয়েছিলাম। ছোটোমামা বলেছেন, "ওসব পকৌড়া, স্যান্ডুইচ, পিৎজা আমার চলবে না বাপু। মুড়ি আলুর চপ চাই। নইলে মাথায় গল্প আসবে না। এবার তোমরা ঠিক কর কী খাবে।"

আমরা গল্প শুনতে চাই। সবাই মুড়ি আলুর চপের জন্য হাত তুললাম। সায়নের মা তেল আচার দিয়ে মুড়ি মেখে দিয়েছেন। আমরা সায়নদের ড্রয়িংরুমে বসে সেই মুড়ি, আলুর চপ আর বেগুনি খাচ্ছি। আমাদের মাঝখানে ছোটোমামা। তিনি গল্প শুরু করেছেন। আমি হাতে নেওয়া মুড়ি মুখে ফেলতে গিয়ে থমকে গেলাম। এটা বাঘ উধাও হয়ে গেছে শোনবার পর মুড়ি কেন, কোনোকিছু খাওয়াই অসম্ভব। বললাম, "ঝোপজঙ্গল সব ভালো করে দেখা হয়েছিল তো?"

সায়ন দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "না, হয়নি। তোর জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। তুই গেলে তারপর কাজ শুরু হবে।"

ছোটোমামা একটা কাঁচা লঙ্কায় কামড় দিয়ে বললেন, "আহা, রাগারাগি করছ কেন? চিন্তা হওয়ারই তো কথা। কিশোরীমোহনপুর গ্রামের সকলেরই তো চিন্তায় চুল খাড়া হয়ে গেছে। দিনদুপুরে একটা বাঘ গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেলটা কোথায়?"

রবিবারের সকাল। ছোটোমামা এসেছেন খবর পেয়ে আমি, অরণি, কিংশুক, অঙ্কুর, নন্দন চলে এসেছি সায়নদের বাড়ি। ছোটোমামা বলছেন বাঘের গল্প। বাঘের গল্প এমনি এমনি শুরু হয়নি। কথায় কথায় অরণি বলল, "এবার পুজোয় আমরা বাঘ দেখতে যাচ্ছি।"

নন্দন ঠাট্টা করে বলল, "বাঘ দেখতে! চিড়িয়াখানায় যাবি নাকি?"

কিংশুক হাতে বেগুনি তুলে নিয়ে বলল, "চিড়িয়াখানা যাওয়ার কী দরকার? আমি তোকে বাঘের ক-টা ভালো ফটো মেল করে দিচ্ছি, বাড়িতে বসে সেগুলোই দেখে নিস।"

অরণি মুচকি হেসে বলল, "তোরা যতই হিংসে করে উলটোপালটা বলিস না কেন, আমি কিছুই মনে করব না। কারণ আমি যাচ্ছি মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় টাইগার স্যাংচুয়ারি। আশাকরি তোমরা নাম শুনেছ। যদি না-শোনো তাহলে আমার কাছ থেকে জেনে নাও। বান্ধবগড় হল বাঘেদের রিজার্ভ ফরেস্ট। খুব বিখ্যাত। গোটা পৃথিবী থেকে ট্যুরিস্টরা এখানে বাঘ দেখতে আসে। জঙ্গলের ভেতর দারুণ দারুণ সব বাংলো থাকে। রাতে বাঘের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে যায়। জানলার পর্দা সরিয়ে দেখতে পাবি গেটের বাইরে বাঘ ঘুরঘুর করছে। আবার দিনে বা রাতে জিপ নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরেও বাঘ দেখা যায়। আমার বোন তো এখন থেকেই ভয়

পেয়ে গেছে। বলছে, রাতে বেরোনোর দরকার নেই। দিনেরবেলাতেই যা ঘোরার ঘুরব। আমি বলেছি রাতেই বেরোব। জিপের ওপর থাকব। ভয়ের কী আছে?"

অরণির কথা শুনে আমাদেরই চোখ চকচক করে উঠল। কিংশুক বলল, "ইস কী মজা। সামনাসামনি বাঘ দেখার মতো উত্তেজনা আর কীসে আছে? আমি তো ভাবতেই পারছি না। তুই কিন্তু ফটো তুলে আনবি।"

ছোটোমামা এতক্ষণ চুপ করে আমাদের কথা শুনছিলেন। এবার আলুর চপে কামড় দিয়ে বললেন, "বেড়াতে যাচ্ছ যাও, কিন্তু ওই বাঘ দেখার মধ্যে আর উত্তেজনা কোথায়? ও তো প্রায় চিড়িয়াখানার মতোই হল। তার থেকে বেশি বই কম নয়। শুনেছি ওসব জায়গায় বাঘ ক্যামেরার সামনে পোজ় দেয়। ট্যুরিস্ট দেখে দেখে এত অভ্যস্ত যে মানুষকে আর মানুষ বলে মনেই করে না। সুন্দরবনের বাঘের মুখোমুখি যদি পড়তে তাহলে একটা ব্যাপার ছিল। বাঘ দেখা কাকে বলে বুঝতে। আজও সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখ মনে পড়লে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।"

আমরা গল্পের গন্ধে নড়ে বসলাম। বললাম, "আপনার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল মানে! আপনি বাঘ দেখেছেন নাকি ছোটোমামা?"

ছোটোমামা মুচকি হেসে বললেন, "দেখেছি, তবে জিপ গাড়ির মাথায় চড়ে নয়, একেবারে তিন হাতের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখেছি। ফটফটে দিনের আলোয়। তখন কটা বাজে? এই ধর সকাল ন-টা, সাড়ে ন-টা। কলকাতায় অফিস টাইম যাকে বলে।"

কথা শেষ করে ছোটোমামা আবার হাসলেন। সায়ন বলল, "গল্পটা বলতে হবে।" আমরাও একসঙ্গে বলে উঠলাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বলতেই হবে।"

ছোটোমামা আস্ত একটা আলুর চপ মুখে পুরে বললেন, "গল্প নয়, সত্যি ঘটনা।"

কিংশুক বলল, "ঠিক আছে, তাই বলুন।"

ছোটোমামা 'সত্যি ঘটনা' বলতে শুরু করলেন।

"তিন বছর আগের ঘটনা। আমি তখন কলকাতা থেকে বদলি হয়ে ক্যানিং-এর কাছে একটা অফিসে বসি। ছিমছাম অফিস। ঝুট ঝামেলা নেই। অফিসের জানলা দিয়ে মাতলা নদী দেখা যায়। সারাদিন নৌকো, স্টিমার, ভুটভুটি চলে। আমার খুব ইচ্ছে, একবার সুন্দরবন দেখে আসব। ক্যানিং মানে সুন্দরবনের একেবারে দোরগোড়া। এখানে এসে সুন্দরবন দেখতে না-যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। আমি সুযাগের অপেক্ষায় রইলাম। সেই সুযোগ দুম করে এসেও গেল। আমাদের অফিসে পিয়োনের কাজ করে সহদেব। ভারি ভালো ছেলে। সে একদিন ঘরে এসে বলল, স্যার, আমার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দুটো ডাল ভাত খেতে হবে। আমি বললাম, তোমার গ্রাম কোথায়? সহদেব বলল, একেবারে সুন্দরবনের গায়ে। কিশোরীমোহনপুর। আমি বললাম, বাঃ ভারি সুন্দর নাম তো! সহদেব বলল, আমাদের গ্রামটাও সুন্দর স্যার। কাছেই নদী। নদীর নাম ঠাকুরান। নদী পেরোলেই

জঙ্গল। আজমলহারি জঙ্গল। সুন্দরবনের খাঁটি জঙ্গল। দুটো দিন যদি থাকেন তাহলে নদী পেরিয়ে জঙ্গলের দিকটা ঘুরিয়ে আনব। ভাগ্য যদি ভালো হয়, বাঘ দেখা হয়ে যেতে পারে। আমার চেনা লঞ্চ আছে। তোমরা তো জানো গ্রামের মানুষ কত আন্তরিক হয়। তাদের নেমন্তন্ন ফেরানো খুব মুশকিল। তা ছাড়া সুন্দরবন আর বাঘ দেখার সুযোগ কে ছাড়ে? এক শনিবার বিকেলে কিশোরীমোহনপুরে গিয়ে হাজির হলাম। সত্যি চমৎকার গ্রাম। ছড়ানো ছিটোনো মাটির বাড়ি। একতলা, দোতলা সবরকমই আছে। গ্রামের মাঝখানে বড়ো বড়ো দিঘি। একপাশে টিনের চাল দেয়া লম্বা স্কুল। স্কুলের গায়ে মস্ত ফুটবল খেলার মাঠ। লাইব্রেরি, কমিউনিটি হল, পঞ্চায়েত অফিস—সব আছে। চলার পথ মাটির হলেও গ্রামটা ঝকঝক তকতক করছে। তার ওপর সময়টা ছিল ধান পাকার সময়। মাঠের পর মাঠ হলুদ হয়ে আছে। আমি তো মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সহদেবের বাড়িটাও চমৎকার। খিড়কির দরজা খুললেই একটা মন ভালো করে দেওয়া পুকুর। টলটলে জল। লাল সিমেন্টে বাঁধানো ঘাট। পুকুর শেষ হলে যতদূর চোখ যায় ধানক্ষেত চলে গেছে। সহদেব বলল, ধানখেত শেষ হলেই ঠাকুরান নদী। নদীপথে কিছুটা গেলে জঙ্গল। সেদিন আর বেশি ঘোরাঘুরি করলাম না। জার্নিতে ক্লান্ত ছিলাম। পুকুর দেখে খুব লোভ হল। দুটো ডুব দিয়ে স্নান সারলাম। আহা, কী ঠান্ডা জল! রাতে খাওয়া দাওয়ার ভালো আয়োজন ছিল। খাওয়ার পর ঠিক হল, পরদিন দুপুরে সুন্দরবন যাত্রা। সহদেব লঞ্চের ব্যবস্থা করবে। দুপুরে খাওয়ার পর রওনা হব। রাত কাটাব নদীতে। পরদিনও নদী, খাঁড়ি ধরে যতটা পারি ঘুরে ফিরে আসব সন্ধের আগে। রাতে পেট পুরে খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিলাম। স্বপ্নে বাঘের দেখা পেলাম। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বাঘ। জানই তো স্বপ্নে রং দেখা যায় না।"

ছোটোমামা চুপ করলেন। আমি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলাম না। বললাম, "সত্যিকারের বাঘের দেখা কি পেলেন?"

ছোটোমামা হেসে বললেন, "পেলাম। তবে জঙ্গলে নয়, পেলাম একেবারে গ্রামের ভেতর। সায়ন যাও তোমার মাকে আর ক-টা বেগুনি সাপ্লাই করতে বল দেখি।"

বেগুনি আসার পর ছোটোমামা আবার শুরু করলেন।

"পরদিন সকালে লুচি, আলুরদম দিয়ে জলখাবার খাওয়ার পর সহদেব বলল, 'স্যার, আপনি গ্রামটা একটু ঘুরে দেখুন, আমি ততক্ষণে লঞ্চের ব্যবস্থা করে ফেলি। বারোটা নাগাদ রওনা দেব। আমি বেরিয়ে পড়লাম। আগেই তো বলেছি গ্রামটা চমৎকার। সকাল বেলাতেই পাখির কিচিরমিচির ডাক। সবাই কাজে বেরিয়ে পড়েছে। কেউ খেতের কাজে যাচ্ছে, কেউ বড়ো জাল নিয়ে মাছ ধরবে বলে বেরিয়েছে। ছোটোরা স্কুলে চলেছে। আমি গোটা গ্রামটাই প্রায় চষে ফেললাম। মাঝখানে একটা চায়ের দোকানে বসে ওখানকার মানুষদের সঙ্গে গল্পগুজব করলাম। তারপর ফেরার জন্য ধানখেতের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মেঠো পথ ধরলাম।

ধানখেত ধরে গেলে একেবারে শেষ প্রান্তে সহদেবের বাড়ি। চলে গেছে এঁকেবেঁকে। ঠিক যেন ছবিতে আঁকা। গোরুর গাড়ি চলছে দুলকি চালে। সূর্যের তেজ নেই। বরং আকাশ একটু মেঘলা। হালকা বাতাস বইছে। বাতাসে একটা মন মাতানো গন্ধ। মনে হয় পাকা ধানের গন্ধ। এক ঝাঁক পাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। মনটাই ফুরফুরে হয়ে গেল। আমার মতো বেসুরো লোকও গুনগুন করে গান ধরল। গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ। আর তখনই...।"

ছোটোমামা দম নেওয়ার জন্য চুপ করলেন। সায়ন চোখ বড়ো করে বলল, "তখনই কী?"

ছোটোমামা এবার নীচু গলায় বলতে শুরু করলেন।

"তখনই পাশের ধানখেতের খানিকটা জায়গা নড়ে উঠল যেন। আমি গান থামালাম। কীসে নড়ল? হাওয়ায়? নিশ্চয় তাই হবে। তারপর খানিকটা খসখসে আওয়াজ। আওয়াজটা ঠিক ধান গাছের হাওয়ায় দোলার আওয়াজ নয়। মনে হল, কে যেন নড়ছে। মুহূর্তের জন্য বিটকেলে একটা গন্ধ পেলাম। আমি থমকে দাঁড়ালাম। মনে হল চারপাশের গাছপালা, পাখি, ধানখেত, আলপথ সবাই যেন দম বন্ধ করে ফেলেছে। নিস্তব্ধ। ওই দিনের আলোতেই কেমন যেন একটা শিরশিরানি ভয়ের অনুভূতি হল। মনে হল, গন্ধটা কেমন চেনা চেনা। আগেও কোথায় যেন পেয়েছি! কোথায়! নিমেষে মনে পড়ল। চিড়িয়াখানায়। মনে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে বাঘটাকে দেখতে পেলাম। বাঘ নয়, বাঘের মুখ। সেই মুখ ধান গাছের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে সটান আমার চোখের দিকে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার! কী সুন্দর অথচ কী মারাত্মক! গা শিউরে উঠল, আবার মন ভরেও গেল। বুঝতে পারলাম, শরীরের সব রক্ত আতঙ্কে যেন জমে যাচ্ছে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিতে পারছি না! মাত্র তিন হাত দূরে থাকা রয়েল বেঙ্গল আমাকে সম্মোহন করে ফেলেছে! পাথরের মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দিনের বেলায় গ্রামের মধ্যে বাঘ দেখে আমি যেমন বিরাট ঘাবড়ে গেছি, মনে হল হঠাৎ মানুষ দেখে বাঘটাও যেন ঘাবড়েছে। তবে সব মিলিয়ে কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। ঘোর কাটতেই, বিপদ বুঝতে পারলাম। আমি পালাতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। চিৎকার করতে গিয়ে দেখলাম গলা থেকে স্বর বেরোচ্ছে না। কী করব বুঝতে পারছি না। শুধু বুঝতে পারছি, তিন হাত দূরে মৃত্যু অপেক্ষা করছে। বাঘ মানুষকে কীভাবে ধরে? ঝাঁপিয়ে পড়ে? নাকি তাড়া করবে? ভাবতে-না-ভাবতেই চাপা গরগর আওয়াজ তুলে সুন্দরবনের মহারাজ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, মিলিয়ে গেলেন ধানখেতে। এরপর আমি যে কীভাবে সহদেবের বাড়ি পৌঁছেছিলাম সে কেবল আমিই জানি।"

ছোটোমামা থামলেন। সায়নের মা চা দিয়ে গেছেন। ছোটোমামা কাপে চুমুক দিলেন। আমরাও যেন আর কথা বলতে পারছি না। ফের গল্প শুরু হল।

"বাড়ি গিয়ে ঘটনা বলতেই সহদেব ছিটকে বেরিয়ে পড়ল। সুন্দরবনের গ্রামে বাঘ ঢুকে পড়া নতুন কিছু নয়। এতে ভয়ংকর কাণ্ড হয়। গোরু ছাগল তো মারেই,

এমনকী মানুষও টেনে নিয়ে যায় জঙ্গলে। এখনই সবাইকে খবর দিতে হবে। আধঘণ্টারও কম সময়ে গোটা গ্রাম জেনে গেল। লাঠিসোঁটা বল্লম যে যা পারল হাতে নিয়ে ছুটে গেল ধানখেতের দিকে। আমার তখন ভয় করতে শুরু করেছে। ভুল দেখিনি তো? তাহলে খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। না ভুল দেখিনি, ধানখেতে বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। ধানখেত পার হয়ে আলপথ ডিঙিয়ে সেই পায়ের ছাপ উধাও। বলতে পার ভ্যানিশ। আর তারপরই শুরু রহস্য।"

চা শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখলেন ছোটোমামা। বললেন, "গ্রামের মধ্যে বাঘ ঢুকে লুকিয়ে পড়া যে কী ভয়ংকর ব্যাপার তা কেবল সুন্দরবনের মানুষই জানেন। গ্রামের মানুষ ধানখেত ঘিরে ফেলল। খবর দেওয়া হল গোসাবার ফরেস্ট অফিসে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিরাট দলবল নিয়ে রেঞ্জার বিমল পাণ্ডে চলে এলেন। সেই দলে দেখি বন্দুকও আছে আবার ঢাকঢোল পটকা, কাঁসর ঘণ্টা, জালও আছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসার নিলয় গুহও বন্দুক নিয়ে এসে হাজির হলেন কিছুক্ষণের মধ্যে। তিনি ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে বাঘ ভল্লুক ঘুম পাড়াতে ওস্তাদ। অনেকে তাঁকে ঘুমপাড়ানি অফিসার নামে ডাকে। দেখলাম, ওঁর দুটো দুশ্চিন্তা। এক নম্বর, লুকিয়ে পড়া বাঘ যদি মানুষের ক্ষতি করে, দু-নম্বর হল গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে যদি বাঘটার কোনো অনিষ্ট করে বসে। দুটোই খুব খারাপ হবে। নিলয়বাবু আমাকে ধানখেতের পাশে নিয়ে গেলেন। আমি দেখিয়ে দিলাম, ঠিক কোন জায়গায় বাঘটাকে আমি দেখেছি। সেখানে ধানগাছের অবস্থাও শোচনীয়। আমাকে ঘিরে গ্রামের মানুষের তখন বিরাট কৌতূহল। সবাই এসে ভিড় করেছে। ভিড় তো করবেই। বাঘের তিন হাত দূর থেকে অক্ষত শরীরে ফেরা কি সহজ কাজ? ছেলেপিলেরা দেখলাম আমার পিছু পিছু ঘুরছে। ধমক দিতেও যায় না। নিলয়বাবু বললেন, বাঘটা নিশ্চয় আজমলমারির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঠাকুরান নদী পার হয়ে এসেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন জাল দিয়ে ধানখেতের খানিকটা ঘিরে ফেলল। একদিকে গাছের ওপর বন্দুক নিয়ে বসলেন অফিসার আর রেঞ্জারবাবু। তারপর তেড়ে ঢাকঢোল, টিনের ক্যানেস্তারা পেটানো শুরু হল। বাপ রে! কান ফেটে যাওয়ার জোগাড়! সেইসঙ্গে ফাটানো হচ্ছে পটকা। ধানখেত ঘিরে ফেলা জালটাকে ধীরে ধীরে চারপাশ থেকে ছোটো করে আনা হচ্ছে। পরিকল্পনা হল বাঘ খোলা দিক দিয়ে পালাবে। বেরিয়ে আসবে ধানখেত থেকে। আর তখনই গুলি ছোড়া হবে। ঘুমপাড়ানি গুলি। বাঘ ঘুমিয়ে পড়লে, খাঁচায় পুরে লঞ্চে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে গভীর জঙ্গলে। ছেড়ে দেওয়া হবে। বিরাট লোহার খাঁচা এসেছে। বাঘের খাঁচা দেখার জন্য মানুষ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু কোথায় কী! জাল গুটিয়ে গেল, বাঘ ধানক্ষেত থেকে বেরোল না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা ঘোষণা করলেন, বাঘবাবাজি ধানখেতে লুকিয়ে নেই। তিনি অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছেন।"

অরণি বলল, "কোথায় গা ঢাকা দিল!"

নন্দন বলল, "অত বড়ো একটা চেহারা নিয়ে গা ঢাকা দেওয়া যায় নাকি?"

কিংশুক ঢোক গিলে বলল, "অসম্ভব।"

ছোটোমামা বললেন, "কিছুই অসম্ভব নয়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার প্রাণীটি অত্যধিক বুদ্ধিমান শুনেছিলাম। কিন্তু তার বুদ্ধির পরিমাণ যে এতখানি জানতাম না। গ্রামের লোক, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসার কর্মী মিলিয়ে কয়েক শো মানুষ গিজগিজ করছে। তাদের মাঝখান থেকে ভ্যানিশ হওয়া মুখের কথা? যেই খবর ছড়িয়ে পড়ল, বাঘ ধানখেতে নেই, গ্রামের মানুষের আতঙ্ক আরও দশগুণ বেড়ে গেল। স্কুল-টুল সব বন্ধ হয়ে গেল। বাইরের কাজ ফেলে অনেকেই ঘরে ঢুকে খিল দিল। নিলয়বাবু এবার বললেন, গ্রামের ভেতর ঢুকে তল্লাশি করতে হবে। তাই শুরু হল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। সবার আগে বন্দুক হাতে নিলয়বাবু আর পাণ্ডে। পিছনে লাঠিসোঁটা বল্লম নিয়ে একদল। তার পিছনে কয়েক শো গ্রামের মানুষ। নিলয়বাবু আমাকে সামনে ডেকে নিয়েছেন। গ্রামের ঝোপঝাড়, ভাঙা মন্দির, স্কুলবাড়ি, লাইব্রেরি পিছন, ফুটবল খেলার মাঠ কিচ্ছু বাদ দেওয়া হল না। বাঘের টিকিও দেখা গেল না। এমনকী বাঘটা তার পায়ের ছাপটুকুও কোথাও রাখেনি!"

ছোটোমামা থামতে আমি বললাম, "এ আবার কখনো হয় নাকি? বাঘ কখনো পায়ের ছাপ লুকোতে পারে?"

ছোটোমামা বললেন, "পারে না, আর সেটাই হল চিন্তার। তাহলে সে কোন পথ দিয়ে গেছে? এদিকে বেলা পড়তে শুরু করেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হব হব করছে। রেঞ্জারবাবু বললেন, যে করেই হোক অন্ধকার নামার আগে খোঁজ চাই। যদি বাঘ গ্রাম ছেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেই প্রমাণটাও দরকার। নইলে ধরে নিতে হবে, গ্রামেই গা ঢাকা দিয়ে আছে। রাতে গোরু ছাগল, হাঁস মুরগি যা পাবে নিয়ে যাবে। মানুষ পেলে ছাড়বে না। সবাই মিলে আবার প্রবল উৎসাহে তল্লাশি শুরু হল। বাড়ি বাড়ি ঢুকে ফুল ফলের বাগান তোলপাড় করে ফেলা হল। লাভ হল না। সন্ধে নামল। গ্রামের অনেকেই তখন নানারকম উদ্ভট কথা বলতে শুরু করেছে। কেউ বলছে, ওই বাঘ নিশ্চয় উধাও হয়ে যাওয়ার জাদু জানে। কেউ বলছে বাঘটা শূন্যে হাঁটতে পারে। শেষ পর্যন্ত তল্লাশির কাজ বন্ধ হল।"

ছোটোমামার কথার মাঝখানেই অরণি কাঁপা গলায় বলল, "বাঘ গ্রামে রয়ে গেল?"

ছোটোমামা হেসে বললেন, "সেটাই তো তখন লাখ টাকার প্রশ্ন। বাঘ কি রয়ে গেছে? নাকি সবার অলক্ষ্যে অন্য কোনো পথে ফিরে গেছে ঘন জঙ্গলে? নাকি এমন কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। নিলয়বাবু বললেন, ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। গ্রামের সবাইকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে হবে। রাতে ঘর ছেড়ে কিছুতেই বেরোনো চলবে না। যদি খুব দরকার হয়, তবে দল বেঁধে বেরোতে হবে। সঙ্গে যেন মশাল বা জোরালো আলো থাকে। ঠিক হল, বাঘের জন্য ফাঁদ পাতা হবে। দুটো ছাগল বেঁধে রাখা হবে গ্রামের দু-দিকে।

একদিকে ঘুমপাড়ানি গুলির বন্দুক নিয়ে পাহারায় বসবেন রেঞ্জার বিমল পাণ্ডে, অন্যদিকে নিলয় গুহ। বাঘ যদি সত্যি গ্রামে থেকে যায় তাহলে টোপ গিলতে আসবেই। তখনই গুলি করে...। আমি বললাম, আর যদি না-আসে? নিলয়বাবু হেসে বললেন, আসবেই। আপনার বন্ধু সারাদিন কিছু খেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয় তার খিদে পেয়েছে। ছাগল পেলে ছেড়ে দেবে?

আমিও হেসে বললাম, আমার বন্ধু!

নিলয়বাবু আওয়াজ করে হেসে বললেন, অবশ্যই বন্ধু। একমাত্র আপনাকে দেখা দিয়ে যে বেমালুম উবে গেল, তাকে আপনার বন্ধু বলব না? মশাই 'টাইগার লাক' বলে একটা ব্যাপার আছে। বাঘ দেখার ভাগ্য। আপনি লঞ্চে চেপে বনে বাঘ দেখতে যাবেন ভেবেছিলেন, আর উনি নিজে এসে দেখা দিয়ে গেলেন। আমি বললাম, আপনাদের সঙ্গে রাত জাগতে পারি?

পাশেই বিমল পাণ্ডে ছিলেন। বললেন, ইমপসিবল। একটা কিছু হয়ে গেলে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা গ্রামের কাউকেই অ্যালাও করব না।

আমি বললাম, আমি এই গ্রামের কেউ নই। তা ছাড়া আমার কী হবে? বাঘে আমাকে নিয়ে যাবে?

বিমল পাণ্ডে বললেন, সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে রসিকতা করবেন না। দে ক্যান ডু এনিথিং। মানুষ ভাবতে পারে না এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে ওরা। আমি জেদ ধরলাম। আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে। যেহেতু বাঘটাকে কেবল আমিই দেখেছি, আমার থাকার অধিকার আছে!

নিলয়বাবু খানিকটা ভেবেচিন্তে বললেন, ঠিক আছে আপনি তৈরি হয়ে আসুন। গাছের ওপর মাচা বেঁধে বসে থাকতে হবে কিন্তু। আমি উত্তেজনায় ফুটছি। নিজেকে জিম করবেটের মতো মনে হচ্ছে। দেরি না-করে ছুটলাম, সহদেবের বাড়ি। অল্প কিছু খাব। সহদেবের পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে নেব। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে হবে। রাত জাগতে হবে না?"

ছোটোমামা থামলেন। আমরাও চুপ করে রইলাম। কথা বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে, নিজেরাই সেই কিশোরীমোহন গ্রামে রয়েছি। উধাও হয়ে যাওয়া বাঘকে খুঁজছি। সায়ন বলল, "তুমি সারারাত জেগে বসে রইলে?"

ছোটোমামা বললেন, "না। দরকার হল না।"

আমি আর কিংশুক একসঙ্গে বলে উঠলাম, "দরকার হল না মানে?"

ছোটোমামা একটা ছোট্ট আড়মোড়া ভাঙলেন। বললেন, "বাড়ি ফিরে সহদেবের কাছে একটা গামছা চাইলাম। বললাম, ঝট করে অল্প কিছু খেতে দাও, আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি। সহদেব দেখলাম মুখ কাঁচুমাচু করে আছে। বলল, স্যার রাতে না-গেলেই নয়? আমি হেসে বললাম, ভয়ের কী আছে? ওদের সঙ্গে তো বন্দুক আছে। তা ছাড়া যার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, তার শেষ পর্যন্ত কী হল জানতে হবে না? কথা বলতে বলতে আমি খিড়কির দরজা খুলে পুকুরের

দিকে চলে গেলাম। দিনের বেলা পুকুরের রূপ ছিল একরকম, রাতেও সেই পুকুর সুন্দর। জল টলটল করছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে বাঁধানো ঘাটে। আমি নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে, আর তখনই চাপা গরগর আওয়াজ!"

ছোটোমামা চুপ করে আমাদের সকলের মুখের দিকে তাকালেন। আমাদের চোখের পাতা কি পড়ছে? মনে হয় না পড়ছে।

ছোটোমামা ফিসফিস করে বললেন, "পুকুর ঘাটের আড়ালে সে বসে ছিল চুপটি করে। গা ঢাকা দিয়ে! সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার। যেন অপেক্ষা করে ছিল আমারই জন্য! আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর জলে লাফ দিল আলতো আওয়াজ করে। অতবড়ো শরীরটা নিয়ে নিঃশব্দে সাঁতরে পার হয়ে গেল চোখের নিমেষে। জল থেকে উঠে মিশে গেল ওপারের অন্ধকারে, ধানখেতের মধ্যে। বুঝতে পারলাম বাতাস উলটো দিকে বইছে বলে বাঘের গায়ের গন্ধও কেউ পায়নি। অথবা বুদ্ধিমান মহারাজ বাতাসের উলটো দিকেই এসে লুকিয়ে ছিলেন এতক্ষণ। সকালেই সহদেব আমাকে বলেছে, তার বাড়ির পিছনে ধানখেত পেরোলেই জঙ্গলে যাওয়ার নদী। গভীর রাতেই বাঘ নিজের আস্তানায় পৌঁছে যাবে। আমি পুকুরে ক-টা ডুব দিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম।"

সায়নদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা চুপ করে হাঁটতে লাগলাম। সেই না-দেখা বাঘটার জন্য আমাদের মন কেমন করছে।

বাড়ি ফিরে

সংসার নিয়মের বাইরে চলে না। তার সব কিছুই নিয়মে বাঁধা। এমনকী 'হেড অব দ্য ফ্যামিলি' সন্ধেবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে কী করবে তারও নিয়ম আছে। তাকে পোশাক বদলে হাত মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসতে হয়। মুখ থাকে গম্ভীর। ভুরু কোঁচকানো। কারণ এইসময়ে অফিসের বিবিধ হেনস্থার কথা মনে পড়ে। সারাদিন কত ঝড়ঝাপটা, কত অপমান। বসের ধমক, কলিগদের পলিটিকস, ইউনিয়নের গুঁতো। অফিসে 'মিউমিউ' টাইপ হয়ে থাকলেও, বাড়ি ফিরে নিজের ওপর রাগ হবে। মনে হবে, ইস, মনে একটু সাহস আনতে পারলেই এসবের জবাব দেওয়া যেত। কেন যে ছাই ওইটুকু সাহসও হল না। কাল সাহস আনতেই হবে। কাল না হলে পরশু তো বটেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। পরশু যদি একেবারে সম্ভব না হয়, তাহলে পরদিন...। সে যবে সাহস হবে তবে হবে। আজ যেন বাড়ির লোক এসব হেনস্তার কথা টের না-পায়। তারা যেন ভাবে মানুষটা যে এত চিন্তার মধ্যে রয়েছে সেটা নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য। দিল্লি থেকে খানিক আগে টেলিফোন এসেছিল। জিনিসপত্রের দাম কীভাবে কমানো যাবে সে ব্যাপারে গভর্নমেন্ট পরামর্শ চেয়েছে। নেহাত কথাটা গোপনীয়, তাই বলা যাচ্ছে না। গম্ভীর মুখ আর কোঁচকানো ভুরু দেখে বুঝে নিতে হবে। বাড়ির লোক কী বোঝে তারাই জানে, তবে সংসারের নিয়ম অনুযায়ী তারা রোজকার মতো তটস্থ হয়ে যায়। নিজেদের গলা এবং টিভির ভল্যুম কমিয়ে ফেলে। ছেলে-মেয়েরা এতক্ষণ লেখাপড়ার ধারকাছ দিয়ে যাচ্ছিল না, বাবাকে দেখে হাতের কাছে হাবিজাবি যা বই পায় পাতা খুলে গলা ফাটিয়ে পড়তে থাকে। এই সময় স্ত্রী সংসারের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে এলে চাপা গলায় ধমক দেওয়াটা 'হেড অব দ্য ফ্যামিলি'র অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে। এই বিষয়ে কোনো দয়ামায়া রাখলে চলবে না।

'এই শুরু হয়ে গেল। বাড়িতে ঢুকতে-না-ঢুকতে প্রবলেমের ফিরিস্তি নিয়ে।'

স্ত্রী গজগজ করবে। বলবে, 'আমি কী করেছি? চারদিকে ধারদেনা আর পাওনাদারে ভরিয়ে রেখেছ। সারাদিন তো আমাকেই হ্যাপা সামলাতে হয়। কলের মিস্ত্রি থেকে মুদির দোকানদার সবাই হাত পাতছে।'

পাওনাদারের কথা শুনে 'হেড অব দ্য ফ্যামিলি'র ঘাবড়ে গেলে চলবে না। নিয়ম হল তখন দাঁত কিড়মিড় করে বলতে হবে—'হাত পাতছে তো আমি কী করব? শিয়ালদা থেকে টাকার চারা গাছ এনে টবে পুঁতব? এইজন্য শালার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না।'

স্ত্রী সামনে থেকে সরে যেতে যেতে বলবে, 'ইচ্ছে না-করলে ফিরো না। তোমার ফেরা-না-ফেরায় তফাত কী?'

সুমন্ত্র এই পরিবারের 'হেড অব দ্য ফ্যামিলি'। কিন্তু তার বেলায় সংসারের এই নিয়ম মেলে না। বরং উলটোটাই ঘটে। অফিস থেকে ফিরে সে বিরাট হইচই শুরু করে দেয়। ফেরার পথে কিছু-না-কিছু নিয়ে আসে। কোনোদিন স্ত্রী সোহাগের জন্য মোমো, চিকেন প্যাটিস, কোনোদিন ক্লাস ফাইভে পড়া ছেলে বাপ্পার জন্য সিডি, ড্রয়িং পেনসিল। ফ্ল্যাটের দরজা থেকেই ডাকাডাকি শুরু করে দেয় সুমন্ত্র।

'কী হল সোহাগ? গেলে কোথায়? বাপ্পা, দেখ তোর জন্য কী এনেছি।'

এত ডাকাডাকির কোনো প্রয়োজন নেই। সোহাগ কাছাকাছি থাকে। ছেলেও আছে পাশের ঘরে। সাড়া পেয়ে তারা এক্ষুনি চলে আসবে। তবু সুমন্ত্র ডাকে। সম্ভবত, বাড়ি ফিরে স্ত্রী পুত্রের নাম ধরে ডাকতে তার ভালো লাগে। এই সময়টায় বাইরের কেউ থাকলে অবাক হবে। ভাববে, মানুষটা লম্বা কোনো ট্যুরে গিয়েছিল। দশদিন পরে ফিরছে!

সোহাগ গ্লাসে ঠান্ডা জল এনে আহ্লাদি ধরনের গলায় বলে, 'বাড়ি ঢুকে তুমি এমন ছেলেমানুষি কর যে হাসি পায়।'

সুমন্ত্র জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে, 'হাসিই তো পাবে। আমি বাড়ি ফিরলে তোমার হাসি পাবে না তো কি কান্না পাবে?'

সোহাগ নীচু গলায় বলে, 'মনে আছে বিয়ের পর পর, দুপুরবেলা পেট ব্যথা বলে অফিস থেকে চলে আসতে?'

জল খাওয়া শেষ করে সুমন্ত্র অবাক হওয়ার ভান করে। বলে, 'তাই নাকি! দুপুরবেলা চলে আসতাম বুঝি? এসে কী করতাম? পেট চেপে শুয়ে পড়তাম?'

সোহাগ মুখ লাল করে বলে, 'ন্যাকামি কোরো না। কী করতে তোমার মনে নেই? অসভ্য কোথাকারে।'

সুমন্ত্র স্ত্রীর হাত ধরে বলে, 'বল না, কী করতাম। প্লিজ বল। আচ্ছা, মুখে বলতে হবে না, চল বেডরুমে গিয়ে দেখাবে।'

সোহাগ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে, 'অ্যাই খবরদার। বাপ্পা আছে। ছেলে বড়ো হচ্ছে, সব বুঝতে পারে।'

'বুঝুক গে। প্লিজ সোহাগ...।'

সোহাগ হেসে বলে. 'পাগল একটা। আচ্ছা, রাতে হবে। বাপ্পা ঘুমিয়ে পড়বার পর। এখন বাথরুমে যাও, ফ্রেশ হয়ে এস। আমি চা বসাচ্ছি।'

সুমন্ত্র টাই খুলতে খুলতে সোফায় গা এলিয়ে দেয়।

'যাব'খন, অত তাড়া কীসের একটু জিরিয়ে নিই। বাপ রে আজ যা খাটুনি গেছে। পাশে বোসো তো সোহাগ, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি। কতক্ষণ দুজনে কথা হয়নি বল তো?'

সোহাগ খিলখিল করে হেসে ফেলে। বলে, 'সে কী গো! কথা হয়নি মানে! মোবাইলে কতবার ফোন করেছ তার ঠিক আছে? দাঁড়াও কল গুনে বলছি।'

সুমন্ত্র বলল, 'দুর ফোনে কথা আবার কথা হল নাকি? ওসব ছেলেছোকরাদের প্রেম করার সময় হয়। স্বামী, স্ত্রীকে মুখোমুখি বসে কথা বলতে হয়। অ্যাট দ্য অ্যান্ড অব দ্য ডে ঘর সংসারের কত ইমপর্টান্ট কথা থাকে।'

সোহাগ সুমন্ত্রর হাত ধরে টেনে তুলতে তুলতে বলল, 'অনেক ঘর সংসার করেছ, এখন বাথরুমে যাও তো।'

সুমন্ত্র ওঠে কিন্তু বাথরুমে যায় না। কাঁধে তোয়ালে নিয়ে পাশের ঘরে ঢোকে। বাপ্পা কম্পিউটারের সামনে বসে গাড়ির রেস খেলছে। কী বোর্ডের হুকুমে পর্দায় শন শন করে গাড়ি ছুটছে। ছেলের সঙ্গে সুমন্ত্রও এক হাত খেলে। সোহাগ কোমরে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে তেড়ে যায়। মাথার ওপর হাত তুলে সুমন্ত্র নাটুকে ভঙ্গিতে চিৎকার করে ওঠে—'বাঁচাও, বাঁচাও, গেলুম গেলুম।' বলতে বলতে ছোটে বাথরুমের দিকে। বাপ্পা হেসে গড়িয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে গোটা ফ্ল্যাটে একটা খুশি খুশি ভাব। ঘটনা যারা একটু আধটু জানে তারা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'বেশি বাড়াবাড়ি, আমাদের কি বর নেই? সে কি অফিস থেকে ফেরে না? কই এমন আদিখ্যেতা করতে তো দেখি না বাপু!'

স্বামীর এই 'বাড়াবাড়ি আচরণ'-এ সোহাগ গর্বিত। তার স্বামী আর পাঁচজন স্বামীর মতো নয়। আজকালকার দিনে অফিস শেষ করে ক-টা পুরুষমানুষ সোজা বাড়ি ফেরে? বাইরে হাজারটা হাতছানি। আড্ডা আছে, ক্লাব আছে। নইলে অফিসের বস বা বিজনেস পার্টনারের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসে দু-পেগ মদ গেলা আছে। আরও খারাপ হয়। তনুকা সেদিন ফোনে কান্নাকাটি করছিল। ওর বর নাকি মাঝে মাঝেই শনিবার করে বাইরে চলে যায়। বলে, অফিসের কাজ। সাইট ভিজিট। তনুকা জানতে পেরেছে, কাজ না ছাই। কোন্ এক মহিলাকে নিয়ে রিসর্টে ফুর্তি মারে। দুটো রাত থাকে। একেবারে সোমবার অফিস করে ফেরে। ফিরেও শান্তি দেয় না। তনুকাকে মেজাজ দেখায়। ছেলে-মেয়েদের মারধোর করে। ইস মাগো! এসব নোংরা কাণ্ড আজকাল ঘরে ঘরে। তাহলে? এরপরও সে সুমন্ত্রকে নিয়ে গর্ব করবে না? একশোবার করবে। হাজারবার করবে। খুব ভাগ্য না-থাকলে এমন মানুষকে স্বামী হিসেবে পাওয়া যায় না। সারাদিন পর ঘরে ফিরে মাতিয়ে রাখে। কেউ শুনলে মনে করতে পারে, বউ নেওটা। মনে করলে করুক। যে যা ইচ্ছে মনে করুক। ওসব

হিংসের কথা। সুমন্ত্র ঘর সংসার ভালোবাসে। বউ ছেলের সঙ্গে এনজয় করে। এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। সারাদিনে তো দেখাসাক্ষাৎই হয় না, সাতসকালে ছেলে স্কুলে চলে যায়। তারপর নিজের অফিস যাওয়ার তাড়া। সোহাগের সঙ্গে কথা মানে, মোবাইল ভরসা। তাই সন্ধেটুকু পুষিয়ে নেয়। টিভি দেখে, গল্প করে, ছেলের হোমটাস্ক হয়ে গেল, তাকে নিয়ে খেলে। কোনো কোনোদিন বাপ্পা বাইরে খাওয়ার জন্য বায়না করলে বিরক্ত হয় না। তিনজন বেরিয়ে পড়ে। আসলে সুমন্ত্র একজন ভালো মানুষ।

গত দু-দিন সেই 'ভালো মানুষ' বাড়ি ফিরছিল থমথমে মুখে। প্রথমদিনই সোহাগ খেয়াল করল। যে মানুষ বাড়ি ফিরে হাঁকডাক শুরু করে দেয় সে চুপচাপ! রাতে খেতে বসে সে বলল, 'কী হয়েছে? শরীর খারাপ?'

সুমন্ত্র মাথা নীচু করে বলল, 'কিছু না।'

'অবশ্যই কিছু। আমাকে লুকিয়ো না। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি একটা কিছু হয়েছে। কী হয়েছে?'

সুমন্ত্র সামান্য বিরক্তি দেখিয়ে বলল, 'বলছি তো কিছু হয়নি। একই কথা বার বার বলছ কেন?' তারপর কিছুক্ষণ খাবার নাড়াচাড়া করে প্লেট সরিয়ে উঠে পড়ল।

সোহাগ খাওয়া থামিয়ে বলল, 'কী হল, আর খাবে না?'

'না, থাক। মনে হয় হজমের প্রবলেম হচ্ছে। রাতটা উপোস দিলে ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিন সকালটাও চুপচাপ কাটাল সুমন্ত্র। চুপ করে চা খেল, খবরের কাগজ পড়ল। অন্য দিন হলে খবর কাগজ আধখানা সকাল নিয়ে নেয়। দোকানবাজার যেতেই চায় না। বলে সংসারের নীরস কাজকর্ম তার নাকি একেবারে ধাতে সয় না। অ্যালার্জির মতো হয়। ঘুম ঘুম পায়। যেদিন যেদিন বাজার করে অফিসে গিয়ে ঝিমুনি লাগে। কাজে ভুল হয়ে যায়। সোহাগ বলে, 'হলে হবে, বাজারে যাও।'

সুমন্ত্র কাঁচুমাচু গলায় বলে, 'আজকের দিনটা ম্যানেজ করে নাও, কাল থেকে বাজার করা আমার কে রোখে দেখব। আজ দুপুরে একটা ইমপর্টান্ট মিটিং আছে। সেখানে যদি ঢুলতে থাকি তাহলে বিরাট কেলেঙ্কারি হবে।'

এভাবে আর কতদিন ঠেলেঠুলে পাঠানো যায়? তাই বেশিরভাগ দিনই সোহাগ নিজে বাজার করে। মাঝে মাঝে রাগ হয়। রাগ সামলে সোহাগ নিজেকে বোঝায়, সব কিছুর কনসেশন আছে, ভালো মানুষেরই-বা থাকবে না কেন? তাকেও কিছু ছাড় দিতে হবে। সেদিন কিন্তু কাগজ সরিয়ে রেগে সুমন্ত্র বলল, 'কই দাও বাজারের ব্যাগটা কোথায়?'

সোহাগ বলল, 'তুমি বাজারে যাবে! থাক না আজ, শরীরটা ভালো নেই যখন।'

সুমন্ত্র উষ্মা ভরা গলায় বলল, 'কথা না-বাড়িয়ে ব্যাগটা দাও তো। সকালবেলা বকবক ভালো লাগছে না।'

সোহাগ অবাক হয়। সাতসকালে খিটখিট করছে? শরীর খারাপ লাগলে অবশ্য মেজাজ খারাপ থাকা অস্বাভাবিক নয়। সে কথা না-বাড়িয়ে ব্যাগ এগিয়ে দেয়।

অফিসে কয়েকবার ফোন করল সোহাগ। চিন্তিত গলায় বলল, 'শরীর ঠিক আছে?'

'আছে।'

সোহাগ একটু থেমে বলল, 'তোমাদের অফিসের কাছে ডাব পাওয়া যায়?'

সুমন্ত্র অবাক গলায় বলে, 'ডাব! ডাব কেন?'

'সকালে মা বলছিল, পেট গরমে ডাব ভালো কাজ দেয়। তুমি একটা ডাব এনে খেয়ে নাও।'

সুমন্ত্র বিরক্ত গলায় বলল, 'তুমি তোমার মাকে কী বলেছ?'

'কাল রাতে খাওনি সে-কথা বলেছি।'

সুমন্ত্র মুখ দিয়ে আওয়াজ করে বলল, 'এসব বলতে গেলে কেন? একবেলা খাইনি সেটা ঢাক পিটিয়ে বলার কী হল?'

সোহাগ বলল, 'ঢাক পেটালাম কোথায়! নিজের মাকে বলাটা ঢাক পেটানো! তোমার কী হয়েছে বল তো। এনিথিং রং?'

সুমন্ত্র হতাশ গলায় বলল, 'কিছু হয়নি। এবার ফোন ছাড়, আমাকে কাজ করতে দাও।'

সন্ধেবেলাতেও অবস্থার কোনো হেরফের হল না। সুমন্ত্র চুপচাপ বসে টিভিতে খবর শুনল। নীচু গলায় ক-টা টেলিফোন করল। বাপ্পা কয়েকবার তার বাবার কাছে ঘেঁষতে চেষ্টা করে। সুমন্ত্র ঠান্ডা গলায় বলে, 'পড়তে যাও। তোমার লাস্ট এক্সামের রেজাল্ট কিন্তু মোটেও ভালো হয়নি বাপ্পা। সারাদিন গেমস নিয়ে থাকলে চলবে না।'

অফিস থেকে ফিরে সাধারণত টোস্ট অমলেট খায় সুমন্ত্র। কাল টোস্ট অমলেটের বদলে একবাটি চিঁড়ে দই মাখা নিয়ে এল সোহাগ।

সুমন্ত্র মুখ কুঁচকে বলল, 'এটা কী!'

সোহাগ বলল, 'খেয়ে নাও। রাতে কাঁচকলা দিয়ে পাতলা করে মাছের ঝোল খাবে।'

অবাক চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে চিঁড়ে দইয়ের বাটি নিল সুমন্ত্র।

'কাল সকালে ডাক্তারের কাছে যাবে। যদি বল এখনই ডাক্তার ঘোষকে একটা ফোন করতে পারি। করব?'

সুমন্ত্র বিড়বিড় করে বলল, 'না, এখন নয়।'

সোহাগ স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'খাওয়া হলে একটু শুয়ে থাক। পেটের প্রবলেমে রেস্ট উপকারী।'

সুমন্ত্র তেতো মুখে এক চামচ দই চিঁড়ে মুখে দিয়ে বাটি সরিয়ে রাখল। নীচু গলায় বলল, 'প্রবলেমটা পেটের নয়, সোহাগ।'

সোহাগ একটু থমকে গেল। আতঙ্কিত গলায় বলল, 'তাহলে? কী হয়েছে?'

'এখন নয়, কাল বলব কী হয়েছে।'

'না, এখনই বল।'

সুমন্ত্র মুহূর্তের জন্য বদলে গেল। কঠিন গলায় বলল, 'বিরক্ত কোরো না।'

কঠিন গলার সোহাগ দুঃখ পেল। কিন্তু আরও উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'বিরক্তের কী আছে! স্বামীর সমস্যা জানতে চাওয়াটা বিরক্ত করা!'

'প্লিজ, চুপ কর এবং এখান থেকে যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

রাতে মা ফোন করে জামাইয়ের খবর নিতে গেলে সোহাগ প্রায় কেঁদে ফেলল।

'আমার কালই সন্দেহ হয়েছিল মা, যে মানুষটা বাড়ি ফিরে হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধায় সে কেমন থম মেরে গেছে। জানতাম শরীর খারাপ। হজমের গোলমাল। এখন বলছে, না, সমস্যা নাকি অন্য। আমাকে ধমক দিচ্ছে; ছেলেকে বকছে। এমন ও কখনো করে না মা। নিশ্চয় বড়ো কোনো বিপদ হয়েছে...কী হবে?'

সোহাগের মা শক্ত মনের মানুষ। তিনি বললেন, 'এখন বেশি ঘাঁটাস না সোহাগ। আগে সমস্যাটা জানার চেষ্টা কর, তারপর ভেবেচিন্তে একটা কিছু করা যাবে।'

সমস্যা জানা গেছে আজ দুপুরে। বারোটার কিছু পরে। সুমন্ত্র ফোন করল অফিস থেকে। গলায় উচ্ছ্বাস। আনন্দে ফুটছে যেন।

'অল ক্লিয়ার সোহাগ।'

সোহাগ থতোমতো খেয়ে যায়। বলে, 'অল ক্লিয়ার মানে! কী ক্লিয়ার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কী হয়েছিল তোমার?'

'অফিস থেকে বলা যাবে না, বাড়ি ফিরে ডিটেইলসে বলব। শুধু জেনে রাখ আর কোনো সমস্যা নেই।'

চোখ বুজে কপালে মোবাইল ফোনটা ঠেকাল সোহাগ। যেন মোবাইলটা ঈশ্বর। সমস্যা গেছে, সুমন্ত্রর মুখে হাসি ফুটেছে এটাই যথেষ্ট। কী সমস্যা না-শুনলেও চলবে। কণ্ঠস্বরই বলে দিচ্ছে, আবার আগের সুমন্ত্র ফিরে এসেছে। সে-ই হুল্লোড়ের সুমন্ত্র। ব্যাস তাহলেই হবে।

সুমন্ত্র বলল, 'অ্যাই, আজ রাতে বাইরে ডিনার।'

সোহাগ বলল, 'না, কাল বাপ্পার ক্লাস টেস্ট। বাইরে যেতে পারব না।'

'ঠিক আছে আমি চায়না টাউন থেকে খাবার নিয়ে ফিরছি।'

সোহাগ অভিমানাহত গলায় বলল, 'জানি না। দু-দিন ধরে যা মুখ ঝামটা দিয়েছ। কিছু বলতে গেলে তেড়েফুঁড়ে উঠেছ।'

সুমন্ত্র চাপা গলায় হেসে উঠল। বলল, 'আরে বাবা, দুটো দিন কী টেনশনে যে ছিলাম সোহাগ, তুমি ভাবতে পারবে না। মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল। রাতে বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় গিয়ে সিগারেট খেতাম। পা টিপে টিপে যেতাম, যাতে তুমি বুঝতে না পার।'

'কেন বুঝতে পারব না? খুব পেরেছি। উঠিনি, ঘাপটি দিয়ে শুয়ে ছিলাম। পাছে তুমি আবার রাগ কর।'

সুমন্ত্র বলল, 'যাক, বল কী কিনব? মিক্সড ফ্রায়েড রাইস নিই? বাপ্পা তো ভালোবাসে। ক-টা নেব? দুটো? সঙ্গে কী নেব? চিলি চিকেন নাকি মাঞ্চুরিয়ান?'

অভিমান ঝেড়ে ফেলে সোহাগ বলল, 'যখন নিচ্ছই প্রনেরও একটা প্রিপারেশন নিয়ো। গার্লিক নাও, না না এক প্লেট গোল্ড ফ্রায়েড প্রন নিয়ে নাও। খরচ একটু বেশি হবে কিন্তু।'

সুমন্ত্র উৎসাহ নিয়ে বলল, 'খরচ নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না সোহাগ, আজ আমার বাজি পোড়ানো উচিত। বাপ রে যা ফাঁসান ফাঁসছিলাম। চার বছর মিনিমাম। পাঁচ সাড়ে পাঁচ হয়ে গেলেও আশ্চর্যের কিছু হত না।'

সোহাগ অবাক হয়ে বলল, 'কী ছাইভস্ম বকছ! চার, পাঁচ! কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'পারবে, পারবে। বাড়ি গিয়ে যখন সব বলব, তখন বুঝতে পারবে। এখন ওসব বাদ দাও, খাবারের এত নাম মনে থাকবে না। গুলিয়ে গেলে রাগারাগি করবে। একমিনিট দাঁড়াও চট করে লিখে ফেলি।'

সোহাগ বলল, 'লিখছই যখন, আর ক-টা জিনিস লিখে নাও। বাপ্পার একটা চার নম্বর রুল টানা খাতা আনবে।'

মুখ দিয়ে আওয়াজ করে সুমন্ত্র বলল, 'চাইনিজ খাবারের রেস্টুরেন্টে রুল টানা খাতা!'

সোহাগ গম্ভীর গলায় বলল, 'রেস্টুরেন্ট থেকে কিনবে কেন? যেখানে খাতা পাওয়া যায় সেখান থেকে কিনবে। খাতা কোথায় পাওয়া যায় জান না? রেস্টুরেন্টে খাবারের অর্ডার দিয়ে হাতে সময় পাবে। তখন আশপাশ থেকে কেনাকাটা করবে।'

'কেনাকাটা!' সুমন্ত্র প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

সোহাগ বলল, 'দু-দিন আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে রেখেছিলে। এটা তার ফাইন। শুধু বাপ্পার খাতা নয়, লিস্টে লেখ এক প্যাকেট গুঁড়ো সাবান, একটা মাঝারি সাইজের টুথ পেস্ট, বাপ্পার টিফিনের কেক, আমার দু-পাতা সেফটিপিন।'

সুমন্ত্র টেলিফোনেই বড়ো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'প্রথম থেকে বল। সব গুলিয়ে গেছে।'

বাড়ি ফিরে হাতে চায়ের কাপ নিয়ে সোফার ওপর পা তুলে জমিয়ে বসেছে সুমন্ত্র। উলটো দিকে বসেছে সোহাগ। চিন্তামুক্তি উপলক্ষে সে আজ একটু সেজেছে। একটা জংলা পাড়ের শাড়ি পরেছে। কপালে ম্যাচ করে টিপ। গালে হালকা পাউডার। চুলে লম্বা বেণী। সুমন্ত্র বলল, 'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। একেবারে কলেজ গার্লদের মতো।' প্রশংসা ভালো লাগলেও বুঝতে দিল না সোহাগ।

'বুড়ো বয়েসে আর কলেজ গার্ল দেখে লাভ হবে না। এবার বল কী হয়েছিল। মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছিল।'

'মোটেই আমসি হয়নি। আমি কি ভীতু?'

সোহাগ হেসে বলল, 'না ভীতু নও, তুমি হলে বীরপুরুষ। তা বীরপুরুষবাবু কী নিয়ে আপনার মাথাব্যথা হয়েছিল শুনি।'

দুই হাঁটুতে আয়েশ করে হাত বোলাতে বোলাতে সুমন্ত্র মুচকি হাসল। বলল, 'বদলি, হঠাৎ আমার ট্রান্সফার অর্ডার এসেছিল।'

'অ্যাঁ, ট্রান্সফার। কোথায়?' পিঠ সোজা করে বসল সোহাগ।

'বিরাট দূরে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে ঘণ্টা দেড়েকের বাস জার্নি। বছর তিন হল নতুন ব্রাঞ্চ খুলেছে কোম্পানি। বাস আবার দিনে মাত্র দুটো চলে। বৃষ্টি-টিষ্টি হলে বন্ধ।'

সোহাগ আতঙ্কিত গলায় বলল, 'তখন?'

সুমন্ত্র হাত উলটে বলল, 'তখন আর কী, অফিসের টেবিলে কাগজ পেতে, ফাইল মাথায় নিয়ে শুয়ে পড়। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আবার দুম্ করে টেবিল থেকে নামা যাবে না। মাঠ, ধানখেতের মাঝখানে অফিস তো, মেঝেতে বড়ো বড়ো ধেড়ে ইঁদুর ঘুরে বেড়ায়।'

সোহাগ ফ্যাকাশে মুখে অস্ফুটে বলল, 'ওমা গো! যদি কামড়ে দেয়?'

সুমন্ত্র বলল, 'সেই চিন্তাতেই তো দু-দিন মাথা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। তবে আর চিন্তা নেই।' তারপর দুটো হাত মুঠো করে ওপরে তুলে বলল, 'আমাকে যেতে হচ্ছে না। আমার ট্রান্সফার অর্ডার বাতিল।'

'কী করে হল!' সোহাগের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল।

কী করে হল সেটা জমিয়ে স্ত্রীকে বলল সুমন্ত্র। সবটাই বলল। কীভাবে সে অফিস ইউনিয়ন ম্যানেজ করেছে। ইউনিয়ন লিডার বিক্রম সামন্ত কঠিন মানুষ। বদলি, প্রোমোশন নিয়ে অসংখ্য কাকুতিমিনতি তাকে রোজ শুনতে হয়। আক্ষরিক অর্থেই হাতদুটো চেপে ধরেছিল সুমন্ত্র।

'ট্রান্সফারটা যে করেই হোক আটকাতে হবে দাদা।'

বিক্রম সামন্ত হাত সরিয়ে বলল, 'একেবারে লাস্ট মোমেন্টে এলেন! অর্ডার হয়ে গেছে। হাতে আর সময় কোথায়?'

'আপনি ইচ্ছে করলেই সময় বেরিয়ে আসবে। বদলি হলে মরে যাব। স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে থাকতে হবে।'

বিক্রম সামন্ত এবার হেসে ফেললেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার সম্পর্কে এটা শুনেছি বটে। আপনি একজন গুড ফ্যামিলি ম্যান। আপনার ডিপার্টমেন্টের লোকেরাই বলেছে। সুমন্ত্রবাবু অফিস করেই বাড়ি ছোটেন। নো বন্ধুবান্ধব, নো পার্টি। তাই তো?'

সুমন্ত্র লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, 'ছেলেটা খুব ছোটো...।'

বিক্রম সামন্ত ঝুঁকে পড়ে ভুরু নাচিয়ে বলল, 'শুধু ছেলে ছোটো? নাকি আরও টান আছে? ছেলে যখন ছোটো হা হা...।'

ইঙ্গিতটা একটু অশ্লীল, তবে বদলির যন্ত্রণার তুলনায় কিছু নয়। সুমন্ত্র গায়ে মাখল না। বিক্রম সামন্ত বলল, 'দেখুন ভাই সবার কথা শুনতে পারি না। কত শুনব? হাজারটা রিকোয়েস্ট নিয়ে গেলে ম্যানেজমেন্টই-বা ক-টা রাখবে? তবে কথা দিচ্ছি আপনারটা এক্সসেপশন কেস হিসেবে দেখব। বাড়ির টানের অনার বলে তো একটা কথা আছে? তাই না? আপনিও নিজে ওপরতলায় কথা বলুন। মিস্টার বোস মানুষ ভালো নয়। তবে আপনাকে একটা টিপস দিয়ে রাখি, শুনেছি ওর পায়ে ধরলে নাকি কাজ হয়।' কথাটা বলে চোখ সরু করে তাকাল বিক্রম। বলল, 'পায়ে ধরতে আপনার অসুবিধে নেই তো? অনেকের আবার নানারকম ইগো আছে। আরে বাবা, কাজ আগে না ইগো আগে?'

সুমন্ত্র আমতা আমতা করে বলল, 'না, না, অসুবিধের কী আছে? অসুবিধের কিছু নেই। বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। পায়ে হাত দিলে দোষ কোথায়?'

বিক্রম সামন্ত হেসে বলল, 'গুড। কাল ফার্স্ট আওয়ারে ওর ঘরে চলে আসুন। আমি থাকব।'

এই পর্যন্ত বলে সুমন্ত্র একটু চুপ করল। সোহাগ চোখ গোল করে বলল, 'তুমি পায়ে হাত দিলে!'

সুমন্ত্র হাসল। বলল, 'ইউনিয়ন লিডারের যখন হাত ধরতে পেরেছি, তখন ম্যানেজমেন্টের পা ধরতে পারব না কেন? ঘরে গিয়ে সটান একটা প্রণাম ঠুকে বললাম, আমায় মাপ করে দিতে হবে স্যার। দেখলাম, বিক্রম তখন ঘরে বসে আছে। আমার দিকে মিটিমিটি হাসছে। তারপর ঘটনা খানিকটা ভেলকির মতোই মনে হল বলতে পার। আজ দুপুরে ট্রান্সফার অর্ডার বাতিল হয়েছে। কিন্তু তা বলে তো আর জলপাইগুড়ির ইঁদুর ছোটা অফিস ফাঁকা থাকতে পারে না।'

সোহাগ বিড়বিড় করে বলল, 'কে যাচ্ছে?'

'বিক্রম সামন্ত পার্কস্ট্রিট ব্রাঞ্চের অফিস থেকে কাকে একটা ধরে এনেছে। ম্যানেজমেন্ট তাকে আর ধরা করার সময় দেয়নি। দুম করে ট্রান্সফার অর্ডার ধরিয়ে দিয়েছে।'

'কী নাম?'

সুমন্ত্র চোখ বড়ো করে হাসি হাসি মুখে বলল, 'বাবাঃ, তোমার তো দেখছি খুব ইন্টারেস্ট! নাম জেনে কী হবে? যতদূর শুনেছি ব্রজগোপাল রায় না ঘোষাল। বয়স আমার থেকে বেশি। রিটায়ারমেন্টের খুব বেশি দেরি নেই। ঠিকই হয়েছে, ওর ছেলে-মেয়ে নিশ্চয় বাপ্পার মতো ছোটো নেই। ধেড়ে ধেড়ে হয়ে গেছে। আর ওই যে টান, বিক্রম সামন্ত আমাকে চোখ নাচিয়ে বলেছিল না? তাও নিশ্চয় এতদিনে কেটে গেছে...হা হা...তাহলে আর সমস্যা কী? বিকেলবেলা অফিস থেকে বেরোনোর সময় শুনলাম, ভদ্রলোক নাকি অর্ডার হাতে পেয়ে বেজায় ঘাবড়ে গেছেন। হেড অফিসে এসে ছোটাছুটি করছেন, কিন্তু কাউকে ধরতে পারছেন না। কেমন হয়েছে বল?'

সোহাগ বেণীটাকে সামনে থেকে পিছনে ছুড়ে দিল। হেসে বলল, 'খুব ভালো হয়েছে। আমার হাতে পায়ে ধরা বরের পারফরমেন্স সত্যি দারুণ।'

সুমন্ত্র গদগদ গলায় বলল, 'হাতে পায়ে কী আর এমনি ধরেছি, তোমার আর বাপ্পার জন্য ধরেছি।'

সোহাগ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মাকে আগে টেলিফোন করে গল্পটা গুছিয়ে বলি। খুব চিন্তায় আছে।'

সুমন্ত্র আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'তোমার মায়ের কপাল ভালো। এমন জামাই ক-জনের ভাগ্যে জোটে।'

সব ঠিকঠাক ছিলই। গোলমাল হল খেতে বসার পর। বাপ্পা আগেই খেয়ে নিয়েছে। সোহাগ প্লেটে সাজিয়ে গুছিয়ে নিল অনেকটাই, কিন্তু খেতে পারল না। চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সুমন্ত্র মুখ তুলে বলল, 'কী হল? খাবার তো খুবই ভালো। প্রনটা খাও।'

সোহাগ কথা বাড়াল না। দ্রুত বাথরুমে উঠে গিয়ে বেসিনে মুখ নীচু করে বমি করতে লাগল। ছুটে এল সুমন্ত্র। স্ত্রীর পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'নিশ্চয় হজমের গোলমাল হয়েছে। বিকেলে হাবিজাবি কিছু খেয়েছিলে?' সোহাগ মাথা নাড়ল।

অনেক রাতে সোহাগ তার স্বামীর ঘুম ভাঙাল। ধড়মড় করে উঠল সুমন্ত্র।

'কী হয়েছে? শরীর খারাপ? বমি করবে?'

'হাতে পায়ে ধরলে তুমি একটা কথা রাখবে?'

'কী বলছ! কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সোহাগ স্বামীর গায়ে হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, 'ট্রান্সফার নিয়ে তুমি জলপাইগুড়ির ওই অফিসে চলে যাও সুমন্ত্র। তোমার বয়স কম, দরকার হলে দু-একটা রাত অনায়াসে টেবিলে শুয়ে কাটাতে পারবে। মোটে বছর তিন চারের তো মামলা। ওই ব্রজগোপালবাবুর বয়স হয়েছে...। তুমি কালই অফিসে গিয়ে বল, আমি যাব। আমার খুব কষ্ট হবে, কিন্তু একজন ভালোমানুষ স্বামী হারানোর কাছে সে কষ্ট কিছুই নয়।'

সংসার নিয়মের বাইরে চলে না। তার সব কিছুই নিয়মে বাঁধা। আমাদের সুমন্ত্রর বেলাতেও তাই হল। সে পরদিন রোজকার মতোই অফিসে যায়। নিজের টেবিলে বসে কাজ করে মন দিয়ে। টিফিনে টিফিন খায়। সোহাগকে ফোন করে। কিন্তু বদলি প্রসঙ্গে কাউকে কোনো কথা বলে না। সব কিছু আগের মতোই চলতে থাকে। শুধু যত দিন যায় ধীরে ধীরে বদলে যায় সুমন্ত্র। সে এখন আর অফিস থেকে বাড়ি ফিরে হই চই করে না। পোশাক বদলে চায়ের কাপ নিয়ে বসে। মুখ গম্ভীর। ভুরু কোঁচকানো। কারণ এইসময়ে অফিসের নানারকম হেনস্থার কথা তার মনে পড়ে যায়। সারাদিন কত ঝড়ঝাপটা, কত অপমান। বসের ধমক, কলিগদের পলিটিক্স, ইউনিয়নের গুঁতো...।

আঠাশে এপ্রিল

আজ আঠাশে এপ্রিল, বৈশাখ মাসের চোদ্দো তারিখ। সকাল থেকে রোদ উঠেছে। তেরছা প্যাটার্নের রোদ। তেরছা প্যাটার্নের রোদে ভয় আছে। বেলা বাড়লে তেজ বাড়ে।

ভুবন সরখেলের ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু তিনি চোখ খোলেননি। চোখ বুজে শুয়ে আছেন চিত হয়ে। দশ মিনিট তিনি এভাবেই থাকবেন। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, আসন করছেন। শবাসন। আসন নয়, আসলে তিনি মনে মনে হিসেব করছেন। জীবনের হিসেব। চৌষট্টি বছরের লম্বা জীবনে কাকে কী দিলেন, কার থেকে কতটুকু ফিরে পেলেন, আর কি কিছু পাওয়ার আছে? নাকি ক্রেডিট ডেবিটে মিলে গেছে তাঁর যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ।

শবাসনের ভঙ্গিতে থেকে জীবনের হিসেব কষার এই পদ্ধতি ভুবনবাবুর নিজের নয়। পদ্ধতি তাঁর বৈকালিক ভ্রমণের সঙ্গী পরিতোষবাবুর। তিনিও ষাট পেরিয়েছেন, তবে ভুবনবাবুর তুলনায় বয়েসে কিছুটা ছোটো। বছরখানেক আগে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে বিষয়টা একদিন তুললেন।

'বুঝলে হে পরিতোষ, আজ সারাদিনই খুব যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে।'

পরিতোষবাবু নিজের সাদা চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'যন্ত্রণা! কীসের যন্ত্রণা ভুবনদা? হাঁটুর ব্যথাটা আবার জ্বালাচ্ছে নাকি?'

ভুবন সরখেল হাতে ধরা বেতের লাঠি মাটিতে ঠুকে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'না, তা নয়। ঘুরতে ফিরতে শুধু হিসেব কষছি, কিন্তু মিলছে না কিছুতেই। কখনো মনে হচ্ছে দিয়েছি বেশি, পেয়েছি কম। কখনো আবার মনে হচ্ছে, এত পেলাম, অথচ তেমন দিতে পারলাম কই! বড়ো অস্থির লাগছে।'

পরিতোষবাবু সবুজ বেঞ্চে হেলান দিয়ে ছিলেন। চিন্তিত গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো ভুবনদা! দার্শনিক ধরনের কথা মনে হচ্ছে। ঘটনা কী? কাউকে টাকাপয়সা ধার দিয়েছেন? নাকি নিয়েছেন?'

ভুবনবাবু বললেন, 'না না টাকাপয়সা নয়। জীবনের হিসেব। আজ গোটা দিন ওটা নিয়ে নাড়াঘাটা করেছি আর জট পাকিয়ে ফেলেছি। কখনো যোগে ভুল হচ্ছে, কখনো বিয়োগে গোলমাল করছি, কখনো ভাগশেষ থেকে গেছে, কখনো গুণফলে পাচ্ছি শূন্য। কী মুশকিল!'

পরিতোষবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'হিসেবে গোলমাল তো হবেই। এ আপনার টাকাপয়সা নয় যে যখন-তখন খাতা কলম বাগিয়ে বসে গেলেই হল। পেনশন, পোস্টাপিস, ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটের হিসেবপত্রের সঙ্গে এর বিস্তর ফারাক। আকাশ-পাতাল বলতে পারেন। জটিল অঙ্ক। খাতা কলমের কম্ম নয়।'

ভুবন সরখেল ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তুমি কি তাহলে খাতা কলমের বদলে কম্পিউটারের কথা বলছ? ওরে বাবা, এই বুড়ো বয়েসে ওসব পারব না।'

পরিতোষবাবু আওয়াজ করে হেসে উঠলেন।

'কথাটা মন্দ বলেননি ভুবনদা। জীবনের হিসেব কম্পিউটারে! আমি হলফ করে বলতে পারি, জাপানিরা আপনার এই কথা শুনলে লাফিয়ে উঠত। দেখতেন, কিছুদিনের মধ্যে একটা সফটওয়্যার বের করে বসেছে। ওরা এসব টকাটক করে ফেলে। হয়তো দেখলেন সফটওয়্যারের জাপানি নাম বাংলা করলে হচ্ছে জীবন খাতা সফটওয়্যার। রিটায়ারমেন্টের দিন ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে কলিগরা ছাতা, ধুতি, মিষ্টির বাক্স আর একটা করে সিডি উপহার দিচ্ছে। সিডির ওপর লেখা জীবনখাতা সফটওয়্যার। হা হা...। বাড়ি ফিরে কম্পিউটারে সিডি ঢোকালেই জীবন খাতা যাবে খুলে। হা হা...।'

পরিতোষবাবুর এটা একটা গুণ। বয়সের কারণে শরীরের অনেক কলকব্জা নড়বড়ে হয়ে গেছে, কিন্তু রসিকতার কবজা নষ্ট হয়নি। ভুবন সরখেল মুখ গোমড়া করে বললেন, 'ঠাট্টা করছ নাকি পরিতোষ?'

পরিতোষবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, 'ঠাট্টা করব কেন? একটা বয়েসে পৌঁছে পাওয়া-না-পাওয়ার হিসেব তো করতেই হবে। সকলকেই করতে হয়। কিন্তু আপনার মতো যখন-তখন করলে হবে না। খাওয়া ঘুমোনোর মতো এরও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে।'

ভুবনবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'সময়! এর আবার সময় কী হে!'

'আলবাত সময় আছে। সবের সময় আছে, এর সময় থাকবে না কেন? জীবনের হিসেব কষতে হবে একেবারে ফ্রেশ মাথায়। মনের মধ্যে সংসারের হাবিজাবি ঢুকে পড়ার আগেই। সবথেকে ভালো হয়, আপনি যদি ঘুম ভাঙার পরেই ঝট করে কাজটা সেরে ফেলেন। এত বছরের জীবন, দু-পাঁচ দিনে তো হিসেব শেষ হওয়ার নয়। হবেও না। আপনাকে করতে হবে অল্প অল্প করে। তবেই দেখবেন অঙ্ক মিলছে।'

তারপর থেকেই ঘুম ভাঙার পর দশ মিনিট সময় ধরে রেখেছেন ভুবন সরখেল। একেকদিন একেকটা চ্যাপটার খুলে বসেন। কোনোদিন ঘরে, কোনোদিন বাইরে।

চ্যাপ্টারের মধ্যে সাব চ্যাপ্টারও আছে। ছেড়ে আসা অফিসের কলিগ, ফেলে আসা পাড়ার প্রতিবেশী। বাড়ি হলে কোনোদিন স্ত্রী, কোনোদিন ছেলে-মেয়ে।

আজকের চ্যাপ্টার বাইরের। সাব চ্যাপ্টারের নাম বল্টু। বল্টু ক্লাস সেভেনের বন্ধু। নরমাল বন্ধু নয়, প্রাণের বন্ধু। স্কুলে পাশাপাশি বসত দুজনে। ভাগ করে টিফিন, ভাগ করে দুষ্টুমি। একজন কামাই করলে অন্যজনের মন খারাপ। একবার অ্যানুয়াল পরীক্ষার মুখে ভুবনবাবুর হল পক্স। কেউ বাড়ির ধারেকাছে যেত না। শুধু বল্টু লুকিয়ে দেখা করত। খাটের পাশে বসে ইতিহাস, ভুগোল বই খুলে পড়ে শোনাত। দুর্বল শরীরে ভুবনবাবু শুয়ে শুয়েই পরীক্ষার পড়া তৈরি করে ফেললেন। অসুখ সারবার ক-দিনের মধ্যেই পরীক্ষা। তখন বল্টু পড়ল পক্সে। ভুবনবাবুর পরীক্ষা দেওয়া হল, বল্টু শুয়ে রইল বিছানায়। তার বছরটাই নষ্ট হল। সেই বল্টুকে নিয়েই আজ হিসেবনিকেশ করবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন ভুবন সরখেল। যে-বন্ধু এতখানি করেছিল, তার জন্য তিনি কী করেছেন? ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে কত বছর। একবারও কি দেশের বাড়ি গিয়ে বল্টুর খোঁজ করা যেত না? হিসেবে তো বলছে নেওয়ার খাতা ভরে আছে, দেওয়ার খাতায় বিগ জিরো।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। মাঝপথে হিসেব বন্ধ করে চোখ খুললেন ভুবনবাবু। উঠে বসলেন খাটে। চোখ পড়ল সামনের দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের পাতায়। চমকে উঠলেন, আজ আঠাশে এপ্রিল! সে কী!

পাশে শুয়ে আছে ভারতী। ঘুমোচ্ছে। হালকা নাকও ডাকছে। ভারতীর এই বিচ্ছিরি অভ্যেসটা ছিল না। স্বামী অবসর নেওয়ার পর থেকে হয়েছে। দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা এবং হালকা নাক ডাকা। ভাবটা এমন যেন তার স্বামী নয়, সে-ই দীর্ঘদিন অফিসে গিয়ে কলম পিষেছে। পিষে পিষে ক্লান্ত। এখন তাই বেলা পর্যন্ত নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। ভুবনবাবু দু-হাতে চোখ কচলে আবার ক্যালেন্ডারের তারিখ দেখলেন। না, ভুল হয়নি। আজ আঠাশ তারিখই বটে। গোটা বাড়িতে এই একটাই ক্যালেন্ডার। বড়ো বড়ো করে তারিখ ছাপা। খাটে বসেও দেখা যায়। ক্যালেন্ডারের ওপরেই ঘড়ি টাঙানো। সেখানেও আঠাশ। ছ-টা বেজে আঠাশ। এটা আসল সময় নয়, আসল সময় হল ছ'টা কুড়ি। এই ঘড়ি আট মিনিট আগে চলে। নানাভাবে সারানোর চেষ্টা হয়েছে, লাভ হয়নি। ভারতীদেবী বলেছিলেন, 'ঘড়িটা ফেলে দেবে!'

ভুবন সরখেল অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'ফেলে দেব! কেন? ফেলে দেব কেন?'

ভারতীদেবী বললেন, 'ফাস্ট চলা ঘড়ি রেখে লাভ কী? যখন তোমার অফিস ছিল তখন একটা মানে ছিল। হাতে এক্সট্রা সময় পাওয়া যেত। এখন এক্সট্রা সময় দিয়ে কী হবে?'

ভুবনবাবু শান্ত গলায় বললেন, 'অবশ্যই মানে আছে। প্রতিটা মুহূর্তেরই দাম আছে ভারতী। অফিস নেই বলে সময়ের দাম থাকবে না এ কেমন কথা! আট মিনিটের দাম অনেক।'

ভারতীদেবী ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, 'লেকচার বন্ধ কর তো। রিটায়ারমেন্টের পর থেকে এই এক নতুন ধ্যাষ্টামো শুরু হয়েছে। ছিলে অফিসার, হয়ে গেলে ফিলজফির প্রফেসর!'

ভুবনবাবু এসব ক্ষেত্রে থমকে যান। আর পাঁচজন পুরুষমানুষের মতো স্ত্রীর ঝাঁঝের কাছে মুখ না-খোলার 'কমন পথ' তিনিও সযত্নে রক্ষা করে চলেন। সেদিন পরিস্থিতি হালকা করার জন্য হেসে বললেন, 'আজ বুঝতে পারছ না ভারতী, সেদিন বুঝতে পারবে।'

ভারতীদেবী ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কোনদিন?'

'আমার চলে যাওয়ার দিন।'

'চলে যাওয়ার দিন মানে!' ভারতীদেবীর ভুরু আরও কুঁচকে গেল।

ভুবনবাবু স্মার্ট হাসার চেষ্টা করলেন।

'আরে বাবা, একদিন তো যেতে হবে। তোমাদের সবাইকে গুড বাই বলে বিদায় নেব না?'

ভারতীদেবী মুখ ঘুরিয়ে 'ফোঁস' ধরনের আওয়াজ করলেন।

ভুবনবাবু সেই আওয়াজ তুচ্ছ করে হেসে বললেন, 'তখন আট মিনিট এক্সট্রা পাব। যমরাজকে বলব, ভাই, এখনো কিন্তু সময় হয়নি। আমার ঘড়ি ফাস্ট আছে। লাস্ট মোমেন্টে আট মিনিট কোনো হেলাফেলার বিষয় নয় ভারতী। ধর তোমার বড়ো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে পৌঁছোতে পারেনি। বাবা ক্রিটিকাল শুনে ছেলে অফিস থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু ফেঁসেছে জ্যামে। ছোটো মেয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে আসার প্লেন ধরেছে...।'

ভারতীদেবী এবার ঝাঁঝের বদলে ধমক দিলেন।

'চুপ কর। এইসব বোকা রসিকতাগুলো বিকেলে তোমার বুড়োদের আড্ডায় গিয়ে করবে। হাততালি পাবে। আজই আমি ঘড়ি সরিয়ে ফেলব।'

ভুবনবাবু চুপ করে গেলেন। কিন্তু আট মিনিট আগে চলা ঘড়ি সরানো হয়নি। কে জানে, হয়তো 'লাস্ট মোমেন্ট'-এর কথাটা ভারতীদেবীর মাথায় ঢুকে গেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভুবনবাবু। ঘড়ি আগে পরে চলতে পারে, ক্যালেন্ডারের সে সমস্যা নেই। সে যা বলে ঠিক বলে। আজ আঠাশ মানে আজ আঠাশই...মানে আজ...। কী আশ্চর্য নিজেই ভুলে বসেছিলেন! ভারতীর কি মনে আছে? ঘুমন্ত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন ভুবনবাবু। মনে হচ্ছে না আছে। ভারতীদেবী একসময় সুন্দরী ছিলেন। অনেকেই ভাবে বয়স হলে মেয়েদের সৌন্দর্য কমে যায়। ঘটনা সত্যি নয়। বয়স বাড়লে মেয়েরা আর একরকম সৌন্দর্য পায়। সেই সৌন্দর্যে এক ধরনের ঝলমলে ভাব থাকে। ভারতীদেবীর বেলাতেও তাই হয়েছে। দিনের প্রথম আলোয় তাকে ঝলমলে লাগছে। ভুবনবাবু অবশ্য এখন স্ত্রীর সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। তাঁর মাথাব্যথা আঠাশ এপ্রিল নিয়ে।

ভুবনবাবু দ্রুত খাট থেকে নামলেন। চোখ-মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে চেয়ারে

বসলেন। রোজই বসেন। দোতলার এই বারান্দা থেকে রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়। এই সময় বিদিশা বুম্বাকে স্কুল বাসে তুলে দিতে বেরোয়। লোহার গেট খুলে সে মাথা তুলে শ্বশুরমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। মায়ের দেখাদেখি ক্লাস ফোরের বুম্বাও ঘাড় তুলল। চিৎকার করে বলল, 'গুড মর্নিং দাদু'। ভুবন সরখেল হাত নাড়লেন। কিন্তু উৎসাহ পেলেন না। তিনি নাতির মুখ থেকে 'গুড মর্নিং'-এর থেকে বেশি কিছু শুনতে চেয়েছিলেন। বুম্বার মনে না-থাক, বিদিশারও কি আজকের দিনটা মনে নেই! নিশ্চয়ই নেই, থাকলে সে তো তার ছেলেকে বলত। এসব তো মায়েরাই ছেলে-মেয়েকে শেখায়।

'সকালেই কিন্তু তুমি দাদুকে হ্যাপি বার্থ ডে বলবে।'

বুম্বা চোখ বড়ো বড়ো করে বলবে, 'কাল দাদুর বার্থ ডে নাকি মা!'

'হ্যাঁ, সোনা। কাল আঠাশে এপ্রিল।'

বুম্বা অবাক গলায় বলবে, 'হোয়াট ইজ আঠাশে মা?'

'আঠাশে হল টুয়েন্টি এইটথ।'

'বার্থ ডে-তে দাদুকে কী গিফট দেব?'

বিদিশা জিব কাটবে। বলবে, 'এই রে আমার যে কোনো গিফট কেনা হয়নি সোনা। ঠিক আছে. তুমি স্কুলে গেলে আমি কিনে রাখব। স্কুল থেকে ফিরে এসে দাদুকে দেবে। সকালে শুধু হ্যাপি বার্থ ডে বললেই হবে।'

'হ্যাপি বার্থ ডে বলার জন্য আমি কি দোতলায় যাব? নাকি নীচ থেকেই বলব?'

বিদিশা বলবে, 'দোতলায় গিয়ে বলতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু আমার মনে হয় না, তুমি সেটা পারবে। রোজকার মতো কালও তুমি স্কুলে লেট করবে। তুমি বরং নীচ থেকে বলে দিয়ো, দাদু তো ওই সময় বারান্দায় এসে বসে। স্কুল থেকে ফিরে একেবারে গিফট নিয়ে দাদুর কাছে যাবে।'

এ ধরনের কোনো কথাবার্তা হয়েছে বলে মনে হল না। হলে বুম্বা অবশ্যই কিছু বলত। বিদিশাকে দোষ দেওয়ার কোনো মানে নেই। সে পরের বাড়ির মেয়ে। শ্বশুরমশাইয়ের জন্মদিন ভুলে যাওয়াটা তার পক্ষে আশ্চর্যের কিছু নয়। উজ্জ্বলের কাল রাতে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। উজ্জ্বল তো আর পরের বাড়ির ছেলে নয়।

'কাল কত তারিখ মনে আছে তো বিদিশা?'

'তারিখ! কীসের তারিখ?'

'বাঃ, এর মধ্যে ভুলে গেলে! কাল আঠাশ। বাবার জন্মদিন।'

'ইস একদম ভুলে গেছি।'

'এটা ঠিক নয় বিদিশা। ছোটো মানুষ আর বুড়ো মানুষের জন্মদিন ভুলে যাওয়া অন্যায়। মাঝারিদের কথা মনে না-রাখলেও চলে।'

'ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে, নইলে একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হত। কী করি বল তো?'

উজ্জ্বল হাই তুলে বলবে, 'করবার আর কী আছে? প্রতিবার যা কর তাই

করবে। সকালে মনে করে একটা প্রণাম করলেই বাবা খুশি হবে। দুপুরে স্পেশাল মেনু করবে। মায়ের সঙ্গে কথা বলে নিয়ো।'

ভুবনবাবু আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। না, ছেলেও তার স্ত্রীকে এ-রকম কিছু বলেছে বলে মনে হচ্ছে না। ছেলেও ভুলে গেছে! ভারতীদেবী দু-হাতে চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এলেন। এটা তার বহু বছরের অভ্যেস। আগে উঠুন বা পরে, দিনের প্রথম চা নিজের হাতে বানাবেন।

'নাও ধর।'

ভুবনবাবু হাত বাড়িয়ে কাপ নিয়ে একটু উৎসাহ বোধ করলেন। প্রতি বছরের মতো ভারতী নিশ্চয় এবার বলবে, 'তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বাজার যাও।'

ভুবনবাবু জানেন, তবু অবাক হওয়ার ভান করে বলবেন, 'বাজার! কেন আমি বাজার যাব কেন? তোমার ছেলে কি বাড়ি নেই? সে-ই তো বাজার করে। ওর শরীর খারাপ নাকি?'

ভারতীদেবী বিরক্ত হবেন। বলবেন, 'না, শরীর খারাপ নয়। আজ উজ্জ্বল নয়, তুমি বাজারে যাবে। মাছ, মাংস, দুটোই নেবে। সঙ্গে চিংড়ি। মাঝারি সাইজের। নারকোল দিয়ে মালাইকারি করব। একটা নারকোলও আনবে। তোমার বড়ো মেয়ে-জামাই চিংড়ি খেতে ভালোবাসে।'

ভুবনবাবু মনে মনে খুব খুশি হবেন। সেই খুশির ভাব গোপন করে বলবেন, 'কী ব্যাপার বল তো ভারতী? মাছ, মাংস, চিংড়ি! আজ ব্যাপারটা কী? তার ওপর আবার বলছ মেয়ে খাবে? বিনু আসবে নাকি?'

ভারতীদেবী স্বামীর দিকে তাকাবেন। তারপর চোখ বড়ো করে কঠিন গলায় বলবেন, জান না আজ কী! ন্যাকামি হচ্ছে? প্রতি বছরই তো বিনু এইদিনে দুপুরে খায়। এবার তোমার জামাইও খাবে। বলেছে, বিনুকে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় খেয়ে যাবে।'

ভুবনবাবু একটা হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর গায়ে রাখবেন। বলবেন, 'বিশ্বাস কর, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। বিলিভ মি। আজ কী?' ভারতীদেবী এবার হেসে ফেলবেন। বলবেন, 'আজ আমার মুণ্ডু। আজ ভুবন সরখেল নামে এক বুড়োর জন্মদিন।' কিন্তু ঘটল অন্যরকম। বাজারের কথা মুখেও আনলেন না ভারতীদেবী। চায়ের কাপ নামিয়ে স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'ভাবছি বিনুর ওখানে গিয়ে আজ থাকব।'

ভুবন সরখেল শুকনো গলায় বললেন, 'হঠাৎ বিনুর ওখানে গিয়ে আজ থাকবে কেন?'

'হঠাৎ-এর কী আছে! মা মেয়ে-জামাইয়ের কাছে গিয়ে থাকতে পারে না? তার জন্য আগে চিঠি পাঠাতে হবে নাকি? সিঙ্গাপুর বা সানফ্রান্সিসকো তো নয়, যাব তো বরানগর। আগে ঢাক পেটানোর কী আছে?'

ভুবনবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম কোনো অকেশন-টকেশন আছে বোধ হয়।'

ভারতীদেবী রাগ রাগ গলায় বললেন, 'আজ আবার কী অকেশন থাকবে? আমার থাকাটাই অকেশন।' ভুবনবাবু বুঝলেন দুম করে অকেশনের কথাটা বলা ঠিক হয়নি। আসলে নিজের জন্মদিন বলে 'অকেশন' কথাটা মাথায় ঘুরছে। তিনি খানিকটা উদাসীন গলায় বললেন, 'ঠিক আছে যাও।'

ভারতীদেবী মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে যাও মানে! এমনভাবে বলছ যেন পারমিশন দিচ্ছ? তুমি হ্যাঁ বললেও যাব, না বললেও যাব।'

ভুবনবাবু গোপনে লম্বা শ্বাস টানলেন। না, ভারতীরও তারিখ মনে নেই। মনে থাকলে সে এভাবে সাত সকালে ধমক দিয়ে দিয়ে কথা বলত না। স্বামীকে সবদিন ধমক দেওয়া যায়, জন্মদিনে দেওয়া যায় না।

'তুমি অমন করে কথা বলছ কেন?'

ভারতীদেবী চিবিয়ে বললেন, 'কীভাবে বলছি?'

ভুবনবাবু শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিক আছে কিছু ভাবেই বলছ না। বিনুর ওখানে কখন যাবে?'

'ভাবছি একটু পরেই।'

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভুবনবাবু বললেন, 'একটু পরেই!'

ভারতীদেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন একটু পরে গেলে অসুবিধে কী? তুমি তো আর যাচ্ছ না, যাচ্ছি আমি। ভালোই হল। এখন কেবল ভোরবেলা শুয়ে শুয়ে জীবনের হিসেব কর, আমি চলে গেলে সারাদিনই চিত হয়ে শুয়ে জীবনের হিসেব করবে। কেউ বিরক্ত করবে না।'

কথা শেষ করে বারান্দা ছেড়ে চলে গেলেন ভারতীদেবী। সম্ভবত এই সাত সকালেই বড়ো মেয়ের বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হতে গেলেন। গায়ে পাঞ্জাবি দিয়ে শুকনো মুখে একতলায় নেমে এলেন ভুবনবাবু। মনটা আরও খারাপ লাগছে। নিজের স্ত্রী যদি জন্মদিন মনে না-রাখে তাহলে মন খারাপ হওয়ারই কথা। অথচ গত বছর পর্যন্ত এ-রকমটা হয়নি। হইচই না-হোক, প্রতি বছরই সবাই মিলে জমিয়ে ভাত মাংস খাওয়া হয়েছিল। গত বছর বড়ো ট্যাংরা ছিল। সরষে মাখা। শেষে ছিল দই। ঘুরে ঘুরে দই খেতে গিয়ে বিনুর মেয়েটা কাচের বাটি ভেঙে ফেলল। বিনু মারল এক চড়। মেয়ে জুড়ে দিল কান্না। সবাই ভাবল চড়ের জন্য মেয়ে কাঁদছে। মেয়ে চোখের জল মুছে জানাল, চড় নয়, সে কাঁদছে দইয়ের শোকে। নতুন করে বাটিতে দই দেওয়ায় তার কান্না থেমে গেল। মাত্র এক বছরের মধ্যে ভারতী বেমালুম সব ভুলে গেল! আশ্চর্য! একবার মনে করিয়ে দিলে কেমন হয়? কী বলতে হবে?

'ভারতী, আজ আঠাশে এপ্রিল। আজ আমার জন্মদিন তোমার মনে নেই?'

না না সে বড়ো লজ্জার হবে। যদি বলে, 'তাতে কী হয়েছে? পঁয়ষট্টি বছরের মানুষের আবার জন্মদিন কীসের? অনেক দিন হয়েছে, আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি আর নয়।'

ওসবের দরকার নেই। তার থেকে একতলায় গিয়ে বসা যাক। সিঁড়ির মুখে বিদিশার সঙ্গে দেখা হল ভুবনবাবুর। মুখটা হাসি হাসি করে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর পুত্রবধূটি চমৎকার মেয়ে। আধুনিক যুগের লেখাপড়া জানা মেয়ে হলে কী হবে, বড়োদের জন্য মনে ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। ভুবনবাবু খুব আশা করেছিলেন, তাঁর সামনে এসে ঝপ করে নীচু হয়ে মেয়েটা প্রণাম করে বলবে, 'শুভ জন্মদিন বাবা।'

দ্রুত দু-পা সরে যাবেন ভুবনবাবু। হেসে বলবেন, 'আহা, কর কী, কর কী মা?'

বিদিশা হেসে বলবে, 'ভালো দিনে ভালো দেখে একটা আশীর্বাদ করুন দেখি।'

কিছুই হল না। বিদিশা মুখ নামিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল হড়বড়িয়ে। মুখটা থমথমে মনে হল। শ্বশুরের দিকে ফিরেও তাকাল না সে। ড্রয়িংরুমে ঢুকতে ছেলের সঙ্গে দেখা, দেখা ঠিক নয়। কারণ উজ্জ্বলের হাতে খবরের কাগজ খোলা। মুখ দেখা যাচ্ছে না। ইচ্ছে করেই গলা খাঁকারি দিলেন ভুবন সরখেল। উজ্জ্বল একটু নড়েচড়ে বসল মাত্র। মুখ বের করল না। বুড়ো বাবার জন্মদিন নিয়ে ধেড়ে ছেলে কখনোই বাড়াবাড়ি করবে না। তবে দেখা হলে বলবে, 'এসো বাবা। চা খেয়েছ? বিদিশাকে আর এক কাপ করে দিতে বলি? কাল রাতে টিভিতে খেলা দেখলে নাকি?'

আবার গলা খাঁকারি দিলেন ভুবনবাবু। অনিচ্ছা নিয়ে উজ্জ্বল কাগজ থেকে মুখ সরাল। তার মুখও লাল। মনে হচ্ছে কোনো কারণে রাগ হয়েছে। ব্যাপার কী! বিদিশার সঙ্গে ঝগড়া?

'কিছু হয়েছে নাকি উজ্জ্বল?' আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন ভুবনবাবু।

উজ্জ্বল থমথমে গলায় বলল, 'কী আর হবে? সংসারে যা হয় তাই হয়েছে। রান্নার মাসি অ্যাবসেন্ট। তাই শুনে মা নাকি এখনই দিদির বাড়ি কেটে পড়বার প্ল্যান করেছে। বিদিশার ঘাড়ে সব ঝামেলা পড়েছে। সে বলছে, সেও থাকবে না। বাপের বাড়ি চলে যাবে। বুম্বাকে স্কুল ছুটির পর নিয়ে ওখান থেকেই নাকতলা রওনা দেবে।'

না, এরা কেউই আঠাশ এপ্রিলের কথা মনে রাখেনি। রাখলে সামান্য একটা রান্নার মাসিকে নিয়ে মনোমালিন্য হতে পারে না। সংসার মনে রাখতে দেয়নি। কোন্‌টা বড়ো? হেড অব দ্য ফ্যামিলির জন্মদিন মনে রাখাটা, না রান্নার মাসির কামাই?

'তুই বাজারে গিয়েছিলি উজ্জ্বল?'

উজ্জ্বল হাতের কাগজটা সামনের টেবিলে ছুড়ে ফেলে গজগজ করতে করতে বলল, 'বাজারে গিয়ে কী হবে? রান্না করবে কে? সবাই তো বাইরে। আমি ভাবছি অফিসে লাঞ্চ করে নেব। রাতে নাকতলা থেকে খেয়ে ফিরব। বিদিশাকে বলেছি, তোমার জন্য দু-বেলাই হোম সার্ভিসে খাবার বলে দিতে। খেতে পারবে না? ডাল, তরকারি, লাইট মাছের ঝোল বলব।'

জন্মদিনে লাইট মাছের ঝোল! মানে ট্যালটেলে! ঠোঁটের কোনায় মুচকি

হাসলেন ভুবন সরখেল। একজন পঁয়ষট্টি বছরের মানুষের জন্মদিন সংসারের কাছে কতটা অবহেলার, কতটা তাচ্ছিল্যের হলে এ-রকম হয়? ভাবতে ভাবতেই মনকে শক্ত করলেন ভুবনবাবু। এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক।

'না, অসুবিধে হবে কেন? তুই বিদিশাকে বলে দে, ও যেন বেরোনোর আগে অর্ডার দিয়ে যায়।'

উজ্জ্বল মুখ নামিয়ে বলল, 'থাক, আমিই ফোনে বলে দিচ্ছি। পোনা মাছের ঝোল বলি? বেগুন ভাজা বলব?'

গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে, পায়ে চটি গলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন ভুবন সরখেল। রাস্তায় ঘুরলেন এলোমেলো। তার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। চিংড়ি মাছের মালাইকারি না পোনা মাছের ঝোল বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হল, মাত্র একটা বছরের মধ্যে এতগুলো মানুষের বিস্মরণ। বেঁচে থাকতে থাকতেই বেমালুম এরা একটা তারিখ ভুলে গেল, মরে গেলে তো মানুষটাকে ভুলতে এক বছরও সময় নেবে না। এরা কেউ দূরের মানুষ নয়। সবাই কাছের। সবাই প্রিয়। তাহলে কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক-পালটায়? নাকি ইচ্ছে করেই অবজ্ঞা শুরু হল? এতদিন এত কষ্ট করে কষা হিসেবে যে বিরাট গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!

ভুবনবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন ততক্ষণে ভারতীদেবী বেরিয়ে গেছেন। ছেলে অফিসে রওনা দিয়েছে। খানিক পরে বিদিশাও ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল। পাড়ার মোড়ের হোম সার্ভিস হটকেসে খাবার দিয়ে গেল বারোটার আগেই। রান্না খারাপ নয়। মশলাপাতির ঝামেলা নেই। শুধু মাছের ঝোলে নুন দিতে ভুলে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে নুনহীন জন্মদিন কাটাতে কাটাতে ভুবন সরখেল মনে মনে কামনা করলেন, অনেক হয়েছে। পরের জন্মদিনটা যেন আর দেখে যেতে না হয়। এই অপমান অসহ্য।

দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ভুবনবাবু। বিকেলে ঘুম ভাঙল কলিং বেলের আওয়াজে। একতলায় নেমে দরজা খুলতেই দেখলেন, ছোটো মেয়ে মিনু। হাতে সুটকেস। সুটকেসে প্লেনের কাগজ ঝুলছে। বুকটা আনন্দে ধক করে উঠল। নিশ্চয় বাবার জন্মদিনের জন্য ব্যাঙ্গালোরের অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে। কিন্তু তা বলে একেবারে প্লেনে করে এল! গাদাখানেক টাকা গেল তো। ছি ছি। এটা খুবই বাড়াবাড়ি হয়েছে। এসব ওর দাদা-বউদির প্ল্যান নয় তো?

'তুই মিনু!'

'না বাবা, আমি মিনু নই, আমি মিনুর ভূত। নাও সর, বাড়িতে ঢুকতে দেবে তো?'

সরে দাঁড়িয়ে মেয়েকে ঢুকতে দিলেন ভুবনবাবু।

মিনু মুচকি হেসে বলল, 'কেন এসেছি বল তো বাবা?'

'কী করে বলব?' লজ্জা লজ্জা গলায় বললেন ভুবন সরখেল।

'প্রিয়ার বিয়ে। প্রিয়াকে মনে আছে? আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত? মনে নেই।

গাধাটা একেবারে প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে। পরশু রাতের গাড়িতে মালদা যাব।'

বুকের ধুকপুকানি থেমে গেল ভুবনবাবুর। না, সত্যি তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। একটু বাড়াবাড়ি নয়, বেশি বাড়াবাড়ি। মনে হচ্ছে মাথায় গোলমাল হচ্ছে। নইলে বাবার জন্মদিন উপলক্ষে মেয়ে প্লেনে করে উড়ে আসবে, এ-রকম উদ্ভট কথা ভাবলেন কীভাবে?

'মা কোথায়?'

'বিনুর কাছে। আজ থাকবে।'

'কেন?'

ভুবনবাবু দোতলায় উঠতে উঠতে গম্ভীর গলায় বললেন, 'জানি না। মনে হয়, রান্নার লোক কামাই করেছে তাই।'

'যা বাবা, খবর না-দিয়ে এসে ভাবলাম সারপ্রাইজ দেব। যাক, কিছু বলতে হবে না। সন্ধেবেলা আমিও দিদির বাড়ি চলে যাব। এখন একটা টেনে ঘুম দিই।'

ভুবনবাবু ঠিক করেছিলেন, আজ বৈকালিক ভ্রমণে বের হবেন না। ঘরে বন্দি থাকবেন। পরিতোষ হাজরা জোর করে নিয়ে গেলেন। পার্কের বেঞ্চে বসে নীচু গলায় তাঁকে সব বললেন। মনের দুঃখের কথা বলার মতো আর কে আছে?

'এই তো জীবনের হিসেব পরিতোষ। এখন জন্মদিন ভুলছে, মরে গেলে মানুষটাকেই ওরা ভুলে যাবে।'

'তুমি এত আপসেট হচ্ছ কেন ভুবনদা? বুড়ো মানুষের আবার ওসব হয় নাকি! জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী এসব তো ছেলেপিলেদের অনুষ্ঠান। তোমার বাড়ির সবাই নেহাত খুব ভালো, তাই এতদিন করেছে। এবার স্টপ করাই ভালো।'

'কথাটা ঠিকই বলেছ। কিন্তু সমস্যাটা কোথায় জান পরিতোষ? সমস্যা তোমার হিসেবে। এতদিন একরকম হিসেব করেছিলাম। ভেবেছিলাম, ছেলে মেয়ে, বউমা চমৎকার। এখন দেখছি, সেই হিসেবেও ওলটপালট হয়ে গেল। সময় এসে যোগ বিয়োগে গোল বাধিয়ে দিয়েছে। তাই অসুবিধে হচ্ছে। যাই হোক, একটা-না-একটা দিন তো এটাই হত। শুরু হয়ে ভালোই হয়েছে।'

পরিতোষবাবু মিটিমিটি হাসলেন। ভুবন সরখেল বললেন, 'তুমি হাসছ?'

'হাসব না? জন্মদিন নয়, কথাটা ভুলে যাওয়া। আমি নিশ্চিত ওরা সবাই ইচ্ছে করে ভুলেছে। একদিন আমি বলে যে একটা মানুষ বাড়িতে থাকি সেটাও ভুলে যাবে।'

বড়ো করে নিশ্বাস ফেললেন ভুবনবাবু।

'এ তো অভিমানের কথা।'

ভুবনবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'হয়তো তাই। কাল থেকে নতুন করে হিসেব শুরু করব। শেষ হওয়ার হিসেব।'

ভুবনবাবু উঠতে গেলে আরও বেশ খানিকটা সময় জোর করে আটকে

রাখলেন পরিতোষবাবু। একসময় বললেন, 'চল এবার ফিরি। সন্ধে হল। আমার আজ আবার একটা নেমন্তন্ন আছে।'

সন্ধে কি মন খারাপের? নাকি আনন্দের? জীবনের হিসেব কী বলে? কিছুই বলতে পারে না। দিন ফুরিয়ে যাওয়ার মন খারাপের সঙ্গে থাকে ঘরে ফেরার আনন্দ। জীবনের হিসেব জটিল হয়ে যায়। সব অঙ্ক জট পাকিয়ে যায়। যেমন জট পাকিয়ে গেল ভুবন সরখেলের।

তিনি বাড়ির কাছাকাছি এসেই দেখতে পেলেন, ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। ভেসে আসছে হইচই। কে জ্বেলেছে এত আলো! কারা এসেছে! সদর দরজা খুলেই থমকে গেলেন চৌষট্টি শেষ করা ভুবন সরখেল। রঙিন কাগজের মালা, রঙিন বেলুনে ড্রয়িংরুম সাজানো। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, জামাই, নাতিনাতনিরা সবাই রয়েছে। টেবিলে একটা ইয়া বড়ো কেক! স্টিরিয়োতে গান বাজছে। বাংলা গান নয়। জগঝম্প হিন্দি গান। হুড়োহুড়ি, লাফালাফি চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। ঘরে পা দিতেই নাতিনাতনি চিৎকার করে উঠল—'হ্যাপি বার্থ ডে।'

দেখ কাণ্ড! ভুবনবাবু হাসতে হাসতে চোখের জল লুকোলেন।

অনেক রাতে ভারতীদেবী বললেন, 'তুমি একটা বোকা। আমরা যে এত প্ল্যান করেছিলাম, কিছুই বুঝতে পারনি? তোমাকে চমকে দেব বলে সব ঠিক হয়েছিল। যখন তুমি ভাববে আমরা তোমার জন্মদিন নিয়ে কিছু করব না, তখনই সব হবে। আসল প্ল্যান বিদিশার। মিনুকে টেলিফোনে জানাতে সে বলল, আমিও কলকাতা যাব। কদিন পরে প্রিয়ার বিয়ে, বিয়েটাকেও জুড়ে নেব। বিশাখা, আমি আর বিনু সারাদিন বিনুদের বাড়িতে রান্না করেছি। তুমি যখন পার্কে ছিলে ঘর সাজিয়েছে মিনু। পার্কে তোমাকে আটকে রেখেছেন পরিতোষবাবু। কেক এনেছে উজ্জ্বল।'

'বাপ রে পরিতোষও এই ষড়যন্ত্রে আছে! ওকে কখন নেমন্তন্ন করলে?' ক্যাবলা হেসে বললেন ভুবন সরখেল।

'দু-দিন আগে। শুধু বলেছিলাম, খবরদার, আপনার বন্ধু যেন জানতে না পারে। আপনি শুধু একটু বেশি সময় পার্কে ধরে রাখবেন। আমরা এসে ঘর সাজিয়ে ফেলব। কী এবার অভিমান গেছে?'

পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে পৌঁছে একজন পুরুষমানুষ কি ভালোবেসে তার স্ত্রীর হাত ধরে খানিকক্ষণ বসে থাকতে পারে? নিয়ম কী বলছে? ভুবনবাবু স্ত্রীর হাত ধরে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তোমাদের সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি।'

ভুবন সরখেল জীবনের হিসেবনিকেশ বন্ধ করে দিয়েছেন। আঠাশ এপ্রিলের পর উনি বুঝেছেন এটার কোনো দরকার নেই। এটার কোনো মানে হয় না।

বকুল



গল্পটা কোনখান থেকে শুরু করব? আগে থেকে? পরে থেকে? নাকি এখন থেকে? কোনটা হলে ঠিক হবে?

যদি 'এখন' থেকে বলি তাহলে শুরুটা একরকম হবে। যদি 'আগে' বা 'পরে' থেকে বলতে যাই তাহলে হবে অন্যরকম। অনেকে বলে, গল্প যেখান থেকেই 'শুরু' হোক না কেন, একই থাকে। আমি মানি না। আমার মনে হয়, গল্পের শুরু গল্প সম্পর্কে একধরনের ধারণা তৈরি করে। সেই ধারণা যেমন ঠিক হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে। সবথেকে বিপদ ঘটে যখন ধারণা হয় বিভ্রান্তিকর। আসল গল্পকে সে গুলিয়ে দেয়।

বিষয়টা কি একটু জটিল হয়ে যাচ্ছে? মনে হচ্ছে, যাচ্ছে। একটা উদাহরণ দিলে খানিকটা সহজ হতে পারে। ধরা যাক, 'আগে' থেকে আমার এই গল্প শুরু হল।

আমার স্বামীর নাম রঞ্জন। রোজ অফিসে বেরোনোর সময় সে আমাকে চুমু খায়। আমিও তাকে চুমু খাই। আমি ভাজাভুজি ভালোবাসি। রঞ্জন আমার জন্য চপ কাটলেট কিনে বাড়ি ফেরে। দুপুরবেলা খাওয়ার পর শেষপাতে একটু দই পেলে রঞ্জন খুশি হয়। মিষ্টি দই নয়, সাদা দই। আগে কেনা দই খেত। কোনোদিন পেত, কোনোদিন পেত না। এখন আমি নিজেই বাড়িতে দই বসাই। রঞ্জন খুশি মনে খায়। শেষ হওয়ার পরও বলে, 'আর একটু হবে নাকি?' আমি জানি ও চাইবে তাই সবসময়েই একটু সরিয়ে রাখি। হেসে বলি, 'না, হবে না। ফুরিয়ে গেছে।' তারপর এনে দিই।

রঞ্জন প্রায়ই আমার জন্য এটা সেটা কিনে আনে। কোনো দিন শাড়ি, কোনোদিন ব্যাগ, কোনোদিন ইমিটেশনের গয়না। জিনিস ভালো হয় না। কোয়ালিটি বাজে, দাম বেশি। রঞ্জন আহ্লাদি মুখ করে বলে, 'সুন্দর হয়েছে না?'

আমি হেসে বলি, 'হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে।'

আমিও রঞ্জনের জন্য কেনাকাটা করি। স্ট্রাইপ শার্ট পরলে ওকে হ্যান্ডসাম

লাগে। সরু স্ট্রাইপ। আমি ওর জন্য স্ট্রাইপ শার্ট কিনি। পরিয়ে দেখি। এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। আমি কোথাও গেলে রঞ্জন বার বার ফোন করে।

'বকুল, কোথায় তুমি?'

'এই তো আসছি।'

'অনেকক্ষণ থেকেই তো আসছি আসছি বলছ। আসছ কই?'

'ওরে বাবা, আর একঘণ্টার মধ্যে চলে যাব।'

'একঘণ্টা! বল কী! সে তো অনেকক্ষণ। আমি অতক্ষণ একা থাকব?'

কোন কোনোদিন রঞ্জনও অফিস থেকে ফিরতে দেরি করে। আমি অস্থির হয়ে পড়ি। আজকাল রাস্তাঘাটে গোলমাল হয়। এই তো ক-দিন আগে মুম্বাইতে কী কাণ্ড হল। কলকাতায় হবে না তার কী গ্যারান্টি? চিন্তা হয়। আমি রঞ্জনের জন্য ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। রঞ্জন রাত করে আসে। দরজা খোলার পর, ঘরে ঢুকেই ঘেমো গায়ে আমাকে জাপটে ধরে। আমি ঠেলে সরিয়ে দিই। নাক মুখ কুঁচকে বলি, 'মাগো! যাও আগে বাথরুমে ঢোকো।'

'বাথরুম থেকে এলে হবে তো?'

আমি ডান হাত মুঠো করে কিল দেখিয়ে বলি, 'মার হবে।'

গল্পের এই 'শুরু' থেকে কী মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে, আমার আর রঞ্জনের জীবন সুখে ভালোবাসায় একেবারে মাখামাখি। ভবিষ্যতেও আমরা এই মাখামাখি জীবন কাটাব। তাই তো?

গল্প কিন্তু মোটেও তা নয়। একেবারেই অন্যরকম। বিয়ের দিন থেকেই রঞ্জনকে আমার অসহ্য লাগতে শুরু করে। স্ত্রীর প্রতি তার এই গদগদ প্রেম দেখলে আমার বমি পায়, মাথায় আগুন জ্বলে। আরও কিছুদিন পর বুঝতে পারি, তাকে আমি ঘৃণা করছি। গল্পের 'শুরু' সেটা বুঝতে দেয়নি। সে বিভ্রান্ত করেছে। অনেকক্ষণ ধরে আমার সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা তৈরি করেছে। সেই ধারণা হল, আমি একজন ভালো মেয়ে। চমৎকার বউ। অথচ এই গল্পটাই যদি 'পরে' থেকে শুরু হত তাহলে ধারণাটা হত উলটো।

তখন 'শুরুটা হত এ-রকম—

রঞ্জন আজ দেরি করে অফিস থেকে ফিরবে। খানিক আগে সে আমাকে ফোন করেছিল। তার জন্য মোবাইলে 'অ্যাসাইন টোন' আলাদা। রবীন্দ্রসংগীত।

'ওলো, রেখে দে, সখী, রেখে দে—/মিছে কথা ভালোবাসা।/সুখের বেদনা, সোহাগযাতনা—/বুঝিতে পারি না ভাষা।'

মায়ার খেলার গান। আমার ভালো লাগে না। রঞ্জনের আবার মায়ার খেলা খুব পছন্দের, সেই কারণেই গানটা রাখা। গানটা জোগাড় করে রিং টোনে লাগিয়ে রঞ্জনকে শোনালাম। রঞ্জন ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি মায়ার খেলার গান রাখলে কেন? তোমার তো মায়ার খেলা পছন্দের নয়!'

আমি হেসে বললাম, 'তোমার ভালো লাগে তাই।'

রঞ্জনও হাসল। বলল, 'লাভ কী? আমি তো আর শুনতে পাব না। তোমাকে বাইরে থেকে ফোন করব। বকুল, তুমি বরং এমন ব্যবস্থা কর যাতে গানটা ভেতরে বাজে। আমি ফোন করতে করতে শুনব। আমার ভালো লাগবে।'

আমি গাঢ় গলায় বললাম, 'না, তোমার ভালোলাগাটা আমার কাছে থাকবে। তোমার ভালো লাগার থেকেও সেটা জরুরি।'

মোবাইলে 'মায়ার খেলা' বাজল। আমি তাড়াতাড়ি ফোন ধরলাম।

রঞ্জন বলল, 'আজ আমার ফিরতে রাত হতে পারে বকুল। তুমি খেয়ে নিয়ো।'

আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। দেরি হবে! তাহলে রঞ্জন কি আজ বাড়িতে খাবে না? মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে নীচু গলায় বললাম, 'তুমি কি খেয়ে আসছ?'

'না, বাড়ি গিয়ে খাব। বস চেন্নাই থেকে আসছে, এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে যাব। ফ্লাইট যদি লেট হয় তাই বলছিলাম।'

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম, 'ঠিক আছে। তোমার বুকের চিনচিনে ব্যথাটা কেমন আছে?'

রঞ্জন হেসে বলল, 'দুর, ওটা কিচ্ছু না। অম্বলের ব্যথা। কখন ভ্যানিশ হয়ে গেছে।'

'তাও তুমি ডাক্তার ঘোষকে একটা ফোন করে নাও প্লিজ।'

'ছাড় তো। ডাক্তার লাগবে না।'

এবার আমি রাগের ভান করলাম।

'তুমি যতক্ষণ না ডাক্তারবাবুকে ফোন করবে ততক্ষণ আমি দু-মিনিট অন্তর অন্তর তোমাকে ফোন করে যাব। তুমি যখন এয়ারপোর্টে তোমার বসকে রিসিভ করতে যাবে, তখনো করব।'

আমার এই উদ্বেগে রঞ্জন খুশি হল। সব স্বামীই চায়, তার শরীরের ছোটোখাটো সমস্যা নিয়ে বউ উদ্বেগ দেখাক। বিষয় যত তুচ্ছ হবে, উদ্বেগ তত ভালো লাগবে। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে।

'আচ্ছা, বিপদে ফেললে তো। ডাক্তারবাবুকে কী বলব?'

আমি বললাম, 'কী আবার বলবে? বলবে, আজ লাঞ্চের পর বুকে একটা পেইন ফিল করছিলাম, কাল সকালে আপনাকে দেখাতে যাব। আপনি যদি মনে করেন, একটা ইসিজি করাব। নাও, এখনই ফোন কর। আমি কিন্তু ঠিক দশ মিনিট পরে ডাক্তারবাবুকে ফোন করে দেখব তুমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছ কিনা।'

রঞ্জন হেসে বলল, 'ওরে বাবা রে! করছি রে বাবা করছি। বিয়ে করে দেখছি বিরাট ঝামেলায় পড়লাম। বউয়ের জ্বালায় কাজকর্ম সব ডকে উঠল।'

ফোন ছেড়ে আমি সোফায় এলিয়ে পড়লাম। ঠিক দশ মিনিট পর আমি ডাক্তার ঘোষকে ফোন করব। জানতে চাইব, রঞ্জন তাকে ফোন করেছে কি না। বুকের ব্যথার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছে কি? তারপর আমি রাগ দেখাব। বলব, 'জানেন

ডাক্তারবাবু, আমি কত করে বললাম, তুমি আজ অফিসে যেয়ো না, ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে এসো। না-শুনে অফিস চলে গেল। আমার একটা কথা যদি শোনে।' ডাক্তারকে রঞ্জনের ফোনটা করাটা খুব জরুরি। এটা আমার পক্ষে মোক্ষম একটা যুক্তি তৈরি করবে। অনেকটা অ্যালিবাইয়ের মতো। প্রমাণ হবে, রঞ্জনের বুকে সকাল থেকেই সমস্যা চলছিল। রাতে তার হার্টফেল হঠাৎ হয়নি। সিমটম্ ছিল।

আসলে আমি রঞ্জনকে খুন করবার জন্য যে বিষটা ব্যবহার করব সেটার কাজকর্ম বেশ মজার। জিনিসটার কাজ কারবার সব হার্টে। রক্তের সঙ্গে মিশে সটান নিজের লক্ষ্যে পৌঁছোয়। তারপর সেখানকার ধমনিগুলো এক এক করে আটকে দিতে থাকে। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে 'ব্লক'। রক্ত চলাচল বন্ধ। ব্যাপারটা অনেকটা এ-রকম—আমি যেখানে পৌঁছেছি, সেখানে আর কারো প্রবেশের অধিকার নেই। হিংসুটে প্রেমিকার মতো। মজার না? দুপুরে রঞ্জনের বুকে হালকা ব্যথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাকে খুন করার জন্য আজকের দিনটাকে বেছে নিয়েছি। রঞ্জনের বুকের ব্যথা কিছুই নয়, নিছকই অম্বল। একটা অ্যান্টাসিড মুখে ফেলতেই ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে আমার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, ব্যথাটা কাজে লাগাব। রাতে রঞ্জনের খাবারে বিষ মেশাব। এই কারণেই দেরি করে ফিরবে বলায় চমকে উঠি। তবে বাড়িতে কি খাবে না? তাহলে বিষটা খাওয়াব কী করে? জলে মিশিয়ে খাওয়াতে সমস্যা হবে। এই বিষে একটা হালকা গন্ধ আছে। ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো। সবথেকে সুবিধে পুডিং জাতীয় কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। গন্ধ আলাদা করা যায়। আমি ঝুঁকি নেব না। রঞ্জনের জন্য পুডিংই করব। রান্নার মাসি চলে গেলে দুধ জ্বাল দেব। এই বিষের খবর অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি। সংগ্রহও করেছি ঝামেলা করে। মানুষ মারার পক্ষে জিনিস চমৎকার। পাকস্থলিতে প্রায় যায় না বললেই চলে। গেলেও দ্রুত রক্তে মেশে। ফলে পোস্টমর্টেমে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। রঞ্জনের এই কেসটায় অবশ্য পোস্টমর্টেম হওয়ার ব্যাপার নেই, ডাক্তার ঘোষকে দিয়ে আমি ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেব। উনি তো জেনেই যাচ্ছেন, রঞ্জনের হার্টে সমস্যা হয়েছে। হার্টফেল নিয়ে সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। খুনের পর ডাক্তার ম্যানেজ করাটা খুনির জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যদি মৃত্যুটাকে 'স্বাভাবিক' বলে মনে করেন, সবটা জলের মতো সরল হয়ে যায়। এই বিষের কারণে হার্টের কাজ পুরোপুরি থামতে মিনিট সাত আট সময় লাগে। শুনেছি, শেষ দিকের সময়টা খুব কষ্টের। রঞ্জনের কষ্ট আমি চোখে দেখতে পারব না। ওই সময়টা আমি থাকব ছাদে। পাশের বাড়ির রজনী মল্লিক খাওয়াদাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে পায়চারি করেন। বৃদ্ধ মানুষ। আমিও হাঁটব আমাদের ছাদে। ভদ্রলোকের সঙ্গে টুকটাক কথা হবে। এটা হবে আমার দ্বিতীয় অ্যালিবাই। রঞ্জনের মৃত্যুর সময় আমি তার ধারেকাছে ছিলাম না। ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য গত তিন সপ্তাহ ধরে আমি মাঝেমধ্যে রাতের দিকে ছাদে এসে রজনী মল্লিকের সঙ্গে কথা বলছি। আজ যখন বলব, তখন রঞ্জন নীচে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করবে। পরিকল্পনা কেমন?

আচ্ছা, এবার গল্পটা সম্পর্কে কেমন ধারণা হচ্ছে? নিশ্চয় মনে হচ্ছে, এটা একটা নিষ্ঠুর মেয়ের গল্প। মেয়েটির নাম বকুল। সে তার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করেছে। তার কাছে ভালোবাসা নামক বস্তুটির কোনো মূল্য নেই। সেই কারণেই ভালোবাসা তার অসহ্য লাগে। ভালোবাসাকে সে ঘৃণা করে। সেই ঘৃণা এতটাই যে তাকে খুন পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যেতে পারে!

না, এটাও ঠিক হল না। আমি ভালোবাসার কাঙাল। সেই ছোটোবেলা থেকেই ভালোবাসার জন্য ছটফট করেছি। আমার যখন ন-বছর বয়স আমার মা আমাকে আর বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। যে-লোকটার সঙ্গে যায় তাকে আমি খুব পছন্দ করতাম। জন্ম থেকেই তার বাড়িতে আসা যাওয়া দেখেছি। বাবার বন্ধু। মানুষটা একদিনের বেশি দু-দিন না এলে কান্নাকাটি জুড়তাম। সেই কান্নাকাটি শুনে মা মাঝেমধ্যে রেগে যেত। আমাকে দু-ঘা দিয়ে বলত, 'একটা বাইরের লোকের জন্য এত সোহাগ কীসের?' যখন শুনলাম মা সেই 'বাইরের লোক'-এর সঙ্গে চলে গেছে এবং চিঠি লিখে গেছে আর কখনো ফিরবে না তখন এতটাই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে দুঃখ করতেও পারিনি। প্রথমে আমার বাবা আমাকে আঁকড়ে ধরল। তিনবছর পর, বাবা আবার বিয়ে করল। ঠিকই করল। তখন কী আর এমন বয়স বাবার? বিয়ের স্বাদ পাওয়া পুরুষ মানুষ ওই বয়েসে বিয়ে না-করলে নানা সমস্যা হয়। বাবা ঠিকই করেছিল।

কী মনে হচ্ছে? সেই বস্তা পচা গল্প? সেই সৎ মা? সেই সৎ মায়ের অত্যাচার? খেতে না-দেওয়া, কাপড় কাচানো, ঘর ঝাট দেওয়া? না, একেবারেই তা নয়। আমার সৎ মা মানুষটা ছিলেন ভীষণ ভালো। যত ভালো হলে একটা মানুষকে ভালো বলা যায় তার থেকেও ভালো। ঢলঢলে চেহারায় এক মাথা চুল। চোখ দুটো মায়াকাড়া। একটা বেশ মজার ব্যাপার ছিল। আমার সৎ মা ছিলেন একজন 'স্নান বিলাসিনী' মহিলা। শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই অনেক আয়োজন করে স্নান করতেন। সময়ও নিতেন অনেক। গরমের সময় আগে কল খুলে জল ভরে রাখতেন বালতিতে। ছাদের ট্যাঙ্কের জল গরম, তাই ঠান্ডা করার ব্যবস্থা। শীতে আবার জল গরম করে নিতেন। প্রথম দিকে বাইরে থেকে কেটলি করে গরম জল নিয়ে বাথরুমে ঢুকতেন। পরে বাবা একটা ইলেকট্রিক তার কিনে দিল। তারের একদিকে রড। রড বালতির জলে ডুবিয়ে সুইচ দিলেই জল গরম হয়ে যেত। স্নান করার আগে আমার সৎ মা বাথরুমে ভেতরেই জল গরম বসাতেন। রোজ তেল সাবান শ্যাম্পু মাখতেন। স্নান শেষ করে বাথরুম থেকে বেরোলে ফুরফুর করে গন্ধ বের হত। তবে এসবই ছোটোকথা। বড়োকথা হল, উনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসা ছিল আমার অসৎ (সৎ-এর উলটো তো অসৎ-ই হয়)। মায়ের থেকে অনেক অনেক বেশি। মহিলা আমাকে যেন সর্বক্ষণ হাতের তেলোর মধ্যে রাখতে চাইতেন। জড়িয়ে ধরে খাওয়াতেন, জাপটে ধরে আদর করতেন। নজরে নজরে রাখতেন। চাইতে-না-চাইতে আমি হাতের কাছে সব পেয়ে

যেতাম। জামা, জুতো, খাবার, পড়ার বই, খেলার পুতুল—সব। উনি এমন সব কাণ্ড করতেন যা একজন এগারো বছরের মেয়ের জন্য ছিল বাড়াবাড়ি। ওঁর শেষ বাড়াবাড়ির গল্পটা বলি। শেষ এই কারণে যে ঘটনাটার কিছুদিনের মধ্যে উনি মারা যান। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। ইলেকট্রিক শক লেগে মৃত্যু। খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট।' লোহার বালতির সঙ্গে কীভাবে যেন জল গরম করার তার জড়িয়ে গিয়েছিল। উনি শক খেয়ে বাথরুমের ভেতরে ছিটকে পড়েন। সমস্যা হল, যেহেতু স্নানে উনি অনেকটা সময় নিতেন, তাঁর মৃত্যুর খবর বুঝতেই অনেকটা দেরি হয়ে যায়। সেই বিকেল। আমার বাবা আবার সেদিন ব্যাবসার কাজে সারাদিন কোর্টে ছিলেন। আমি স্কুলে। বাথরুমের দরজা ভেঙে ডেডবডি বের করাটাও একটা সমস্যার ছিল। একেই ইলেকট্রিক কারেন্টের ব্যাপার, তার ওপর মহিলার গায়ে কোনো জামা কাপড় ছিল না।

যাই হোক, আসল কথায় আসি। সৎ মা আমাকে নিয়ে কেমন বাড়াবাড়ি করতেন সেই কথা।

রোজই আমার স্কুলের টিফিন বক্সে একটা-না একটা মিষ্টি থাকত। কখনো সন্দেশ, কখনো দরবেশ, কখনো বড়ো জিলিপি। একদিন সৎ মা আমাকে মিষ্টি দিতে ভুলে গেলেন। টিফিনের সময় দেখি, স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর কাছে গেলাম। ওর হাতে মিষ্টির কৌটো, চোখে জল। আমি বললাম, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

উনি বললেন, 'তোমাকে মিষ্টি দিতে ভুলে গেছি সেই দুঃখে কাঁদছি।'

আমি বললাম, 'এই তো দিয়ে গেলে, এবার কান্না থামাও।'

উনি চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'থামাতে পারছি না বাবা। তোমাকে যে মিষ্টিটা এসে দিয়ে যেতে পারলাম, এখন সেই আনন্দে চোখে জল আসছে।'

এরপর থেকেই আমার কেমন যেন হতে লাগল! মহিলা কাছে এলে আমার ভালো লাগত না। শরীরে অস্বস্তি অনুভব করতাম। দমবন্ধ হয়ে আসত। উনি আমাকে আদর করলে মনে হত গলায় কেউ ফাঁস পরিয়ে দিচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম, সুন্দর মানুষটাকে আমি ভয় পাচ্ছি। তাকে এড়িয়ে যেতে শুরু করলাম। ভালোবাসার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলাম, কিন্তু ভালোবাসা সহ্য করতে পারছিলাম না। বিষয়টা কি খুবই অদ্ভুত? না, খুব অদ্ভুত নয়। এই অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। সে-কথায় পরে আসব।

যাই হোক, সৎ মায়ের মৃত্যুর পর আমি ভালোবাসার ফাঁস থেকে মুক্ত হলাম।

ও, একটা ছোটো কথা বলতে ভুলে গেছি। সেই ভয়ংকর ঘটনার দিন বাথরুম থেকে ডেডবডি সরানোর পর পুলিশ আবিষ্কার করে, জল গরম করবার ইলেকট্রিক তার এক জায়গায় ছেঁড়া। ব্লেড দিয়ে চিরলে যেমন হয় অনেকটা সে-রকম। পুলিশ নিশ্চিত হয়, লোহার বালতির কোনায় ঘষে পুরোনো তার কেটে গেছে। সেখান থেকেই সরাসরি কারেন্ট চলে এসেছে বালতি এবং জলে।

বাবা মাথা নামিয়ে বলতে লাগলেন, 'উফ, আমি যদি জানতাম...উফ আমি যদি জানতাম...।'

পুলিশ অফিসার ভালো মানুষ। সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, 'আগে থেকে যদি সব জানা যেত তাহলে তো আর অ্যাক্সিডেন্ট বলে কিছুই থাকত না। দুঃখ করবেন না, যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে।'

প্রথমে আমি একটু ঘাবড়েই ছিলাম। ব্লেডের কথাটা যদি ওঠে। না-উঠতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। যদিও তেমন চিন্তার কোনো কারণ ছিল না। কারণ জ্যামিতি বক্সে রাখা ব্লেডটা আমি স্কুলের ডাস্টবিনেই ফেলে এসেছি। ভগবান আমাকে যেমন অনেক কিছু দেননি, তেমন আবার অনেক কিছু দিয়েছেনও। ছোটো থেকেই আমি লেখাপড়া পছন্দ করি। নিজের ক্লাসের থেকেও বড়োদের বই ঘাঁটি। অঙ্ক, বিজ্ঞান আমার প্রিয় বিষয়। ত্রিভুজের কোন, বৃত্তের ব্যাসার্ধ নিয়ে পড়ে থাকতে আমার ভালো লাগে। ভালো লাগে, আলোর ছোটাছুটি, শব্দের প্রতিধ্বনি, ইলেকট্রিক কারেন্টের কেরামতি জানতে। লোহা আর জলের মধ্যে দিয়ে গেলে বিদ্যুৎ যে মানুষ মারতে পারে তা আমি বই পড়েই জেনেছি। দুনিয়ার ভালো কথা সব বইতেই লেখা থাকে। ব্লেডের দুশ্চিন্তা কেটে গেলে আমি হালকা মনে সৎ মায়ের জন্য অনেকটা সময় ধরে কাঁদতে পারলাম।

যাই হোক, একটা জরুরি কথা বলতে গিয়ে অনেক হাবিজাবি কথায় চলে গেলাম। তাহলে একটা জিনিস প্রমাণিত হল, গল্পের 'শুরু' যা-ই বলুক, আমি ভালোবাসা, স্নেহ, আদর, যত্ন পাইনি এই ধারণা ঠিক নয়।

এবার ধরা যাক, গল্পটা 'শুরু' হল 'শেষ' থেকে। তাহলে কেমন হবে?

বেডরুমের দরজাটা ঠেলতেই রঞ্জনকে দেখতে পেলাম। সে খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে। হাতের বইটা আধখোলা অবস্থায় খসে পড়েছে বুকের ওপর। ঠিক যেন ঘুমোচ্ছে। আমি পা টিপে টিপে বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। এটা নতুন কিছু নয়। বই হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া রঞ্জনের স্বভাব। বিয়ের পর থেকে দেখছি। কিন্তু আজ অন্য দিনগুলোর মতো নয়। আমি জানি, আজ রঞ্জন ঘুমোচ্ছে না। আমি আলতো করে বইটা সরিয়ে নিলাম। নাকের তলায় ডান হাতের চেটোটা পেতে দিলাম। নিশ্বাস কি পড়ছে? না পড়ছে না। মুখ তুলে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালাম। খাবার পর থেকে ধরলে প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে। বিষ কাজ করার পক্ষে অনেক সময়।

আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। আমার পরপর সব ভাবা আছে। মাথা ঠান্ডা করে সেগুলো এখন করতে হবে। সবার প্রথমে আমি যে-বাটিতে রঞ্জনকে পুডিং খেতে দিয়েছিলাম সেটা ভালো করে ধোব। শুধু বাটি নয়, পুডিং তৈরির কোনো প্রমাণই বাড়িতে থাকবে না। ইতিমধ্যেই বিষের শিশি আমি বাথরুমের প্যানে খালি করে ফ্ল্যাশ টেনে দিয়েছি। ধোয়াধুয়ির কাজ শেষ হলে ডাক্তার ঘোষকে ফোন করব। ওঁকে আসতে বলব। তারপর ডাকব পাশের বাড়ির রজনী মল্লিককে। তিনি আসার আগে

ফোন করব, ব্যারাকপুরে। রঞ্জনের দিদিকে। তবে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। এই ফাঁকে দরজা টেনে দিয়ে আর একবার ছাদে ঘুরে এলে কীরকম হয়? না থাক। কাজগুলো মাথা ঠান্ডা করে শেষ করি।

রাতে খাওয়ার পর আমি ছাদে গিয়ে হাঁটি। রোজ নয়, মাঝেমধ্যে হাঁটি। যেদিন শরীরটা আনচান করে সেদিন। অনেক সময় শরীর নয়, মনের জন্যও ছাদে হাঁটি। মনটা হয়তো কোনো কারণে বিক্ষিপ্ত, একটু খোলা আকাশের তলায় রইলাম। অবশ্যই খুব শীত বা বৃষ্টিতে এটা সম্ভব হয় না। আমাদের পাশের বাড়িতে থাকেন রজনী মল্লিক। বুড়ো মানুষ। উনিও রাতে খাওয়ার পর ছাদে ওঠেন। আমার সঙ্গে একটা দুটো কথা হয়। একেবারে সাধারণ কথা। উনি আবার আমাকে ঠাট্টা করে 'বউমা' ডাকেন। বুড়ো মানুষ, বেশ লাগে শুনতে।

'কী বউমা ,আজ রান্না কী হয়েছিল?'

'বেশি কিছু নয় মেসোমশাই, খুব সামান্য।'

'সামান্যটাই কী শুনি।'

'ডাল, তরকারি আর পারশে মাছের একটা ঝোল।'

'ভেরি গুড। তা আমাদের রঞ্জনবাবু রাতে ভাত খান? নাকি রুটি?'

'ভাত। দু-বেলা ভাত না হলে ওর আবার চলে না মেসোমশাই।'

'বাঃ, তোমার কর্তাটি তো দেখছি একেবারে মাছে ভাতে বাঙালি হে।'

রঞ্জন রাতে আমার ছাদে ওঠা পছন্দ করে না। আবার স্বাস্থ্যের কারণে বারণও করতে পারে না। সে অবশ্য নিজে কখনো ছাদে ওঠে না। খাওয়া হলেই দুম করে বিছানায় গিয়ে শুড়ে পড়ে। আমি ফিরে এসে দেখি কোনোদিন বই পড়ছে। কোনোদিন ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে আছে। আলো নেভালেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আজও আমি ছাদে ছিলাম। অন্য দিনের থেকে বেশি সময়ই ছিলাম। কিন্তু রজনীবাবুকে দেখলাম না। মনটা খচ খচ করছিল। আজ রজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়াটা জরুরি ছিল। যদি প্রশ্ন ওঠে পুলিশকে বলতে পারবেন, ঘটনার সময় আমি তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলাম। গল্পের বিষয় ছিল পারশে মাছের ঝোল। এখন কি একবার ট্রাই নেব? কোনো কারণে হয়তো ভদ্রলোক আজ দেরি করে ডিনার করেছেন। এবার গেলে দেখা হয়ে যেতে পারে। আমি ঘরের আলো নেভানোর আগে, আবার গিয়ে রঞ্জনের বুকের ওপর আলতো করে হাত রাখলাম। না, ধুকপুকুনি নেই। আলো নিভিয়ে, পায়ের কাছে ভাঁজ করে রাখা চাদরটা গায়ে দিয়ে দিলাম।

এই হল গল্পের 'শেষ' দিয়ে 'শুরু'। রঞ্জনের মৃত্যু দিয়ে। সত্যি কথা বলতে কী, এতেও কিন্তু গল্পের প্রতি সুবিচার হল না। সবাই ভাববে, এটা একটা খুনের গল্প। না, একটা নয়, দুটো খুনের গল্প। তবে প্রথম খুন, অর্থাৎ সৎ মাকে শক দিয়ে মারার কথাটা গল্পে পাওয়া যেতে পারে, আবার নাও পাওয়া যেতে পারে। যদি পাওয়া যায় তাতেও কি গল্পের মূল বিষয়টা ঠিক থাকবে? থাকবে না। কারণ গল্পতে দুটো

নয়, তিনটে খুন রয়েছে। তাই গল্পটা খুনের গল্প নয়, ভালোবাসার গল্প। সেই খুনটার কথা না-জানলে এটা বোঝা মুশকিল। কিন্তু সমস্যা হল খুনটার কথা কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না। একটা জটিলতা দেখা দিচ্ছে। সময়ের জটিলতা। বলার সময় ঘটনাটাকে ঠিক কোন সময়ে নিয়ে গিয়ে ফেলব? আগে? পরে? নাকি এখন? ঠিক করতে পারছি না। আসলে খুন হওয়া মানুষটার সঙ্গে আমার এখনো নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সুযোগ পেলেই আমি তার কাছে চলে যাই। যোধপুর পার্কের কাছে ফ্ল্যাট। টু বেড রুম। বড়ো লিভিং ডাইনিং। ঘটনাব পর থেকে ফ্ল্যাটে তালা। বউ কেটে পড়েছে। যতদূর খবর, বিয়ে করেছে। তাতে আমার সমস্যার কিছু নেই। আমার সমস্যা হল, অতীত-হয়ে-যাওয়া একটা মানুষকে বর্তমানে এনে ফেলতে গেলে কী বলতে হবে? 'আগে' নাকি 'এখন'? নাকি দুটো সময় পাশাপাশি চলবে? ট্রেন আর ট্রেনের ছায়ার মতো।

যাকগে বলতে যখন হবে, খুনের কথাটা সংক্ষেপে সেরে নিই। ঘটনাটা ছিল সোজাসাপটা। যাকে বলে ওয়ান ডাইমেনশনাল।

ছেলেটার নাম তীর্থ। লম্বা চওড়া, হ্যান্ডসাম চেহারা। ভালো চাকবি করে। কোনো এক বিয়েবাড়িতে একটা মেয়ের সঙ্গে তার দেখা। বলা ভালো, মেয়েটিই দেখল তাকে। দেখামাত্রই পড়ল প্রেমে। তীর্থ বিশেষ পাত্তা দিল না। তাতে মেয়ের প্রেম গেল আরও বেড়ে। প্রেমের নিয়মই তাই। কঠিন ঠাঁইতে ফরফর করে বাড়ে। জল বাতাস পাওয়া চারাগাছের মতো। তবে এতেও তীর্থর কিছু এসে গেল না। সে মেয়েটিকে আরও এড়িয়ে যেতে লাগল। মেয়ের তখন পাগল পাগল অবস্থা। নাওয়া খাওয়া বন্ধ। এমনকী তৃতীয় শ্রেণির প্রেমের কায়দায় সুইসাইডের হুমকি দিয়ে চিঠি পর্যন্ত পাঠিয়ে বসল। তাতেও ছেলে তেমন টলল না। মেয়ের অবস্থা হল শোচনীয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মেয়েটি জিতেই যায়। গজগজ করতে করতে বিয়েতে রাজি হয়ে গেল তীর্থ। মনে হয় মেয়ের কান্নাকাটি দেখে করুণা হয়েছিল। তবে ফুলশয্যার রাতেই সে কঠিন গলায় বউকে বলে দেয়, 'বিয়ে করেছ মানে ভেবো না আমি তোমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকব। আমি চলব আমার মতো, তুমি চলবে তোমার মতো। নিজের নিজের কাজ নিয়ে থাকব। অতিরিক্ত সোহাগ, আহ্লাদের কোনো প্রয়োজন নেই।' মেয়ে খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। সে এটাই চায়। সে এমন একজন পুরুষমানুষকে ভালোবেসেছে, ভালোবাসার ব্যাপারে যে উদাসীন, কঠিন এবং নির্মম। তাই সে আলাদা। তাই সে লোভনীয়।

কিন্তু বিয়ের কিছুদিন যেতে-না-যেতেই জল গড়ালও উলটো দিকে। তীর্থ গিয়ে পড়ল তার বউয়ের [illegible] চোখে হারায়। দূরে গেলে ডাকাডাকি করে, কাছে থাকলে হাঁ করে মুখেব দিকে চেয়ে থাকে। একেবারে নেতাজোবড়া অবস্থা। মানুষটা পুরোপুরি [illegible] বদলে! বউয়ের সঙ্গে লেপটে থাকতে গিয়ে কাজকর্মও শিকেয় তুলল। লোকে আড়ালে হাসে। সামনে ঠাট্টা করে। তবে বেশিদিন নয়, এই অবস্থা চলল ঠিক বছরখানেক। মেয়েটি একদিন তীর্থর সঙ্গে ঠান্ডা গলায় কথা বলল।

'আমি চললাম। যে-মানুষটাকে আমি ভালোবেসেছিলাম, তুমি সেই মানুষ নও। এত ভালোবাসা আমার সহ্য হচ্ছে না। দমবন্ধ হয়ে আসছে। বাকি জীবন তোমার সঙ্গে কাটানো অসম্ভব। মিউচ্যুয়াল ডিভোর্স হলে ভালো, না হলেও অসুবিধে নেই। আমি কোর্টে কনটেস্ট করব। তবে তুমি চিন্তা কোরো না, আমি এখনই তোমাকে পুরোপুরি ছেড়ে চলে যাচ্ছি না। সেটা তোমার পক্ষে বিরাট আঘাত হবে। তুমি আমাকে এত ভালোবাস, তোমাকে বিরাট ধাক্কা দেওয়াটা আমার উচিত কাজ হবে না। তুমি সেটার প্রাপ্য নও। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আরও কিছুদিন আমি তোমার কাছে আসা যাওয়া করব। ঘর পরিষ্কার করব, তোমার পছন্দের খাবার বানিয়ে দেব, তোমার সঙ্গে বসে ডিভিডিতে সিনেমা দেখব। এমনকী তুমি চাইলে তোমার সঙ্গে শুতেও পারি। আসলে ধীরে ধীরে তোমার মন শক্ত করার চেষ্টা করব।'

এর খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যে ফ্ল্যাটে তীর্থর মৃতদেহ পাওয়া যায়। সবাই জানল হার্ট অ্যাটাক। আসলে যে-বিষ তাকে খাওয়ানো হয়েছিল, সেটা কাজ করে হার্টে। ধমনীগুলো অকেজো করে। হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে পার্থক্য বোঝা যায় না। খুব সন্দেহ না-করলে ধরা মুশকিল। একা থাকার মানুষের ওপর কে সন্দেহ করবে? করলেই-বা কী? খুনের প্রমাণ কীভাবে গোপন করতে হয় আমার থেকে ভালো কে জানে?

তীর্থের সঙ্গে ডিভোর্স না হওয়ার কারণে যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটের মালিকানা এখন আমার। খবরটা কেউ জানে না। আমি প্রায়ই সেই ফ্ল্যাটে যাই। তালা খুলে ঢুকি। তারপর তীর্থর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাই। মরে যাওয়ার পর ছেলেটা আগের মতো হয়ে গেছে। ভালোবাসায় সেইরকম কঠিন, নির্মম। অনেক সাধ্যসাধনা করে তার ভালোবাসা পেতে হয়। যে ভালোবাসার জন্য নারী অপেক্ষা করে থাকে জন্মজন্মান্তর। কী যে ভালো লাগে বুঝিয়ে বলতে পারব না। হয়তো সারারাত তার আদর চাইলাম, অথচ ও রইল মুখ ফিরিয়ে। গ্রহণ করল একেবারে শেষরাতে। ব্যথা দিয়ে দিয়ে প্রবেশ করল আমার শরীরে। আমি চিৎকার করে উঠলে মুখে হাত চাপা দিল। সেই হাত কী ঠান্ডা! যেন রক্তমাংস নয়, সেই হাত বরফ দিয়ে তৈরি! আহা!

শুধু শরীর নয়, তীর্থর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি আলাপ আলোচনাও করি। আমার দ্বিতীয় স্বামী রঞ্জনকে খুন করার পরিকল্পনা সে-ই আমাকে দেয়। আমি তাকে কেঁদে বলেছিলাম, 'তীর্থ, আমি আর পারছি না। আমার দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

তীর্থ হেসে বলল, 'পারছ না তো কী হয়েছে? না-পারলে কী করতে হয় তুমি জান না?'

'কী করতে হয়?'

'তোমার সৎ মাকে যা করেছ, আমাকে যা করেছ, রঞ্জনকেও তাই করবে। সমস্যা কোথায়?'

না সমস্যা নেই। রঞ্জন নেই, আমি এখন মুক্ত। আরও বেশি সময় তীর্থর সঙ্গে থাকতে পারব। ভালোবাসা পাবার জন্য তার কাছে কাকুতি মিনতি করব।

অন্ধকার ঘরে মৃত রঞ্জনকে রেখে আমি এখন দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছি।

দুটি গল্প

কেনাকাটা

আমি নিনি, আমার বন্ধু পুঁটি। আমরা দুজনে পুজোর বাজার করতে এসেছি।

আমাদের সঙ্গে রয়েছে লম্বা লিস্টি। এই লিস্টি আমরা অনেকদিন ধরে বানিয়েছি। লিস্টি বানানোর সময় আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। সেই কথায় যেমন ভাব ভালোবাসা ছিল, তেমন আবার ঝগড়াও হয়েছে। পুঁটি একটা কিছু কেনার জন্য বলেছে, আমি রাজি হইনি। আবার হয়তো আমি কোনো জিনিস লিস্টিতে লিখতে বলেছি, পুঁটি মানতে চায়নি। এই নিয়ে চটামটি। কোনো কোনো সময় ঝগড়া এতদূর গড়িয়েছে যে আমরা কথা বন্ধ করে দিয়েছি। একে অন্যকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছি। এই তো সেদিন হল। আমি একটা জামার কথা বললাম। গোলাপি রঙের লম্বা ঝুলের ফ্রক। সামনে ছোটো ছোটো ফুলের মতো করা। গায়ে দিলে মনে হবে, কাপড়ের জামা পরিনি, ফুলের জামা পরেছি। পুঁটিকে বললাম, 'ওই জামাটা কিনব। তুই লিস্টিতে লেখ।'

পুঁটি ভুরু কুঁচকে বলল, 'এই জামা তুই কোথায় দেখেছিস?'

আমি বললাম, 'দোকানে।'

পুঁটি বলল, 'কই! আমি তো দেখিনি!'

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, 'তুই দেখিসনি তো আমি কী করব? আমি দেখেছি। সব ভালো জিনিস তোকে দেখতে হবে তার তো কোনো মানে নেই। নাকি আছে?'

পুঁটি বলল, 'জামার দাম কত?'

আমি বললাম, 'কত জানি না, তবে যতই হোক, আমি কিনব।'

পুঁটি বলল, 'নিশ্চয় অনেক দাম।'

আমি বললাম, 'তা তো হবেই। সুন্দর জিনিস দাম বেশি হবে না? যেকোনো সুন্দর জিনিসেরই দাম বেশি।'

পুঁটি গম্ভীর হয়ে বলল, 'না, অত দাম দিয়ে জামা কেনা যাবে না।'

আমি রেগে গেলাম। বললাম, 'কেন যাবে না! টাকা কি তোকে দিতে হবে? টাকা আমি দেব।'

আমি আর পুঁটি কেনাকাটার লিস্টি বানাই ছেঁড়া পাতায়। পেনসিলে লিখি। খাতার পাতা জোগাড় করেছি আমি। পেনসিল এনেছে পুঁটি। পুরো পেনসিল আনতে পারেনি, ভাঙা পেনসিল এনেছে। পেনসিলের শিসের অবস্থাও ভালো নয়। লেখা ভালো হয় না। আবছা লাগে। তা হোক, আমাদের কেনাকাটার লিস্ট আমরা বুঝলেই হল। এ তো আর দশজনকে দেখানোর জিনিস নয়। পুঁটি সেই আধখানা পেনসিলে কামড় দিল। বলল, 'টাকাটা বড়ো কথা নয়, এত দামি জিনিস কেনাটা ঠিক হবে না।'

আমি রেগে গেলাম। রেগে যাবারই কথা। আমি জানি, ওই জামা পরলে আমাকে খুব সুন্দর লাগবে। একেবারে পরির মতো। এই কারণেই পুঁটির রাগ হচ্ছে। আসলে পুঁটির গায়ের রং কালো। তার ওপর নাকও খেঁদা। লাল, গোলাপি, নীল কোনো জামাতেই ওকে পরির মতো দেখাবে না। এই কারণেই ও চায় না আমি জামাটা কিনি। আমি বললাম, 'একশোবার কিনব। তুই একটা হিংসুটে। আমাকে সুন্দর দেখাবে বলে বারণ করছিস। আমি তোর সঙ্গে পুজোর বাজার করব না। কিছুতেই করব না।' কথাটা বলে পুঁটির মুখের ওপর লিস্টির কাগজ ছুড়ে গড়গড় করে চলে গেলাম।

এ তো গেল ঝগড়া। এবার ভাব ভালোবাসার কথা বলি।

সেদিন দুজনে যখন লিস্টি নিয়ে বসেছি পুঁটি বলল, 'অ্যাই নিনি, লিস্টিতে লেখ পাথর বসানো গয়না। গোলাপি পাথর। একটা মালা, দুটো কানের দুল, আর হাতের ক-টা চুড়ি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'পাথর বসানো গয়না! কে পরবে? তুই?'

পুঁটি এক গাল হেসে বলল, 'না, তুই। গোলাপি জামার সঙ্গে মানাবে। ওই জামা আর গয়না পরে ঠাকুর দেখতে যাবি।'

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'তাহলে তোকে জুতোটা নিতে হবে।'

পুঁটি অবাক হয়ে বলল, 'কোন জুতোটা?'

আমি বললাম, 'ওই যে তুই দেখেছিলি। কাচের মতো। একটা মেয়ে হাতে নিয়ে যাচ্ছিল। মনে পড়েছে?'

পুঁটি বলল, 'খুব মনে পড়েছে। পায়ের বদলে হাতে জুতো—মনে থাকবে না? আসলে মেয়েটার জুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখে ধমক দিয়ে বলল, অ্যাই মুচি কোথায় বসে? এমন করে বলল যেন আমি ওর কাচের জুতো ছিঁড়ে দিয়েছি।

আমি সঙ্গেসঙ্গে উলটো দিক দেখিয়ে দিলাম। ধমক দেবার শাস্তি। যাক, আরও খানিকক্ষণ খালি পায়ে হাঁটুক।'

গল্পটা আমি অনেকবার শুনেছি। যতবার শুনেছি ততবারই হেসেছি। আজও হাসতে হাসতে পুঁটির গায়ে গড়িয়ে পড়লাম। পুঁটি বলল, 'না না জুতোর জন্য অত টাকা খরচ করা যাবে না।'

আমি রাগের ভান করে বললাম, 'তুই যদি লিস্টিতে না-রাখিস আমি পুজোর কেনাকাটা করতেই যাব না। এই বলে রাখলাম।'

পুঁটি তাড়াতাড়ি আমাকে সামলে বলল, 'আচ্ছা বাবা লিখছি। তোর সবেতেই ঠোঁট ফোলানো।'

আমি নিনি, আমার বন্ধু পুঁটি। আজ আমরা দুজনে পুজোর বাজার করতে এসেছি। রাস্তাটা পার হলেই বিরাট বাড়ি। আলো ঝলমল করছে। বাড়ির ভেতরই বাজার। এখান থেকেও বড়ো বড়ো কাচ ঘেরা দোকান দেখা যাচ্ছে। দোকানে জামা কাপড় সাজানো। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ভেতরে আরও অনেক দোকান আছে। সেগুলো না-জানি কেমন! কত যে মানুষ বাড়িটায় ঢুকছে তা গুনেও শেষ করতে পারব না। বাপরে বাপ। ছেলে-মেয়ে সবাই সেজেছে। গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে একটার পর একটা। বাড়ির ভেতর বাজারগুলোকে কী যেন একটা বলে। ইংরেজি কথা। মনে নেই। ভেতরে শুধু দোকান নয়, খাবার জায়গা, বসার জায়গাও আছে। সিনেমা হল আছে। আমি আর পুঁটি ঠিক করেছি, আজ কেনাকাটার পর খাব। সময় থাকলে সিনেমাও দেখতে পারি।

আমি আর পুঁটিও সেজেছি। পুঁটি চুলে লাল ফিতে দিয়েছে। পুরোনো বলে লাল রং ফিকে হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধে নেই। কালো মেয়ে পুঁটিকে দেখাচ্ছে ভারি সুন্দর। আমি পরেছি ফুলকাটা ফ্রক। ফ্রকের নীচের দিকে তাপ্পি। তবু পুঁটি বলেছে, আমাকে নাকি পরির মতো দেখাচ্ছে। দশ বছরের পরি!

অন্ধকার বেছে ফুটপাথের একপাশে বসেছি আমরা। ফুটপাথে বসতে আমাদের কোনো অসুবিধে নেই। অসুবিধে হবে কেন? আমরা তো ফুটপাথে থাকি। খাই দাই, শুই, ঝগড়া ও ভাব ভালোবাসা করি ফুটপাথে। জন্ম থেকে ফুটপাথই আমাদের ঘরবাড়ি। রাস্তা পার হয়ে ওই বাজারের দিকটায় যে আমাদের যেতে ইচ্ছে করে না এমন নয়। তবে ভয় করে। টুপি পরা দারোয়ানগুলো লাঠি হাতে তেড়ে আসে। দরকার কী তাড়া খেয়ে? তাই অন্ধকারে, এই ফুটপাথে বসেই আমরা পুজোর কেনাকাটা সারি। পুঁটি দোকানি সাজে, আমি তার কাছ থেকে মিছিমিছি ফ্রক, হাতের চুড়ি, চুলের ব্যান্ড কিনি। খানিক পরে উলটে যায়। তখন আমি দোকান খুলি। কাচের জুতোর দোকান। পুঁটি মিছিমিছি দরদাম করে। দরদাম করে জুতো কেনে। রাত বাড়লে অদৃশ্য নতুন জামা, কাপড়, গয়নার পাহাড় নিয়ে আমরা দুই বন্ধু ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাই। আজও যাচ্ছি। পুঁটিটা খুব পাজি। সে হাঁটছে খুঁড়িয়ে। বলছে,

'নতুন জুতো পরেছি, তাই পায়ে ফোসকা পড়েছে।' আমি হাসতে হাসতে ওর গায়ে গড়িয়ে পড়লাম। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আমাদের মিছিমিছি পুজোর কেনাকাটার মতো মিছিমিছি চাঁদ নয়। সত্যি চাঁদ। সেও আমাদের সঙ্গে হাসছে।

বিকেল

এখন বিকেল। পাশের বাড়ির ছাদে দুই কিশোরী গল্প করছে। কখনো হাত নাড়ছে। কখনো হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। তাদের কথা, তাদের হাসি কিছুই শোনা যাচ্ছে না, শুধু দেখা যাচ্ছে। এক মেয়ে আর একজনকে চড় দেখাল। এক মেয়ে আর একজনকে জিভ ভেঙাল। আবার হাসি। পাশের বাড়ির ছাদে বাচ্চু আর তপু। ঘুড়ির কল বাঁধছে, লাটাইয়ের সুতো ঠিক করছে আর দুই কিশোরীর দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাচ্ছে।

বাচ্চু নীচু গলায় বলল, 'মেয়ে দুটো কে?'

তপু আরও নীচু গলায় বলল, 'চিনতে পারছি না। মল্লিককাকুর বাড়িতে হয়তো বেড়াতে এসেছে।'

বাচ্চু বিড়বিড় করে বলল, 'ওরা কী বিষয়ে কথা বলছে?'

তপু ফিসফিস করে বলল, 'মনে হচ্ছে আমাদের বিষয়ে। আমাদের নিয়ে আলোচনা করছে।'

বাচ্চু শার্টের কলার ঠিক করে বলল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

তপু তাড়াতাড়ি নিজের চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'মেয়ে দুটো হাসছে কেন!'

বাচ্চু মাথা নামিয়ে বলল, 'ও কিছু নয়, প্রেমে পড়লে মেয়েরা প্রথমদিকটায় ও-রকম হাসাহাসি করে।'

তপু অবাক গলায় বলল, 'তোকে কে বলেছে?'

বাচ্চু গম্ভীর হয়ে বলল, 'কেউ বলেনি, আমি জানি। তোকে নিয়ে কোন মেয়েটা আলোচনা করছে বল তো। দেখি তোর কেমন বুদ্ধি।'

তপুর একটু সর্দি সর্দি হয়েছে। সে নাক টেনে বলল, 'মনে হয় লম্বা আর ফর্সা মেয়েটা। খানিক আগে আমার দিকে একবার তাকাল।'

ফর্সা মেয়ে তপুকে নিয়ে কথা বলছে শুনে বাচ্চু একটু থমকাল। দ্রুত নিজেকে সামলে নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'হতে পারে। কারণ ঝাঁকড়া চুলের মেয়েটা যে আমাকে নিয়ে কথা বলছে এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমি শিয়োর।'

তপু মাথা চুলকে বলল, 'কী করে শিয়োর হলি?'

বাচ্চু ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলল, 'একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছে না। একটা

মেয়ে যখন কোনো ছেলেকে ভালোবেসে ফেলে তখন চট করে তার দিকে তাকাতে পারে না।'

তপুর প্রেস্টিজে লাগল। লম্বা ফর্সা মেয়ে তার দিকে তাকিয়েছে। ভুরু কুঁচকে বলল, 'তোকে কে বলেছে?'

বাচ্চু গম্ভীর মুখে বলল, 'কেউ বলেনি, আমি জানি। এটাই নিয়ম।'

তপু এবার রেগে গেল। হিসহিসিয়ে বলল, 'কচুর নিয়ম।'

কথা বলতে বলতে বাচ্চু আর তপু ঘুড়ি ওড়াতে শুরু করল। একজনের হাতে লাটাই। একজনের হাতে সুতো। দুজনেরই হাত পা ঝিমঝিম করছে। বুক ধুকপুক। মন অন্যদিকে। এই অবস্থায় প্যাঁচ খেলতে গিয়ে ঘুড়িটাও গেল কেটে। দুজনে ভেসে যাওয়া কাটা ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে বোকা বোকা মুখে হাসল।

আজ বিকেলে কোনো দুঃখ নেই। পাশের বাড়ির শূন্য ছাদে সন্ধে নামল ঝপ্ করে।

চলে যাচ্ছি

বিদায় জানানো নিয়ে হাওড়া স্টেশনে যদি কোনো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত, তাহলে ঝুমুর আজ অবশ্যই একটা মেডেল পেত। সেই মেডেলের নাম হত 'সী-অফ মেডেল' বা 'বিদায় পদক'।

ঝুমুর নিজেও কল্পনা করতে পারেনি, তাকে সী-অফ করতে এতগুলো মানুষ স্টেশনে আসবে। এসি টু-টিয়ার কোচের দরজার সামনে ছোটো মতো একটা ভিড় হয়ে গেছে। সেই ভিড়ের মাঝখানে হাসি হাসি মুখে ঝুমুর দাঁড়িয়ে। শুধু হাসি হাসি নয়, সঙ্গে একটু লজ্জা ভাবও আছে। এত লোক দেখে লজ্জা।

ট্রেনের অন্য যাত্রীরা মুখ ঘুরিয়ে ঝুমুরদের দেখছে। তাদের তাকানোর ভঙ্গি দেখলে বোঝা যাচ্ছে, এত মানুষ দেখে ওরা যেমন অবাক হয়েছে, তেমনি আবার হিংসেও করছে। হিংসে না-করে উপায় কী? অন্যদের বিদায় জানাতে স্টেশনে এসেছে দু-জন, তিনজন, খুব বেশি হলে পাঁচজন। ঝুমুরের মতো দশ-বারো জন এসে হইচই বাধিয়ে দেয়নি। এক একটা সময় মনে হচ্ছে, ঝুমুরের লোকেরাই উনিশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম পুরো দখল করে ফেলেছে!

একটা অল্প বয়সি ছেলে যেতে যেতে পাশের বন্ধুকে বলল, 'ওরে বাস, কত লোক দেখেছিস? নিশ্চয় কোনো ফিল্মস্টার যাচ্ছে। দাঁড়া একটু দেখে যাই।'

কথাটা শুনতে পেয়ে ঝুমুরের লজ্জা আরও বেড়ে গেল। ভাগ্যিস আর কেউ শোনেনি। শুনলে খুব বিচ্ছিরি হত। নূপুর শুনলে তো কেলেঙ্কারি ঘটত। ও যা ফাজিল মেয়ে। নির্ঘাত দিদির দিকে একটা কাগজ পেন এগিয়ে বলত, 'ম্যাডাম, অটোগ্রাফ প্লিজ।'

ঝুমুর তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। চুলটা ঠিক আছে তো? চট করে ট্রেনের বাথরুমে গিয়ে গালে একটু পাউডার বুলিয়ে এলে কেমন হয়? এখন থাক। এখান থেকে সরে গেলে খোঁজাখুঁজি পড়ে যাবে। একটু পরে একটা ট্রাই নেওয়া যাবে।

সত্যি, নিজেকে কেমন একটা অন্যরকম লাগছে যেন! এতক্ষণ লাগেনি। এত মানুষ এসে যাওয়ার পর এখন লাগছে। মনে হচ্ছে, সত্যি যেন সে একটা স্টার!

ঝুমুর যাচ্ছে পুনেতে। সেখানকার এক নামকরা ইনস্টিটিউটে আইন পড়তে। পাঁচ বছরের কোর্স। তারপর বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। তবে সেসব অনেক পরের কথা। পাঁচটা বছর তো পুনেতে থাকতে হবে। যেখানে পড়তে যাচ্ছে তাদের নিজেদের হস্টেল আছে। হস্টেলগুলোতে ব্যবস্থা খুব ভালো। কিন্তু এই মুহূর্তে জায়গা পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে ইনস্টিটিউট থেকে একটু দূরে ঘর ভাড়া নিতে হয়েছে ঝুমুরকে। আপাতত ক-টা মাস সে দক্ষিণ ভারতের একটি মেয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকবে। মেয়েটির নাম শশী। পরে হস্টেল পেলে দুজনেই উঠে যাবে। এখনও পর্যন্ত সেইরকমই প্ল্যান।

ঝুমুরের সঙ্গে বাবা যাচ্ছে। মা আর নূপুরেরও যাওয়ার কথা ছিল। ঠিক ছিল, সাতদিন ওখানে থেকে, ওরা সব গোছগাছ করে দিয়ে আসবে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে ওদের যাওয়া ক্যানসেল হয়ে গেল। হঠাৎ করে নূপুরের পরীক্ষা পড়ে গেছে। পরীক্ষার রুটিন হাতে নিয়ে নূপুর কেঁদে ফেলল। মা আর ঝুমুরেরও একই অবস্থা। বাবা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ইস আগে জানলে আমি আর ঝুমুর প্লেনেই চলে যেতাম। সবাই মিলে যাব বলেই ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলাম। অনেকটা সময় নষ্ট হবে।'

সময় নিয়ে ঝুমুর চিন্তিত নয়। সে চিন্তিত অন্য কারণে। মা যেতে না-পারায় অনেকরকম সমস্যা হবে। প্রথম ঘর গোছানোর কাজটা মা-ই সামলে দিয়ে আসত। বাবা বলেছে, 'চিন্তা করিস না, আমি যাচ্ছি না?' এটা বেশি ভয়ের। বাবার গোছানো মানে একেবারে লন্ডভন্ড কাণ্ড। মা বলেছে, 'থাক, তোমাকে কিছু করতে হবে না। ঝুমুর যতটা পারে নিজেই করে নেবে।' এটা একটা বড়ো সমস্যা হল।

তবে সব থেকে বিচ্ছিরি যে সমস্যাটা হবে, সেটা হল রান্নার সমস্যা। ঝুমুর লেখাপড়ায় যেমন ভালো, রান্নায় তার থেকে অনেক বেশি খারাপ। তার মানে এই নয় যে ঝুমুর রান্না করতে চায় না। খুবই চায়। কিন্তু কিছুতেই হয় না। নূপুর বলে, 'দুঃখ করিস না। এটা খুব কমন জিনিস। অনেকের দেখবি খুব গান করতে ইচ্ছে করে। তারা গান করেও। কিন্তু কিছুতেই সুর, তাল হয় না। তোরও সে-রকম হয়েছে। রান্না করিস, কিন্তু নুন, মিষ্টি, ঝাল হয় না। তুই বরং শৌখিন কিছু রান্না শেখ। এই ধর স্যান্ডুইচ, মিল্কশেক, কোল্ড কফি...।

বোন যতই হাসি ঠাট্টা করুক। পুনেতে গিয়ে হস্টেল যতদিন-না হচ্ছে নিজেই রান্না করে খেতে হবে। শশীর মতো ইডলি দোসা বা নূপুরের উপদেশ মতো স্যান্ডুইচ, মিল্কশেক আর কোল্ড কফি খেয়ে তো বেশিদিন থাকা যাবে না। তা ছাড়া কতদিন আর বাইরের খাবার খাওয়া যায়? এই কারণেই চিন্তা। গত কয়েকদিন অবশ্য বাড়িতে সকাল বিকেল ট্রেনিং হয়েছে। শেষ মুহূর্তে মা খুবই চেষ্টা চালিয়েছে। তাতে খুব একটা কাজ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ভাতের মতো অতি

সহজ জিনিস শিখতেই পাক্কা তিন দিন লেগে গেল! যাতে কারো কখনো কোনো গোলমাল হয় না, সেই রাইস কুকারেও ঝুমুরের গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। জল, চাল, সময়ের গোলমাল। নূপুর এর নাম দিয়েছে 'রাইস কুকারের বিশ্বাসঘাতকতা।'

ঠিক ছিল, পুনেতে পৌঁছে মা মাছের ঝোলের একটা কোর্স নেবে। সেই সুযোগ আর পাওয়া গেল না। মা অবশ্য অভয় দিয়েছে। বলেছে, 'রান্নার সময় তুই মোবাইলে আমাকে ধরবি। আমি বলে বলে যাব, তুই রাঁধবি। কটা-দিন করলেই সড়োগড়ো হয়ে যাবে।'

ঝুমুর রেগে গিয়ে বলল, 'মোবাইলে কি মাছের ঝোল শেখা যায়?'

নূপুর দিদির পাশেই ছিল। বলল, 'আলবাত যাবে। তুই চেখে দেখবি।'

ঝুমুর কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'দুর, আমি বুঝতেই পারব না। নিজের রান্না বোঝা খুব কঠিন কাজ।'

নূপুর হেসে বলল, 'খুবই সহজ কাজ। যখন দেখবি খুব আনন্দ হচ্ছে, তখন বুঝবি হয়েছে।'

'কী হয়েছে?' ঝুমুর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

নুপূর বলল, 'বুঝতে পারবি, রান্না অতি খারাপ হয়েছে। নিজের হাতের খারাপ রান্না খেলে খুব আনন্দ হয়। বেশি বেশি খেতে ইচ্ছে করে। তুইও খাবি। খেয়ে মোটা হয়ে যাবি।'

কথাটা বলেই নূপুর দূরে সরে গেল। সরে না-গেলে মুশকিল। দিদির হাতের চিমটি মারাত্মক। ঝুমুর চিমটিতে খুব ওস্তাদ। স্কুলে এক সময় ওর নাম হয়েছিল 'চিমটি রানি'।

সেই 'চিমটি রানি' এখন লজ্জা লজ্জা মুখ করে ট্রেনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই তাকে ঘিরে বক বক করছে। মা, বাবা, বোন তো আছেই। তা ছাড়া আত্মীয়স্বজন, আর বন্ধুরাও আছে।

অথচ ঠিক ছিল অন্যরকম। ঠিক ছিল, স্টেশনে খুব বেশি কেউ আসছে না। যাদবপুর থেকে কাকা-কাকিমা আর তাদের দুই ছেলে-মেয়ে বিপাশা, অভ্র আসবে। সল্টলেক থেকে মামা আসছে, কিন্তু মামি আসছে না। যদিও তার আসার খুব ইচ্ছে ছিল। মামা রাজি হয়নি। বলেছে, 'হাওড়া-স্টেশন কোনো পার্ক নয় যে সেখানে বেড়াতে যেতে হবে। টেলিফোনে ঝুমুরকে টা-টা, গুডবাই জানিয়ে দাও। তাহলেই হবে। মনে রেখো, মুখে যে-কথা বলা যায়, টেলিফোনেও সেই একই কথা বলা যায়।'

পিসতুতো দিদি শর্মিষ্ঠা তার দুই মেয়ে তিতির, মিতিরকে নিয়ে আসবে বলেছিল। কাল প্ল্যাটফর্ম নম্বর, কোচ নম্বর, সিট নম্বর সব জিজ্ঞেস করল।

ঝুমুর অবাক হয়ে বলল, 'এতগুলো নম্বর নিয়ে কী হবে শর্মিষ্ঠাদি? গুলিয়ে যাবে তো!'

শর্মিষ্ঠা ধমক দিয়ে বলল, 'বোকার মতো কথা বলিস না। গুলোবে কেন?

আমি সব লিখে লিখে রাখছি। আসলে এক একটা সময়ের জন্য এক একটা নম্বর লাগে। সী-অফের একটা নিয়ম আছে।'

ঝুমুর বলল, 'সী-অফের নিয়ম। সেটা আবার কী?'

'সেটা কিছুই নয়। যদি আগে যাই তাহলে প্ল্যাটফর্মের নম্বর থাকলেই চলবে। কিন্তু দেরি হয়ে গেলে কোচ খুঁজে বের করতে হবে। তখন তোর প্ল্যাটফর্মের নম্বরের সঙ্গে দেখতে হবে কোচের নম্বর। এরপরেও যদি দেরি হয়ে যায় তাহলে হবে আরও ঝামেলা। তখন শুধু প্ল্যাটফর্ম আর কোচ নম্বরে কুলোবে না। তোরা তো তখন ট্রেনে উঠে সিটে গুছিয়ে বসে পড়বি। সী-অফ করতে একেবারে সিট পর্যন্ত যেতে হবে। সুতরাং সিট নম্বর ছাড়া উপায় নেই।'

ঝুমুর হেসে বলল, 'বাপরে! আর শুনতে চাই না। তুমি বাবা সবকটা নম্বর লিখে নাও।'

তবে এত নম্বর জানার পর আজ দুপুরে শর্মিষ্ঠাদি ফোন করে জানাল, স্টেশনে যাওয়া হচ্ছে না, দুই মেয়েরই জ্বর-জ্বর ভাব।

সব থেকে সমস্যা হয়েছে ছোটো মাসির। মেসোমশাই অফিসের কাজে ট্যুরে গেছেন। ওদের গাড়ির ড্রাইভার ছুটি নিয়ে গেছে দেশে। মাসতুতো বোন কোনি বলেছে, সে পৃথিবীর সব জায়গায় গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু হাওড়া স্টেশনে যেতে পারবে না। হাওড়া ব্রিজের জ্যাম দেখলেই তার ভিতরে নাকি কেমন একটা করতে থাকে। মনে হয়, গাড়ির স্টিয়ারিং ছেড়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই। তবে তার মানে এই নয়, সে ঝুমুরকে বিদায় জানাতে যাবে না। অবশ্যই যাবে। সরাসরি কলেজ থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যাবে। শুধু মাকে সঙ্গে নিতে পারবে না। সুতরাং ছোটোমাসিও বাদ।

ছোটোমাসি গাড়ির কারণে বাদ পড়লেও ঝুমুরের দাদু, দিদাকে কিন্তু বাদ দিতে হয়েছে বকাবকি করে। আর সেটা ছিল বেশ কঠিন কাজ। গত তিনদিন ধরে ওঁরা বলতে শুরু করেছিলেন, সী-অফ করতে আসবেনই আসবেন। নাতনি বাইরে চলে যাচ্ছে আর তাঁরা ঘরে বসে থাকবেন এ-জিনিস নাকি কখনোই হতে পারে না। কাল রাতে টেলিফোন করে মা খুব বকাবকি করল। বলল, 'বাড়াবাড়ি কোরো না। তোমরা বুড়ো মানুষ, স্টেশনের ভিড়ভাট্টার মধ্যে গিয়ে কী করবে? খবরদার যাবে না।'

দিদা মেয়ের বকুনিতে একটু যেন দমে গেলেন। বললেন, 'স্টেশনে যাওয়ার জন্য আমার অত মন নেই। তোর বাবারই বেশি ইচ্ছে। বলছে, ওই সময় গেলে নাতনিটার ভালো লাগবে।'

মা বলল, 'সেটা যেমন ঠিক, আবার স্টেশনে এসে তোমাদের কোনো অসুবিধে হলে ঝুমুরের মন আরও খারাপ হয়ে যাবে।'

ঝুমুর তখন টেলিফোন ধরে নিজে বারণ করল। বলল, 'ওখানে পৌঁছে সবার আগে তোমাদের ফোন করব। তাহলে হবে তো?'

দাদু বললেন, 'হবে।'

দাদু-দিদাকে বারণ করতে ঝুমুরের খুব খারাপ লাগছিল। সে খারাপ লাগা ভাবটা লুকিয়ে রেখে বলল, 'ভেরি গুড। তাহলে তোমরা আসছ না কিন্তু।'

দাদু গম্ভীর গলায় বললেন, 'না, আসছি না।'

স্টেশনে আজ সবার আগে দাদু দিদাই এসেছেন!

ঝুমুররা ক্যাব ওয়েতে গাড়ি রেখে প্ল্যাটফর্মে উঠে দেখল, তখনও ট্রেন দেয়নি। তবে যাত্রীরা অনেকেই পৌঁছে গেছে। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। যথেষ্ট ভিড়। দাদু আর দিদা সেই ভিড় থেকে একটু দূরে, একপাশে দুটো মোড়া পেতে বসে আছেন! শুধু বসে আছেন না, বসে মিটিমিটি হাসছেন! যেন নাতনিকে সারপ্রাইজ দিয়ে দারুণ খুশি!

শান্তিনিকেতন থেকে কেনা এই মোড়া দুটো আনা হয়েছে বাড়ি থেকে। দেখতে ভারি সুন্দর। ড্রাইভার গাড়ির ডিকি থেকে নামিয়ে পেতে দিয়ে গেছে। দাদুদের গাড়িতে এই মোড়া দুটো সবসময়ই থাকে। কখন কোথায় লেগে যাবে বলা তো যায় না।

ঝুমুর ছুটে গিয়ে দিদাকে জড়িয়ে ধরল। মা কটমট করে তাকাতে দাদু নার্ভাস ধরনের হেসে বললেন, 'আর বলিস না, তোর মা সব গোলমাল করে দিল। বলল, কী-একটা জরুরি কথা নাতনিকে বলতে একদম ভুলে গেছে। আমি বললাম, মোবাইলে বলে দাও। ঝুমুরের কাছে তো মোবাইল আছে। ও রেগে গিয়ে বলল, সব কথা যদি মোবাইলে বললেই হয়ে যেত তাহলে তুমি আর আমিও দুটো মোবাইল কানে নিয়ে দু-ঘরে বসে থাকলেই তো পারি। আমি স্টেশনেই যাব। তখন আমি বললাম, ঠিক আছে তুমি যখন এত করে যাবে বলছ, চল আমিও যাই। ঝুমুরকে আমারও একটা জরুরি কথা বলতে হবে।'

মা আরও চোখ কটমট করে বলল, 'তোমার আবার কী জরুরি কথা?'

দাদু হেসে বললেন, 'এখন মনে পড়ছে না। তুই অমন করে তাকাচ্ছিস কেন? ভয় করছে।'

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। আরও কাণ্ড হল। একটার পর একটা।

মামা 'আসব না' বলেছিল। তবু প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দেওয়ার কিছু আগেই মামিমাকে নিয়ে মামা হাজির। মামিমা দারুণ সাজগোজ করেছে। এত সাজগোজ করেছে যে মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি স্টেশনে বেড়াতে এসেছে। মুখে হাসি অথচ ছলছল চোখে ভাগনিকে জড়িয়ে ধরল মামিমা। বলল, 'তোর মামা আমাকে না নিয়ে এলে আমি নিজেই চলে আসতাম। স্টেশন তো পার্ক নয়, যে বেড়াতে আসার জন্য তোর মামাকে সঙ্গে লাগবে।'

জ্বর-জ্বর ভাব নিয়ে তিতির, মিতির দুজনেই পৌঁছে গেছে খানিকটা আগে! একজনের মাথায় একটা স্কার্ফ অন্যজনের গলায় মাফলার। প্রথমদিকে দুজনেই শর্মিষ্ঠাদির হাত ধরে শান্তভাবে দাঁড়িয়েছিল। এখন গোলমাল শুরু করেছে। সকলকে

ঠেলেঠুলে ট্রেনে উঠে পড়েছে। তারপর বাঙ্কে উঠে 'ঝাঁপানো ঝাঁপানো' খেলছে। খেলাটা অত মারাত্মক ছিল না। কিন্তু এখন হয়ে গেছে। কারণ ওদের দুজনেরই হাতে পোটাটো চিপসের প্যাকেট। এই প্যাকেট তাদের মা ঝুমুরের জন্য এনেছিল। প্যাকেট হাতে বাঙ্ক থেকে ঝাঁপানোতে বেশ ঝুঁকি আছে।

সব থেকে মজার কাণ্ড হয়েছে ছোটোমাসির। ছোটোমাসি তো নিজে এসেছেই, সঙ্গে এমন একজনকে এনেছে যার স্টেশনে আসার কথা ঝুমুর কল্পনাও করতে পারেনি।

তাঁর নাম ট্যাঙ্গো। ট্যাঙ্গো গাড়ি ছাড়া আসতে পারত না। তাই কোনিই বাধ্য হয়ে গাড়ি চালিয়ে এসেছে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে গাড়িতে মাসি আর ট্যাঙ্গোকে বসিয়ে সোজা হাওড়া। ট্যাঙ্গো ঝুমুরের ভীষণ প্রিয় বললে কম বলা হয়। ভীষণ ভীষণ প্রিয়। ও স্টেশনে আসায় ঝুমুর খুব খুশি। সেইজন্যই তাকে নিয়ে আসা। ট্যাঙ্গোও খুশি। সে তার ছোটো লেজটা ঘন ঘন নাড়াচ্ছে আর জিভ বের করে ঝুমুরের মুখ চেটে দেওয়ার চেষ্টা করছে। খুশির সঙ্গে উত্তেজিতও। উত্তেজিত হওয়ারই কথা। তিনমাস বয়েসের এই ড্যাশহাউন্ড কুকুরটি জীবনে এই প্রথম কাউকে 'সী-অফ' জানাতে স্টেশনে এসেছে। এরপরেও উত্তেজিত হবে না?

ট্যাঙ্গো আসায় ঝুমুর অবাক হয়েছে ঠিকই, তবে, সব থেকে বেশি অবাক হয়েছে বন্ধুদের দেখে। তার হিসেব বলছিল, খুব বেশি হলে তিনজন আসবে। কল্লোলিনী, তিস্তা আর রূপ। তবে রূপের আসাটা নিশ্চিত নয়। তার বাবার শরীর খারাপ। সে নাও আসতে পারে। সকলেই টেলিফোনে বিদায় জানিয়েছে। গত সাতদিন ধরে এই বিদায় পর্ব চলেছে। নূপুর তো মজা করে বলল, 'দিদি, এই সময় তুই রিংটোনে বেহালার সুর লাগা। বেশ দুঃখ দুঃখ শোনাবে।'

অন্তরা তো কাল রাতে ফোনেই কেঁদে ফেলল। সেই কান্না শুনে ঝুমুরেরও কান্না পাচ্ছিল। নিজেকে কোনোরকমে সামলে সে অন্তরাকে ধমক দিয়েছে। বলেছে, 'এমন করছিস যেন সাত সমুদ্র পেরিয়ে চলে যাচ্ছি।' অন্তরা তখন বলল, 'ইস, কাল তোকে স্টেশনে ছাড়তে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এমন একটা কাজে আটকে গেছি। যাক, এরপর যখন আসবি তখন স্টেশনে গিয়ে তোকে রিসিভ করব। শুধু সী-অফ করলে তো হবে না। রিসিভ করারও তো লোক চাই।'

সেই অন্তরাই আজ চমকে দিয়ে হই হই করতে করতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল! সঙ্গে আরও ছ-জন! কল্লোলিনীরা তো আছেই, তা ছাড়াও অর্চি, মেঘনা, শতদল, অনির্বাণও এসেছে। অন্তরার হাতে একটা বড়ো গোলাপ ফুলের তোড়া! তোড়ায় হলুদ রঙের গোলাপ। অন্তরা একগাল হেসে সেটা ঝুমুরের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'সরি, ফুলের রং খুঁজতে দেরি হয়ে গেল। সব রং পাচ্ছিলাম, কিন্তু হলুদ গোলাপ পাচ্ছিলাম না। এদিকে হলুদ ছাড়া আসি কী করে বল?'

ঝুমুর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন! হলুদ ছাড়া আসা যাবে না কেন?'

অন্তরা চোখ কপালে তুলে বলল, 'ওমা হলুদ রঙের মানে জানিস না? সাদা

যেমন শান্তির রং, লাল হল আনন্দের, তেমন হলুদ তো মন কেমনের রং। তোর জন্য আমাদের মন কেমন করবে তাই হলুদ ফুল এনেছি।'

ঝুমুরের মন গত কয়েকদিন ধরেই খারাপ। সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছে, মন খারাপ তো হবেই। কাল তো অবস্থার বেশ অবনতি হয়ে গিয়েছিল। সবসময় একটা কান্না কান্না ভাব। শেষ পর্যন্ত রাস্তায় বেরিয়ে ফুচকা খেয়ে পরিস্থিতি খানিকটা সামলানো গেছে। মন খারাপের রং যাই হোক, মন খারাপের ওষুধ হল ফুচকা। মন যত খারাপ হবে ফুচকাওলাকে তত বেশি ঝাল দিতে বলা হবে। হলুদ ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে ঝুমুর হঠাৎ খেয়াল করল, বড়োদের উপদেশ, বন্ধুদের ঠাট্টা ইয়ার্কির মাঝখানে মা কানের কাছে একটানা মাছের ঝোলের রেসিপি বলে চলেছে।

...তারপর মাছগুলো ভালো করে ভেজে নিবি। দেখবি, কাঁচা মাছে আবার জল ঢেলে দিস না। ঝাল, মশলা বেশি দিবি না। একটা আস্ত কাঁচা লঙ্কা...।'

নূপুর বলল, 'বুঝলি দিদি, রন্ধন প্রণালীর ইতিহাসে এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। রেল স্টেশনে মাছের ঝোল শিক্ষা! কেউ কখনো শুনেছে?'

নূপুরের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। এমনকী মা পর্যন্ত। বাবা একটু দূরে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছিল। এখনই ট্রেনে উঠে পড়তে হবে? অসম্ভব, এখন সে কিছুতেই ট্রেনে উঠতে পারবে না। ঝুমুর হাত উলটে ঘড়ি দেখল। এদিক ওদিক তাকাল। কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'প্লিজ বাবা। আর একটু। এখনও তো সময় আছে।'

মা বলল, 'সময় আছে তো কী হয়েছে? উঠেই পড়। গুছিয়ে-টুছিয়ে বসতে হবে না? এতটা জার্নি। চল আমি গিয়ে তোদের সিটটা দেখে আসি।'

অন্তরার সব কিছুতেই নেচে ওঠা স্বভাব। সে লাফ দিয়ে বলল, 'আমি মাসিমার সঙ্গে কোচে উঠব।'

শতদল ধমক দিয়ে বলল, 'তোর সবটাতে বাড়াবাড়ি অন্তরা। সবাই মিলে ট্রেনে ওঠার কী আছে? ট্রেন কি কলেজের ক্যান্টিন?'

অন্তরা বলল, 'তুই চুপ কর তো? স্টেশনে সী-অফ করতে এলে একবার ট্রেনে উঠতে হয়। নইলে মনটা খচ খচ করে। প্লেনের বেলাতে অন্য নিয়ম। এয়ারপোর্টে গিয়ে তো আর প্লেনে উঠে সিট দেখা যায় না। তাই আকাশের দিকে তাকিয়ে প্লেন উড়ে যাওয়া দেখতে হয়। চল, চল তোরাও উঠবি চল।'

বন্ধুরা সত্যি সত্যি টক টক লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

ঝুমুরের মুখ শুকিয়ে গেছে। সে আবার হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল। মুখ তুলে একবার প্ল্যাটফর্মের গেটের দিকে তাকাল। তাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। করতেই হবে। একবার ট্রেনে উঠে গেলে মুশকিল। এসি কোচগুলোতে বাইরে থেকে কাউকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন।

ট্রেন ছাড়তে আর কত দেরি? আবার হাতের ঘড়ি দেখল ঝুমুর।

কোনি চোখ সরু করল, 'বার বার ঘড়ি দেখছিস কেন ঝুমুর? তুই কি ট্রেনের গার্ড যে ঘড়ি দেখে ফ্ল্যাগ নেড়ে তবে ট্রেনে উঠবি?'

ঝুমুর ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'না না, ঘড়িটা গোলমাল করছিল। দেখছি ঠিক আছে কি না। ঠিকই আছে। দাঁড়া, দিদার জরুরি কথাটা শুনে নিই, তারপর উঠছি।'

দিদা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললেন, 'জরুরি কথা এখনও মনে পড়েনি। মনে হচ্ছে না, পড়বে। পড়লে চিঠি লিখে জানাব। তুমি আগে গাড়িতে ওঠো তো।'

ছোটোমাসি আর শর্মিষ্ঠাদিও তাড়া দিল। মামা চোখ পাকানোর ভান করে বলল, 'ঝুমুর আমি কিন্তু তিন গুনব। তার মধ্যে তুমি গাড়িতে উঠে গিয়ে সিটে বসবে।'

আবার সবাই হেসে উঠল। হাসল না শুধু ঝুমুর। তার রাগ হচ্ছে। ভীষণ রাগ হচ্ছে। একটু আগেই এত লোক দেখে সে খুব খুশি হয়েছিল। এখন একেবারে উলটোরকম মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে, স্টেশনে এতজন না এলেই ভালো হত! ট্রেনে ওঠার জন্য তাকে এত তাড়া খেতে হত না। সে আরও কিছুক্ষণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে পারত।

বাবা বলল, 'ঝুমুর, যাও উঠে পড়ো। আমি তোমার দাদু, দিদাকে ক্যাব ওয়েতে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি।'

নূপুর এগিয়ে এসে দিদির হাত ধরল। নরম গলায় বলল, 'চল, বাবা এবার রাগ করবে। ওরা ভেতরে তোর জন্য অপেক্ষা করছে। তা ছাড়া, প্ল্যাটফর্মে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী? সবাই তো এসে গেছে?'

না, সবাই আসেনি।

কিন্তু এ-কথা নূপুরকে বলা যাবে না। কাউকেই বলা যাবে না। এত মানুষ এলেও একজন এখনও বাকি রয়ে গেছে। সেই মানুষটা চুপিচুপি ঝুমুরকে বলেছিল, 'চিন্তা কোরো না। ঠিক সময় আমি স্টেশনে পৌঁছে যাব। কাছে গিয়ে কথা তো বলতে পারব না, দূর থেকে হাত নাড়ব। হাত নেড়ে সী-অফ করব।'

ঝুমুর ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'পাগল, হাত নাড়বে কী? কেউ যদি দেখে ফেলে?'

'ঠিক আছে, হাত নাড়ব না। শুধু হাসব।'

ঝুমুর এবার চোখ পাকাল, 'খবরদার হাসবে না। যাওয়ার সময় তোমার হাসি দেখলে আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব বলে দিচ্ছি।'

ট্রেনে ওঠবার আগে ঝুমুর শেষবারের মতো প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল। যতদূর তাকানো যায়। অনেক হাসিমুখ। অনেক হাত নাড়া।

কিন্তু সে কই?

ইস ওর কাছে মোবাইল ফোনও নেই যে ঝুমুর আড়ালে সরে গিয়ে ফোন করবে। ফিসফিস করে বলবে, 'কী হল তোমার? কোথায় তুমি? ট্রেন কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছে। আমি যে চলে যাচ্ছি...।'

চৈত্রের মেয়ে

আমি থমকে দাঁড়ালাম। বেলফুলের গন্ধ না? চৈত্র মাসের এই কড়কড়ে দুপুরে গড়িয়াহাটের মোড়ে বেলফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসছে! আমি চোখ বন্ধ করে জোরে শ্বাস নিলাম।

আশপাশের কোনো বাড়িতে কি বেলফুলের গাছ আছে? সেখানে ফুল ফুটেছে? আচ্ছা, ফুলওয়ালা বসেনি তো? কিন্তু তাতেই-বা কী? বেল সন্ধেবেলার ফুল। এই ভরদুপুরে তার গন্ধ কোথা থেকে আসবে? নিশ্চয় আমার কোনো ভুল হচ্ছে। আমি চোখ বোজা অবস্থাতেই বার বার শ্বাস নিতে লাগলাম। হ্যাঁ, বেল ফুলের গন্ধই বটে। স্নিগ্ধ অথচ তীব্র। সঙ্গে ভেজা ভাব। বেল, টগর, জুঁই ফুলে এই ব্যাপারটা আছে। ওদের গন্ধে সবসময় একটা ভেজা ভাব থাকে। মনে হয়, এইমাত্র বৃষ্টিতে ভিজছিল।

চোখ বুজে ফুলের গন্ধ নেওয়ার এই অদ্ভুত থিয়োরি আমার নয়। রেবার। রেবার সব পরিচয় এখানে দেওয়া যাবে না। কিছু গোপন ব্যাপার আছে। তার অনুমতি ছাড়া সেই গোপন ব্যাপার বলে দেওয়া ঠিক নয়। শুধু এইটুকু বলতে পারি, পৃথিবীর সেরা দশ মহিলার লিস্ট তৈরির যে কাজ চলছে, সেখানে রেবার নাম থাকবে। সে এতই ভালো মেয়ে যে কোনো কোনো সময়ে তার সান্নিধ্যে অস্বস্তি হয়। সেই কারণে মাঝেমধ্যেই আমি তাকে এড়িয়ে চলি। তার কাছে যাব বলে যাই না। ফোনে কথা বলতে বলতে লাইন কেটে দিই। অথচ সবসময়েই মনে হয়, রেবার কাছে যাই। গিয়ে বকবক করি বা চুপ করে থাকি দীর্ঘসময়। পাশে বসে থাকি বা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দুজনে এমন কোনো জায়গায় চলে যাই যেখানে যাব বলে বাড়ি থেকে বের হইনি। কখনো কখনো রেবার বাড়ির গেট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসি। মনে হয় এটা রেবার বাড়ি নয়। আসলে রেবা নামে কেউ নেই। সে আমার হ্যালুসিনেশন। বিভ্রম। মানুষ বিভ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। আমি রেবার

বিভ্রমকে যত্ন করে টিকিয়ে রাখি। তার সঙ্গে উলটো ব্যবহার করি। তবু রেবা আমার ওপর রাগ করে না। চমৎকার মেয়েদের এই এক সমস্যা। তারা চট করে রাগ করতে পারে না।

একদিন কোন এক ফ্লাওয়ার শোতে দুজনে ঢুকে পড়েছিলাম। শীতের শেষ বিকেলে। খানিকটা এলোমেলো ঘোরার পর রেবা বলল, 'সাগর, একবার চোখ বোজো।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'চোখ বুজব! কেন চোখ বুজব কেন? চোখ বুজে ফুল দেখব কী করে?'

রেবা হেসে বলল, 'ফুল অনেক দেখা হয়েছে, এবার চোখ বুজলে একটা মজা হবে।'

'কী মজা?'

'ফুলের গন্ধ পাবে।'

আমি আরও অবাক হলাম।

'ফুলের গন্ধ পাব মানে! চোখ খুলেও তো পাচ্ছি। এই তো গোলাপের গন্ধ পাচ্ছি। আহ্ কী সুন্দর।'

রেবা আমার হাত ধরে বলল, 'পুরো পাচ্ছ না। অর্ধেক পাচ্ছ। পৃথিবীর সব গন্ধই চোখ খুলে পাওয়া যায়, একমাত্র ফুলের গন্ধ পুরো পেতে গেলে চোখ বুজতে হয়। সাগর, তুমি রাজাবাদশাদের ছবি দেখনি? অয়েলপেন্টিং-এ দেখবে তারা হাতে ফুল নিয়ে, চোখ বুজে গন্ধ শুঁকছেন।'

আমি এবার না-হেসে পারলাম না।

'রেবা, আমি রাজাবাদশার স্টাইলে চলব কেন? আমি কি রাজাবাদশা? আমি একজন অতি তুচ্ছ যুবক। টিউশন, প্রুফ দেখা আমার ব্যাবসা। অলস হওয়ার কারণে সেই ব্যাবসা সর্বদাই লোকসানে চলে। বাড়ি ভাড়া তিনমাস বাকি। রাস্তার হোটেলে মাসকাবারি খাওয়ার সিস্টেম। সেখানেও ধার। তুমি যদি মাঝেমধ্যে লুকিয়ে ধারের খাতা ক্লিয়ার না-করে দিতে তাহলে সিস্টেম ব্রেক করত। আমি পড়তাম বিরাট বিপদে। এরপরেও আমি রাজাবাদশার স্টাইলে চললে সবাই হাসবে। আমি চলব ভিখিরি স্টাইলে। তুমি যদি ফুল হাতে কোনো ভিখিরির তৈলচিত্র দেখতে তাহলে তোমার অন্য অভিজ্ঞতা হত। দেখতে, ভিখিরিটি মুগ্ধ নয়নে বড়ো বড়ো চোখে গোলাপের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন বলছে, হা ঈশ্বর পৃথিবীতে এমন সুন্দর জিনিসও আছে! কই কেউ তো কখনো আমার হাতে দেয়নি! দুর্ভাগ্যের কথা কী জান রেবা, শিল্পী যখন ভিখিরির ছবি আঁকেন তখন তার হাতে গোলাপ দেন না। দেন ভাঙা ভিক্ষাপাত্র। হতদরিদ্র মানুষও যে ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারে, তা আমাদের অজানাই থেকে গেছে। আমার সঙ্গে কখনো যদি কোনো শিল্পীর আলাপ হয় তাহলে অবশ্যই তাকে ফুল হাতে ভিখিরি আঁকার জন্য অনুরোধ করব।'

অন্য কেউ হলে আমার এই হাবিজাবি ভাষণে গুরুত্ব দিত না। রেবা দেয়। বলল, 'তুমি রাজা না-হতে পার, কিন্তু আমি যতক্ষণ তোমার পাশে থাকি, নিজেকে রানি বলে কল্পনা করি। তুমি আমাকে মূল্য না-দাও আমার কল্পনাকে অবশ্যই মূল্য দেবে। সুতরাং তুমিও রাজার মতো আচরণ করো। নাও চোখ বুজে জোরে শ্বাস টানো।'

এরপর আর তর্ক করা অর্থহীন। আমি রাজা-রানি খেলায় অংশ নিই। চোখ বুজে শ্বাস টানি এবং আশ্চর্যজনকভাবে ফুলেদের গন্ধে আমার বুক ভবে যায়।

সেই শুরু। তারপর থেকে সময় সুযোগ হলেই ফুলের কাছে চোখ বুজি। তবে কখনো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এই কাণ্ড করিনি। আজ করছি। যদিও আমার খুব তাড়া আছে। আবার বেল ফুলের গন্ধ ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না। গন্ধটা এমনি হলে একটা কথা ছিল, কিন্তু গন্ধ এমনি নয়। এর মধ্যে রহস্য আছে। গন্ধের উৎস বোঝা যাচ্ছে না। এটাই বেশি টানছে। দার্শনিকভাবে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, 'ওরে তোকে যেতেই হবে। পৃথিবীর নিয়মটাই এ-রকম। যাকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না, তাকে ছাড়তে হয় সবার আগে।'

চোখ খুললাম, চাপা হুংকারে।

'এই যে মশাই, চোখ বুজে ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?'

পুলিশ। খাকি প্যান্ট, জামা। কোমরে বেল্ট। মাথায় টুপি। টুপির অবস্থা ভালো নয়। ছোকরা পুলিশটির চেহারা চিমসে। কিন্তু হম্বিতম্বি বিরাট। ঠোঁটের কোনায় গুন্ডাদের মতো তেরচা হাসি। মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম, রাস্তার ওই পাশে আরও কয়েকজন আছে। বেঞ্চ পেতে বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। পাশে রেডিয়ো। এফ.এম.-এ লো ভল্যুমে গান বাজছে। রবীন্দ্রনাথের গান। 'বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।/কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি...' বাঃ, খুবই উচ্চাঙ্গের পুলিশ। চিনতে পারলাম। এরা হল পুলিশের বিশেষ বাহিনী। কলকাতা শহরের ফুটপাথ পরিষ্কার রাখে। হকা'র, ভবঘুরে, ভিখিরি দেখলেই 'মার শালাকে, ধর শালাকে' বলে তেড়ে আসে। ফুটপাথ ঝকঝকে তকতকে থাকে। সবাই খুশি হয়।

'কী হল ভাই, ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে? নাকি এখনও কথা ফোটেনি?'

পুলিশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। আমি একটু নড়েচড়ে উঠলাম। ছোকরা আমাকে ফালতু হিসেবে স্পট করে ফেলেছে। এফিশিয়েন্ট পুলিশের এটাই গুণ। চট করে দামি আর ফালতু চিনে ফেলে। আজ আমি যে খুব খারাপ পোশাক পরে আছি এমন নয়। মঞ্জুবউদির নির্দেশমতো বরং একটু সেজেগুজেই আছি। জিন্সের ওপর পাঞ্জাবি। কাঁধের ব্যাগটা তো অতি সুন্দর। নীল কাপড়ের ওপর নীল রঙের ফেব্রিকের কাজ। ফেব্রিকের কাজ শুরু করেছিল রেবা। শেষ হওয়ার আগেই বললাম, 'এবার দিয়ে যাও।'

রেবা বলল, 'শেষ করব না?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'না করবে না। শেষ না-করা জিনিস, শেষ করা জিনিসের থেকে বেশি সুন্দর। দেখবে, আধখানা ছবি, আধখানা গান, আধখানা পড়া বই আমাদের খুব প্রিয়। ওদের জন্য মন কেমন করে।'

রেবা আমার কথায় একমত হয়ে ব্যাগ দিয়ে দিল।

আমি সেই 'শেষ না করা' ব্যাগ নিয়েছি। সব মিলিয়ে চেহারায় একটা ভদ্র যুবক ভাব আসার কথা। এখন বুঝতে পারছি, আসেনি। শাক দিয়ে যেমন মাছ ঢাকা যায় না, তেমন জামাকাপড় দিয়ে আমাকে ঢাকা যায়নি। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা? আমি যে ভদ্রলোক নই, আমি যে একজন হাবিজাবি সেটা ওরা ধরে ফেলেছে। এই ছেলের ফিউচার খুবই ব্রাইট মনে হচ্ছে। চাকরিতে অনেক দূর উঠবে। আমার যদি খুব ভুল না হয়, তাহলে এ খুব দ্রুত 'তুই তোকারি' শুরু করবে।

এবার পুলিশের হাতে ধরা লাঠিটার দিকে নজর পড়ল। বেঁটে লাঠি। চকচকে নয়, বরং খেসটে মার্কা। সরকার অত বোকা নয়। ভিখিরি, ভবঘুরেদের জন্য চকচকে লাঠি সাপ্লাই করে টাকার অপচয় করবে না। লাঠির ডগা সামান্য উঁচু হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। একটু একটু নড়ছে। পুলিশটাই নাড়াচ্ছে? নাকি লাঠি নিজেই নড়ছে? হতে পারে, নিজেও নড়তে পারে। আশ্চর্যের কিছু নয়। আমার ছোটোমামা ছিলেন পুলিশের অন্ধ ভক্ত। সবার দুর্নাম শুনতেন, পুলিশের দুর্নাম শুনতেন না। পথে পুলিশ দেখলে বাহান্ন বছর বয়েসেও শিশুর মতো মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকতেন। একবার এক গোলমালে ঢুকে পুলিশের কেরামতি দেখছিলেন। চোখ মুখ গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। পুলিশ এগিয়ে এসে দিল পিটিয়ে। তারপর ঘাড় ধরে তুলল ভ্যানে। ছোটোমামা তাদের বার বার বোঝানোর চেষ্টা করেন, 'আমি আপনাদের দলে, আমি আপনাদের দলে...।' কে শোনে কার কথা? আরও গোটাকতক ঘা পড়ল পিঠে। যাক সে অন্য গল্প। সেই ছোটোমামাই বলেছিল, পুলিশ সব পারে। কুকুরের মতো এটাও হয়তো পুলিশের ট্রেনিং প্রাপ্ত লাঠি। ফালতু পার্টি দেখলে কুকুর যেমন হাউ হাউ করে। কামড় দেওয়ার ভয় দেখায়। লাঠিও তেমন করছে। নড়েচড়ে ভয় দেখাচ্ছে। বলছে, তেণ্ডাই মেণ্ডাই করলেই পিটানি হবে। পুলিশকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? না, থাক এখন এসব কিছু করা ঠিক হবে না। এমনিতেই মনে হচ্ছে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছি। ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সময় নেই। ঝামেলা থেকে বেরোতে হবে।

পুলিশ এবার কয়েক পা এগিয়ে এসে জোর ধমক দিল। যা ভেবেছিলাম তাই, তুই তোকারি শুরু হয়েছে।

'কী রে! কথা কানে যাচ্ছে না? হারামজাদা ফুটপাথে কী করছিস?'

বেঞ্চে বসা কে যেন বলে উঠল—'অত কথার কী আছে? পাছায় দুটো ব্যাটন লাগা, বলে দেবে।'

রবীন্দ্রনাথের গান কি শেষ হয়েছে? শুনতে পাচ্ছি না। খামোকা গালমন্দ

করছে কেন? আমি যদি সত্যি ভিখিরি বা ভবঘুরে হই তাহলেই-বা গাল দেবে! আমি নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। এই লোক ঝামেলায় ফেলতে চাইছে। ঝামেলা থেকে বেরোতে হবে। আমার খুব তাড়া। আমি যাচ্ছি শ্যামলদার বাড়ি। শ্যামলদার কাছে যাচ্ছি না, যাচ্ছি মঞ্জুবউদির কাছে। মঞ্জুবউদি আমাকে ডেকেছে। একটু পরেই আমাকে নিয়ে জরুরি একটা কাজে বেরোবে। আমার কাছে অবশ্য 'জরুরি কাজ' নয়। আমার কাছে বিরাট সুযোগ। এ-রকম সুযোগ জীবনে আগে কখনো আসেনি। ভবিষ্যতে আসবে বলে মনেও হয় না। দেরি করলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

আমি পুলিশ ছোকরার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। অনেক সময় হাসিতে কাজ দেয়।

'কিছু করছিলাম না।'

'কিছু করছিলি না মানে! নিজের চোখে দেখলাম, ফুটপাথের মাঝখানে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছিস, এখন বলছিস কিছু করছিলাম না! নিশ্চয় রাতে এখানে এসে শোবার প্ল্যান করেছিস। চোখ বুজে জায়গার হিসেব কষছিলি। দলবল নিয়ে আসবি। ঠিক কিনা?'

মঞ্জুবউদি আমাকে যে-কাজে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে যাওয়ার কোনো যোগ্যতা আমার নেই। এই কাজে যেতে হলে কিছু-না-কিছু হতে হয়। বড়ো, মেজো, সেজো—কোনো একটা কিছু। আমার মতো 'নাথিং'কে নিয়ে যাওয়া যায় না। প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে যায়। কাজ পণ্ড হয়ে যেতে পারে। মঞ্জুবউদি সে কথা জানে না এমন নয়। খুব ভালো করেই জানে। তবু নিয়ে যাচ্ছে। কারণ আজ সকালে শ্যামলদার সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া হয়েছে। পর পর তিনটে কাপ ভেঙেছে। কিছুদিন হল মঞ্জুবউদি রেগে গেলে কাপ ভাঙা শুরু করেছে। এর জন্য হাতিবাগানের ফুটপাথ থেকে ডজন দরে সস্তার কাপ কিনেছে। ঝগড়ার সময় মঞ্জুবউদি হাত বাড়িয়ে দেয়। বাড়ির কাজের লোক রতনের মা কাপ এনে হাতে তুলে দেয়। ভুল করে দামি কাপ দিলে মঞ্জুবউদি শান্ত গলায় বলে, 'এটা কী দিলে রতনের মা! এটার জোড়া কত জান? তা ছাড়া তোমার দাদাবাবু অফিস থেকে ফিরে এই কাপে চা খায়, তুমি জান না? এতদিন কাজ করে এই ভুল তোমার হয় কী করে! যাও কাপ বদলে আনো। দেখবে, ওপরের তাকে ডান দিকে সাজানো আছে। সাবধানে নামাবে। হাত থেকে পড়ে ভেঙে না যায়।'

সংসারে কাপ বিপর্যয় শুরু হওয়ার পর আমাকে একদিন শ্যামলদা ফোন করলেন। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'সাগর, তোমার মঞ্জুবউদির মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'সে তো আগে থেকেই ছিল।'

'রসিকতা নয়, সে এখন রেগে গেলে কাপ ভাঙে। এর জন্য ডজন দরে কাপ কিনে এনেছে। বলছে, এবার ফ্যাক্টরিতে যাবে। আরও সস্তায় পাবে। তখন লট ধরে

কিনবে। একশো কাপ একসঙ্গে নিলে দাম কম পড়বে, সংসারে সাশ্রয় হবে। রান্নাঘরের তাকে কাপ সাজিয়ে রাখে। চায়ের কাপ, দুধের কাপ, ভাঙার কাপ।'

ফোন হাতে আমি লাফিয়ে উঠলাম।

'এটা তো দারুণ ঘটনা! ভাঙার জন্য কেনার কথা আগে কখনো শুনেছেন শ্যামলদা? মঞ্জুবউদি ক্রয় বিক্রয়ের অর্থনীতিতে নতুন দিশা দেখাচ্ছে। হয়তো দেখবেন, আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এ-বিষয়ে তত্ত্ব আবিষ্কার করে বসবে। কেইনস মডেল, সেনস মডেলের মতো সেই তত্ত্বের নাম হবে মঞ্জু মডেল। আপনি অবশ্যই মঞ্জুবউদিকে বলবেন, পরবর্তী পর্যায়ে কাপ কেনার সময় আমাকে যেন সঙ্গে নেয়। পরে বলতে পারব, আমি মঞ্জু মডেলের একজন সহযোদ্ধা।'

শ্যামলদা আমার কথায় উৎসাহ পেলেন বলে মনে হল না। ফোঁস ধরনের আওয়াজ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'সাগর, আরও আছে।'

'আরও আছে! কীরকম?'

'তোমার মঞ্জুবউদি ক-টা কাপ ভাঙবে সেটা নির্ভর করে তার রাগ কতটা তার ওপর। বেশি রাগ হলে ছ-টা আটটা পর্যন্ত ভাঙছে।'

আমি হইহই করে উঠলাম।

'এ তো আরও মারাত্মক ব্যাপার শ্যামলদা। তাহলে এতদিন পরে মানুষের রাগ মাপার ইউনিট চলে এল। এক কাপ রাগ, দু-কাপ রাগ, তিন কাপ রাগ...ওহ্ আমি ভাবতেও পারছি না মঞ্জুবউদি কী কাণ্ড করেছে! রাগ যখন মাপা যাচ্ছে তখন নিশ্চয় একদিন ভালোবাসা, দুঃখ, মান অভিমান সব মাপা যাবে। হুর্‌রে! চিন্তা করবেন না শ্যামলদা, আমি আজই আপনাদের বাড়ি যাচ্ছি।'

শ্যামলদা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি চিন্তা করছি। শুধু আজ নয়, তুমি আর কোনোদিনই আমাদের বাড়িতে আসবে না। ফাজিল ছেলে কোথাকার।'

শ্যামলদা ফোন কেটে দেওয়ার পর আমি বোঝার চেষ্টা করলাম, এই মুহূর্তে তার রাগের পরিমাণ কত? এক কাপ না দু-কাপ?

আজ সকালে কাপ ভাঙা পর্ব শেষ করে মঞ্জুবউদি আমাকে ফোন করল। গলা রাগে গনগন করছে।

'অ্যাই সাগর, আজ বিকেলে তোর কাজ কী?'

'অনেক কাজ।'

আলস্য, বেকারত্বের এটাই মূল সিম্পটম। সবসময় মনে হয়, অনেক কাজ। আমি কাঠ বেকারকে দেখেছি, সারাদিন বসে কাজের লিস্ট বানাচ্ছে।

মঞ্জুবউদি বলল 'সব কাজ বাদ দে। আজ তুই আমার সঙ্গে মেয়ে দেখতে যাবি।'

আমি খাটের ওপর বাবু হয়ে বসেছিলাম। তাড়াতাড়ি খাট আঁকড়ে ধরলাম।

'কী বলছ মঞ্জুবউদি! মেয়ে দেখতে যাব মানে! কার মেয়ে, কীসের মেয়ে!'

'আমার পিসতুতো ভাই বল্টুর বিয়ে দেব ঠিক করেছি। তার জন্য মেয়ে দেখতে যাব। তুই আমার সঙ্গে যাবি। ভদ্রসভ্য পোশাক পরে এখানে চলে আসবি। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব।'

আমার বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় ধুকপুক করে উঠল। 'মেয়ে দেখা' বিষয়টা বইতে পড়েছি, মুখে শুনেছি, সিনেমাতেও দেখেছি। হাতেকলমে অভিজ্ঞতা হয়নি। খুব লোভ ছিল। যত দিন যাচ্ছে লোভ বাড়ছে। আমার বিশ্বাস, এই ব্যবস্থা মুখ দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ে। পাত্রী সেজেগুজে এসে মাথা নামিয়ে বসে। কাঁপে ঠকঠকিয়ে। রাজভোগে রস ঠিক আছে তো? হোমরাচোমরারা আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকায় আর জিভ বের করে গড়িয়ে পড়া রস চাটে। এই ঘটনার আয়ু আর বেশিদিন নয়। সভ্যতা খুবই কঠিন চিজ। সে যেমন খারাপ জিনিস সাপ্লাই করতে জানে, তেমন খারাপ জিনিস নিষ্ঠুরভাবে বাতিল করতে পারে। 'মেয়ে দেখা' একদিন ইতিহাস বইতে ছবি হয়ে যাবে। ছবির নীচে লেখা থাকবে—

একটি লুপ্ত হওয়া প্রাচীন ব্যবস্থা। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, প্রাচীনপন্থী, আধুনিক—সর্বপ্রকার মানুষ এই ব্যবস্থায় গর্বের সহিত অংশ নিতেন। অনুষ্ঠান চলিবার কালে পাত্রপক্ষের লোকজনকে জলযোগ হিসেবে রাজভোগ এবং শিঙাড়া দেবার নিয়ম ছিল বাধ্যতামূলক। মফস্বলে লুচি আলুরদমেরও প্রচলন ছিল। মেয়ে যাহাতে পাত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয় তাহার জন্য মেয়ের আত্মীয়স্বজন মেয়ের হাতের রান্না, মেয়ের হাতের সেলাই সম্পর্কিত বহুবিধ মিথ্যা কথা বলিত, মিথ্যা তথ্য প্রমাণ দাখিল করিত। পাত্রপক্ষ বুঝিতে পারিলেও আপত্তি করিত না। মনোযোগ সহকারে সেগুলি দেখিত এবং প্রশংসা করিত। প্রথা ছিল, ছেলেপক্ষের সামনে মেয়ের পিতাকে হাত কচলাইতে এবং গদগদ মুখে হাসিতে হইবে। ভঙ্গি এমন রাখিতে হইবে যাহাতে মনে হয়, তিনি খুবই বড়ো কোনো অন্যায় করিয়াছেন। এবার ছেলেপক্ষের কাছ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

অবলুপ্ত হওয়ার আগে আমাকে এই ঘটনার সাক্ষী হতেই হবে। আমার মামাতো ভাইয়ের জন্য মেয়ে দেখতে যাওয়া হয়েছিল। আমি পুলিশ ভক্ত ছোটো-মামাকে বললাম, 'আমিও যাব।'

ছোটোমামা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ধমক দিল, 'খেপেছিস? তুই কী যাবি? তোর কী পরিচয়?'

'বলবে পাত্রের দাদা।'

'পাত্রের দাদা কী করে বলব? ভ্যাগাবন্ড? বেকার? তারপর আর ওরা মেয়েকে এ-বাড়িতে বিয়ে দেবে ভেবেছিস? জেনে রাখবি সাগর, মেয়ের বাবা মা মেয়ের ওপর গালমন্দ, লাথি, ঝাঁটা সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু বেকার সহ্য করতে পারে না। টিমে বেকার দেখলেই আঁতকে পিছিয়ে যায়। অতএব তুমি বাদ।'

তখনই বুঝছিলাম, 'মেয়ে দেখা' কাণ্ডে হাজির থাকতে হলে কিছু-না-কিছু হতে

হবে। আমি কিছু হতে পারিনি, তবু মঞ্জুবউদি এতদিন পরে আমাকে এই সুযোগ দিচ্ছে। তাকে ধন্যবাদ। আসলে কথা ছিল, শ্যামলদা আজ হাফ ছুটি নিয়ে আসবে। তারপর দুজনে মিলে সেজেগুজে পাত্রী দেখতে যাবে। ঝগড়ার কারণে প্ল্যান ভেস্তে গেছে।

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'তুমি ভেবেচিন্তে বলছ তো মঞ্জুবউদি? আমার পরিচয় কী দেবে? আমি তো একজন বেকার ছেলে। বেকার ছেলেকে নিয়ে পাত্রী দেখা কি উচিত হবে। ওরা বিগড়ে যাবে না তো?'

মঞ্জুবউদি আরও রাগি গলায় বলল, 'আলবাত ভেবেচিন্তে বলছি। আমার বেকার মানুষই ভালো। তোর শ্যামলদা কী মনে করে? সে অফিসার বলে আমার মাথা কিনে নিয়েছে? আমার ওপর অফিসারগিরি ফলায়? এত বড়ো সাহস তার! আমাকে বলছে, তোমার ওই হামদো পিসতুতো ভাইয়ের জন্য রোজ রোজ অফিস কামাই করব না। সাহস কত! বল্টু হামদো?'

'হামদো জানি না মঞ্জুবউদি, মনে হচ্ছে, শব্দটা মামদো ভূতের থেকে এসেছে। যদি বল ডিকশনারি কনসাল্ট করতে পারি।'

'ঠিক আছে, জানতে হবে না। তুই দেরি না-করে চলে আয়।'

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'বল্টু কি আমাদের সঙ্গে যাবে মঞ্জুবউদি?'

'না, শুধু আমি আর তুই যাব। বল্টুর মেয়ে দেখা হয়ে গেছে। মেয়ে তার খুবই পছন্দ। ওরা দুজন একদিন বেরিয়েছিল। ট্যাক্সি করে গঙ্গার পাড়ে ঘুরেছে। আমি আজ ফাইনাল দেখব। তারপর টিক দেব।'

'মঞ্জুবউদি, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।'

মঞ্জুবউদি বিরক্ত গলায় বলল, 'তোর আবার কীসের প্রশ্ন?'

'বল্টুর মেয়ে পছন্দ হয়েছে। কিন্তু মেয়ের কি বল্টুকে পছন্দ হয়েছে?'

মঞ্জুবউদি থমথমে গলায় বলল, 'তোর জেনে কী হবে?'

এই রে, মঞ্জুবউদি চটে গেল নাকি! আমি হেসে ম্যানেজ দেওয়ার চেষ্টা করলাম, 'না, কিছু হবে না, আসলে একটা হোমওয়ার্কের মতো করে নিতে চাই-ছিলাম। মেয়ে দেখার ব্যাপারে আমার তো কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই।'

'হোম, আউট কোনো ওয়ার্কই করতে হবে না। ওখানে গিয়ে মুখ টিপে বসে থাকবি। একটা কথাও বলবি না। আমি যা বলব, মাথা নাড়বি।'

'যদি জিজ্ঞেস করে?'

'তাও বলবি না। গাধা কোথাকার।'

মঞ্জুবউদি ফোন কেটে দিল। আমার এ-প্রশ্ন করার কারণ আছে। আমি শুনেছি, মঞ্জুবউদির এই হামদো পিসতুতো ভাইটি অতি মাত্রায় বদ। বদ ছেলের জন্য মেয়ে ফাইমাল করতে যাওয়াটা অতিরিক্ত আকর্ষণের।

আমি এখন সেখানেই যাচ্ছি। মাঝখানে এই পুলিশের ঝামেলা।

ছোকরা আমার আরও কাছে এগিয়ে এল। লাঠি বাগিয়ে বলল, 'কীরে মুখ

খুলবি? নাকি অন্য ব্যাবস্থা করব? এক রাত লকআপে থাকলে ফুটপাথে রাত কাটানোর প্ল্যান বেরিয়ে যাবে। জামা প্যান্ট তো ভদ্রলোকের মতোই পরেছিস। চুরির মাল নাকি?'

আমার খুব বলতে ইচ্ছে করছে, 'ভাই, এই ফুটপাথ কি আপনার ঠাকুরদা বানিয়েছেন? যদি বানিয়ে থাকেন তাহলে আসুন আমরা একটা ফলক বসাই।' অন্য সময় হলে বলতাম। কিন্তু এখন বললে ঝামেলা বাড়বে। রাগলে চলবে না। অন্য পথ নিতে হবে। সাগরের পথ। মিটিমিটি হেসে বললাম, 'ভাই, একটা অদ্ভুত ঘটনা হয়েছে। সেই কারণেই ফুটপাথে থমকে দাঁড়িয়েছি।'

পুলিশ ভুরু কোঁচকাল। বিশ্বাস করছে না।

'কী ঘটনা?'

'আপনি একটু এগিয়ে আসুন তাহলেই ঘটনা বুঝতে পারবেন ভাই। আমার ধারণা, আর কিছুক্ষণের মধ্যে বহু মানুষ এখানে এসে জড়ো হবে।'

পুলিশ হোক আর মিলিটারি হোক, বয়স তো কম। বুদ্ধিও বেশি নয়। ছেলেটা আমার কথায় ঘাবড়াল। এবার আর শুধু ভুরু নয়, চোখ-মুখ কুঁচকে গেল। মনে হল আমাকে উন্মাদ ঠাওরেছে। বলল, 'মানুষ জড়ো হবে! মানে! কী হয়েছে?'

আমি হাসি মুখে বললাম, 'চৈত্র মাসের ভরদুপুরে গড়িয়াহাটের মোড়ে যা হওয়ার নয়, তাই হয়েছে। বেলফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এরপরেও মানুষ জড়ো হবে না? জানাজানি হলে অবশ্যই জড়ো হবে।'

পুলিশ ছোকরা এবার বেশি ঘাবড়াল। দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, 'বেল ফুল! ফুলের গন্ধ!'

আমি বড়ো করে হাসলাম।

'কেন ভাই ফুলের গন্ধ কাকে বলে জান না? রবীন্দ্রনাথের গান শোনো, অথচ ফুলের গন্ধ কী জান না! কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে।/গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে—শোননি?'

এবার ছোকরা আমাকে ভয় পাচ্ছে। পুলিশ যখন বড়োলোকে ভয় পায়, সেই ভয় সামলে নিতে জানে, ফালতুদের বেলায় ঘটনা ঘটে অন্য। ভয় মাথায় চড়ে বসে। ভয় বাড়িয়ে দিতে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

'ভয় করছে?' মুচকি হাসলাম।

পুলিশ আরও ছিটকে গেল। আমিও এগিয়ে গেলাম। বেঞ্চে বসা বাকিদের দিকে গলা তুলে বললাম, 'ভাইসব, আপনারাও আসুন ভাই। সবাই মিলে চমৎকার জিনিস উপভোগ করা যাক। ভিড় হয়ে গেলে চান্স পাব না। তার আগেই ফুটপাথে কিছুক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে যান।'

পুলিশ এবার লাঠি বাগিয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে চিৎকার করে উঠল—

'যা ভাগ, ভাগ এখান থেকে। যত্তসব পাগলের কারবার। পালা বলছি...। নইলে কিন্তু...।'

আমি আর দেরি করলাম না। এটাই সুযোগ। হন হন করে হাঁটতে লাগলাম। আমি নিশ্চিত কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশবাহিনী ফুটপাথের ওই জায়গায় এসে চোখ বুজে দাঁড়াবে। বেলফুলের গন্ধ খুঁজবে। গন্ধ কি পাবে? কে জানে রহস্যময় গন্ধ হয়তো ওদের সঙ্গে আরও রহস্য করবে।

'মেয়ে দেখা' অনুষ্ঠান থেকে মঞ্জুবউদি আমার নাম কেটে দেয়নি তো?

২

ট্রেন ছুটছে। আমি তৃণাঞ্জনীকে নিয়ে পালাচ্ছি।

এই মেয়ের সঙ্গে আমার দু-দিন আগে দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে মঞ্জুবউদির 'মেয়ে দেখা' অনুষ্ঠানে। একেই আমরা বল্টুর বউ করার জন্য ফাইনাল দেখতে গিয়েছিলাম। মঞ্জুবউদি 'টিক' মেরেছে।

তৃণাঞ্জনী বসেছে জানলার পাশে। জানলার ওপাশে চৈত্রের হলুদ রোদ। সেই রোদ পড়ছে খেতে, মাঠে, সরে সরে যাওয়া গ্রামের ওপর। আমাদের ছুটে যাওয়া রেলপথের পাশে কোথা থেকে জানি হঠাৎ একটা লাল মাটির পথ এসে হাজির হয়েছে। অতি সামান্য হলেও সে এখন আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। তৃণাঞ্জনী মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। তার গায়ে হলুদ আলো এসে পড়েছে। সে যেন চৈত্রের মেয়ে। মায়ার আলো মেখে আমার পাশে বসে আছে। মানুষের যখন একইসঙ্গে মন ভালো ও মন খারাপ হয় তখন তাকে ঘিরে এই মায়া তৈরি হয়। বাবা-মা, বাড়ি, চেনা শহর ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে তার মন খারাপ। আবার উলটোদিক থেকে ডাক আসছে—

'এসো, চলে এসো। আর কত দেরি? আর কতদূর?'

এই ডাক শোনার জন্য একটা মেয়ে অপেক্ষা করে থাকে সারাজীবন। এই ডাকের জন্য চিঠি, টেলিফোন লাগে না। এই ডাক মনের মধ্যে বাজে। তাই মন খারাপের সঙ্গে মন ভালো লাগে।

হিসেব মতো আমার প্রতি তৃণাঞ্জনীর খুশি থাকবার কথা। কিন্তু তা সে নেই। ট্রেনে ওঠবার আগে পর্যন্ত একরকম ছিল। তারপর থেকে বিরক্ত হয়ে আছে। কথা বলছে না। আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

'তৃণাঞ্জনী, তোমার কি ভয় করছে?'

তৃণাঞ্জনী আমার দিকে না-তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

'তৃণাঞ্জনী, কোনো চিন্তা কোরো না।'

তৃণাঞ্জনী এবারও আমার দিকে তাকাল না। নীচু গলায় বলল, 'আমি চিন্তা করছি না।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তৃণাঞ্জনী মুহূর্তের জন্য ঠোঁট কামড়ে বলল, 'সব ঠিক না হলেও আমার আর কিছু এসে যায় না।'

পঁচিশ বছরের একটি তরুণী যখন বলে সব ঠিক না হলেও তার কিছু এসে যায় না, তখন তাকে বাড়াবাড়ি ধরনের সুন্দর লাগে। তার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে। আমি নরম গলায় বললাম, 'আমার দিকে তাকাতে কি তোমার কোনো অসুবিধে আছে তৃণাঞ্জনী?'

মেয়েটা এবার মুখ ফেরাল এবং কঠিন গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আছে।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'তুমি কি আমার ওপর রাগ করছ?'

'হ্যাঁ করছি। বকবক করে আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন কেন? এতবার নাম ধরে ডাকছেনই-বা কী জন্য?'

আমি বোকার মতো হেসে বললাম, 'তোমার নামটা চমৎকার, তাই বার বার বলতে ইচ্ছে করছে।'

'আমার নাম চমৎকার হোক, খারাপ হোক আপনি ডাকবেন না?'

অপমানের কথা। আমি গায়ে মাখলাম না। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধ করছি। ইতিহাসে আমার নাম উঠতে চলেছে এই কারণে উত্তেজনা। ইতিহাসে নাম থেকে যাওয়ার কাছে মান অপমান তুচ্ছ বিষয়। 'মেয়ে দেখা'র ইতিহাসে লেখা হবে—

'...এই কু প্রথাটি অবলুপ্তির পিছনে যেমন বহু জ্ঞানী গুণী মণীষীর অবদান রহিয়াছে তেমন এক বেকার, অলস যুবকের ভূমিকার কথাও জানা গিয়াছে। ভবিষ্যৎ গবেষণার স্বার্থে সেই ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক চৈত্রের বৈকালে সেই যুবক একটি 'মেয়ে দেখা'র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যায়। নিয়ম মানিয়া সেখানে সে শিঙাড়া এবং রাজভোগ ভক্ষণ করে। কিন্তু দুই দিন পর সেই অনুষ্ঠানকে ফুৎকারে অস্বীকার করিয়া মেয়েটিকে লইয়া পলায়ন করে। কোথায় এবং কেন পলাইয়া যায় তাহা অবশ্য জানা যায় না। আজও সেই গবেষণা চলিতেছে। যুবকটির নাম...।

গবেষণার দরকার নেই, আমি বলছি।

আমি আর তৃণাঞ্জনী পালাচ্ছি শান্তিনিকেতনে। আমার কাজ হবে তৃণাঞ্জনীকে তার প্রেমিকের হাতে তুলে দেওয়া। তৃণাঞ্জনীর প্রেমিকের নামও তার মতোই ভালো। নীলার্ভ। নীলার্ভ মাত্র কয়েক মাস হল বিশ্বভারতীর কলাভবন থেকে গাদাখানেক নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। তৃণাঞ্জনীর বিশ্বাস, এই ছেলে একদিন খুব বড়ো শিল্পী হবে। এ-কথা সত্যি না মিথ্যে জানি না। মনে হয় না সত্যি। সব মেয়েরাই ভাবে তার প্রেমিক একদিন খুব বড়ো হবে। এতে মাথা ঘামাতে নেই। যাই হোক, কথা ছিল, নীলার্ভ কলকাতায় এসে তৃণাঞ্জনীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যাবে। সেখানে বিয়ে করবে। বাসা ভাড়া করে থাকবে। ফাইনাল মেয়ে দেখার দু-দিনের মধ্যে ঘটনা ঘটবে। সেইমতো সব ব্যবস্থাও সে করেছিল। কিন্তু দু-দিন আগে কোপাই নদীর ধারে গাছের ডালে বসে ছবি আঁকতে গিয়ে ছেলেটি ডাল ভেঙে পড়ে গেছে। তার পা ভেঙেছে। এখন বিছানায়। আমি অবাক হয়ে তৃণাঞ্জনীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'গাছের ডালে বসে ছবি আঁকার কারণ কী?'

তৃণাঞ্জনী গম্ভীর গলায় বলে, 'মনে হয় বাঁদরদের স্কেচ করছিল।'

মেয়ে দেখার দিন মঞ্জুবউদির কথা আমি পুরো রাখতে পারিনি। মঞ্জুবউদি বলেছিল, 'কোনো কথা বলবি না। একেবারে স্পিকটি নট থাকবি।' আমি প্রথমটায় তাই ছিলাম। স্পিকটি নট। মঞ্জুবউদি আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলল। আমি নাকি কম্পিউটার নিয়ে লেখাপড়া করতে খুব শিগ্‌গিরই হামবুর্গ চলে যাচ্ছি। আমি মুখ খুলিনি। শুধু মিটি মিটি হেসেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলাম না। একটা বাড়িতে গিয়ে রাজভোগ গিলছি, কিন্তু কোনো কাজে লাগছি না তা কী করে হয়? লজ্জা করে না? আর 'মেয়ে দেখা' অনুষ্ঠানে দেখলাম কাজ একটাই। মেয়েকে প্রশ্ন করে বিপদে ফেলা। আমি ভাবলাম, সুযোগ যখন পেয়েছি, আমিও বিপদে ফেলি। রাজভোগ খাওয়া শেষ করে ঘর ভরতি লোকের সামনে ফস করে প্রশ্ন করে বসলাম।

'তৃণাঞ্জনী, তোমাকে ছেলের পছন্দ হয়েছে বলে শুনেছি। তোমার কি ছেলেকে পছন্দ হয়েছে? আমাদের বল্টুকে?'

চোখের নিমেষে দেখি মেয়ের মুখ ফ্যাকাসে। সে মাথা নামিয়ে নিল। সবাই নড়েচড়ে বসল। মঞ্জুবউদি জোরে চিমটি কাটল আমার পায়ে। তারপর একগাল মিথ্যে হেসে চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'ওমা! ও ছেলেমানুষ, ও ভালো মন্দর কী বোঝে? সাগর, তুই না একটা পাগল।'

যা বাবা, আজ দেখছি, সবাই আমাকে পাগল ভাবছে। গড়িয়াহাটের পুলিশ পাগল ভেবেছে। মঞ্জুবউদি পাগল ভাবল। মেয়ের বাড়ির লোকজনও নিশ্চয় পাগল ভাববে। আজ আমার পাগল ডে। আমি চান্স নিলাম। পাগল টাইপ লাজুক হেসে বললাম, 'তৃণাঞ্জনী, চা খাব।'

তৃণাঞ্জনীর মা না মাসি গদগদ গলায় বললেন, 'যাও মা, ওনার জন্য চা নিয়ে এসো।'

যা আশা করেছিলাম তাই হল। চায়ের কাপের তলায় তৃণাঞ্জনীর মোবাইল নম্বর লেখা কাগজের টুকরো চলে এল। কে বলে 'মেয়ে দেখা' অনুষ্ঠান ভালো নয়? অনুষ্ঠান না-থাকলে এমন বুদ্ধিমতী মেয়ের সঙ্গে আমার কখনো দেখা হত? বল্টুর মতো বদ গাধার সঙ্গে এই বুদ্ধিমতী সারাজীবন থাকবে কেমন করে! অসম্ভব।

রাতে ফোন করতে তৃণাঞ্জনী মোবাইলেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

'অসম্ভব। আমি কিছুতেই পারব না। আপনার ওই ভাইটি খুব খারাপ। সেদিন ট্যাক্সিতে জোর করে...। ছি ছি। আমি বললাম, ট্যাক্সি থামাও আমি নেমে যাব...।'

আমি নরম গলায় বললাম, 'বল্টুর কথা বাদ দাও। ও একটা বদ। তুমি যে ছেলেটিকে বিয়ে করবে ভেবে রেখেছ তার নাম কী?'

তৃণাঞ্জনী চমকে উঠল, 'আপনি কী করে বুঝলেন?'

আমি সহজ গলায় বললাম, 'তোমার কান্না শুনে। প্রেমে পড়া মানুষের কান্না অন্যরকম। একটা ফোঁপানি, একটু গ্যাপ, আবার দুটো ফোঁপানি। ফের একটা

ফোঁপানি...জটিল ব্যাপার। যাক ওসব, এখন বল, নিজের পছন্দের কথা বাড়িতে বলার সাহস হয়নি কেন?'

তৃণাঞ্জনী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'বলেছি। রাজি হয়নি। নীলার্ভ ছবি আঁকে শুনে বাবা বলেছে, ভিক্ষে করে খেতে হবে। ওই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াও যা মেয়ের মাথায় ক্যানভাসের বাড়ি মেরে খুন করাও তাই। শিল্পী বলে ক্যানভাসের কথা বলেছে। গায়ক হলে হারমোনিয়াম বা তানপুরার কথা বলত। তারপর জোর করে বিয়ের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে।'

'নীলার্ভ জানে না?'

'জানে বই কী। কথা ছিল, আজই ও আসবে, ফাইনাল কথার আগে আমরা পালিয়ে যাব। বিয়ে করব। কিন্তু আজ সকালে ও পা ভেঙে ফেলেছে।'

আমি হাই তুলে বললাম, 'সমস্যা কী? তুমি একা পালাও।'

'আর পারব না, আমাকে নজরে রেখে দিয়েছে। মা বলছে, বিয়ে ফাইনাল, এখন সাবধানে চলতে হবে। যখনই বাড়ি থেকে বেরোবি সঙ্গে কাউকে নিবি।'

কথা শেষ করে মেয়েটা আবার ডুকরে উঠল। আমি আবার হাই তুললাম। এই হাই লম্বা হল।

'তোমার ওই শিল্পী থাকে কোথায়?'

'শান্তিনিকেতন।'

'ঠিক আছে, কাল দুপুরের ট্রেনে আমি তোমাকে নিয়ে পালাব। রেডি থাকবে। শিল্পীকে বলে রাখবে সে যেন ফোনে ফোনে সব ব্যবস্থা করে রাখে। কাল সন্ধেবেলাই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে। রাতে পুলিশ গেলে যেন কিছু করতে না-পারে। এখন ফোন রাখছি। আমার ঘুম পাচ্ছে। তোমাকে একটা রহস্য বলছি, উত্তর খুঁজবে। উত্তর পেলেও আমাকে বলতে হবে না। নিজের কাছে রাখবে।'

তৃণাঞ্জনী অবাক গলায় বলল, 'কী রহস্য?'

'ফুল নেই তবু গন্ধ।'

ঘুমোতে যাওয়ার সময়ে বড়ো লজ্জা করল। আজও এমন ঘটে! কাগজে কাতর বিজ্ঞাপন বের হয়—ফর্সা, সুন্দরী মেয়ের জন্য পাত্র চাই। আজও 'মেয়ে দেখা'র জন্য রাজভোগ, শিঙাড়ার ব্যবস্থা হয়। আজও কালো কুশ্রী মেয়েকে সুন্দর দেখাতে 'কনে দেখা আলো'র জন্য হাপিত্যেস করে বসে থাকে বাবা-মা!

কাউকে বুঝতে দিইনি। এমনকী মঞ্জুবউদিকেও নয়। দুপুরে সটান তৃণাঞ্জনীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। মেয়ের মাকে বললাম, 'ছেলে নতুন গাড়ি কিনেছে। মেয়েকে চড়াতে চায়। বড়োরাস্তায় অপেক্ষা করছে। লজ্জায় এ-বাড়িতে আসতে পারছে না, আমাকে পাঠাল। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে মেয়েকে ঘণ্টা-খানেকের জন্য ছেলে গাড়ি চড়াতে নিয়ে যেতে চায়।'

তৃণাঞ্জনীর মা আনন্দে কী করবেন বুঝতে পারলেন না। গাড়ির কথা শুনে কেমন একটা আলুথালু হয়ে গেলেন মহিলা।

আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'আমি বলি কী এটা অ্যালাউ করবেন না। গাড়ি-টাড়ি চড়া বিয়ের পরই ভালো। এখন গাড়ি চড়াচ্ছে, কাল সোনার হার কিনে দেবে, পরশু নতুন ফ্ল্যাট পছন্দ করতে বলবে। বিয়ের আগে এত খরচ খরচা ভাল নয়। আপনি মেয়েকে ছাড়বেন না।'

মেয়ের মা দশ মিনিটের মধ্যে মেয়েকে রেডি করে দিল। আমি ড্রয়িং রুমে বসে পা নাড়ালাম। এখানেই গতকাল পবিত্র 'মেয়ে দেখা' অনুষ্ঠান হয়েছিল।

ট্রেন বোলপুর পৌঁছোতে আর বেশি দেরি নেই। তৃণাঞ্জনী কেন যে আমার ওপর রেগে আছে? থাকুক, যত খুশি রেগে থাকুক। আমি ঠিক করেছি, আজ রাতে বিয়ে হয়ে গেলে, ওর বরকে আমি অনুরোধ করব, সে য়েন আমাকে একটা ছবি এঁকে দেয়। অয়েল পেন্টিং। ছবির বিষয় অতি সহজ। ফুল হাতে এক ভিখিরি। ভিখিরি মুগ্ধ চোখে ফুলের দিকে চেয়ে থাকবে। ছবিটা আমি রেবাকে উপহার দেব। ভালোবাসার মানুষকে ভালোবাসার উপহার।

তৃণাঞ্জনী কেন আমার ওপর রেগে আছে বুঝলাম রাতে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার কাগজপত্র বুঝিয়ে চলে যাওয়ার পর। নীলার্ভর ভাড়া করা বাসার বারান্দায় তিনজন বসে আছি। পা ভাঙা জামাই চমৎকার হয়েছে। সমস্যা একটাই, ছেলের এখনও রোজগারপাতি নেই। প্ল্যান করেছে, ছবি এঁকে চালাবে। বেচারির যে কী দুর্দশা হবে আমি বুঝতে পারছি।

চৈত্রের তারা ভরা আকাশ শান্তিনিকেতনের ওপর ঝাঁপ দিয়েছে। চাঁদ কি উঠেছে আজ? হাওয়ায় ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। বোধ হয় অনেকদূরে কোথাও ঝড় দিয়েছে। বৈশাখ আসছে।

তৃণাঞ্জনী নীচু গলায় বলল, 'একটা দিন কি আমাদের সঙ্গে থেকে যাওয়া যায় না সাগরদা? একটা দিন?'

আমি হেসে বললাম, 'না, আজই রাতের গাড়ি ধরব। কাল কলকাতায় আমার কাজ আছে। মেয়ে পাচারের দায়ে পুলিশ আমাকে খুঁজছে না?'

তৃণাঞ্জনী আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আপনি যাবেন না। দোহাই আপনাকে।'

আমি হাত সরিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিলাম। ফিসফিস করে বললাম, 'অ্যাই, সবাই চোখ বোজ।'

নীলার্ভ বলল, 'কেন সাগরদা! চোখ বুজব কেন?'

'বোজই না, একটা দারুণ মজা হবে।'

আমরা চোখ বুজেছি। বেল ফুলের গন্ধে চারপাশ ম ম করে উঠেছে।

ছেলেটাকে একটু দেখুন



বেঞ্চটার পাশে এসে দাঁড়ালাম। আকাশে মেঘ ডেকে উঠল। সেই ডাক গম্ভীর এবং দীর্ঘ।

প্ল্যাটফর্মে এই একটাই বেঞ্চ। সেখানে বুড়োটে ধরনের একটা লোক বসে আছে। তোবড়ানো গালে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। ধনী মানুষের দাড়ি বড়ো হওয়ার পিছনেও তাল জ্ঞান থাকে। এই মুখের দাড়ি বড়ো হয়েছে হেলাফেলায়, গরিবি কায়দায়। লোকটার হাঁটু পর্যন্ত ময়লা কাপড়। জামার অবস্থাও তথৈবচ। একটা পা মুড়ে তুলে দিয়েছে ওপরে। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় সরানো। এক হাতে বিড়ি, অন্য হাতে বিচ্ছিরিভাবে পেট চুলকোচ্ছে। রেলস্টেশনে দু-ধরনের মানুষের যাতায়াত। একদলের চোখে-মুখে সবসময় টেনশন। ট্রেন কখন আসবে? এলে কোন প্ল্যাটফর্মে দেবে? দিলে ঠিকমতো বসার জায়গা পাওয়া যাবে তো? বসার জায়গা যদি-বা পাওয়া যায় তাহলে লেট করবে কি? লেট করলে কাল সকালে কখন পৌঁছোনো যাবে? লম্বা মালার মতো লম্বা টেনশন। আর একদল থাকে যাদের মুখ দেখে মনে হয়, কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না। ট্রেন এলেও যা, না-এলেও তাই। লেট করলেও যা, না-করলেও তাই। এই লোক সে-রকম। বিড়ি টানার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, এর কিছু যায় আসে না।

আমি আরও এক পা এগিয়ে এলাম। এবার ছেলেটাকে দেখতে পেলাম। মেরেকেটে সাত আট বছর বয়স। মাথা উলটো দিক করে লোকটার পাশে শুয়ে আছে। হাঁটু দুটো বুকের কাছে গোটানো। ঘুমোচ্ছে। বুড়োটা পেট চুলকোনো থামিয়ে পরম যত্নে ছেলের পায়ে হাত বুলিয়ে দিল।

প্ল্যাটফর্মে একটা বেঞ্চ মানে বসার জায়গা আর নেই এমন ভাবার কোনো মানে হয় না। এই ধরনের পাড়াগাঁয়ের স্টেশনে অন্য ব্যবস্থা থাকে। শেডের বাইরে কোনো গাছতলা বাঁধানো আছে। ইচ্ছে করলে সেখানে বসা যায়। কিন্তু যেকোনো

মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হবে। গাছতলায় যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাই আমি এই বেঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। শুধু বসার জন্য নয়, অন্য কারণ আছে। এই অকিঞ্চিৎকর স্টেশনে যে সামান্য দু-তিনটে জায়গায় আলো জ্বলছে তার একটা এই বেঞ্চের মাথায়। যদিও আলোর অবস্থা অতি শোচনীয়। আলো ঘিরে মাকড়সার জাল, ধুলো জমেছে। মনে হয় ব্রিটিশ আমলের ধুলো। সেই রেললাইন তৈরির সময় থেকে জমছে। ফলে যত না আলো, তার থেকে অন্ধকার বেশি। তবু তো আলোর ভাব। সঙ্গে টাকাপয়সা থাকলে, আলো ভরসা জোগায়। আমার সঙ্গে টাকা আছে। খুব বেশি নয়, কিন্তু আছে। কালেকশনের টাকা। তবে তার মানে এই নয় যে আমি 'ভরসা' পেতে হাঁকুপাঁকু করছি। টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো আমার অভ্যেস আছে। একটু সাবধান হচ্ছি এই যা।

লোকটা মুখ তুলে তাকাল। একটু চমকে উঠল যেন। চমকানোরই কথা। এ-রকম হাবিজাবি স্টেশনে আমার মতো চকচকে পোশাকের 'ভদ্রলোক' ক-টা দেখা যায়? দিনে একটা তো দূরের কথা, সপ্তাহে একটা কিনাও সন্দেহ। তাও তো এটা শীতের সময় নয়। শীতের সময় কোনো কোনোদিন আমি কোট টাই পরে কাজে বেরোই। ঠেঁটা পার্টির কাছে কোট টাই, জুতো ভালো রেজাল্ট দেয়। কালেকশন ভালো হয়। সময় যতই আধুনিক হোক না কেন, গ্রাম দেশের দিকে এখনো কোট টাই আর ইংরেজি ভাষা ভয়ের জিনিস। অনেকে ভাবে পুলিশে চেনাজানা আছে। আজ আমার গায়ে কোট টাই না-থাকলেও জামা প্যান্ট ভালো। আমি ইঙ্গিত করে লোকটাকে বোঝালাম, 'বসতে চাই'। হাতের বিড়ি ফেলে ধড়মড়িয়ে পা নামাল বুড়ো। ঘুমন্ত ছেলেকে ঠেলে সরিয়ে হাত দুই জায়গা করে বলল, 'আসেন আসেন। বসেন স্যার।' তারপর নিজেই হাত দিয়ে বেঞ্চের ময়লা ঝেড়ে দিতে লাগল অতি উৎসাহে। আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, 'থাক, আমি করে নিচ্ছি।' করার কিছু নেই, মুখ নামিয়ে একটু ফুঁ দিলাম। বসলাম কোনোরকমে। রেলকোম্পানির লোহার ভাঙা বেঞ্চে কোনোরকমেই বসতে হয়। ব্রিফকেসটা রাখলাম ডান পাশে, কনুইয়ের নীচে। পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখলাম, না, এখনো সিগন্যাল নেই। সকালে এখানে আসার পর থেকেই এ-রকম হচ্ছে। সিগন্যাল আসা যাওয়া করছে। টাওয়ার দুর্বল। এখন একেবারে ভ্যানিশ। আসার সময় অবশ্য ট্রেনে আসিনি। পুরুলিয়া থেকে বাসে ঢুকেছি সকালে। কাল পুরুলিয়ায় কাজ করেছি। কালেকশনের সঙ্গে ফিল্ড ইনস্পেকশন। মোটরপাম্পের কোম্পানি। খাটনি বেশি। তবে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে। ভালো লাগে প্রকৃতির শোভা দেখতে নয়, বাড়তি টাকার জন্য। ফিল্ডে কাজ করলে দু-ধরনের বাড়তি টাকা পাওয়া যায়। একটা সোজা পথে একটা বাঁকায়। কালেকশনের ওপর কমিশন আছে। নিজের কোম্পানির ব্যাপার। সোজা পথের আয়। আর বাঁকা পথের উপরি হল অন্য কোম্পানির জন্য সার্ভে করা। করতে গেছি মোটরপাম্পের কাজ, একইসঙ্গে জেনে এলাম ধানবীজ, সার, হাঁস মুরগির খাবারের মার্কেট। সঙ্গে অর্ডার। ছোটোখাটো কো· ়ানি সবসময় দূরে দূরে

লোক পাঠাতে পারে না। ওদের লাভ। মুখে মুখে রিপোর্ট দিলেই হয়ে যায়। নগদ টাকা চলে আসে। কেউ জানতে পারে না। শুধু যাওয়ার আগে টেলিফোন করে বলতে হয়—'কাল বেরোচ্ছি। তোমাদের কিছু জানতে লাগবে নাকি?' বলার মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ ভাব রাখতে হয়।

বিয়ের প্রথম প্রথম আমার এত ট্যুর নিয়ে মল্লিকা আপত্তি করত। টাকার কথাটা বুঝতে চাইত না। আমি বলতাম, 'অরে বাপু শরীর থাকতে থাকতে রোজগার করে নিতে হবে।'

মল্লিকা মুখ নামিয়ে, আঙুল দিয়ে আমার জামার বোতাম নাড়াচাড়া করতে করতে বলত,'আর আমার বুঝি শরীর নেই? রাতে একা শুয়ে ছটফট করি বোঝ না?'

এসব আহ্লাদির কথা। নতুন বউয়ের আহ্লাদ। আমি হাত দিয়ে মল্লিকার চিবুক তুলে তার চোখের দিকে তাকাতাম।

'সব পুষিয়ে দেব।'

'কচু দেবে। সময় চলে গেলে এ জিনিস পোষানো যায়?'

'খুব যায়।'

মল্লিকা রেগে গিয়ে বলত, 'তোমায় বলেছে। খালি কাজ কাজ আর কাজ। আমি যেন কেউ নই। তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন?'

আমি আরও বেশি করে হেসে বলি, 'কাজ বলছ কেন সোনা? বল টাকা, টাকা আর টাকা। এত টাকা আমি কাকে দেব? তাই বিয়ে করেছিলাম।'

তখন না-মানলেও মল্লিকা পরে মেনে নিয়েছে। টাকার হিসেব বুঝেছে। বুঝেছে অফিসে বসা বাবুর থেকে বাইরে টই টই করলে লাভ বেশি। রোদে জলে স্বামীর রং খানিকটা তামাটে মেরে যায় এই যা। সে যাক। পুরুষমানুষের গায়ের রঙের দাম নেই। পুরুষমানুষের দাম তার উপার্জনে।

ঘন ঘন মেঘ ডাকার পর বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

'স্যার কি কলকাতায় চললেন?' বুড়োটে লোকটার কথায় ঘোর কাটল। গ্রামের মানুষ হলেও লোকটার মুখে শহুরে ভাষা। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমি মাঠে ঘাটে ঘুরি। ঘুরে দেখেছি, গাঁয়ের মানুষ শহরের সুযোগ সুবিধে পায়নি, কিন্তু ভাষা পেয়েছে। অচেনা লোকের সঙ্গে ভাব জমানো কোনো কাজের কথা নয়—এই নিয়ম সবসময় মানলে চলে না। আমার সঙ্গে মেয়ে বউ নেই। আমি নিজেও কচি খোকা নই যে অচেনা লোকের দেওয়া চা বিস্কুট খেয়ে জ্ঞান হারাব। এই নির্জন রেলস্টেশনে একজন সঙ্গী জোটানো মন্দ নয়। লোকটার চেহারা ছবি দেখে বদ মনে হচ্ছে না। সঙ্গে আবার একটা ছোটো ছেলে রয়েছে। পাশে পুঁটলির মতো ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ছেলে, ক্যাম্বিসের ব্যাগ নিয়ে নিশ্চয় ডাকাতি করতে বসে নেই।

লোকটা আবার প্রশ্ন করল, 'স্যার কি কলকাতা?' প্রশ্ন করে খয়েরি দাঁত বের করে হাসল।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, 'হ্যাঁ, আপনি?'

'আমি বর্ধমান যাচ্চি। আমাকে তুমি বলেন স্যার। আপনার থেকে বয়েসে ছোটো।'

ছোটো! বয়স কম করে আমার থেকে দশ বছর বেশি। দশ না-হলেও সাত আট তো হবে। একে 'তুমি' বলব কী করে! আসলে গ্রামের গরিবগুরবোরা এখনো 'তুই তোকারি'তে সহজ। আমি মৃদু হাসলাম। বললাম, 'আপনার বাড়ি বুঝি এখানে?'

বুড়োর মুখের বিড়ি নিভু নিভু। ঘন ঘন টান মেরে নাক মুখ দিয়ে ঘন ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, 'না এখানে নয় স্যার, কনুরে।'

'কনুর! সেটা কোথায়?'

'দূর আছে। বাসে তিন, সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগে যায়। আজ আবার গোড়াতেই বাস গেল বিগড়ে। পথে বসে গেল। বিকেলের ট্রেন ফেল করেছি।'

কথা বলতে বলতে পাশে-শুয়ে-থাকা ছেলের হাত পা ঠেলেঠুলে ঠিক করে দিল আবার। বোকা হেসে বলল, 'সেই সকালে বেরিয়েছে, আর পারে? দেকুন দিকি অবস্তা। ঘুমিয়ে কাদা।'

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বেশ জোরেই শুরু হয়েছে। একেবারে ঝমঝমিয়ে না-হলেও জোর আছে। আপ লাইনে জল ঝরাতে ঝরাতে একটা মালগাড়ি দীর্ঘসময় ধরে স্টেশন পেরোল। এক কাপ চা পেলে ভালো হত। এই গাঁইয়া স্টেশনের ভেতরে চা-টায়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। স্টেশন আছে এই যথেষ্ট। বাইরে ঝুপড়ি মতো একটা দোকান দেখেছি না? মনে পড়ছে না। পড়লেই-বা কী এসে যায়? বৃষ্টি মাথায় তো আর সেখানে চা খেতে যাব না।

'ছেলের গায়ে একটা চাদর দিয়ে দিন। বেচারির শীত করছে।'

একেবারেই খেজুরে কথা। বলতে হয় তাই বলা। লোকটা কিন্তু আমার কথা শুনে কাঁচুমাচু হয়ে গেল।

'সঙ্গে চাদর-টাদর কিছু রাখিনি স্যার। ইস বড্ড ভুল হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম দিনে দিনে পৌঁছে যাব। ঝড় জল হবে তাও জানতাম না। কী যে হবে...'

লোকটার উদ্‌বেগ দেখে হাসি পেল। আবার ভালোও লাগল। বুড়ো বয়সের সন্তান সম্পর্কে স্নেহ অতিরিক্ত হয়। ছেলের মা কোথায়? বুবাই তো মল্লিকা ছাড়া দশ মিনিটও থাকতে পারে না। বুবাই অবশ্য আরও ছোটো। সবে তিন চলছে। মেয়েটাকে মল্লিকা বড্ড আতুপুতু করে তৈরি করছে। আমি ঠাট্টা করে বলি, 'তুমি তো সবসময় হাতে জল নেকড়া নিয়ে ছুটছ দেখছি।'

'মানে!' মল্লিকা ভুরু কোঁচকায়।

'মানে আর কী, মেয়ে কোথাও পা রাখার আগে জায়গা মুছে দিচ্ছ। পাছে হাতে পায়ে ধুলো লাগে।'

'তাতে তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে জানতে পারি কি?'

আমি আড়মোড়া ভেঙে উদাসীন ভঙ্গিতে বলি, 'না, আমার অসুবিধে নয়, পরে মেয়ের যাতে অসুবিধে না হয় তাই ভাবছি। বেচারিকে তো এই ধুলো কাদার দুনিয়াতেই বাঁচতে হবে। তুমি তো আর মাথায় করে রাখতে পারবে না।'

মল্লিকা ঠোঁট বেকিয়ে বলে, 'আর তুমি? তুমি কম কর? এর মধ্যেই মেয়েকে আশকারা দিয়ে মাথায় তুলেছ। মুখ ফুটে একটা কিছু চাইলেই হল। ড্রেস, রঙের বাক্স, পেনসিল, পুতুল রাখবার তো আর জায়গা নেই ঘরে।'

আমি চোখ নাচিয়ে বলি, 'আরে বাবা, ওটা ঘুস। বাড়িতে ক-টা দিন থাকি বল? মেয়েকে তো চুপ করিয়ে রাখতে হবে। যদি বল তোমাকেও ঘুস দিতে পারি। শুধু একবার চেয়ে দেখ না। একটা চাইলে দশটা দেব।'

মল্লিকা চোখ পাকিয়ে বলে, 'অসভ্য।'

যে-বৃষ্টি হঠাৎ নামে তার জোর বেশি হয়। এই বৃষ্টির বেলাতে তা হয়নি। এই বৃষ্টি হঠাৎ নামেনি। বিকেল থেকেই টিপটিপ করে পড়ছিল। সঙ্গে স্যাঁৎসেঁতে হাওয়া। স্যাঁৎস্যাঁতে হাওয়া ভালো লক্ষণ নয়। এর মানে 'জমিয়ে আসছে'। আমি অবশ্য 'জমিয়ে আসা'র আগেই স্টেশনে পৌঁছে গেছি। এখন মনে মনে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছি। ভাগ্যিস সময়মতো বেরিয়ে পড়েছিলাম। একটু কাজ বাকি রইল। সে থাক। মাস তিন পরে তো আবার আসতে হবে। দেরি করলে পথেই ঝামেলায় পড়তাম। সন্ধের পর অজ গ্রামের পথে ঝড়বৃষ্টি ডেনজারাস জিনিস। স্টেশন পর্যন্ত আসা মুশকিল হত। কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার পথ কম নয়। তাও রাস্তা যদি ভালো হত। ভাঙা বললে কম বলা হয়। কিছু কিছু জায়গায় তো মনে হচ্ছিল, পথই নেই। মাঠের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। আজই প্রথম বাস চলল। অনেকটা সময় লেগে গেল। স্টেশনে পৌঁছে টিকিট কেটে শেডের তলায় আসতে-না-আসতে বৃষ্টির ফোঁটা। সঙ্গে মেঘের গর্জন। এখন আকাশ ভেঙে নেমেছে। সঙ্গে এলোপাথাড়ি হাওয়া। মনে হচ্ছে, অন্ধকারে কেউ যেন সাদা রঙের কাপড় ধরে দোলাচ্চে। মাঝেমধ্যেই এফোঁড় ওফোঁড় করে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। সেই ঝলকানিতে নিমেষের জন্য আশপাশ খানিকটা স্পষ্ট হচ্ছে। দু-পাশে চলে যাওয়া রেললাইন ভেসে উঠছে চোখের সামনে। আবার সব ডুব মারছে অন্ধকারে। থেকে থেকে কান ফাটানো বাজের আওয়াজ। গ্রামের দিকে ঝড় বৃষ্টির দাপটই অন্যরকম। একবার শুরু হলে মনে হয় আর থামবে না। বেশি বয়েসেও ভয় ভয় করে। তবে এই মুহূর্তে শুধু ভয় নয়, কেমন একটা অস্বস্তিও হচ্ছে। অস্বস্তির কারণ বৃষ্টি নয়, অস্বস্তির কারণ পাশে বসা লোকটার নির্লিপ্ত ভাব। ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাতে কিছু এসে যাচ্ছে না যেন!

'খুব বৃষ্টি হচ্ছে।'

লোকটাকে দেখতে যতটা বুড়ো লেগেছে, এখন বুঝতে পারছি ততটা নয়। জামার বুকপকেট থেকে আর একটা বিড়ি বের করল।

আমি আবার বললাম। খানিকটা মনে মনে।

'এত বৃষ্টি হচ্ছে। লাইনে জল-টল জমে না-যায়।'

'যেতে পারে। গেলে চিত্তির। গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে।'

গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে! লোকটা বলে কী? ট্রেন না-এলে এখানে রাত কাটাব কোথায়? আমি ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশে ভালো করে তাকালাম। যদিও 'ভালো করে তাকানো'র কিছু নেই। মাঠঘাট, ধানখেতের মাঝে একটুকরো রেলস্টেশন। এর আর ভালো করে দেখার মতো কী আছে? লাইনের এপাশে-ওপাশে দুটো নির্জন প্ল্যাটফর্ম। পড়ে আছে হেলাফেলায়। ওদিকেরটায় মানুষজন নেই। এদিকে হাতে গোনা দু-তিনজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একেবারেই দু-তিনজন। তার মধ্যে এক জোড়া মহিলা পুরুষ মাটিতেই উবু হয়ে বসে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, আমার মতো ট্রেন ধরতে এসেছে। শহুরে রেলস্টেশনে ভবঘুরে থাকে। অকারণে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের দিকে সেসব হয় না। এখানে যারা আসে তার কাছেই আসে। এখন মোটে আটটা। মনে হচ্ছে অনেক রাত। মাথার ওপরে অপরিসর টিনের শেড। তাতে বৃষ্টির তুমুল আওয়াজ। হাতুড়ি পিটছে। শেড ছাপিয়ে বৃষ্টি ভাসিয়ে দিচ্ছে প্ল্যাটফর্ম। তাও তো এখানে শেড আছে। মাথাটুকু বাঁচছে কোনোরকমে। অনেক স্টেশনে তাও থাকে না।

লোকটা বোধ হয় আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারল। অল্প হেসে বলল, 'চিন্তা করেন না স্যার। সে-রকম হলে, আপনার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার একটু গেলেই। আপনার কথা বললে না করতে পারবে না।'

এই কথায় আমি কোনো আশ্বাস পেলাম না। ঘুমন্ত ছেলে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেটাই স্বাভাবিক। যত সময় যাচ্ছে বাতাসে ঠান্ডা ভাব বাড়ছে। লোকটা আবার তার ছেলের গায়ে হাত রেখেছে। আমার ব্রিফকেসে একটা হালকা চাদর আছে। হোটেলে থাকলেও বিছানায় নিজের চাদর না-পেতে শুতে পারি না। চাদরটা বের করে দিলে কেমন হয়?

নিজেই নিজের মনে ব্রেক কষলাম। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কোথাকার কে, চিনি না, জানি না...। সময় কাটাতে হয়, সময় কাটাচ্ছি। ব্যস এর বেশি কিছু নয়। ট্রেন এলে উঠে যাব। কিন্তু যদি না-আসে? লোকটা কি সত্যি স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে নিয়ে যাবে? ছিনতাই-টিনতাইয়ের প্ল্যান নয় তো? কেন হবে? আমার কাছে টাকা আছে জানবে কী করে? গলা নরম করে বললাম, 'কী আর করবে। ছেলের গায়ের জামাটাই টেনেটুনে দাও ভালো করে।'

নিজের অজান্তেই 'তুমি' বেরিয়ে এল। লোকটা এক গাল হেসে বলল, 'আমার ছেলে নয় স্যার। আমার ভাগনে।'

আমি অবাক হলাম। যদিও অবাক হওয়ার কিছু নেই। মামা-ভাগনে একসঙ্গে ট্রেনযাত্রা করতে পারে না এমন কোনো নিয়ম নেই। আসলে এতক্ষণে যাদের পিতাপুত্র ভেবে আসছিলাম...। ভাবনায় ভুল হলে একটা ধাক্কামতো লাগে।

'ও। আমি বুঝতে পারিনি।'

লোকটা গল্প করার কায়দায় বলতে শুরু করল।

'আমার বোনের বাড়ি বর্ধমান সদর থেকে আরও খানিকটা যেতে হয় স্যার।

তার চার পুত্রকন্যা। এইটা হল গিয়ে একেবারে ছোটো। ওপরে তিনটে আছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা করে আমার কাছে এনে রাখি।'

আমি হেসে ফেললাম।

'বাঃ, ওদের বেশ মজা তো। মামার বাড়ি বেড়িয়ে যায়।'

লোকটাও হাসল। বলল, 'মজা নয় স্যার, বোনটার উপকার হয়। এই বাজারে চার চারটে পেটের খাওয়াদাওয়া তো কম কথা নয়। বিরাট বিপদ। বোঝেনই তো স্যার। তাই পালা করে এনে রাখি। ভালো মন্দ কিছু দিতে পারি না, তবে পেট ভরিয়ে দিই। এবার ছিল এইটার পালা। আমার বাসায় পেট পুরে খেয়ে গেল।'

আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। দুঃখের কাহিনি শুরু হলে ভয় করে। সাধারণত এইসব কাহিনির পিছনেই সাহায্যের কথা চলে আসে। তবে এই লোককে ঠিক সে-রকম বলে মনে হচ্ছে না। যারা দুঃখের কাহিনি হাসিমুখে বলে তারা সাহায্য চায় না।

'তোমার ভগ্নীপতি করে কী? কাজকর্ম কিছু করে?'

'বুড়োটে' আবার হাসল। ফিচ করে হেসে হাত নাড়ল, 'হারামজাদা বহুদিন আগে কেটে পড়েছে। বছরের পর বছর রোজগারপাতি ছিল না। শুধু বাবা হয়েছে। গাদাখানেক মদ গিলে একদিন লাইনে দিল ঝাঁপ। যদিও ঝাঁপ দিয়েই মল না। হাসপাতালে শুয়ে রইল ছ-মাস। প্রথমে বেড দিল। তারপর নামিয়ে দিল মাটিতে। সেখানে হল নিমোনিয়া। মরল তাতে। আমার এই ছোটো ভাগনে তখন বোনের পেটে। ছোটো ভাগনির নাম দিয়ে গেল। শিলু।'

'ও গড।' অস্ফুটে বললাম। যতই হোক মৃত্যুর ঘটনা।

লোকটা এবার বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়ল। ছেলেটাকে পরম যত্নে সরিয়ে দিল ভিতর দিকে। গড়িয়ে না পড়ে

বাতাসে জোর কমলেও বৃষ্টি বেড়েছে। প্ল্যাটফর্মে জলে থইথই করছে। আমার পায়ের তলাতেও জল।

'বোন ঠিক করেছিল, ছেলে-মেয়ে সুদ্ধু বিষ খাবে। আমি গিয়ে বললাম, চড় মেরে দাঁত ফেলে দেবো হারামজাদি। তোর বর না-থাকুক, দাদা তো রয়েছে। বিয়ে থা করিনি। সংসারে খরচপাতি নেই। মণ্ডা মিঠাই না-পারি, এগুলোকে ফ্যান ভাত তো দিতে পারব। মামার কাছে ভাগনে ভাগনিরা বড়ো হয় না? খুব হয়। তোর ছেলে-মেয়েদেরও বড়ো করে না হয় মরব। যমরাজের সঙ্গে চুক্তি থাকবে। মামা-ভাগনে চুক্তি।'

আমি চুপ করে রইলাম। লোকটা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। আমার শরীর সামান্য কেঁপে উঠল। শীতে? নাকি আবেগে? একটু আগে অন্যরকম ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম কাঁদুনি গাওয়া শেষ হলে সাহায্য চাইবে। ছি ছি। আসলে আমরা এ-রকমই হয়ে গেছি। একমুখী ভাবি। ভাবি সবাই ঠকিয়ে নেবার তাল করে আছে। ঘুমন্ত বালকের দিকে তাকিয়ে একটু যেন লজ্জা লাগছে।

লোকটা এবার বেঞ্চ থেকে নেমে পড়ল। আড়মোড়া ভেঙে ঝুঁকে তাকাল বাইরের অন্ধকারে।

'বৃষ্টি এবার ধরবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ধরবে মানে! আবার তো জোরে এসেছে।'

বুড়োটে তার তোবড়ানো গালে হাত বুলিয়ে বলল, 'থামবে বলেই তো শেষবারের মতো জোর দিয়েছে। আপনে স্যার পা তুলে আরাম করে বসেন। ইচ্ছে করলে জুতোটাও খুলে নিতে পারেন।'

আমি বললাম, 'না থাক। ট্রেনেরও সময় হয়ে এল।'

'তা হল।' তারপর খানিকটা অন্যমনস্কভাবে ঘুমন্ত শিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আহা রে! বেচারির পেটে কতক্ষণ যে কিছু পড়েনি। এত রাতে ট্রেনেও তো কিছু পাব না।' নীচু হয়ে ছেলের মাথার চুলে হাত বোলাল লোকটা। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'একটা কাজ করলে কেমন হয় স্যার?'

'কী?'

'চট করে গিয়ে ছেলেটার জন্য কিছু খাবার যদি কিনে আনতে পারি...।'

আমি খুশি হলাম। বললাম, 'খাবার! এই ঝড়জলে খাবার পাবে কোথায়?'

'এই তো বাইরেই ঝুপড়ি আছে। রুটি কলা যা পাই।'

'ভিজে যাবে কিন্তু।'

লোকটা হেসে বলল, 'না ভিজব না। বৃষ্টি ধরে এসেছে।'

সত্যি বৃষ্টি ধরে এসেছে। হাওয়াও কম। আমার খুব ভালো লাগল। ঝড় জল কমা মানে ট্রেন আসবে। রাতে এই নির্জন স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে না। আমি পকেট হাতড়ে মানিব্যাগ বের করলাম। দশ টাকার একটা নোট বের করে বললাম, 'নাও, এইটা ধর।'

লোকটা টাকার দিকে তাকিয়ে যেন সিঁটিয়ে গেল! হাতজোড় করে কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'এইটা মাপ করবেন স্যার।'

'কেন?' আমি হাসলাম। বললাম, 'তোমার ভাগনের খাবার জন্য আমি পয়সা দিতে পারি না? নাও ধর।'

'অবশ্যই পারেন। কিন্তু এইটা স্যার আমি নিতে পারব না। বোনকে কথা দিয়েছি, তোর ছেলে-মেয়েগুলো আমার কাছে যখন থাকবে আমিই তাদের খাওয়াব। চিন্তা করিস না, এদের জন্য কখনো কারো কাছে হাত পাতব না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'দুর এ তো মোটে দশ টাকা।'

'দশ না এক-শো বড়ো কথা নয় স্যার। এতে কথার খেলাপ করা হবে। আমাকে ক্ষমা করেন। আপনে বরং ছেলেটাকে একটু দেখেন। আমি এক ছুটে আসছি...।'

মনটা ভরে গেল। এখনো এ-রকম মানুষ আছে! এরপর আর টাকার জন্য জোর করা চলে না। টাকা মানিব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে আমি মুচকি হাসলাম। বললাম, 'আচ্ছা যাও, আমি আছি। চট করে চলে এস।'

'যাব আর আসব স্যার। পাঁচ মিনিটও লাগবে না।'

লোকটা টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যেই লম্বা লম্বা পা ফেলে প্ল্যাটফর্ম পেরোতে লাগল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার যদি দেখি ছেলেটা ঠান্ডায় কাঁপছে তাহলে ব্রিফকেস থেকে চাদরটা বের করে দেব।

পাঁচ কোথায়, দশ, পনেরো, কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে লোকটা ফেরেনি!

ছেলেটা এতক্ষণ গুড়িসুড়ি মেরে ঘুমোচ্ছিল। এবার উঠে বসেছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল চারপাশে। নিশ্চয় 'মামা'কে খুঁজছে। তারপর পাংশুটে মুখে সরে এল আমার দিকে। সাত আট বছরের একটা বাচ্চা ভয় পেয়ে কাছে চলে এলে কী করা উচিত? পাশে রাখা ব্রিফকেসটা তুলে নিলাম কোলে। আড়চোখে ছেলেটার দিকে তাকালাম। একেবারে ভিখিরির মতো না হলেও ছেলেটার জামা প্যান্টের অবস্থা খুবই খারাপ। বোতামের বদলে জামার বুকে সেফটিপিন লাগানো। বাকিটুকু খোলা। বৃষ্টি শেষের শিরশিরে হাওয়ায় উড়ছে। হাফপ্যান্টের রং চটা। পায়ে চটি জুতো কিছু নেই। ধুলো মাখা কম আলোতেই দেখতে পাচ্ছি, চোখদুটো বড়ো বড়ো। সুন্দর বড়ো নয়, ডেলা পাকানো বড়ো। অপুষ্টিতে এ-রকম হয়। মাথা ভরতি জট পাকানো চুল উড়ছে এলোমেলোভাবে।

আমি ঢোক গিলে বললাম, 'তোমার মামা এখুনি আসবে।'

ছেলেটা কোনো কথা বলল না। একইরকমভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কী হল? এই ছেলে কি কথা বলতে পারে না?

'তোর নাম শিলু?'

এবারও কোনো উত্তর নেই। আমার শরীরে কেমন ঝিম ধরে এল। এই ছেলে কি কানেও শুনতে পায় না? কোনো গোলমাল হল? কী গোলমাল হবে? বৃষ্টি তো থেমে গেছে। কোথায় গেল?

'ভয় পাস না, তোর মামা এখুনি এসে পড়বে।'

ছেলেটার চোখ বিস্ফারিত হল। 'ভয় পাস না' শুনে আরও ভয় পেয়ে গেল যেন! মনে হচ্ছে 'মামা' শব্দটা এই প্রথম শুনছে।

লোকটা কোথায়? খুঁজতে হবে। ট্রেন যদি চলে আসে। আচ্ছা, আমি এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন? আমার কী? কিছুই নয়। এই বেঞ্চ থেকে সরে যাই। পালিয়ে যাই। তাহলেই তো...আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর তখনই দূরে ট্রেনের আলো ভেসে উঠল অন্ধকারে। বেজে উঠল হুইসল। জলে ভিজে সেই আওয়াজ ভোঁতা, ঘ্যাস ঘ্যাসে। আমার হাত পা কাঁপছে। কাঁপার কী আছে? নিশ্চয় লোকটা এখনই চলে আসবে। আসবেই। আমি স্টেশনের গেটের দিকে তাকালাম। কেউ নেই! কেউ কোথাও নেই! প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে থাকা তিন চার জন এগিয়ে গেছে। আমি স্টেশনের গেটের দিকে তাকালাম। কেউ নেই! কেউ কোথাও নেই! প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে থাকা তিন চার জন এগিয়ে গেছে। ট্রেন ঢুকছে। ঢুকছে স্টেশন ও আমার বুক কাঁপিয়ে।

গাড়ি দেড় মিনিটের বেশি এখানে দাঁড়ায় না। তার মধ্যে কি শিলুর মামা ফিরবে না? অবশ্যই ফিরবে। যে-মানুষটা ভাগনেকে অত ভালোবাসে...। তার অবশ্যই দায়িত্বজ্ঞান আছে।

আমি দু-পা এগিয়ে গেলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম বেঞ্চের দিকে। তাকিয়েই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মাথাটা ঘুরে গেল। ব্যাগটা! ক্যাম্বিসের ব্যাগটা কোথায়? লোকটা নিয়ে গেছে। আমি বুঝতেও পারিনি! তার মানে লোকটা পালিয়েছে, ছেলেটাকে ফেলে...।

শিলু একইভাবে বসে আছে। তাকিয়ে আছে অবাক চোখে। যেন গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে এই দুনিয়ার দিকে।

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। আমি কী করব? কী করব আমি? উন্মাদের মতো চারপাশে তাকাচ্ছি। এমন কাউকে যদি পাওয়া যায় যাকে বলব—'দাদা, ছেলেটাকে একটু দেখুন। আমি এক ছুটে আসছি...। যাব আর আসব পাঁচ মিনিটও লাগবে না।'